ভূমিকা

এবছর আমার বিশেষ আনন্দের কারণ হয়ে উঠে মানব প্রযুক্তির নবীনতম উদ্ভাবন ই-মেইল। এর মাধ্যমে সুদুর আমেরিকার আটলান্টা থেকে একটি বার্তা আসে অপরিচিতা লেখিকা বন্যা আহমেদ-এর কাছ থেকে। বার্তাটির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল *বিবর্তনের পথ ধরে* শীর্ষক বইয়ের কয়েকটি অধ্যায়। বইটি সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য আমাকে অনুরোধ করেন তিনি।

আকস্মিক এ ঘটনায় আমি যারপর নাই বিস্মিত হই। কিন্তু অধ্যায়গুলো পড়ে আমি হই ততোধিক আনন্দিত। কারণ অনেক। প্রথমত, বইটি বিবর্তনবিদ্যা সংক্রান্ত। আর বহু বছর যাবত আমার একাডেমিক আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু বিবর্তনবিদ্যা। দ্বিতীয়ত, বইটি আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলায় লেখা। এদেশে বাংলা ভাষায় উঁচু মানের বিবর্তনবিদ্যার বইতো দূরের কথা, বিজ্ঞানের যেকোন শাখার বইই দুষ্প্রাপ্য। তৃতীয়ত, এর রচনাশৈলী বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত একাডেমিক রীতির বদলে জনপ্রিয় ও সহজবোধ্য রীতি। চতুর্থত, বইটি আধুনিক তথ্যে সমৃদ্ধ। পঞ্চমত, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে প্রচলিত সৃষ্টিবাদী (creationist) বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর (paradigm, worldview) বদলে আধুনিক বিবর্তনবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী গঠনে বিবর্তনবিদ্যার প্রভাব নিয়ে প্রগতিশীল আলোচনা রয়েছে বইটিতে।

কিছুদিন আগে বন্যা ঢাকায় আমার বাসায় এসেছিল। সঙ্গে আরো অনেকগুলো অধ্যায়। তাকে দেখে ও তার সাথে কথা বলে বুঝলাম আমার জন্য অপেক্ষা করছিল আরো কিছু বিস্ময়। এক, বয়স তার বেশ কম। দুই, তার প্রথাগত শিক্ষা বিবর্তনবিদ্যায় নয়, এমনকি প্রত্যক্ষভাবে জীববিদ্যায়ও নয়। লেখিকা জৈবপ্রযুক্তির পটভূমিতে সুশিক্ষিত একজন কম্পিউটার প্রযুক্তিবিদ। সবার উপর, তিনি বিবর্তনবিদ্যায় অত্যন্ত আগ্রহী একজন প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষ।

ক্রমান্বয়ে অবশিষ্ট অধ্যায়গুলো পেয়ে যাই ই-মেইলে। এভাবে পুরো পান্ডুলিপিটি পড়ে বইটি সম্পর্কে ইতোপূর্বে গড়ে উঠা আমার ধারণা আরো সুদৃঢ় হলো। আর আমি দেখতে পেলাম যে বইটিতে রয়েছে সৃষ্টিবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর সর্বশেষ রূপ বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনা (Intelligent Design) বা আইডি সম্পর্কে মনোজ্ঞ ও বিশদ আলোচনা। এটি বোধ হয় বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম। আমার বলতে কোন দ্বিধা নেই যে, *বিবর্তনের পথ ধরে* হচ্ছে আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও ঋদ্ধ আলোচনা-সমৃদ্ধ আধুনিক বিবর্তনবিদ্যার একটি অতি প্রয়োজনীয় জনবোধ্য গ্রন্থ।

আমাদের দেশের জন্য দারুণভাবে প্রয়োজনীয় বন্যা আহমেদের এ বইটি। কারণ বোধ হয় সবিস্তারে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে এই রকম। তথাকথিত মুক্ত বাজারের খোলা হাওয়াতেও নানা কারণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে বাকি বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না আমাদের দেশ। বলতে গেলে, বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের বদলে এ দেশে ঘটছে সংকোচন। এর অন্যতম কারণ এই যে, বেশ কয়েক বছর থেকে দেশে বিজ্ঞানবিরোধী সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ মৌলবাদের চলছে রমরমা। এক শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তকচ্চ প্রসার ঘটছে মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার। জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা প্রতিষ্ঠা করার একটি সচেতন ও সংগঠিত প্রচেষ্টা চলছে এসব স্থানকে কেন্দ্র করে। তাই বলা যায় এগুলো হয়ে পড়ছে মধ্যযুগীয় মুর্খতা প্রচার কেন্দ্র। এর ঢেউ এসে লাগছে আমাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ সেক্যুলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও। এ পরিমন্ডলেই কয়েক বছর আগে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের জীববিজ্ঞানের পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ পড়েছে বিবর্তন তত্ত্ব। অথচ সেই ব্রিটিশ আমল থেকে উক্ত স্তরের পাঠ্য পাঠ্যপুস্তকে বিষয়টির জন্য নির্দিষ্ট থাকত একটি অধ্যায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মান্ধ ও মৌলবাদী একটি ছাত্র সংগঠনের প্রকাশ্য চাপে পড়ে বিবর্তনবিদ্যা পড়ানো বন্ধ করা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রথমে মাস্টার্স শ্রেণী থেকে বিবর্তনবিদ্যার কোর্স বাদ দিয়ে এবং পরে সম্মান শ্রেণীর সিলেবাস সঙ্কোচন করে বিষয়টির যথেষ্ট গুরুত্ব হ্রাস করা হয়েছে। অথচ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কলেজগুলোতে পড়ে দেশের সিংহভাগ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থী। একাডেমিক জগতের বাইরেও নানাভাবে বিজ্ঞানবিমুখ প্রচারণা বেশ শক্তিশালী হয়ে চলেছে। এসবের প্রভাব পড়ছে জনমানসে, আমাদের সমাজে। আমার বিশ্বাস, বিজ্ঞানবিমুখ পশ্চাদগামিতার এই আত্মঘাতি শক্তিকে প্রতিরোধ করতে পারে একমাত্র শতভাগ বিজ্ঞানমনস্ক বিবর্তনবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী। জীববিজ্ঞানের সব শাখার ভিত্তিমূল হিসেবে বিবেচিত আধুনিক বিজ্ঞানের প্রত্যয়টির নাম বিবর্তনবাদ; আমার বিশ্বাস সেটি বাংলাদেশের মানুষদের কাছে সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে বন্যা আহমেদের *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটি। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

ড. ম. আখতারুজ্জামান
সাইটোজেনেটিক্স গবেষণাগার,
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা।

১১ ডিসেম্বর, ২০০৬।

লেখকের কৈফিয়ৎ দ্রষ্টব্য

কিছু কৈফিয়ৎ এবং কৃতজ্ঞতা

ভূমিকার পর...

সেই ষোলশ' শতাব্দীতে কোপার্নিকাস যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন তারই শেষ দৃশ্যপটের মঞ্চায়ন দেখছে যেন আমাদের এই প্রজন্ম। কোপার্নিকাস থেকে শুরু করে কেপলার, গ্যালিলিও এবং নিউটনের মত বিজ্ঞানীদের কয়েক শতাব্দীর কাজ আমাদের পৃথিবীকে ফিরিয়ে দিয়েছিল অতিপ্রাকৃত শক্তির হাত থেকে প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার পরিমন্ডলে। মানব সভ্যতার সেই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা প্রথমবারের মত ভাবতে শিখলাম যে, পৃথিবীসহ এই বিশাল মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য বাইরের কোন কল্পিত শক্তির প্রয়োজন নেই - প্রাকৃতিক নিয়মগুলোর সাহায্যেই আজকে মহাবিশ্বের উৎপত্তি, বিস্তৃতি, ভুত ভবিষ্যতের ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব, আর সেই ব্যাখ্যাগুলো মানুষের জ্ঞানের পরিধির বাইরে নয়। কিন্তু মানব সভ্যতার এই চেতনামুক্তি জড়জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল প্রথম কয়েক শতাব্দী, জীবজগৎ তখনও রয়ে গিয়েছিল প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার উর্দ্ধে। পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে ঠেলে বের করে দিলেও মানুষ কিন্তু তখনও দিব্যি নিজেকে বসিয়ে রেখেছিল সমগ্র প্রাণ জগতের কেন্দ্রবিন্দুতে। ১৮৫৯ সালে ডারউইনই প্রথম বললেন, এই পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির উৎপত্তি এবং প্রাণের বিকাশ ও বিস্তৃতিও প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে নয়, মানুষসহ সব জীবও এই প্রকৃতির অংশ। আমরা যতই নিজেদেরকে তথাকথিত 'সৃষ্টি'র কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে স্বান্তনা পাওয়ার চেষ্টা করি না কেন, মানুষ আসলে অন্যান্য জীবের মতই বিবর্তনের অমসৃন আর বন্ধুর পথেরই সহযাত্রী।

বিবর্তনবাদ বলছে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতিগুলো আলাদা আলাদাভাবে তৈরি হয়নি। আমাদের এই পৃথিবীর বয়স দীর্ঘ সাড়ে চারশ কোটি বছর, সেখানে প্রাণের স্ফুরণ ঘটার পরিবেশ তৈরি হতে হতে আরও প্রায় একশ কোটি বছর পার হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর এই অফুরন্ত প্রাণের মেলায় আমরা যে হাজার হাজার প্রজাতির আনাগোনা দেখি তারা সবাই সেই আদি সরল প্রাণ থেকে বিবর্তিত হতে হতে এখানে এসে পৌঁছেছে। অসংখ্য প্রজাতির উৎপত্তি ঘটেছে, টিকে থাকতে না পেরে তাদের অনেকেই আবার বিলুপ্ত হয়ে গেছে। খুব সহজ একটা তত্ত্ব, কিন্তু কি অপরিসীম প্রভাব তার! ডারউইন তার তত্ত্বটি দেওয়ার পর প্রায় দেড়শ বছর পার হয়ে গেছে, বিজ্ঞান এগিয়ে গেছে অভুতপূর্ব গতিতে। আর যতই নতুন নতুন আবিষ্কার হয়েছে ততই নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে বিবর্তনবাদের যথার্থতা। ফসিলবিদ্যা থেকে শুরু করে আণবিক জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, এবং জেনেটিক্স, জিনোমিক্সের মত বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক শাখাগুলো থেকে পাওয়া সাক্ষ্যগুলো বিবর্তনবাদকে আজ অত্যন্ত শক্ত খুঁটির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আর তাই, গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই বিজ্ঞানীরা এই সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিবর্তনবাদকে জীববিদ্যার সব শাখার ভিত্তিমুল হিসেবে গন্য করে আসছেন। কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের মতই এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

বিবর্তনবাদ তো আসলে শুধই একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই নয়, এটা আমাদের চিরায়ত চিন্তাভাবনা, দর্শন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনকেও প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। ঘুণ ধরা পুরনো সব মুল্যবোধে তীব্রভাবে আঘাত হেনেছে সে, পুরনো ধ্যানধারণাকে ভেংগে চুরমার করে দিয়েছে! পৃথিবীতে যে গুটিকয়েক তত্ত্ব মানব সভ্যতার ভিত ধরে নাড়া দিয়েছে তার মধ্যে এটি একটি। কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রচার করার জন্য যদি ব্রুনোকে পুড়ে মরতে হয়, গ্যালিলিওর মত বিজ্ঞানীকে চার্চ নামক নিপীড়ক প্রতিষ্ঠানটির কাছে হাঁটু ভেঙে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হয়, তাহলে

বিবর্তনবাদের মত তত্ত্বকে আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে কি প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হবে তা তো বোঝা দুঃসাধ্য নয়। তাই আজ দেড়শ' বছর পরেও আমরা এই প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কোন অন্ত দেখি না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জনমানুষের মধ্যে বিবর্তনবাদ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে গৃহীত হয়ে গেলেও আমেরিকার মত উন্নত দেশটিতে কিন্তু এ নিয়ে বিরোধিতার কোন সীমা পরিসীমা নেই। আমেরিকা যে আজকের দুনিয়ার অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় অনেক বেশী রক্ষণশীল এটা আর কোন নতুন খবর নয়, তবে বিবর্তনের মত একটা সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে এখানকার প্রভাবশালী ধর্মীয় রক্ষণশীল গোষ্ঠীগুলোর হৈ চৈ এর নমুনা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আজকে আমেরিকার এই অংশটি ক্ষমতাবান রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলগুলোর মদদপুষ্ট হয়ে এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে তারা এখন স্কুলের পাঠ্যসুচী থেকে বিবর্তন পড়ানো বন্ধ করার দাবী তুলছেন, বিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণার জন্য অর্থবরাদ্দ পর্যন্ত কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। শুধু তো তাই নয়, বিবর্তনের পাশাপাশি ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন (আইডি) নামে নতুন এক চাকচিক্যময় মোড়কে পোড়া সেই প্রাচীণ সৃষ্টতত্ত্বকে স্কুল কলেজের বিজ্ঞান পাঠ্যসুচীর অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন তারা।

আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের দেশগুলো এখন জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বইতে সয়লাব হয়ে গেলেও কিছুদিন আগেও কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম ছিল না। বিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র গবেষণা এবং গবেষণামুলক লেখা বা পাঠ্য বই লেখাতেই ব্যস্ত থাকতেন, সহজ ভাষায় সাধারণ পাঠকের জন্য বই লেখাকে একটু যেন হেয় করেই দেখা হত। বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের মধ্যে দীর্ঘ বৈরীতা এবং সাধারণ জনগণ থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে রাখার মনোবৃত্তি তো ছিলই, তার সাথে সাথে বোধ হয় সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের ক্ষমতাটাকেও একটু খাটো করে দেখেছিলেন তাঁরা। মনে করা হত যে, বিজ্ঞান যে গতিতে এগুচ্ছে তাতে করে এই রক্ষণশীল ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের অবৈজ্ঞানিক দাবীগুলো আর ধোপে টিকবে না, নিজে নিজেই চুপ করে যাবেন তারা। ওহাইয়ো স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ টিম বেড়া আশির দশকে তার 'Evolution and Myth of creationism' বইতে লিখেছিলেন যে, বিজ্ঞানীরা এতকাল এই রক্ষণশীল বিজ্ঞান বিরোধীদের শক্তি এবং আগ্রাসনের মাত্রাকে অবহেলা করে ভুল করেছেন। নিজেদেরকে গবেষণাগারে রুদ্ধ করে রেখে একদিকে যেমন সাধারণ জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তেমনিভাবেই পরোক্ষভাবে এই বিজ্ঞানবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল অংশটিকে ডালপালা বিস্তার করে ফুলে ফেঁপে উঠতে সহায়তা করেছেন। তাই আজকে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা অনেকটা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কারণেই 'একলা চলো' নীতি পরিবর্তন করেছেন। তাঁরা এখন সাধারণ পাঠকের জন্য সহজ ভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই প্রকাশ করছেন, পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখছেন, সভা সমিতিতে বক্তব্য রাখছেন, টেলিভিশন, রেডিও, ম্যাগজিনে বিতর্কে অবতীর্ণ হচ্ছেন, আইডি প্রবক্তাদের বিবর্তন-বিরোধী মহলের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে নেমেছেন, এমনকি কোর্টে গিয়ে আইডি প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে জনগণের করা মামলায় সাক্ষ্যও দিচ্ছেন। আইডির বিরুদ্ধে আমেরিকার বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং প্রগতিশীল জনগণের সংগ্রামের এই ইতিহাস নিয়ে বাংলায় বোধ হয় এখনও তেমন বিস্তারিত কোন লেখালিখি হয়নি। এই বইটিতে বিবর্তনের মুল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার সাথে সাথে এই ক্ষমতাশালী আইডি প্রবক্তাদের উত্থান এবং বিস্তৃতির ইতিহাস নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে, এবং বিবর্তনবাদের আলোকে তাদের দেওয়া 'যুক্তি'গুলোর অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।

আর ওদিকে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিবর্তনবাদের মত বিষয়গুলোকে তো সযত্নে এড়িয়েই যাওয়া হয়। সমকাল পত্রিকার এক পরিসংখ্যানে পড়েছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা বিভাগের ছাত্র এবং শিক্ষকদের বেশীরভাগই বিবর্তনবাদকে ভুল বলে মনে করেন! স্কুল-কলেজের জীববিদ্যার পাঠ্য বইগুলোতে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটাকে এমনই দায়সাড়াভাবে পড়ানো হয় যে এ

থেকে ছাত্রছাত্রীরা কিছু বুঝতে পারে কিনা তা নিয়েই সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। তাই সাধারণ জনগণের মধ্যে এ নিয়ে বিরোধিতা এবং ভুল ধারণার কোন অন্ত নেই বললেই চলে। এর পিছনে আরেকটি কারণের কথা বোধ হয় না বললেই নয়; বিচ্ছিন্নভাবে বেশ কিছু ভালো বিজ্ঞানের বই বের হলেও বাংলায় এখনও সেভাবে সহজবোধ্য জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই লেখার ধারাটি শুরু হয়নি। বিবর্তনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শনকে প্রভাবিত করতে পারে, তা কি আমাদের শুধু পাঠ্য বই পড়েই জানার কথা? যারা বিবর্তনবাদ নিয়ে লেখাপড়া, গবেষণা বা কাজ করেন তারা ছাড়া অন্যরা তাহলে এ সম্পর্কে কিভাবে জানতে পারবেন? বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া আর বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে পরীক্ষা পাশ করা তো আর এক কথা নয়! গত কয়েক দশকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর কথা জানতে হলে ইংরেজী বই পড়া ছাড়া আমাদের সামনে আর কোন উপায়ই বা খোলা থাকে? কিন্তু ধরুন যারা ইংরেজি বই পড়তে ঠিক অভ্যস্ত নন, কিংবা বিজ্ঞানের ছাত্র নন তাদের জন্য এ ধরণের বিষয়গুলো জানার পথটা একরকম বন্ধই বলতে হবে।

অনুসন্ধিৎসু সকল পাঠকের কথা মাথায় রেখে বিবর্তন তত্ত্বের উপর আধুনিক আবিষ্কারগুলোর কথা লিখেছি, নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছি, আবার একই সাথে চেষ্টা করেছি খুব সহজ ভাষায় তা ব্যাখ্যা করতে। তবে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোতে যেন কোন ভুল না থাকে তার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হয়েছে। ইন্টারনেটের বহুল বিস্তৃতির কারণে সুবিধা এবং অসুবিধা দু'টোই প্রবলতর হয়েছে। একদিকে যেমন সব তথ্য সহজেই হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে ঠিক তেমনই ভুরিভুরি ভুলভাল অবৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বলিত সাইটও গজিয়ে উঠেছে। আর সেই সাথে বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল এবং অন্ধ সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের উদ্দেশ্যপ্রনোদিত মিথ্যাচারের তো কোন শেষ নেই। তাই ইন্টারনেট সাইটগুলো যথাসম্ভব কম ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি, শুধু সেই সাইটগুলো থেকেই উদ্ধৃতি দিয়েছি যেগুলো বৈজ্ঞানিকমহলে বহুলভাবে স্বীকৃত। মুলত রিচার্ড ডকিন্স, মার্ক রিডলি, ডগলাস ফুটুইমা, কেন মিলার, স্টিফেন জে গুলড, ক্রিস স্ট্রিঙ্গার, পিটার অ্যান্ড্রুজের মত আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত ও স্বীকৃত বিজ্ঞানীদের বই এবং প্রকাশিত জার্নাল থেকে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান (প্রাক্তন) এবং বিবর্তনবিদ্যার স্বীকৃত ও স্বনামধন্য শিক্ষক ড. ম. আখতারুজ্জামান অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে বইটি সম্পাদনা করে দিয়েছেন। তিনি আনুসঙ্গিক ভুল ত্রুটিগুলো সংশোধন দিয়েছেন এবং মুল্যবান মতামত দিয়ে লেখাটাকে আরও সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন এবং পরিশেষে বইটির জন্য একটি চমৎকার ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন, তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

ছোটবেলা থেকেই বাংলায় জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই এর অভাব অনুভব করে আসলেও নিজেই কখনো বিবর্তনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বই লিখে ফেলবো তা কোনদিন ভাবিনি। অনেকের অনুপ্রেরণা এবং সহযোগীতার ফসল এই বইটা। মুক্তমনা (www.mukto-mona.com) ওয়েব সাইটে বাংলা এবং ইংরেজিতে বিবর্তন নিয়ে কিছু লেখালিখি শুরু করার পরপরই সুদুর সিলেট থেকে অনন্ত বিজয় অনুরোধ করতে শুরু করেন যাতে এ নিয়ে বাংলায় আমি একটি বই লিখি। সরাসরি বিজ্ঞানের ছাত্র নন তিনি, কিন্তু বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলো জানার আগ্রহ অপরিসীম। পরবর্তীতে অনন্তসহ আবুল কালাম, অভিজিৎ ও হাসান মাহমুদের দেওয়া অনুপ্রেরণায় বইটা লেখা শুরু করি। তারা নিয়মিতভাবে প্রত্যকটি অধ্যায় পড়েছেন, দোষত্রুটি ধরে দিয়েছেন, মুল্যবান মতামত দিয়ে লেখাটার মান উন্নয়নে সহায়তা হয়েছে। ওনাদের আগ্রহ, সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরণাকে স্মরণ করে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ড. বিপ্লব পাল বইটার পর্যালোচনা লিখে এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতামত দিয়ে কৃতজ্ঞতা বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমার মা, জাকিয়া আহমেদ, অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে প্রত্যকটা অধ্যায়

পড়েছেন। তিনি পেশায় ওকালতি করেন, বিজ্ঞান নিয়ে তেমন কোন আগ্রহ ছিল বলে কোনদিনও মনে হয়নি, কিন্তু এই লেখাগুলো যতই পড়তে থাকলেন ততই যেন তার আগ্রহ বাড়তে থাকলো। আমার বারবারই মনে হয়েছে যে, আমার মার মত দু'একজন সাধারণ পাঠকও বইটা পড়ে যদি আগ্রহ এবং আনন্দ পান তাহলেই আমার এই প্রচেষ্টাটুকু সার্থক হবে। সাথী এবং বন্ধু অভিজিৎ রায়ের কথা বোধ হয় আলাদাভাবে উল্লেখ না করলেই নয়। লেখাটার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিরিবিচ্ছিন্নভাবে পুরো সময়টা ধরেই তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যায়ে এসে সময়াভাবে যখন বইটা শেষ করতে পারছিলাম না তখন ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন অধ্যায়টির প্রায় অর্ধেকটা লিখে দিয়েছেন, এমনকি বইয়ের মাঝখানের রঙীন প্লেটগুলো সাজানোর কাজটিরও বেশীরভাগই তারই করা। অভিজিতের সাহায্য ছাড়া মনে হয় না এই বইটা কখনই দিলের আলো দেখতে পেত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিষয়ের অধ্যাপক ডঃ অজয় রায় সাপ্তাহিক বিচিত্রায় লেখাটা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা এবং সম্পাদনা করে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আসিফকে ধন্যবাদ সাইন্স ওয়ার্লডে লেখাটির বিভিন্ন অংশ প্রকাশের জন্য। এছাড়াও ভোরের কাগজ এবং সমকালসহ বিভিন্ন দৈনিকেও বইটির বিভিন্ন অংশ প্রকাশিত হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শফি আহমেদ লেখাটার প্রথম অংশ পড়ে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে অবসর প্রকাশনীর প্রকাশক আলমগীর রহমানের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ। ভুমিকাটা যখন লিখছি তখন বইটার প্রথম প্রুফ রিডিং চলছে, আলমগীর রহমান যেভাবে বানান থেকে শুরু করে সব খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে নজর দিচ্ছেন তার জন্য তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে হয়। অবসর প্রকাশনীর জাকির আহমেদকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি কম্পোজিং এবং ফন্টের সমস্যাসহ বিভিন্ন টেকনিকাল সমস্যাগুলো সুচারুভাবে দ্রুত সমাধান করে দেওয়ার জন্য। মুক্তমনা ওয়েবসাইটে লেখাটির ধারাবাহিক প্রকাশনার সময় বহু পাঠক ফোরামে এবং ব্যক্তিগতভাবে ই-মেইল করে তাদের মতামত জানিয়েছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

পরিভাষাগত সমস্যা নিয়ে হাবুডুবু খেয়েছি পুরো সময়টা ধরে। আন্তর্জাতিকভাবে কিছু কিছু প্রচলিত শব্দ যেমন gene বা mutation কি ইংরেজিতেই রাখা উচিত নাকি বাংলা পরিভাষায় (যথাক্রমে বংশগতির একক এবং পরিব্যক্তি) লেখা উচিত তা নিয়ে দোটানায় থেকেছি। শেষ পর্যন্ত এ ধরণের কিছু শব্দের বাংলা অনুবাদ ব্যবহার না করে বহুলভাবে প্রচলিত ইংরেজি শব্দগুলোকেই বাংলায় লিখেছি। ভাষা তার গতিতেই চলে, তাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না; যেমন ধরুন, বাংলায় শেষ পর্যন্ত 'টেলিফোন' কথাটা টিকে থাকবে নাকি 'দুরালাপনীর' মত প্রতিশব্দ ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠবে তা সময়ের সাথে সাথেই নির্ধারিত হয়েছে। আশা করি বাংলায় যত বেশী করে জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই বের হবে ততই পরিভাষাগত সমস্যাগুলোরও সমাধান হবে। বেশ কিছু জায়গায় এখনও ইংরেজি উদ্ধৃতি রয়ে গেছে যা সময়াভাবে অনুবাদ করতে পারিনি। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার পরেও বইটিতে যদি কোন তথ্যগত বা অন্য কোন দোষত্রুটি রয়ে যায় তার দায়িত্ব সমস্তটাই আমার। পাঠকেরা যদি এ বিষয়ে তাদের মতামত জানান, বা বইটা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে তাদের মতামত ই-মেইল (bonna_ga@yahoo.com) করে জানিয়ে দেন তাহলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

বন্যা আহমেদ
ডিসেম্বর, ২০০৬।

প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

প্রথম অধ্যায়

এলাম আমরা কোথা থেকে?

লেখকের কৈফিয়তের পর...

ইন্দোনেশিয়ার ছোট্ট দ্বীপ *ফ্লোরস* (Flores)। এখানকার অধিবাসীরা অন্যান্য সব জাতির মতই কাজ করে, খায় দায়, ফুর্তি করে আর অবসর সময়ে গল্পগুজব করে। এখানকার বুড়োবুড়িরা আমাদের দাদী-নানীদের মতই 'ঠাকুরমার ঝুলি' সাজিয়ে বসে নাতি-নাতনীদের কাছে - হাজার বছরের মুখে মুখে চলে আসা উপকথাগুলোকে বলে যায় তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। কিন্তু এদের ঠাকুরমার ঝুলিগুলো যেন কেমনতর অদ্ভুত! লালকমল-নীলকমল আর দেও-দৈত্য নেই ওতে, আছে কতকগুলো ক্ষুদে বামনদের গল্প। মাত্র এক মিটারের মত লম্বা বেটে লিলিপুটের মত একধরনের মানুষ অনেক অনেকদিন আগে তাদেরই আশে পাশে নাকি বাস করতো, যা সামনে পেতো তাই মুখে দিতো, তাদের ফসল নষ্ট করতো, নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কথা বলতো আর যা শুনতো তাই নাকি নকল করার চেষ্টা করতো। এমনি একজন ক্ষুদে বামনের নাম ছিল *এবু গোগো* (এবু মানে নানী আর গোগো মানে এমন কেউ যে যা সামনে পায় তাই খায়), তাকে খেতে দিলে সে খাওয়ার বাসনটা পর্যন্ত খেয়ে ফেলতো, সুযোগ পেলে নাকি মানুষের মাংসও খেতে দ্বিধা করতো না[১] ......

দ্বীপবাসীদের বলা গল্পগুলো শুনলে মনে হয় যেনো এই সেদিনই তারা সবাই একসাথে বসবাস করতো। নিছক রূপকথা ভেবেই বেঁটে-বাটুলদের গল্পগুলো সবাই উড়িয়ে দিয়েছিলো এতদিন। অবাক এক কান্ড ঘটলো ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে। বিজ্ঞানীরা *ফ্লোরস* দ্বীপেরই মাটি খুড়ে পেলেন এক মিটার লম্বা এক মানুষের ফসিল-কঙ্কাল; প্রথমে সবাই ভেবেছিলো হয়তো কোন বাচ্চার ফসিল হবে বুঝি এটা। কিন্তু তারপর ঠিক ওটারই কাছাকাছি জায়গায়ই পাওয়া গেলো আরও ছয়টি একই রকমের অর্ধ-ফসিলের কঙ্কাল। বিজ্ঞানীরা আরও পরীক্ষা করে বুঝলেন এগুলো আসলে পূর্ণাংগ মানুষেরই কঙ্কাল, কার্বন ডেটিং থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী জানা গেলো, মানুষের এই নব্য আবিষ্কৃত প্রজাতিটি (প্রজাতি হল এমন কিছু জীবের সমষ্টি যারা শুধু নিজেদের মধ্যে প্রজননে সক্ষম, যেমন ধরুন আমরা অর্থাৎ আধুনিক মানুষ বা *Homo sapiens* একটি প্রজাতি যারা আর কোন প্রজাতির জীবের সাথে প্রজননে অক্ষম - আরও অন্যান্য প্রজাতির মানুষের ফসিল পাওয়া গেলেও আমরা একটাই প্রজাতি যারা এখনও টিকে আছি) মাত্র ১২,০০০-১৪,০০০ বছর আগেই এই দ্বীপটিতে বসবাস করতো। ১২,০০০ বছর আগে এই দ্বীপে এক ভয়াবহ অগ্নুৎপাত ঘটে, বিজ্ঞানীরা মনে করছেন হয়তো দ্বীপের অন্যান্য অনেক প্রাণীর সাথে এরাও সে সময়ে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে তারা আমাদের *হোমিনিড* (মানুষ এবং নরবানর বা *ape man* কে *Hominid* গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়) গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের চোয়াল এবং মস্তিষ্কের মাপ আমাদের মত আধুনিক মানুষের মত নয়। উচ্চতায় মাত্র ১ মিটার কিন্তু হাতগুলো অপেক্ষাকৃতভাবে বেশ লম্বাটে যা থেকে মনে হয় তারা তখনও অনেকটা সময় হয়তো গাছে গাছেই কাটাতো। তাদের মাথার মাপ আবার খুবই ছোট - মাত্র ৩৮০ সিসি (কিউবিক সেন্টিমিটার), যেখানে আমাদের বা আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কের মাপ হচ্ছে গড়ে প্রায় ১৩৩০ সিসি। এত ছোট মগজ নিয়ে আধুনিক মানুষের মত অস্ত্র বানিয়ে শিকার করে খাবার সংগ্রহের মত বুদ্ধি কি ছিলো তাদের, নাকি গাছের ডালে ঝুলে ঝুলেই তারা সময় কাটাতো বানর আর শিম্পাঞ্জিদের মত? এই প্রশ্নেরও উত্তর মিললো যখন তাদের ফসিলের পাশে ১২,০০০-৯৫,০০০ বছরের পুরনো বেশ কিছু পাথুরে অস্ত্র পাওয়া গেল যা কিনা

শুধুমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণীর পক্ষেই বানানো সম্ভব।

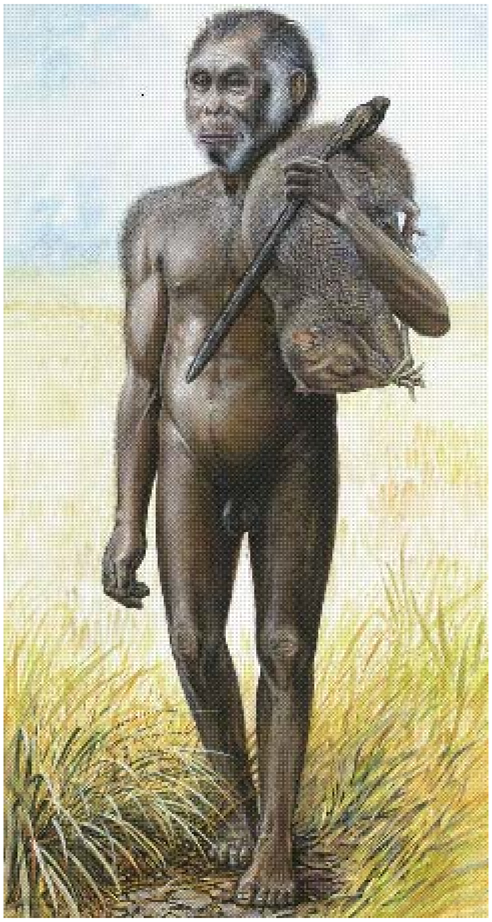

চিত্র ১.১ : বামন মানুষের সম্ভাব্য প্রতিকৃতি
(সৌজন্য : National Geographic journal, April 2005)

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন সম্ভবত অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া মানুষের আরেকটি প্রজাতি *Homo erectus* এর একটি দল এই দ্বীপে এসে বসবাস করতে শুরু করে। হাজার হাজার বছর ধরে অত্যন্ত ছোট এই দ্বীপটিতে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করার ফলে তারা বিবর্তিত হতে হতে একসময় ভিন্ন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। তাদের ফসিলের আশে পাশে এক ধরনের বামন হাতি এবং *কমডো ড্রাগন* সহ অন্যান্য বেশ কিছু প্রাণীর ফসিলও পাওয়া গেছে[২]।

এই নব্য আবিষ্কৃত ক্ষুদে বামনগুলো (Hobbit) বিজ্ঞানীদেরকে বেশ অবাক করেছে। এদের কারণে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে তারা আবার নতুন করে ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন । এই যে এতদিন ধরে আমরা ভেবে এসেছি যে সাম্প্রতিক কালে আমরা ছাড়া মানুষের আর কোন প্রজাতি পৃথিবীতে ছিল না - সেটা তো আর তাহলে সত্যি নয়। ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যাওয়া নিয়ান্ডারথালদের (Neanderthal) ফসিল দেখে প্রথমে বিজ্ঞানীরা তাদেরকে আমাদের একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত

করেছিলেন, কিন্তু তারপর বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশেষ করে ডিএনএ (DNA)র পরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা একমত হয়েছেন যে তারাও আসলে আমাদের *Homo sapiens* প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত নয় [৩]। প্রায় ১৫০ থেকে ৩০ হাজার বছর আগে পর্যন্ত তারা একটি ভিন্ন প্রজাতি হিসেবে বিচরণ করেছে পৃথিবীর বুকে। হয়তো আমাদের পূর্বপুরুষেরাই ইউরোপ দখল করে নেওয়ার সময় তাদেরকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য করেছিলো। কিন্তু সে তো হল ৩০-৪০ হাজার বছর আগের কথা, তারপর তো মানুষের আর কোন প্রজাতির সাথে আমাদেরকে এই পৃথিবী ভাগ করে নিতে হয়নি! কিন্তু এই বামন মানুষদের এতো সাম্প্রতিক কালে টিকে থাকার প্রমাণ মেলার পর বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করেছেন তাহলে হয়তো আরও কাছাকাছি সময়েও মানুষের একাধিক প্রজাতি টিকে ছিলো [৩]। বানর, বিড়াল, কুকুর বা অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষেরও আরও প্রজাতি ছিলো, ভাবতেও অবাক লাগে এই পৃথিবীর বুকে প্রায় আমাদের মতই দেখতে একাধিক প্রাণী হেটে বেড়িয়েছে একই সাথে। শুধু তাই তো নয়, জীববিজ্ঞান, অনুজীববিজ্ঞান সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অভুতপুর্ব উন্নতির ফলে বিজ্ঞানীরা মানুষের পূর্বসুরী প্রজাতিগুলোকেও সনাক্ত করতে পেরেছেন, তারা আজকে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করতে পেরেছেন যে এক ধরনের নর বানর বা এপ থেকে আসলে মানুষের বিবর্তন ঘটেছে, এদের সাথে আমাদের *ডি. এন. এ*র প্রায় ৯৮.৬% মিল রয়েছে।

এ তো গেলো আমদের নিজেদের কথা, এবার চোখ ফিরানো যাক আমাদের প্রিয় বাসভুমির দিকে। আমাদের মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটেছিল প্রায় ১৩-১৫ শ কোটি বছর আগে, আর পৃথিবীসহ আমাদের সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহের উৎপত্তি ঘটে সাড়ে চারশ কোটি বছর আগে। তারপর আরও একশ কোটি বছর লেগেছে আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহটির মহাপ্রলয়ঙ্করী উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরির মত অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে প্রাণের উৎপত্তির জন্য উপযুক্ত একটা পরিবেশ তৈরী করতে। এখন পর্যন্ত পাওয়া সব বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ অনুযায়ী বলা যায় পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি হতে শুরু করেছে প্রায় সাড়ে তিনশ কোটি বছর আগে। আমরা আজকে আমাদের চারপাশে প্রাণ বলতে যা বুঝি বা দেখি তার সাথে সেই আদিমতম প্রাণের কিন্তু কোন মিলই ছিল না - প্রাণ বলতে ছিল অতি সরল আনুবীক্ষণিক এবং আদিম একধরনের অকোষীয় জীবন। গঠনের দিক থেকে এরা আজকের দিনের ব্যাকটেরিয়ার থেকেও অনেক বেশী সাধারণ এবং সরল। দেখতে যেমনই বা যত আনুবীক্ষনিকই হোক না কেন এদেরকে জীবন্ত বলে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া কোন উপায়ও নেই! এরা তো জীবের মৌলিক দুটো বৈশিষ্ট্যই ধারণ করে যা কোন জড় পদার্থের মধ্যে থাকা সম্ভব নয় - এরা একদিকে যেমন বাইরের পরিবেশ থেকে সক্রিয়ভাবে শক্তি সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে, বড় হয় এবং বদলায়, তেমনিভাবে আবার বংশবৃদ্ধি করে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধিও করতে পারে। আর সাড়ে তিন'শ কোটি বছর আগে এই আদিম এবং সরলতম জীবগুলো থেকেই শুরু প্রাণের বিকাশ এবং বির্বতনের ইতিহাস। কোটি কোটি বছর ধরে ঘটে আসা বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সরলতম এক কোষী প্রাণ থেকেই উদ্ভব ঘটেছে আমাদের চারপাশের মানুষ সহ অন্যান্য সব জীবের।

বিবর্তনের এই দীর্ঘ ইতিহাসের বইয়ের কোন পাতায় তাহলে মানুষের দেখা মিললো? এক্কেবারে শেষের দিকের পাতায় এসে আমরা খুঁজে পাই মানুষ নামের আমাদের এই আধুনিক প্রজাতিটির এবং তার পূর্বপুরুষদের সন্ধান। ৪০-৮০ লাখ বছর আগে এক ধরনের বানর প্রজাতি দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে শিখলেও তার থেকে আমাদের অর্থাৎ আধুনিক মানুষের উদ্ভব ঘটেছে মাত্র এক লাখ বছর আগে। ভূতাত্বিক নিয়মে হিসাব করলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের ব্যাপারটা এক্কেবারে আনকোরা। ধরা যাক, পৃথিবীর বয়স একদিন বা ২৪ ঘন্টা, তা হলে মানুষ নামের এই তথাকথিত 'সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিটির' জন্ম

হয়েছে ২৪ ঘন্টা ফুরানোর মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে!

তাহলে এখন স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন আসে, এই যে ছোটবেলা থেকে আমাদের মুরুব্বী, প্রচারযন্ত্র, ধর্ম্প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের উৎপত্তি নিয়ে যে সব গাল-গপ্প শিখিয়ে এলো তার সাথে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত আমাদের উৎপত্তি এবং বিবর্তনের তত্ত্বের কোন মিল নেই কেনো? কারণ, ক'দিন আগেও মহাবিশ্ব বা প্রাণের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে তা বোঝার জন্য যে বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণ প্রয়োজন তা মানুষের জানা ছিলো না, ছিল না কোটি কোটি বছরের ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা। কিন্তু নিজের 'সৃষ্টি-রহস্য' নিয়ে কৌতুহলের তো কোন অন্ত ছিল না সেই সময়ের আদি থেকেই। তাই এই 'সৃষ্টি-রহস্য' নিয়ে প্রত্যেক জাতির মধ্যে সেই প্রাচীন কাল থেকেই রচনা করা হয়েছে নানা ধরনের কল্প-কাহিনী, ইংরেজীতে যেগুলোকে বলে 'myth'। ধর্মগ্রন্থগুলোসহ বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতাগুলো প্রত্যেকে তাদের তদানীন্তন স্থানীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, সময় এবং জ্ঞানের স্তর অনুযায়ী একেক ধরনের গল্পের অবতারণা করেছে। হিন্দু পুরাণ বলছে, মহাপ্রলয়ের শেষে এই জগৎ যখন অন্ধকারময় ছিল, তখন বিরাট মহাপুরুষ পরম ব্রহ্ম নিজের তেজে সেই অন্ধকার দূর করে জলের সৃষ্টি করেন, সেই জলে সৃষ্টির বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। তখন ওই বীজ সুবর্ণময় অন্ডে পরিণত হয়। অন্ড মধ্যে ওই বিরাট মহাপুরুষ স্বয়ং ব্রহ্মা হয়ে অবস্থান নিতে থেকেন। তার পর ওটিকে বিভক্ত করে আকাশ ও ভূমন্ডল আর পরবর্তীতে প্রাণ সৃষ্টি করেন। বাইবেল এবং কোরাণ বলছে, সৃষ্টিকর্তা ছয় দিনে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরী করেছিলেন। বাইবেলের (জেনেসিস) ধারণা অনুযায়ী ছয়দিনের প্রথম দিনটিতেই ঈশ্বর আমাদের এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেন। এর তিনদিন পর তিনি সূর্য, চন্দ্র আর তারকারাজির সৃষ্টি করেন - আর এ সব কিছুই তিনি তৈরী করেছিলেন মাত্র ছ'হাজার বছর আগে। আবার প্রাচীন চৈনিক একটি কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির শুরুতে একটা কালো ডিমের মত ছিল। *প্যান গু* নামের একজন দেবতা তাঁর কুড়ালের কোপে ডিমটিকে দ্বিখন্ডিত করেন এবং মহাবিশ্বকে প্রসারিত হবার সুযোগ করে দেন। প্যান গুর শরীরের মাছি আর উকুন থেকেই নাকি পরবর্তীতে মানব সভ্যতার জন্ম হয়েছে। আবার অ্যাপাচি মিথ অনুযায়ী, সৃষ্টির শুরুতে আসলে কিছুই ছিল না - না ছিল এই পৃথিবী, আকাশ কিংবা কোন সূর্য -চন্দ্র-তারা। এই তমসাচ্ছন্ন নিকষ অন্ধকার থেকে হঠাৎ করেই একটি পাতলা চাকতির অভ্যুদয় ঘটে, যেখানে আসীন ছিলেন এক 'দাঁড়ি ওয়ালা ভদ্রলোক' - যিনি এ জগতের মালিক, আমাদের বিশ্বপিতা! তিনিই নিজের ইচ্ছায় জগৎ থেকে শুরু করে প্রাণ পর্যন্ত সব কিছুই সৃষ্টি করেন ......মানুষের উৎপত্তি নিয়ে এমনতর হাজারো গল্পের সন্ধান পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায় এবং ধর্মগ্রন্থে [৯]।

আসলে আঠারো শতকের শেষভাগ থেকেই মানুষ বুঝতে শুরু করে এই কল্পকাহিনীগুলো নিয়ে পড়ে থাকলে আর চলবে না, কারণ বৈজ্ঞানিকভাবে পাওয়া তথ্য-প্রমাণগুলো ইতিমধ্যেই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে শুরু করেছে যে, মহাবিশ্বের অন্য সব কিছুর মতই আমাদের এই পৃথিবীও ক্রমাগতভাবে পরিবর্তিত হতে হতে অবশেষে আজকের জায়গায় এসে পৌছেছে। এই কোটি কোটি বছরের ইতিহাস হচ্ছে ছোট, বড়, ধীর, ক্রমাগত থেকে শুরু করে অত্যন্ত নাটকীয় এবং অকস্মাৎভাবে ঘটা পরিবর্তন, বিকাশ আর বিবর্তনের ইতিহাস, যা আসলে আজও আমাদের চারপাশে ঘটে চলেছে অনবরত। পৃথিবীর মাটির বিভিন্ন স্তরে জমে থাকা বিভিন্ন প্রাণী এবং উদ্ভিদের ফসিল থেকে আমরা এই পরিবর্তনের নিদর্শন দেখতে পাই। জীবের *ডিএনএ* বিশ্লেষণ করেও পাওয়া যাচ্ছে একই তথ্য। মানুষসহ পৃথিবীতে অন্যান্য প্রাণের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, টিকে থাকার ইতিহাস বুঝতে হলে এই সুদীর্ঘ পরিবর্তনের ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিকভাবে

বুঝতে হবে; অজ্ঞতা, কুসংস্কার, প্রাচীন এবং অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে পৃথিবীকে বিশ্লেষণ করতে শিখতে হবে।

বিবর্তন নিয়ে এতো মাথাব্যথা কেন?

কিন্তু এখন মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কেনোই বা আমাদের বিবর্তন সম্পর্কে জানতে হবে, এর খুঁটিনাটি বুঝতে হবে? দিব্যি তো দিন চলে যাচ্ছে এসব তত্ত্বকথা না জেনেই। একটু খেয়াল করে আশেপাশে তাকালেই দেখা যাবে যে, বিবর্তনের তত্ত্ব ছাড়া আজকে আমাদের চারপাশের অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, অনেক সহজ প্রশ্নের উত্তর মিলছে না। যেমন ধরুন, ডাক্তাররা কেনো বারবার করে রোগীকে তার অ্যান্টিবায়োটিকের পুড়ো ডোজটা শেষ করতে বলে দেন? আমাদের সাথে ঐ বেচারী ইঁদুরগুলোর কিইবা মিল রয়েছে যে, বিজ্ঞানীরা মানুষের উপর নতুন কোন ওষুধ প্রয়োগ করার আগে তাদের উপর পরীক্ষা করে নেন? কিংবা আমাদের চারপাশে এত্ত ধরনের প্রাণের সামহার কেনো, তাদের দরকারটাই বা কি ছিলো? পৃথিবীর একেক জায়গায় কেনো একেক রকমের প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়? আমরাই বা এলাম কোথা থেকে? কেনো একেক জায়গার মানুষ দেখতে একেক রকম হল?.......

বিবর্তনবাদ তত্ত্বের মাধ্যমে আজকে আমরা আমাদের চারপাশের জীবন এবং প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর পেতে পারি। আমাদের চারপাশের জীবের মধ্যে এত বৈচিত্র দেখা যায় কেনো, এমনকি একটা মানুষের সাথে আরেকটা মানুষের কেনো এত পার্থক্য? বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই আসলে প্রকৃতিতে একেকটা জীবের একেক রকম বৈশিষ্ট্যের বিবর্তন ঘটে, এর ফলশ্রুতিতেই তারা একেকজন একেক পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে খাবার এবং শক্তি জোগার করে টিকে থাকতে সক্ষম হয়। যেমন- মানুষের কথাই ধরা যাক, সব মানুষ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের মধ্যে পার্থক্যের কোন শেষ নেই। একেক এলাকার মানুষের মধ্যে একেরকমের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী যে পার্থক্যটা চোখে পড়ে তা হচ্ছে মানুষের গায়ের রং। কালো রং এর গায়ের মানুষের সূর্যের তাপ থেকে নিজের চামড়াকে রক্ষা করার ক্ষমতা অনেক বেশী থাকে। তাই আমরা সাধারণভাবে দেখতে পাই যে, শীতের দেশের মানুষের চামড়া অনেক বেশী সাদা আর গরম দেশের মানুষের গায়ের রং কালো হয়। অবশ্য ইতিহাসের পরিক্রমায় মানুষ তার জীবন আর জীবিকার তাগিদে এতবার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে যে এখন সব জায়গায় এই পার্থক্য আর এত সুক্ষ্মভাবে নাও দেখা যেতে পারে। ব্রিটিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন যে বিভিন্ন প্রজাতির ফিঙ্গে (Finch) দেখে খুব অবাক হয়েছিলেন তাদের কথাই ধরি। গ্যালাপ্যাগাস দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপে তিনি বিভিন্ন রকমের ঠোঁটওয়ালা ফিঙ্গে দেখতে পান, ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, সময়ের সাথে সাথে খাবারের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের ঠোটের আকারও বদলে গেছে। অতীতে এক সময় সব রকমের ফিঙ্গেই একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলো, সময়ের সাথে সাথে বিবর্তনের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এরকম ১৪ ধরনের ফিঙ্গের প্রজাতি খুঁজে পেয়েছেন।

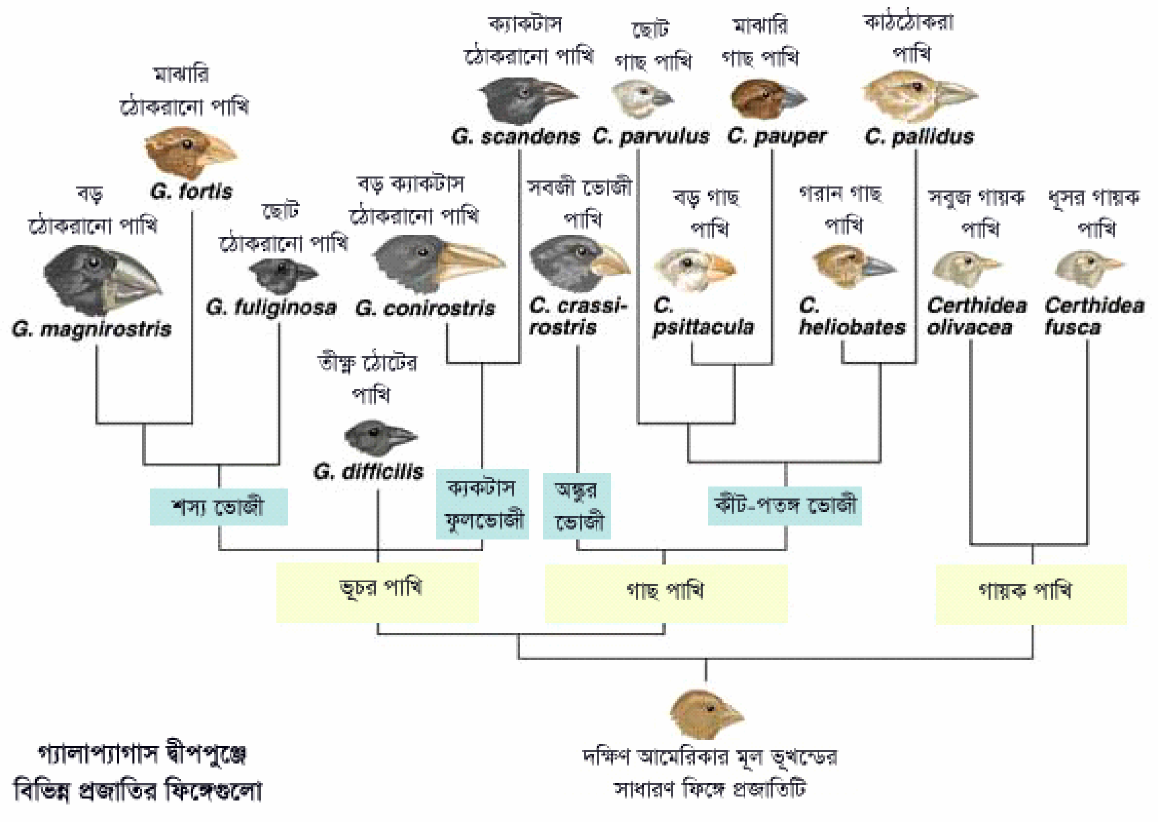

চিত্র ১.২: ঠোটের গঠনের সাথে বিভিন্ন প্রজাতির ফিঙ্গে পাখির আহার্য্য দ্রব্যের সম্পর্ক
www.cox.miami.edu থেকে নেওয়া

আবার ঠিক উলটোভাবে দেখা যায় যে বিভিন্ন প্রাণীর বৈশিষ্ট্য এবং জিনের গঠনের মধ্যে অকল্পনীয় রকমের মিল দেখা যাচ্ছে [৪]। যেমন ধরুন, মানুষের হাতের হাড় আর এত অন্যরকম দেখতে একটা তিমি মাছের সামনের পাখার হাড় প্রায় একইরকম। আবার, জন্মপূর্ববর্তি ভ্রূণাবস্থায় বিভিন্ন প্রাণীর বাচ্চাদের দেখতে আনেকটা একইরকম দেখায়। শিম্পাঞ্জীদের সাথে আমাদের ডি এন এ প্রায় ৯৮.৬%, ওরাং ওটাং এর সাথে ৯৭ % [৫], আর ইঁদুরের সাথে ৮৫% [৬] মিলে যাচ্ছে। এ কারণেই ইঁদুর বা অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে বিভিন্ন ওষুধের বা চিকিৎসার প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে তা পরবর্তীতে আবার মানুষের দেখে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। আর এসব সাদৃশ্যের পিছনে কারণ একটাই, পৃথিবীর সব প্রাণীই একই আদি জীব বা পূর্বপুরুষ থেকে কোটি কোটি বছরের বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপত্তি হয়েছে। যে জীব যত পরে আরেক জীব থেকে বিবর্তিত হয়ে অন্য প্রজাতি বা জীবে পরিণত হয়েছে তার সাথে ঐ জীবের ততই বেশী মিল খুজে পাওয়া যায়।

বিবর্তনের প্রক্রিয়া থেকে আমরা চারপাশের পরিবেশ, প্রকৃতি এবং তার গঠন সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণাও পাই। বিবর্তনের মাধ্যমে যেমন অহরহ জীবের পরিবর্তন ঘটছে আবার তারই ফলশ্রুতিতে পরিবর্তন ঘটে চলেছে আমাদের পারিপার্শ্বিকতারও। এর একটা মজার উদাহরণ হচ্ছে পৃথিবীর বাতাসে

অক্সিজেনের আবির্ভাব। আমাদের তো উদ্ভবই ঘটতো না বাতাসে অক্সিজেন না থাকলে! অবাক লাগে ভাবতে যে আদি পৃথিবীর বাতাসে মুক্ত অক্সিজেনের কোন অস্তিতই ছিলো না। প্রায় আড়াইশো কোটি বছর আগে সালোক সংশ্লেষণকারি (photo sysnthetic) উদ্ভিদের বিবর্তন ঘটে যারা পরিবেশ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি গ্রহন করে খাদ্য তৈরী করতে শুরু করে এবং বিনিময়ে পরিবেশে মুক্ত অক্সিজেন ছেড়ে দিতে শুরু করে। তার ফলেই আমাদের পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের আবির্ভাব ঘটতে শুরু করে। এই যে আমরা আমাদের চারপাশে মানুষসহ অক্সিজেন গ্রহণকারী সব প্রাণী দেখছি, তাদের সবারই বিবর্তন ঘটেছে বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন ছড়িয়ে পরার পর।

জীবের বিবর্তন না বুঝলে আজকে চিকিৎসাবিদ্যা, কৃষিবিদ্যার বিভিন্ন আবিষ্কার অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো। বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসগুলো কিভাবে ওষুধ প্রয়োগের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়ে আরও শক্তিশালী এবং পরিবর্তিত রূপ ধারণ করতে পারে তা না বুঝলে আজকে ওষুধ কোম্পানীগুলোকে ঠিক অসুখের জন্য ঠিক ওষুধটা তৈরী করাই বন্ধ করে দিতে হবে। আজকে ডাক্তাররা অ্যন্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ প্রয়োগ বন্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, কারণ আমাদের শরীরে রোগ সারাতে যত বেশী অ্যন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হচ্ছে ততই ব্যাকটেরিয়াগুলো তাতে খাপ খাইয়ে নিয়ে পরিবর্তিত হতে হতে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। একই ব্যাপার ঘটতে দেখা যায় জমিতে কীটনাশক ব্যবহার করার সময়েও। কদিন আগে আমেরিকার একটা স্টেটের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, ইদানীং কালে সেখানকার হাসপাতালগুলো থেকেই অনেক বেশী রোগী জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে, অর্থাৎ তারা আসে এক রোগের চিকিৎসা করাতে আর ঘরে ফিরে যায় হাসপাতাল থেকে পাওয়া অন্য রোগের জীবাণু শরীরে নিয়ে। এর থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার রোগী মারাও যাচ্ছে। ব্যাকটেরিয়াগুলো প্রচলিত অ্যন্টিবায়োটিকে অভ্যস্ত হয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে নিজেদেরকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে, আর তার ফলে হাসপাতালগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে অসংখ্য শক্তিশালী জীবাণু যাদেরকে নিরোধ করতে ডাক্তাররা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন।

বিবর্তনের ধারনা জানার এবং বোঝার আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ কারণ রয়েছে। বিবর্তনবাদ আমাদের সময়ের এমনই একটি শক্তিশালী তত্ত্ব যে এর বিস্তৃতি শুধু বৈজ্ঞানিক বা টেকনিকাল জগতেই নয় বরং সামাজিকভাবেও এর গুরুত্ত্ব অপরিসীম। সমাজের বেশীর ভাগ মানুষ, বিশেষ করে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অংশ, এর কথা শুনলেই আঁতকে ওঠেন, কারণ এটা আমাদের প্রচলিত পুরানো, অবৈজ্ঞানিক এবং ধর্মীয় ধারণাগুলোকে সমর্থন করে না। বিবর্তনবাদকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে শেখার মাধ্যমে আমরা নিজেরা যেমন আমাদের চারদিকের প্রকৃতি এবং পরিবেশকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করতে শিখবো, তেমনিভাবে বুঝতে এবং অন্যদেরকে বুঝাতে পারবো বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং সমাজে হাজার হাজার বছর ধরে টিকে থাকা বহু স্থবির চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়। বিবর্তনবাদ বলে প্রকৃতি প্রতিনিয়ত বিবর্তিত হচ্ছে, পরিবর্তনই জগতের মূল নিয়ম, নতুনকে, পরিবর্তনকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানোই প্রকৃতির রীতি। সব কিছুই ঘটছে আমাদের চোখেরই সামনে কখনো খুবই ধীরে, কখনও বা আকস্মিকভাবে খুব দ্রুত গতিতে। পরিবর্তন ঘটছেই; বাইরের কোন ঐশ্বরিক শক্তি এসে যেমন আমাদের কোন কিছু বদলে দিয়ে যাচ্ছে না, তেমনি পরলৌকিক পুরষ্কারের জন্যও হা-পিত্যেশ করে বসে থাকার কোন কারণ নেই। দর্শনের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় যে আমরা আসলে নিজেদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রামের মাধ্যমেই পরিবর্তিত হতে হতে প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে।

তাই এই বিবর্তন তত্ত্বকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে গুটিকয়েক যে বড় বড় ঘটনা ঘটেছে তার একটি বলে ধরে নেওয়া হয়। পদার্থবিদ ভিকটর স্টেঙ্গার যেমন বলেছেন,

> ‘ ..... তবে গত পাঁচ শতাব্দীতে অন্ততপক্ষে দুটি বৈজ্ঞানিক আবিস্কারকে বড় paradigm shift হিসাবে চিহ্নিত করা যায় ; (১) ষোড়শ শতাব্দীতে কোপার্নিকাসের আবিস্কৃত সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব- পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এবং (২) উনবিংশ শতাব্দীতে (১৮৫৯ সাল) চার্লস ডারউইন এবং অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেসের প্রস্তাবিত তত্ত্ব - প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) মাধ্যমে জীবজগতের বিবর্তন। এই দুটি আবিস্কার শুধু যে মানুষের চিন্তাধারাকে এক নতুন স্তরে উন্নীত করতে সাহায্য করেছিল তাই নয়, সেগুলো তখনকার প্রাচীন এবং গভীরভাবে সুরক্ষিত চিন্তাপদ্ধতিকে সরিয়ে দিয়ে পুরানো ধারণাগুলোর উপরও আধিপত্যও বিস্তার করে নিয়েছিল। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, তত্ত্ব দুটোই পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর প্রাচীন চিন্তাগুলোকে অত্যন্ত প্রবলভাবে আঘাত করেছিলো - যে গুলোকে মানুষ এতদিন ধরে সৃষ্টিকর্তার অভ্রান্ত বাণী হিসেবে বিশ্বাস করতো [৭]।’

চার্লস ডারউইনের প্রস্তাবিত এই বিবর্তন তত্ত্বে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে, সাম্প্রতিক কালের বিখ্যাত বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স সুন্দরভাবে অল্প কথায় বর্ণনা করেছেন জীববিজ্ঞানের এই মূল দুটি তত্ত্বকে,

> *জীববিজ্ঞানে ডারউইনের মূল অবদান একটি নয় দুটো, আর এই দুটো বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা ছাড়া বিবর্তনবাদ বোঝা সম্ভব নয়। তিনিই প্রথম পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমানের মাধ্যমে প্রমান করে দেখান যে, জীবজগৎ স্থিতিশীল নয় - বিবর্তন ঘটছে, কোটি কোটি বছর ধরে বিবর্তনের মাধ্যমেই জীবের পরিবর্তন ঘটছে। আর তারপর ওয়ালেসের সাথে একসাথে প্রথমবারের মত ব্যাখ্যা করলেন যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ঘটে চলেছে এই নিরন্তর পরিবর্তন, যা এখন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমানিত জীববিজ্ঞানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ন মূল তত্ত্ব [৮]।*

তবে পরবর্তী অধ্যায়ে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করার আগে আরেকটি ছোট্ট বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। অনেকে মনে করেন, বিবর্তন তত্ত্ব বোধ হয় প্রাণের উৎস নিয়েও কাজ করে। এটি কিন্তু সর্বাংশে সত্য নয়। উৎস নিয়ে আসলে বিবর্তন তত্ত্বের কোন মাথা ব্যথা নেই, এটি কাজ করে মূলতঃ প্রাণের উৎপত্তির পর থেকে কিভাবে তার বিকাশ ঘটেছে তা নিয়ে। যদিও বিজ্ঞান জীবনের উৎস সন্ধানে খুবই তৎপর (যেমন, প্রাণের উৎপত্তির জৈব রাসায়নিক তত্ত্ব, প্যানস্পার্মিয়া ইত্যাদি তত্ত্ব দ্রষ্টব্য), কিন্তু এগুলো কোনটাই বিবর্তন তত্ত্বের মূল বিষয় নয়। যে ভাবেই জীবনের উৎপত্তি ঘটুক না কেন, সেটি কি

করে পদে পদে বিকশিত হল, বিবর্ধিত হল, উদ্ভব ঘটল নতুন নতুন প্রজাতির - এগুলোই বিবর্তন তত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয়।

চিত্র ১.৩: ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পিসিজ' প্রাণের উৎপত্তি' নিয়ে কাজ করে না

(সৌজন্য : http://evolution.berkeley.edu/evosite/misconceps/IAorigintheory.shtml)

তথ্যসূত্র:

১. Villagers speak of the small, hairy Ebu Gogo, 2004,
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2004/10/28/whuman228.xml&sSheet=/news/2004/10/28/ixnewstop.html

২. Q&A : Indonesian hominid find, BBC News, 2004,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3960001.stm

Flores Man, Nature online news,
http://www.nature.com/news/specials/flores/index.html

'Hobbit' joins human family tree, BBC News,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3948165.stm

Moris D, Eton or the zoo? BBC News, 2004,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/3964579.stm

৩. Rincon P, Neanderthals not close family, BBC News, 2004,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3431609.stm

৪. The National Academies Press (NAP), Teaching about Evolution and the Nature Of Science, http://www.nap.edu/readingroom/books/evolution98/evol1.html

৫. Stringer, C and Andrews P, 2005, The Complete World of Human Evolution. Thames and Hudson, New York, USA.

৬. Russell S, 2001, Of Mice and Men: Striking similarities at the DNA level could aid research, San fransisco Chornicle, http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2002/12/05/MN153329.DTL&type=science

৭ Stenger, VJ, 2003, Has Science Found God? The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe, Prometheus Books, New York, USA

৮. Dawkins R, Darwin and Darwinism, Mukto-Mona Darwin Day celebration, http://www.mukto-mona.com/Articles/dawkins/darwin_and_darwinism120206.htm

৯ রায় অ, ২০০৫, আইডি নিয়ে কূটকচালি, পড়শী মাসিক পত্রিকা (মুক্ত-মনায় পুনঃপ্রকাশিত) http://www.mukto-mona.com/Articles/avijit/porshi/id_porshi.pdf

দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য

{বন্যা আহমেদের *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটি অবসর প্রকাশনী থেকে ২০০৭ এর একুশে বইমেলায় প্রকাশিতব্য। এই অংশটি বইটির প্রথম অধ্যায়।}

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিবর্তনে প্রাণের স্পন্দন

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পর

খটকা যে লাগছিলো না তা তো নয়। সব কিছুতেই গরমিল, চোখ মেলে একটু বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা করতে গেলেই কোথায় যেনো গন্ডগোল বেঁধে যাচ্ছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃতিবিদ, বিজ্ঞানী এবং ভূতত্ত্ববিদেরা বারবারই যেনো হোঁচট খেয়ে পড়ছিলেন চারপাশের অসংখ্য পরিচিত এবং অপরিচিত প্রাণের সমাহার কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। তথাকথিত এই মহান সৃষ্টির মধ্যে এত অনাসৃষ্টি কেনো, কেনো এতো অযথা অপচয়, কেনো দেখলে মনে হয় এর পিছনে আদৌ কোন পরিকল্পনা বা প্ল্যান নেই? অবস্থাটা দাঁড়ালো অনেকটা কুয়োর ব্যাঙের মত, কুয়ো থেকে বের না হলে তো আর বাইরের পৃথিবীর নতুন নতুন জিনিষগুলো পরখ করে দেখা যাচ্ছে না, আবার কুয়ো থেকে বের হওয়ার পথটাও যে কেউ বাতলে দিচ্ছে না। ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের এই পৃথিবীর বয়স বহু কোটি বছরের কম নয়, বিজ্ঞানীরা তখনও জানতেন না পৃথিবীর আসল বয়স কত, পৃথিবীর বয়স হিসেব করে বের করার মত প্রযুক্তি তখনও তাদের হাতে ছিলো না, কিন্তু ভুতত্ত্বের বিভিন্ন স্তর এবং ফসিল দেখে বুঝতে পারছিলেন যে এর বয়স বহু কোটি বছরের কম নয় (অনেক পরে, ১৯০৫ সালে *রেডিওমেট্রিক ডেটিং* আবিষ্কৃত হওয়ার পরও বেশ পরে বিজ্ঞানীরা হিসাব করে বের করেন যে, পৃথিবীর বয়স আসলে প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর)। ফসিলগুলোও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে জীবজগতের সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশের ইতিহাস! কিন্তু বাইবেল তো বলছে, মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে সৃষ্টি করা হয়েছে সব গ্রহ, তারা, নক্ষত্রসহ আমাদের এই পৃথিবী, প্রকৃতিতে বিরাজমান সব প্রাণ একটি একটি করে সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টিকর্তার হাতে, আর তারপর তারা সেভাবেই রয়ে গেছে, বদলায়নি একটুও, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তারা থেকে যাবে অপরিবর্তনীয়! এই শাশ্বত স্থায়িত্বের তত্ত্ব যেন সিন্দাবাদের ভুতের মতই ঘাড়ে চেপে বসেছিলো। ষোড়শ শতাব্দীতে কোপার্নিকাস মানুষের কল্পনায় তৈরি স্থির পৃথিবীকে সূর্যের চারদিকে ঘুড়িয়ে দিলেন, ব্রুনোকে আগুনে পুড়তে হলো এই ঘুর্নায়মান পৃথিবীর তত্ত্বকে সমর্থন করার জন্য। কিন্তু জীববিজ্ঞান ঘুরপাক খেতে থাকলো সেই কাল্পনিক কয়েক হাজার বছরের অপরিবর্তনশীল এবং স্থবির প্রাণের আবর্তের ভিতরেই।

কিন্তু সেই প্রাচীন কালেই কি গ্রীক দার্শনিকদের মনে সন্দেহ জাগেনি প্রজাতির স্থিরতা নিয়ে? তাদের কেউ কেউ তখনই তো প্রস্তাব করেছিলেন যে প্রজাতি আসলে পরিবর্তনশীল, এক প্রজাতি থেকেই হয়তো আরেক প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে! তাহলে তারপর কি হলো? আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় যে, খ্রিষ্টীয় ধর্ম তত্ত্বের অন্ধকূপে আবদ্ধ হয়েই আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিলো দীর্ঘ দুই হাজার বছর! কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাসের পাতাগুলো একটু মনযোগ দিয়ে উল্টালে দেখা যায় যে, এই স্থির বিশ্ব বা অপরিবর্তনশীলতার দর্শনের আসল নাটের গুরু আমাদের বিশ্বজোড়া পূজনীয় দার্শনিকদ্বয়, প্লেটো এবং এরিস্টোটল ছাড়া আর কেউ নয়। এরিস্টোটল তার গুরু প্লেটোর মতই প্রাণশক্তি, স্থবির মহাবিশ্ব, স্থির এবং অপরিবর্তনশীল প্রজাতিতে আস্থাবান ছিলেন। তার মতে, বিশ্বজগতের সব কিছুর পিছনে একটা উদ্দেশ্য ঠিক করা আছে আর এই উদ্দেশ্যের মূলে রয়েছে অপরিবর্তনশীলতা [১]। সব কিছুর 'বিদ্যমান স্বভাব ধর্ম' জানাটাই নাকি বিজ্ঞান! মানব সভ্যতা তার এই স্থবির জাগতিক দর্শনের বোঝা বয়ে বেড়িয়েছে প্রায় দুই হাজার বছর! বার্ট্রান্ড রাসেল তার 'পশ্চিমা দর্শনের ইতিহাস' বইতে এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে,

এরিস্টোটলের এই মতবাদ বিজ্ঞান এবং দর্শনের জন্য পরবর্তীতে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো [২]। তারপর যত বড় বড় বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটেছে তাদের প্রায় সবাইকেই কোন না কোন ভাবে কোন না কোন এরিস্টোটলীয় মতবাদকে উৎখাত করে এগুতে হয়েছে। এখনও পর্যন্ত পৃথিবী জুড়ে তারই ধারাবাহিকতা দেখতে পাচ্ছি আমরা।

আঠারশ শতাব্দীর কার্ল লিনিয়াসকে (১৭০৭-১৭৭৮) জীবের শ্রেনিবিন্যাসের জনক বলে ধরা হয়, তিনিই প্রথমবারের মত জীবের শ্রেনিবিন্যাসের একটি সাধারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তৈরী করেন। লিনিয়াসও তখনকার দিনের রেওয়াজ অনুযায়ী একজন প্রকৃতিবিদ হিসেবে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর শ্রেনীবিন্যাস করে স্রষ্টার তুষ্টি লাভেই বেশী আগ্রহী ছিলেন [৩]। এমনকি প্রথম জীবনে তিনি মনে করতেন যে প্রজাতিরা উৎপত্তির লগ্ন থেকে অপরিবর্তনীয় অবস্থায়ই রয়ে গেছে, যদিও পরবর্তীতে এই মত কিছুটা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি বললেন, এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির হয়তো সৃষ্টি হয় এবং ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রকৃতিতে অনবরত সংগ্রামও চলে, তবে এর সব কিছুই ঘটে স্বর্গীয় নির্দেশে। বিজ্ঞানীরা গত ২০০ বছর ধরে লিনিয়াসের এই শ্রেনীবিন্যাসের পদ্ধতিকে (অল্প কিছু পরিবর্তনসহ) স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন। শুধুমাত্র পার্থক্য এই যে, লিনিয়াস এই মডেল আবিষ্কার করেছিলেন মহান স্রষ্টার সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার জন্য আর আজকের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জীবকে বিভিন্ন শ্রেনীতে ভাগ করেন তাদের মধ্যকার সঠিক বিবর্তনীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ।

জীবের বিবর্তনবাদ তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রা শুরু হয় আসলে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ব্রিটিশ প্রকৃতিবিদ চার্লস ডারউইনের (১৮০৯- ১৮৮২) হাত ধরে। তিনি বললেন,

> *কোন প্রজাতিই চিরন্তন বা স্থির নয়, বরং এক প্রজাতি থেকে পরিবর্তিত হতে হতে আরেক প্রজাতির জন্ম হয়, পৃথিবীর সব প্রাণই কোটি কোটি বছর ধরে তাদের পুর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হতে হতে এখানে এসে পৌঁছেছে।*

বিবর্তনের ইতিহাসের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে কয়েকশ কোটি বছর পিছনে গেলে দেখা যাবে যে মানুষ সহ সকল জীবেরই আদি উৎপত্তি হয়েছিল সেই একই আদিম এক কোষী প্রাণী থেকে, তার পর নানা ভাবে, নানা প্রজাতির মাধ্যমে তা বিবর্তিত হয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ডারউইনের দেওয়া এই বিবর্তন তত্ত্বটি আজকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত; এটি অত্যন্ত সফল একটি তত্ত্ব যা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আজকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ তিনি অন্যদের মত শুধু একটি ধারণা প্রস্তাব করেই ক্ষান্ত হননি, বিবর্তনের এই প্রক্রিয়াটি কিভাবে কাজ করে তার পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন সবিস্তারে, প্রথমবারের মত। কিন্তু উনবিংশ শতকের সেই সময়ে রক্ষণশীল খ্রীষ্ট ধর্মের প্রবল প্রতাপে প্রকৃতিবিজ্ঞান যখন মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল তখন ডারউইন এরকম একটি বৈপ্লবিক মতবাদ দিতে পারলেন কিভাবে? আসলে ডারউইনের আগের হাতেগোনা কয়েকজন সাহসী পুর্বসুরী ইতিমধ্যেই কাজ কিছুটা এগিয়ে নিয়েছিলেন; পৃথিবী তখন অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলো এমন একজনের জন্য, যিনি তখন পর্যন্ত পাওয়া, বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন তথ্য এবং সিদ্ধান্তগুলোকে এক বিনি সুতোর মালায়

গেঁথে জীববিজ্ঞানকে এগিয়ে দেবেন তার পরবর্তী স্তরে। তিনিই হলেন চার্লস রবার্ট ডারউইন।

তাই, ডারউইনের গল্পে আসার আগে তার এই পূর্বসুরীদের কয়েকজনের অবদান সম্পর্কে দু' একটি কথা না বলে নিলে বিবর্তনের ইতিহাসের গল্পটি হয়তো অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে। প্রথমেই বলতে হয় ফরাসী জীববিজ্ঞানী জ্যঁা ব্যাপ্তিস্তে ল্যামার্কের (১৭৪৪-১৮২৯) কথা। মজার ব্যাপার হচ্ছে, জীববিজ্ঞানে ল্যামার্ক তাঁর অবদানের জন্য যতখানি পরিচিত, তার চেয়ে ঢের বেশি পরিচিত বিবর্তনতত্ত্ব নিয়ে তার ভুল মতবাদের কারণে। ল্যামার্ক সঠিকভাবেই সিদ্ধান্তে আসেন যে, প্রজাতি সুস্থির নয়, এক প্রজাতি থাকে আরেক প্রজাতির বিবর্তন ঘটে, তবে তিনি যে পদ্ধতিতে এই পরিবর্তন ঘটে বলে ব্যাখ্যা দেন তা পরবর্তীতে সম্পূর্নভাবে ভুল বলে প্রমানিত হয়। কিন্তু এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, ল্যামার্কই হচ্ছেন প্রথম বিজ্ঞানী যিনি প্রজাতির স্থিরতাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে চ্যালেঞ্জ করে বিবর্তনের চালিকাশক্তি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে একটি যুক্তিযুক্ত উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন। তার মতবাদ সাড়া পৃথিবী জুড়ে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়, এবং এখনও প্রায়ই দেখা যায় যারা বিবর্তন সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারনা রাখেন তাদের অনেকেই ল্যামার্কিয়ান মতবাদকে ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বের সাথে গুলিয়ে ফেলেন। ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বের সাথে ল্যামার্কিয়ান দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো পরবর্তী অধ্যায়ে। ডারউইনের দাদা ডঃ ইরেমাস ডারউইনও (১৭৩১ - ১৮০২) ছিলেন একজন প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ এবং জীবের বিবর্তনের মতবাদের সক্রিয় সমর্থক। তিনি কোন ধর্মীয় বিধি বিধানে বিশ্বাস করতেন না, তবে মনে করতেন যে, এক পরমেশ্বরের নির্দেশেই জীব জগৎ, তার চারদিকের প্রতিকুল প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য, অনবরত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, আর এই পরিবর্তন চলছে বাইবেলে বলা কয়েক হাজার বছর নয়, বরং বহু কোটি বছর ধরে। এ দু'জন ছাড়াও জর্জ বুঁফো, সেন্ট-ইলার, রবার্ট চেম্বার্স, শ্লিখার, উঙ্গার, হার্বাট স্পেন্সর, শোপেন হাওয়ার সহ অনেক ডারউইন-পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের নাম করা যায় যারা বুঝতে পেরেছিলেন প্রজাতি আসলে স্থিতিশীল নয়। এরা বিবর্তনকে বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিলেও এর প্রক্রিয়া কি তা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি।

এবার আসা যাক, প্রখ্যাত ভুতত্ত্ববিদ চার্লস লায়েলের (Charles Lyell, ১৭৯৫ - ১৮৭৫) কথায়, ডারউইনের বিবর্তনবাদ মতবাদের আবিষ্কারের পিছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ডারউইন লায়েলের এর লেখা 'Principle of Geology' বইতে ভুতত্ত্বের সদাপরিবর্তশীলতার ধারনা দিয়ে খুবই প্রভাবিত হন। লায়েল বললেন,

> নূহের আমলের এক মহাপ্লাবন দিয়ে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন হয়নি, বরং হয়েছে ধীরে ধীরে বহু কোটি বছর ধরে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর কারণে– বৃষ্টি, আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নুৎপাত, ভূমিকম্প, বাতাসের মত অসংখ্য প্রাকৃতিক শক্তি যুগে যুগে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটিয়ে এসেছে এবং এখনও একইভাবে এই পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

যদিও লায়েলই প্রথম এই মতবাদটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন, তার মতবাদের বেশীরভাগ অংশই এসেছিলো তার পূর্বসূরী ভুতত্ত্ববিদ, ইতিহাসের পাতায় প্রায় হারিয়ে যাওয়া, জেমস হাটনের দেওয়া মতবাদ থেকে। সে গল্প আপাতত তোলা থাকলো পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য। লায়েলের এই মতবাদ তখনকার সমাজে তীব্রভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হলেও পরবর্তিতে তা ডারউইনকে খুবই প্রভাবিত করে। অনেকেই মনে করেন যে লায়েলের এই মতবাদ সামনে না থাকলে ডারউইন এত সহজে বিবর্তনবাদের পক্ষে তার যুক্তি এত বলিষ্ঠভাবে খাড়া করতে পারতেন না। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের পিছনে লায়েলের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান এতখানিই যে, তাকে ছাড়া এই গল্প বলা একরকম অসম্ভবই বলতে হবে, তাই পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে দেখা যাবে তাঁর প্রসংগ বারবারই সামনে এসে পড়ছে।

অনেকটা হঠাৎ করেই **১৮৩১** সালে ডারউইন বিগল্ জাহাজে করে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে শুরু করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ৫ বছরের জন্য ঘুড়ে বেড়ানোর সুযোগ পেয়ে যান। তখন তিনি মোটে কেমব্রিজের ক্রাইষ্ট কলেজ থেকে বি এ পাশ করে বেড়িয়েছেন। ছেলেকে ডাক্তার এবং আইনজ্ঞ বানানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ডারউইনের বাবা ডঃ রবার্ট ডারউইন শেষ পর্যন্ত তাকে ধর্মজাযক বানানোর জন্য এই ক্রাইষ্ট কলেজে পাঠান। কিন্তু তাতে আপাতভাবে হিতে বিপরীতই হলো! ধর্মজাযক হওয়া তো দূরের কথা, তিনিই শেষ পর্যন্ত চরম আঘাত হানলেন সানতন ধর্মের উপর তার বিবর্তন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বীগল্ জাহাজে ওঠার সময়ও কিন্তু তিনি অন্যান্য ছাত্রদের মতই সৃষ্টিতত্ত্ব এবং জীবের স্থিতিশীলতার তত্ত্বে বিশ্বাসী একজন প্রকৃতিবিদ ছিলেন, লায়েলের তত্ত্ব তখনও তার পড়া হয়ে ওঠেনি। তাহলে, এই পাঁচ বছরের বিশ্ব-অভিযানে বেড়িয়ে ডারউইন এমন কি দেখলেন যে তার

চিত্র ২.১ : ডারউইনের ২২ বছর বয়সের ছবিঃ এ সময়ই তিনি বিগেল জাহাজের যাত্রা শুরু করেন।

চিত্র ২.২ : বিগেল জাহাজে করে ডারউইন যে পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন
(সৌজন্যঃ http://www2.ups.edu/faculty/veseth/watson/Toby/darwins-voyage.htm)

এই ধারনাগুলোর আমুল পরিবর্তন ঘটে গেলো? আসলে, হঠাৎ করে পুরো পৃথিবী ঘুরে দেখার সুযোগ ও দক্ষিণ আমেরিকার বৈচিত্রময় প্রকৃতির সাথে তার স্বভাবজাত ধৈর্য, গভীর পর্যবেক্ষন শক্তি, অনুসন্ধিৎসু মন এবং সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতিকে সমন্বয় করে জীবের উৎপত্তি এবং বিকাশ সম্পর্কে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন তা আমাদের হাজার বছর ধরে লালন করা সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত প্রাচীন এবং ধর্মীয় চিন্তা পদ্ধতিগুলোকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিলো। ডারউইনের নিজের কাছেই বিবর্তন তত্ত্বটি এতখানি বিপ্লবাত্মক মনে হয়েছিল যে তিনি তা প্রচার করতেও যথেষ্ট দ্বিধা বোধ করছিলেন। বীগল্ জাহাজের পাঁচ বছরব্যাপী বিশ্বভ্রমণ শেষ করে এসে, ১৮৩৭ সালের দিকেই প্রজাতির উৎপত্তি নিয়ে লিখতে শুরু করলেও ১৮৫৯ সালের আগে তিনি ‘On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life’ বা ছোট করে বললে ‘প্রজাতির উৎপত্তি’ বইটি প্রকাশ করেননি। হুকারের কাছে লেখা এক চিঠিতে ডারউইন এ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছিলেন যে এই তত্ত্বটি প্রস্তাব করতে গিয়ে তার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে, বিবর্তনের এই গল্প বলতে গিয়ে মনে হচ্ছে তিনি যেনো একজন নরঘাতক হিসেবে স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, ডারউইনের শিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী প্রফেসর হেনস্লো ১৮৩১ সালে লায়েলের লেখা বইটি উপহার দেন জাহাজে বসে পড়ার জন্য। গভীরভাবে ইশ্বরে বিশ্বাসী শিক্ষকমশাই পইপই করে এও বলে দেন ডারউইন যেনো লায়েলের সব সিদ্ধান্তই আবার বোকার মত বিশ্বাস না করে বসেন! কিন্তু আবারও হিসেবে গন্ডগোল হয়ে গেলো, তিনি যতই বিশ্ব-প্রকৃতি ঘুড়ে দেখতে থাকলেন ততই এর পক্ষে আরও বেশি করে সাক্ষ্য প্রমান পেলেন [8] এবং লায়েলের সদাপরিবর্তশীলতার ধারনাতে দীক্ষিত হয়ে উঠলেন। ডারউইন এ সময়ে মুলত ভুতত্ত্ব নিয়েই গবেষনা করছিলেন, এবং ভ্রমন শেষে তিনি ভূ-প্রকৃতি নিয়ে উল্লেখযোগ্য তিনটি বইও লেখেন। কিন্তু এর মধ্যে দিয়েই জীবজগত নিয়ে তার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটতে থাকে, বিচিত্র ভূ-প্রকৃতির সাথে বিচিত্র সব জীবের সমারোহ দেখতে দেখতে

তিনি আরও গভীরভাবে জীবের উৎপত্তি এবং বিকাশ নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের চিলির উপকূলে নোঙ্গর করা বীগল্ জাহাজের ভিতরে হঠাৎ একদিন ভীষণভাবে আঁতকে উঠলেন ডারউইন সহ জাহাজের অন্যান্য বাসিন্দারা, দুই মিনিট ধরে যেনো এক মহাপ্রলয় ঘটে গেলো সারা পৃথিবী জুড়ে। ভুমিকম্প শেষ হলে ডারউইন এবং বীগেলের ক্যাপটেন ফিটজরয় সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে, উপকুলের ভূমির উচ্চতা বেড়ে গেছে প্রায় ৮ ফুট! তাহলে কি লায়েলের হিসাবই ঠিক? সেই অনাদিকাল থেকে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোই পরিবর্তন করে আসছে আমাদের এই পৃথিবীর চেহারা? আবার একদিন কেপ ভার্দে নামে এক দ্বীপপুঞ্জে নেমে তিনি দেখলেন একটি সাদা দাগ চলে গেছে মাইলের পর মাইল জুড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে [১]। কৌতুহলী ডারউইন পরীক্ষা করে বুঝলেন যে, এগুলো আর কিছুই নয়, বহু বছর ধরে শামুক ঝিনুকের খোলসের চুনাপাথর থেকে এই সাদা দাগের উৎপত্তি ঘটেছে, ঠিক একইরকম দাগ বয়ে চলে গেছে সমুদ্রের পার বেয়েও। ডারউইন আবারও লায়েলের তত্ত্বের স্মরণাপন্ন হতে বাধ্য হলেন, তার মানে সমুদ্রের পার থেকে ৪৫ ফুট উপরের এই এলাকাটি এক সময় সমুদ্রের নীচে ছিলো এবং অগ্নুৎপাতের ফলে সমুদ্রের নীচ থেকে এত উপরে উঠে এসেছে! প্রকৃতিতে এরকম বড় বড় পরিবর্তনের উদাহরনের তো কোন অভাব নেই, যেমন, মানচিত্র খুললে আজ যে ৭ টি মহাদেশ আমরা একেক জায়গায় দেখি, তিনশো কোটি বছর আগে কিন্তু এভাবে ছিলো না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন যে, মহাদেশীয় সঞ্চারনের (Continental drift) মাধ্যমে এক সময় তারা আলাদা হয়ে বিভিন্ন মহাদেশের উৎপত্তি হয় এবং এই সঞ্চারন আজও ঘটে চলেছে বিরামহীনভাবে। সে যাই হোক, এখন আবার ফিরে যাওয়া যাক আমাদের আসল গল্পে। ডারউইন লায়েলের এই তত্ত্বকেই পরবর্তীতে কাজে লাগান জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, যদিও লায়েল নিজে প্রজাতির পরিবর্তনের ধারণাকে ভুল বলে মনে করতেন। চারপাশের বিচিত্র প্রাণী আর উদ্ভিদের সমারোহ দেখতে দেখতে ডারউইনের সন্দেহ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে যে জীবজগতও স্থির হতে পারে না, এদের অতীতে পরিবর্তন ঘটেছে এবং আজও তা ঘটে চলেছে। বীগল্ জাহাজে ভ্রমনকালীন সময়ে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কয়েকটি বড় বড় অভিযান চালান। এরকম একটি থেকে ফিরে এসে তিনি তার বোন সুজানকে লেখা একটি চিঠিতে বলেন যে এটি ছিলো তার সবচেয়ে সফল অভিযান কারণ এর পরই তিনি নিশ্চিত হন যে,

> *আসলে এত দিন ধরে চলে আসা ভূ-প্রকৃতির স্থিতিশীলতার তত্ত্বটি ভুল, লায়েলের সদা-পরিবর্তনশীল ভূ-প্রকৃতির ধারণাই আসলে সঠিক। এই উপলব্ধিটিই পরবর্তিতে প্রাণের বিবর্তন সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে অগ্রনী ভুমিকা পালন করে [৮]।*

তখনও অন্যান্য ফসিলবিদদের আবিষ্কৃত বেশ কিছু ফসিলের উদাহরণ ছিলো ডারউইনের সামনে, কিন্তু সেগুলোর উপর তার মূল সিদ্ধান্ত ভিত্তি না করে তিনি বেশীরভাগ উদাহরণই সংগ্রহ করেন প্রকৃতিতে বিদ্যমান বিচিত্র প্রাণী এবং উদ্ভিদ থেকে। তিনি প্রকৃতিতে এত বৈচিত্রময় প্রাণের সমাহার এবং তাদের মধ্যকার বিপুল সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হন। একই ধরনের কাছাকাছি শারীরিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রজাতিগুলোকে কেন সাধারণত একই মহাদেশে বা কাছাকাছি দ্বীপপুঞ্জেই দেখা যায়? আবার অন্যদিকে এই প্রতিটি প্রজাতির খাদ্যাভ্যাস, বা বসবাসের পরিবেশের মধ্যে কেন এতো লক্ষণীয় রকমের পার্থক্য

দেখা যায়? কেন আফ্রিকা মহাদেশেই শুধু বিভিন্ন প্রজাতির জেব্রা দেখা যায়, মারসুপিয়াল (পেটের কাছের থলিতে বাচ্চা বড় করতে পারে এমন ধরনের প্রাণীদের মারসুপিয়াল বা Marsupian জাতীয় প্রাণী বলা হয়) জাতীয় ক্যাঙ্গারু বা কোয়ালা কেন পাওয়া যায় শুধু অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে? আবার দক্ষিণ আমেরিকার দ্বীপে উড়তে অক্ষম দু'ধরনের বেশ বড় আকৃতির পাখি দেখা গেলেও অস্ট্রেলিয়ার ইমু বা আফ্রিকার উটপাখীর সাথে তাদের কোন মিল নেই। স্থলচর প্রাণীর মধ্যে ইউরোপের মত এখানে খরগোশ নেই, আছে কয়েক ধরনের তীক্ষ্ণ দাঁতসম্পন্ন অন্য ধরনের ইঁদুর, জলচর প্রাণীর মধ্যে কয়পাস (coypus) বা ক্যাপিব্যারাসের (capybaras) মত প্রাণী থাকলেও, বিবর জাতীয় (beaver) প্রাণীর তো দেখা পাওয়া যাচ্ছে না এখানে! গ্যালাপ্যাগাস দ্বীপপুঞ্জে এবং তার কাছাকাছি এলাকাগুলোতে ১৪ ধরনের প্রজাতির ফিঞ্চ পাখী, ১৬ প্রজাতির শামুক, তিন রকমের প্রকান্ড আকারের কচ্ছপ এবং গিরগিটির মত দেখতে কয়েক প্রজাতির ইগুয়ানা দেখা যায় যেগুলো পৃথিবীর আর কোন অঞ্চলে দেখা যায় না। দক্ষিণ আমেরিকায় আরও আছে টেপির, চিনচিলা, আর্মাডিলা, লামা, জাগুয়ার, প্যান্থার, বিশাল আকৃতির পিপিলিকাভূক এবং আরও অনেক প্রাণী যাদেরকে আফ্রিকা মহাদেশে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আবার আফ্রিকার সিংহ, হাতি, গন্ডার, জলহস্তী, জিরাফ, হায়েনা, লেমুর, শিম্পাঞ্জির মত প্রাণীগুলো সম্পূর্নভাবে অনুপস্থিত সেই মহাদেশে। এ প্রসংগে বলতে গিয়ে তিনি তার বইতে লিখেন, জৈব-ভৌগলিক উদাহরণগুলো নিয়ে যারা কাজ করছেন, তারা নিশ্চয়ই 'কাছাকাছি প্রজাতিগুলোর' মধ্যে একই ধরনের বৈশিষ্ট্যের বা প্যাটার্নের রহস্যময় সমন্বয় দেখে অবাক না হয়ে পারেন না [৫]।

ডারউইন এই গ্যালাপ্যাগাসের দ্বীপগুলোতেই সবচেয়ে বিচিত্র ধরনের প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন, যা তাকে পরবর্তীতে বিবর্তনের পক্ষের প্রমাণগুলো প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। গ্যালাপ্যাগাসের বিভিন্ন দ্বীপগুলোতে যে ১৪ ধরনের ফিঞ্চ দেখতে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে ডারউইন নিজেই ১৩ টি সংগ্রহ করেছিলেন। এই ফিঞ্চ পাখিগুলো হচ্ছে বিবর্তনীয় অভিযোজন (adaptation) বা বিবর্তনের ফলে এক প্রজাতি থেকে বিচিত্র বহু ধরনের প্রজাতি উৎপত্তি হওয়ার একটি চমৎকার উদাহরণ। বিস্মিত ডারউইন লক্ষ্য করলেন যে, তাদের সার্বিক দৈহিক গঠনে প্রচুর মিল থাকলেও ঠোটের আকৃতি ও গঠনে বেশ উল্লেখযোগ্য রকমের পার্থক্য রয়েছে। এদের মধ্যে আবার ছয়টি মাটিতে বাস করে এবং বাকিরা থাকে গাছে। যারা মাটিতে থাকে তাদের মধ্যে একটি অংশ বিভিন্ন ধরনের বীজ খেয়ে বেঁচে থাকে আর বাকীদের প্রধাণ খাদ্য হচ্ছে ক্যাকটাস জাতীয় গাছের ফুল। দেখা গেলো যারা বীজ খায় তাদের ঠোঁট বেশ মোটা যা তাদেরকে বীজ ভাঙ্গতে সহায়তা করে, আবার যারা ক্যাকটাসের ফুল খায় তাদের ঠোঁটগুলো হচ্ছে সোজা এবং খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ফুল খাওয়ার উপযোগী। যারা গাছে থাকে এবং পোঁকা মাঁকড় ধরে খায় তাদের ঠোঁটের আকৃতি আবার ঠিক সেরকমই লম্বা যাতে তারা গর্ত থেকে পোঁকা ধরে নিয়ে আসতে পারে। ডারউইন এই পর্যবেক্ষণ থেকে লিখেলেন, 'সবচেয়ে কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় হচ্ছে এই প্রজাতিগুলোর ঠোঁটের নিখুঁত ধাপে ধাপে ঘটা ক্রমবিকাশ ...একটি ছোট ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত পাখির দলের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের এই ক্রমাগত রূপান্তর ও বৈচিত্র দেখে যে কেউ অবশ্য কল্পনা করতে পারে যে এই দ্বীপগুলোতে পাখির প্রাথমিক অভাব দুর করার জন্য একটি মুল প্রজাতি থেকে নিয়ে বিভিন্ন পরিবেশের জন্য উপযোগী ও পরিবর্তন করে অন্যদের তৈরী করা হয়েছে' [৬]।

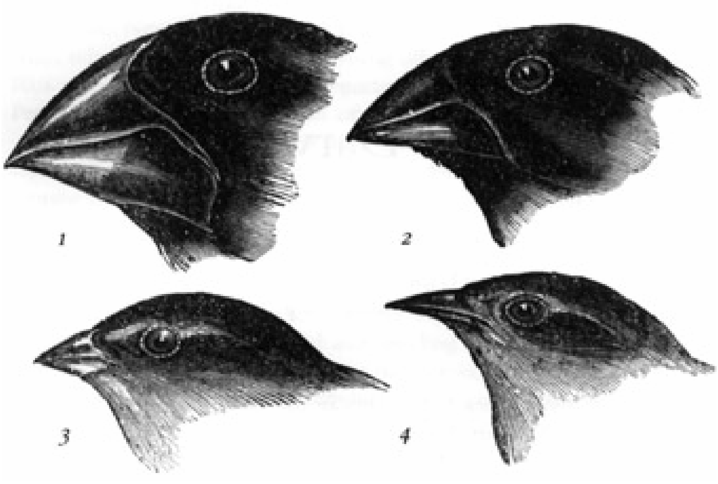

চিত্র ২.৩ : ডারউইনের আঁকা কয়েকটি প্রজাতির ফিঞ্চের ছবি
(সৌজন্যঃ Darwin's *Journal of Researches:* (1) large ground finch (2) medium ground finch (3) small tree finch (4) warbler finch)

তিনি পরবর্তিতে তার বইতে লেখেন,

> বিভিন্ন জীবের মধ্যে এলাকা এবং সময় বিশেষে এই নিবিড় সম্পর্কের কারন উত্তরাধিকার ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না, অর্থাৎ এই কাছাকাছি ধরনের প্রজাতিরা সাধারনত খুব কাছাকাছি এলাকায় বাস করে কারন তারা একসময় একই পুর্বপুরুষ থেকে পরিবর্তিত হতে হতে বিভিন্ন প্রজাতিতে পরিনত হয়েছে [৫]।

এতদিনের সৃষ্টিতত্ত্ব আমাদেরকে যা শিখিয়ে এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ধরে নিতে হবে যে, কোন এক সৃষ্টিকর্তা বিভিন্ন পরিবেশের সাথে উপযোগী করে বিভিন্ন জায়গার প্রাণী এবং উদ্ভিদ তৈরী করেছিলেন। কিন্তু এই যুক্তির সাথেই কি বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমান উদাহরণের কোন মিল পাওয়া যাচ্ছে? তাহলে তো একই ধরনের জলবায়ু এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জায়গাগুলোতে একই রকমের প্রাণী দেখা যাওয়ার কথা ছিলো! ডারউইন দেখলেন যে, বিভিন্ন মহাদেশের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে মিল বা অমিল - কোনটাকেই শুধুমাত্র পরিবেশগত পার্থক্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। যেমন, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের প্রাণীগুলোর সাথে অন্য মহাদেশের প্রাণীর তেমন কোন মিল নেই, আবার আমরা দেখেছি যে, দক্ষিণ আমেরিকার প্রাণীগুলোও দেখতে বেশ অন্যরকম। অথচ ইউরোপ, এশিয়া বা আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় তো অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আমেরিকার মত পরিবেশ দিব্যি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! আবার গ্যালাপ্যাগাস বা দক্ষিণ আমেরিকার কাছাকাছি দ্বীপগুলোর প্রাণীদের সাথে তার মুল ভুখন্ডের প্রাণীদের যেরকম মিল পাওয়া যাচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জীবজন্তুর সাথে তা পাওয়া যাচ্ছে না। ডারউইন যদি

এই দ্বীপগুলোতে সম্পূর্ন নতুন ধরনের প্রাণী দেখতেন তাহলে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে তার মনে হয়তো প্রশ্ন উঠতো না, কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার মুল ভুখন্ডের সাথে তাদের এই পরিমাণ সাদৃশ্য তাকে ভাবিয়ে তুলেছিলো। তিনি প্রশ্ন করলেন, সৃষ্টির সময় এইসব দ্বীপে যদি বিভিন্ন জীবদের রেখে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এদের গায়ে দক্ষিণ আমেরিকার ছাপ কেনো? আবার ঠিক বিপরীতভাবে দেখা যাচ্ছে, কাছাকাছি জায়গার দ্বীপগুলোতে বাস করা বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তুর মধ্যে রয়েছে অকল্পনীয় রকমের বৈচিত্র! বিস্মিত হয়ে ডারউইন লিখলেন যে তিনি এত কাছাকাছি, মাত্র ৫০-৬০ মাইল দুরে অবস্থিত দ্বীপগুলো, যাদের একটি থেকে অন্যটিকে খালি চোখে দেখা যায়, যারা একই শীলায় তৈরী, একই জলবায়ুর অধীন, এমনকি যাদের উচ্চতাও এক - তাদের মধ্যে এত ভিন্ন ধরনের বাসিন্দা দেখা যাবে তা স্বপ্নেও আশা করেননি [১]।

দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া নানা ধরনের প্রাণীর ফসিলও চোখে পড়েছিলো ডারউইনের। বহুদিন আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এইসব প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যের সাথে আজকের পৃথিবীর প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য তুলনা করে তিনি প্রজাতির স্থায়িত্ব নিয়ে আরও সন্দিহান হয়ে পড়লেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক স্তরে কেনো বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর ফসিল পাওয়া যাচ্ছে? ভুতাত্ত্বিকভাবে যেমন অপেক্ষাকৃত পুরানো স্তরের উপরে থাকে তার চেয়ে কম পুরানো স্তরটি, ঠিক একইভাবে যে জীব যত প্রাচীন তার ফসিলও পাওয়া যায় ততই প্রাচীন স্তরের মধ্যেই। ডারউইন লক্ষ্য করলেন, কাছাকাছি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রজাতির প্রানী বা উদ্ভিদের ফসিলগুলোকে সময়ের ধারাবাহিকতায় তৈরি একটির উপরে আরেকটি ভুতাত্ত্বিক স্তরের মধ্যেই শুধু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে কি একটি প্রজাতির থেকে কাছকাছি আরেকটি প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে নাকি এধরনের মিলগুলোকে কেবলই কাকতালীয় ঘটনা বলে ধরে নিতে হবে? কিন্তু ফসিল রেকর্ডে তো স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে যে একটি প্রাণী হাজার বছর ধরে টিকে থেকে একসময় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, কোন স্তরেই তার আর কোন ফসিল পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু ঠিক তার উপরের স্তরেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে খুবই সাদৃশ্যপুর্ণ আরেকটা নতুন ধরনের প্রজাতি।

> শুধু দেড়শো বছর আগে ডারউইনের সময়েই নয়, একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসেও এখন পর্যন্ত এমন একটি ফসিল পাওয়া যায়নি যা কিনা এই নিয়মের বাইরে পড়েছে। কয়েকদিন আগে, ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে বিবর্তনের বিপক্ষ শক্তির প্রচারনাকে খন্ডন করতে গিয়ে আজকের দিনের বিখ্যাত বিবর্তনবাদী প্রফেসর রিচার্ড ডকিনস বলছেন, *".. And far telling - not a single authentic fossil has ever been found in the "wrong" place in the evolutionary sequence. Such an anachronistic fossil, if one were ever unearthed, would blow evolution out of the water.."* [৭].

একটি বহুল আলোচিত উদাহরণ দেওয়া যাক এ প্রসঙ্গে। উত্তর আমেরিকায় এক্কেবারে নীচের দিকের প্রাচীন স্তরে (প্রায় ৫ কোটি বছর আগের) পাওয়া গেছে খানিকটা ঘোড়ার মত দেখতে *Hyracotherium* নামক একটি প্রাণী, তারপর বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সময়ে পাওয়া গেছে *Orohippus* , *Epihippus* ,

Mesohippus , *Hipparion*, *Pliohippus* এবং আরও অনেক ধরনের মাঝামাঝি ধরনের ঘোড়ার ফসিল। কিন্তু প্রায় ৫০ লক্ষ বছর আগে এদের একটি প্রজাতি ছাড়া বাকি সবাই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং এর

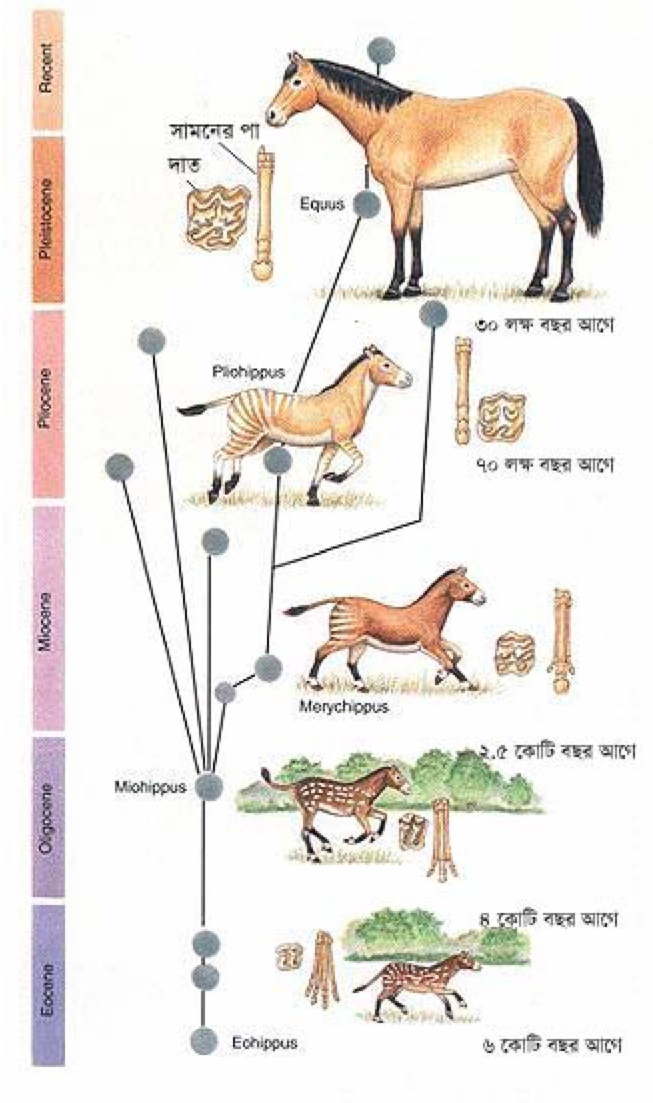

চিত্র ২.৪ : ঘোড়ার বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর
(সৌজন্যঃ University Of Texus Web page :
http://www.micro.utexas.edu/courses/levin/bio304/evolution/evol.proc.html)

থেকেই পরবর্তীতে উৎপত্তি হয় আজকের যুগের আধুনিক ঘোড়ার বিভিন্ন প্রজাতি। ডারউইনের সময় এতো ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন স্তরের ফসিল পাওয়া না গেলেও তিনি এর পিছনের সম্ভাব্য কারণটি ঠিকই খুঁজে বের করতে পেরেছিলেন।

> তিনি এ ধরনের উদাহরনগুলো থেকে ক্রমশঃ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে থাকেন যে, ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত প্রজাতিরা বিবর্তনের মাধ্যমে একে অন্যকে প্রতিস্থাপিত করেছে। তিনি বলেন, 'সমস্ত ফসিলকে দুভাগে ভাগ করা যায়, হয় তারা বর্তমান কোন গোষ্ঠীর মধ্যে পড়বে, নয় তো তাদের জায়গা হবে দুটি গোষ্ঠির মধ্যের কোন জায়গায়'।

এই মুহূর্তে ফসিল রেকর্ড নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না, বিবর্তন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ফসিল রেকর্ডের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে, তাই পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার সাথে বিভিন্ন প্রজাতির মিল বা আমিলের কি কোন সম্পর্ক রয়েছে? পরবর্তীকালে ডারউইন বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং তার সংগৃহীত অসংখ্য জীবিত এবং ফসিলের নমুনা থেকে উপলব্ধি করেন যে, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার সাথে বিভিন্ন প্রজাতির সাদৃশ্য বা অসাদৃশ্যের একটি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বললেন,

> দুটি এলাকা যদি দীর্ঘকাল ধরে বিচ্ছিন্ন থাকে, তাদের মাঝে মহাসমুদ্র, খুব উচু পর্বতশ্রেনী বা এধরনের অন্য কোন প্রতিকুল বাঁধা থাকে যা অতিক্রম করে প্রানীরা অন্য দিকে পৌঁছুতে পারবে না, তাহলে তাদের স্থানীয় জীবজন্তু, গাছপালাগুলো স্বতন্ত্রভাবে বিবর্তিত হতে শুরু করবে এবং এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ক্রমাগতভাবে চলতে চলতে দীর্ঘকাল পর দেখা যাবে যে, এই দুই অঞ্চলের প্রানীদের অনেকেই অন্যরকম প্রজাতিতে পরিনত হয়েছে। আবার যে অঞ্চলগুলোর মধ্যে এ ধরনের কোন বাধার দেওয়াল নেই, সেখানে বিস্তীর্ন অঞ্চল বা সমস্ত এলাকা জুড়েই একই ধরনের জীব দেখা যাবে[৮]।

এ প্রসঙ্গে দু'টি মজার উদাহরণ দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। আমরা সাধারণত মারসুপিয়াল (ক্যাঙ্গারু, কোয়ালা,ইত্যাদি প্রাণী) জাতীয় প্রাণীর বাসস্থান বলতে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশকেই বুঝি। কিন্তু শুধু অস্ট্রেলিয়া নয়, দক্ষিণ আমেরিকায় আজও গুটিকয়েক মারসুপিয়াল জাতীয় প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। এর কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়, একসময় দক্ষিণ আমেরিকা অ্যান্টারটিকার মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ার সাথে সংযুক্ত ছিলো, তখন সেখান থেকে মারসুপিয়াল জাতীয় প্রাণীগুলো অ্যান্টারটিকা হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছায়। তারপর দক্ষিণ আমেরিকায় কয়েকটি ছাড়া প্রায় সবগুলো মারসুপিয়াল প্রাণী বিলুপ্তির পথ ধরলেও অস্ট্রেলিয়ায় তারা আধিপত্য বিস্তার করে নেয়। আর ইতিমধ্যে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং

অ্যান্টারটিকা একে অপরের থেকে সম্পুর্নভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আর তার ফলে অস্ট্রেলিয়ায় তাদের বিবর্তন ঘটতে থাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে, নিজস্ব গতিতে, যার ফলশ্রুতিতেই আমরা আজকে অস্ট্রেলিয়ায় এতো বিচিত্র প্রাণীর সমাবেশ দেখতে পাই, যার নমুনা অন্যান্য আঞ্চলে দেখা যায় না বললেই চলে। আর অন্যদিকে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে অ্যান্টারটিকা মহাদেশের পরিবেশ ক্রমাগতভাবে খুব বেশী ঠান্ডা হয়ে যাওয়ায় সেখানকার সব স্তন্যপায়ী প্রাণী-বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবার ঠিক এর বিপরীত ঘটনা ঘটতে দেখা যায় ঘোড়ার ইতিহাসের ক্ষেত্রে। আমরা ফসিল রেকর্ড থেকে আগেই দেখেছি যে, উত্তর আমেরিকায় প্রথম ঘোড়ার পুর্বপুরুষের উদ্ভব ঘটে। যখন উত্তর আমেরিকা, প্রায় ২০-৩০ লক্ষ বছর আগে, তার উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে রাশিয়ার মাধ্যমে এশিয়া মহাদেশের সাথে সংযুক্ত ছিলো তখন আধুনিক ঘোড়ার একটা অংশ এশিয়া হয়ে ইউরোপ এবং আফ্রিকা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এবং পরবর্তীতে এই মহাদেশগুলোর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। একসময়, উত্তর আমেরিকার সাথে এশিয়ার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন কারণে ১০-১৫ হাজার বছর আগে উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ঘোড়াও সম্পুর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু পনেরশো শতাব্দীতে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর আবার নতুন করে ইউরোপ থেকে আমেরিকায় ঘোড়ার আমদানী করা হয়। ডারউইন এপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে স্তন্যপায়ীদের ইতিহাসে নিশ্চয়ই এটি একটি চমৎকার ঘটনা, দক্ষিণ আমেরিকাতে তার নিজস্ব ঘোড়া ছিলো, তা বিলুপ্ত হয়ে গেলো, কিন্তু বহুকাল পরে স্পেনীয়দের আনা কয়েকটি ঘোড়ার বংশধর তাদের স্থান দখল করে নিলো [১]। এই ভাবেই ভৌগলিকভাবে সংযুক্ত এলাকাগুলোর বিস্তীর্ন অঞ্চল জুড়ে একই প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদের অস্তিত্ব দেখা যায়। ঘোড়া যদি এশিয়া, ইউরোপে ছড়িয়ে না পড়তো, বা তারা ছড়িয়ে পড়ার আগেই যদি উত্তর আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো (যা পরবর্তীতে হয়েছে) তাহলে আজকে হয়তো পৃথিবীর বুকে আর ঘোড়ার অস্তিত্বই থাকতো না!

বিবর্তন প্রক্রিয়া যদি সত্যিই প্রকৃতিতে কাজ করে থাকে তবে যে প্রাণী যত পরে অন্য প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়ে নতুন প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে, তার সাথে তার ঠিক আগের পুর্বপুরুষের শারীরিক পার্থক্য ততই কম হবে বলে আশা করা যায়। এ ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়েছে। বিভিন্ন প্রাণীর শারীরিক গঠনের মধ্যে এই সাদৃশ্য দেখেও ডারউইন বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। বিভিন্ন মেরুদন্ডী প্রাণীর সামনের হাত বা অগ্রপদের মধ্যে কি অস্বাভাবিক মিলই না দেখা যায়! ব্যাঙ, কুমীর, পাখি, বাদুর, ঘোড়া, গরু, তিমি মাছ এবং মানুষের অগ্রপদের গঠন প্রায় একই রকম। এখন আমরা আধুনিক জেনেটিক্স-এর জ্ঞান থেকেও জানতে পারছি যে, এরকম বিভিন্ন প্রাণীর ডিএনএর মধ্যেও লক্ষ্যণীয় মিল দেখা যায়। ডারউইনের সময় বিজ্ঞানীদের ডিএনএ-এর গঠন বা জেনেটিক্স সম্পর্কে কোন ধারণা ছিলো না, তিনি প্রাণীদের মধ্যে শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য দেখে অবাক হয়ে লেখেন, 'হাত দিয়ে মানুষ কোন কিছু ধরে, আর ছুঁচো তা দিয়ে মাটি খুঁড়ে। ঘোড়ার পা, শুশুকের প্যাডেল ও বাদুরের পাখার কাজ ভিন্ন। অথচ এদের সবার হাত বা অগ্রপদের গঠন শুধু একই প্যাটর্নেরই নয়, তুলনামুলকভাবে একই জায়গায় আছে একই নামের অস্থিগুলো .... এর থেকে অদ্ভুত আর কি হতে পারে?' [১]।

বিবর্তনের আরেকটি বেশ গুরুত্বপুর্ণ সাক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন প্রাণীর শরীরে এখনও বিদ্যমান বিলুপ্তপ্রায় (Vestigeal Organs) এবং অপ্রয়োজনীয় অংগগুলো। তিমি মাছের সমুদ্রে বাস করার জন্য পায়ের দরকার নেই, কিন্তু এখনও পিছনের পায়ের হাড় গুলো কেনো রয়ে গেছে তার? সাপের পাঁচ পা হয়তো দেখা যায় না, কিন্তু কিছু সাপের শরীরে কেনো এখনও রয়ে গেছে পায়ের হাড়ের অংশগুলো? উড়তে

পারে না এমন অনেক পাখি, পোকা বা আরশোলার পাখা রয়ে গেছে। মানুষের তো লেজ থাকার কথা নয়,

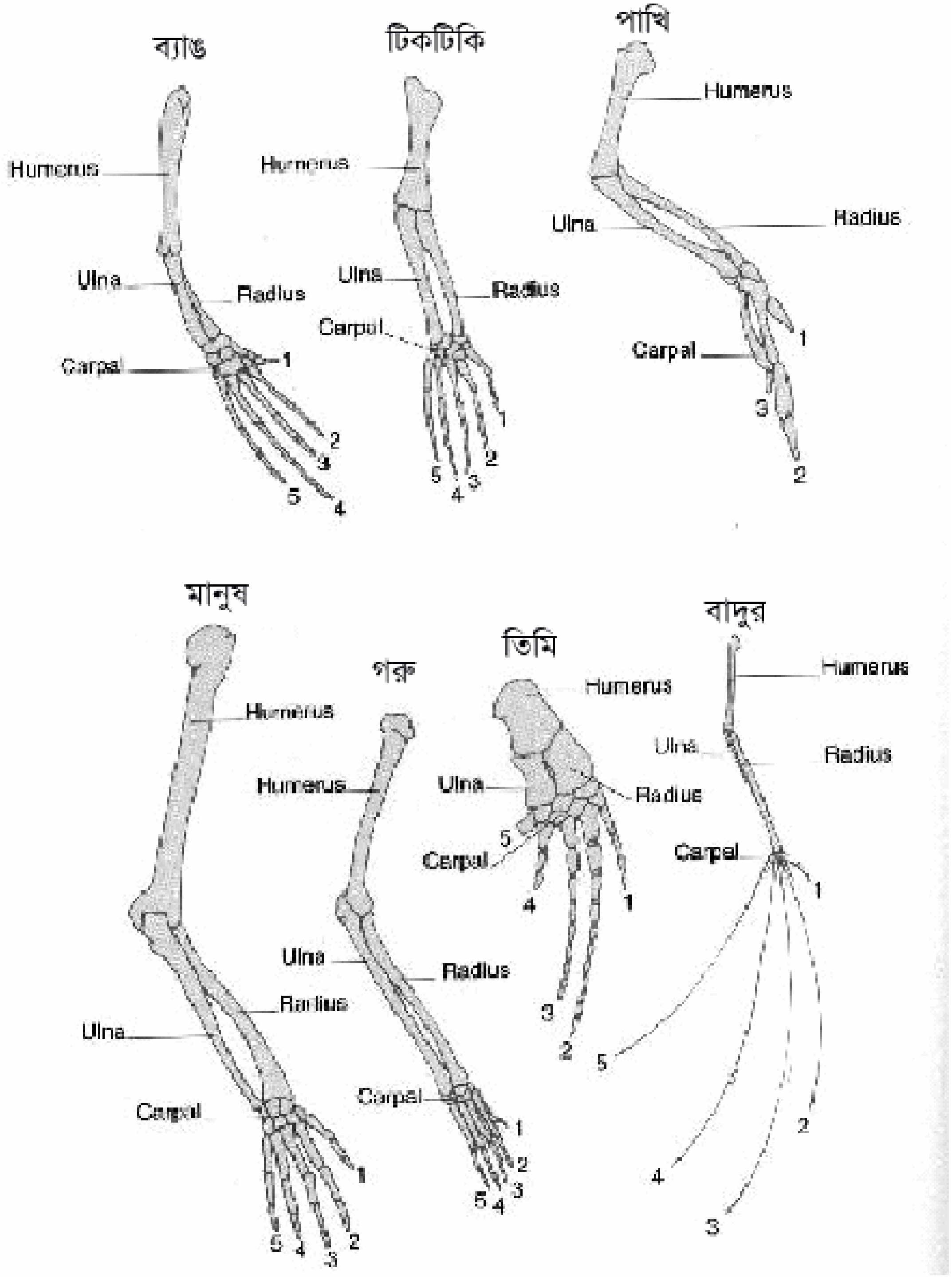

চিত্র ২.৫ : বিভিন্ন প্রাণীর অগ্রপদের হাড়ের মধ্যে সাদৃশ্য
(সৌজন্যঃ ইউনিভারসিটি অফ ব্রিটিশ কলাম্বিয়া,
http://www.zoology.ubc.ca/~bio336/Bio336/Lectures/Lecture5/Overheads.html)

তাহলে লেজের হাড়ের অংশগুলো কি করছে আমাদের শরীরে? এ্যাপেনডিক্সের প্রয়োজন ঘাসসহ বিভিন্ন ধরনের সেলুলোজ-সমৃদ্ধ খাওয়া হজম করার জন্য, মানুষ তো ঘাস খায় না, তাহলে এ অংগটির কি প্রয়োজন ছিল আমাদের? তারপরে ধরুন, আক্কেল দাঁত বা ছেলেদের শরীরের স্তনবৃন্ত - এগুলোরই বা কি দরকার? প্রকৃতিতে এমন ধরনের উদাহরণের কোন শেষ নেই - বোঝাই যাচ্ছে যে,

> *এই বিলুপ্তপ্রায় অংগগুলো একসময় পূর্বপুরুষদের কাজে লাগলেও, এখন বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় পরিবর্তিত প্রাণীদের দেহে এরা আর কোন কাজে আসে না।*

তবে ডারউইন দীর্ঘকাল ধরে অব্যবহারের ফলে এই অংগগুলো একসময় ছোট এবং অকেজো হয়ে পড়ে বলে যে ধারণা করেছিলেন পরবর্তীতে বংশগতিবিদ্যার জ্ঞানের আলোকে তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়। ডারউইনের সময় জেনেটিক্স বা বংশগতি সম্পর্কে তার নিজের এবং সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের কোন ধারণা ছিল না, তার ফলে তিনি কয়েকটি ব্যাপারে সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলেও পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে বিবর্তন সম্পর্কে তার মুল ধারণার সবগুলিই প্রায় সঠিক ছিলো। বিখ্যাত ফসিলবিদ Stephen Jay Gould এর ভাষায়, "Odd arrangements and funny solutions are the proof of evolution-paths that a sensible God would never tread but that a natural process, constrained by history follows perforce" (Gould 1980; Gould in Pennock 2001, 670).

এ ধরনের হাজারো উদাহরণ টেনে ডারউইন প্রমাণ করেন যে, এগুলো থেকে একদিকে যেমন বোঝা যায় আমাদের চারদিকের সৃষ্টিগুলোতে কি পরিমান খুঁত রয়ে গেছে, অন্যদিকে এটাও প্রমাণিত হয় যে আমাদেরকে আলাদা আলাদা করে কোন সৃষ্টিকর্তার হাতে যত্ন করে সৃষ্টি করা হয়নি, আমরা এসেছি কোন না কোন পুর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে। তিনি তার 'প্রজাতির উৎপত্তি' বইটিতে এতো রকমের উদাহরণ দিয়ে তার বিবর্তনের তত্ত্ব প্রমাণ করেছিলেন যে আজও তা বিস্ময়কর বলেই মনে হয়। বিবর্তনের মাধ্যমেই জীবের পরিবর্তন হতে হতে একসময় নতুন প্রজাতির উৎপত্তি হচ্ছে, আর এই বিরামহীন পরিবর্তনই কাজ করে চলেছে আমাদের বেঁচে থাকার চাবিকাঠি হিসেবে। ডারউইন তার সময়ের থেকে এতখানিই অগ্রগামী ছিলেন যে, তার মতবাদকে সঠিক বলে প্রমাণ করতে আমাদের আরও অনেকগুলো দশক পার করে দিতে হয়েছিলো। বিজ্ঞান যতই এগিয়েছে ততই গভীরভাবে প্রমাণিত হয়েছে তার তত্ত্বের যথার্থতা।

আমরা আগেই দেখেছি যে, ডারউইন বীগল্ জাহাজে ওঠার সময় জীবের স্থিতিশীলতার তত্ত্বে বিশ্বাসী একজন প্রকৃতিবিদ ছিলেন, পাঁচ বছর ধরে তিনি যতই বিভিন্ন দ্বীপে ঘুরলেন, খুব কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে চারদিকের প্রকৃতিকে দেখলেন ততই তার সন্দেহ বাড়তে লাগলো। আর তারই ফলশ্রুতিই আমরা পরবর্তীতে পেলাম জীবের বিবর্তনের মতবাদ। বীগল্ যাত্রা থেকে ফিরে আসার সময়ই তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সন্দেহ করতে শুরু করেন যে, জীবজগৎ স্থির নয়, বিবর্তনের ফলে এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির উৎপত্তি হয়ে আসছে অনাদিকাল থেকেই। কিন্তু তিনি খুব ভালো ভাবেই জানতেন যে,

একথা আরও কয়েকজন প্রকৃতিবিদও বলেছেন তার আগে - তাদের সেই মতবাদ আদৌ ধোপে টেকেনি! তাই তিনি ১৮৩৬ সালে ইংল্যান্ডে ফিরে এসে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বিবর্তনের ধারণাটি শুধু প্রকাশ করলেই হবে না, কিভাবে ঘটে তা পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণসহ উপস্থাপন করতে না পারলে তার মতবাদকেও অন্যদের মতই ইতিহাসের আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। ঠিক করলেন, গোপনে তার কাজ চালিয়ে যাবেন - আর তারপরই শুরু হলো সেই দীর্ঘ যাত্রা, প্রায় ২০ বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন তা শুধু ১৮৫৮ সালেই পৃথিবী জুড়ে হইচই ফেলে দেইনি আজও তার জের চলছে পুরোদমেই। আর এই ২০ বছরের সাধনার ফল থেকেই আমরা পেলাম ডারউইনের সেই যুগান্তকারী প্রস্তাব - প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমেই ঘটে চলেছে প্রাণের বিবর্তন।

তথ্যসূত্র:

১. আখতারজ্জামান,ম, ২০০২, বিবর্তনবাদ, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃঃ ১৩-১৬।

২. Russel B, 1946, History of Western Philospphy, George Allen and Unwin Ltd, London, p 157.

৩. Carl Linnaeus, The University of California Museum of Paleontology, http://www.ucmp.berkeley.edu/history/linnaeus.html

৪. Charles Lyell: Principles of Geology, PBS, http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/02/4/l_024_01.html

৫. Was Darwin, 2004, Wrong, National Geographic Magzine, Nov. ed.

৬. Berra MT, 1990, Evolution and the Myth of Creationism. Stanford University Press, Stanford, California

৮. সুশান্ত মজুমদার, ২০০৩, চার্লস ডারউইন এবং বিবর্তনবাদ, প্রকাশকঃ সোমনাথ বল, কোলকাতা, ইন্ডিয়া।

৭. http://www.guardian.co.uk/life/feature/story/0,13026,1559743,00.html

তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য

{বন্যা আহমেদের *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটি অবসর প্রকাশনী থেকে ২০০৭ এর একুশে বইমেলায় প্রকাশিতব্য। এই অংশটি বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়।}

তৃতীয় অধ্যায়

অনন্ত সময়ের উপহার

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পর

ছয় হাজার বছর বনাম কোটি কোটি বছর! মানুষের সীমিত ৭০-৮০ বছরের জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকশো কোটি বছর হাতে পাওয়াকে অনন্ত কাল বলেই তো মনে হওয়ার কথা। আগের অধ্যায়ে আমরা জেমস হাটন আর চার্লস লায়েলের কথা শুনেছি, তারাই দিয়েছিলেন ডারউইনকে এই মূল্যবান 'সুদীর্ঘ সময়ের' উপহার। অনেকে মনে করেন ডারউইন এদের কাছ থেকে এই অমুল্য উপহারটা না পেলে তিনি তার বিবর্তন তত্ত্বটা এত সহজে প্রমাণ করতে পারতেন না! প্রাণের বিবর্তন ঘটতে, এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতি তৈরি হতে লাগে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বছর! ডারউইন কিভাবে বিবর্তন এবং তার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসতেন যদি তার মাথাটা বাইবেলের এই ছয় হাজার বছরের গন্ডিতেই আটকে থাকতো? একটা বৈজ্ঞানিক মতের পূর্ব শর্তটাই যদি পূরণ করা না যায় তাহলে তত্ত্ব হিসেবে তাকে উপস্থাপন করা হবে কি করে? আদম হাওয়াকে না হয় আল্লাহ বা ঈশ্বর চোখের পলকে তৈরি করে টুপ করে পৃথিবীর বুকে ফেলে দিতে পারে; কাল্পনিক গল্প ফাঁদতে তো আর সাক্ষ্য প্রমাণের দায়ভার থাকে না! কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে মানুষের সামনে হাজির করতে হলে তো লাগে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, প্রমাণ এবং যুক্তির সমন্বয়! ভাবতে অবাক লাগে, আমাদের বুড়ো পৃথিবী কখন এই কাল্পনিক ছয় হাজার বছরের বেড়াজালে বাঁধা পড়ে গেলো; কখন তার অসীম ব্যাপ্তি বিলীন হয়ে গেলো মানুষ নামের এই দ্বিপদী প্রজাতিটার কল্পণা, কুসংস্কার আর ক্ষুদ্রতার মাঝে? খুব বেশীদিন আগে কিন্তু নয়, ১৬৫৪ সালে আইরিশ ধর্মজাযক জেমস আসার (James Ussher, 1581-1656) বাইবেলের সব জন্মতালিকা হিসেব কষে বের করেছিলেন যে আমাদের পৃথিবীর বয়স নাকি ছয় হাজার বছর! অবশ্য মনে করা হয় যে এই ধরনের একটা গল্প ইউরোপীয় সমাজে হয়তো আরও আগে থেকেই প্রচলিত ছিলো, কারণ এর বেশ কিছুদিন আগে লেখা শেক্সপীয়ারের As You Like It নাটকে ছয় হাজার বছর বয়সের পৃথিবীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তবে জেমস আসারই এই ধারণাটাকে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলেন, এবং তার ফলাফল হলো ভয়াবহ - বিশেষ করে ভুতত্ত্ববিদ্যার ভবিষ্যৎ মুখ থুবড়ে পড়লো আরও কয়েকশো বছরের জন্য। আর তার হাত ধরে পিছিয়ে পড়লো বিবর্তনবাদসহ জীববিজ্ঞানের অন্যান্য অগ্রগতি।

আসলে তো বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের এই সংঘাত কোন নতুন ঘটনা নয়। ধর্ম কোন যুক্তি মানে না, ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে মানুষের মনের বিশ্বাস; আর এদিকে বিজ্ঞান হচ্ছে ঠিক তার উলটো, তাকে নির্ভর করতে হয় যুক্তির পরীক্ষালব্ধ প্রমাণের উপর। কোন অনুকল্পকে (hypothesis) বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের (theory) জায়গায় উঠে আসতে হলে তাকে কতগুলো সুনির্দিষ্ট স্তর পার হয়ে আসতে হয় - প্রথমে গভীর পর্যবেক্ষণ, যুক্তি, সমস্যার বিবরণ, সম্ভাব্য কারণ, ফলাফল ইত্যাদির উপর নির্ভর করে প্রকল্পটা প্রস্তাব করা হয়, তারপর তাকে প্রমাণ করার জন্য চলতে থাকে ক্রমাগত পরীক্ষা নিরীক্ষা। বিভিন্ন পরীক্ষার থেকে পাওয়া ফলাফল এবং তথ্যের মাধ্যমে যদি প্রকল্পটাকে প্রমাণ করা না যায় তাহলে তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। আর যদি দীর্ঘ দিন ধরে বারবার করে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষার মাধ্যমে তাকে প্রমাণ করা যায় এবং অন্য কোন বিজ্ঞানী এই প্রমাণের বিরুদ্ধে কোন তথ্য হাজির না করেন তবেই তাকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়। এখানেই কিন্তু শেষ নয়, তার সাক্ষ্য প্রমানের দায় কখনই শেষ হয় না, বিজ্ঞানে বিমূর্ত বা অনাদি সত্য বলে কোন কথা নেই। এই প্রক্রিয়ায় একটা প্রচলিত এবং প্রমাণিত তত্ত্বকেও যে কোন সময়

আংশিক বা সম্পূর্ণ ভুল বলে প্রমাণ করা যেতে পারে, আজকে একটা তত্ত্বকে সঠিক বলে ধরে নিলে কালকেই তাকে ভুল প্রমাণ করা যাবে না এমন কোন কথা নেই। তাই আমরা দেখি, নিউটনের তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার জগতে কয়েকশো বছর ধরে রাজত্ব করার পরও আইনস্টাইন এসে বিশেষ কোন কোন ক্ষেত্রে তার অসারতা প্রমাণ করে দিতে পারেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এরকম উদাহরণের কোন শেষ নেই, কারণ

> বিজ্ঞান কোন তত্ত্বকে পবিত্র বা অপরিবর্তনীয় বলে মনে করে না, বিজ্ঞান ধর্মের মত স্থবির নয়, সে গতিশীল। এখানেই তার সাথে ধর্মের পার্থক্য। ধর্ম মানুষকে প্রশ্ন করতে বারণ করে, হাজার বছরের পুরনো ধ্যান ধারণাগুলোকে বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়াই ধার্মিকের দায়িত্ব।

প্রশ্ন করা যাবে না সৃষ্টিকর্তা কিভাবে সৃষ্টি হল, পৃথিবী আসলেই সমতল কিনা, ধর্মগ্রন্থগুলোর কথা মত আসলেই সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে কিনা! চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে হবে যে একজন সৃষ্টিকর্তার হাতে মাত্র ছয় হাজার বছর আগে সমস্ত জীবের সৃষ্টি হয়েছিলো, আর তারা অপরিবর্তিত অবস্থায়ই রয়ে যাবে অনাদিকাল ধরে। হাজারো সাক্ষ্য প্রমান চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে এর সবই ভুল, সবই মানুষের আদিম অজ্ঞানতার ফসল, কিন্তু তবুও এই মিথ্যাকেই যেনো মেনে নিতে হবে! আশার কথা হচ্ছে, কিছু সচেতন এবং সাহসী মানুষ বহু অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েও মিথ্যা এবং অন্যায়ের বিরদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, আর তারই ফলশ্রুতিতেই এগিয়ে গেছে মানব সভ্যতা। তাই আমাদের এই সভ্যতার ইতিহাস হাজারো রক্তাক্ত সংঘাতে ভরা - কোপার্নিকাস তো মরে গিয়ে বাঁচলেন চার্চের রোষানল থেকে, মৃত্যুশয্যায় শোয়ার আগে তিনিও সাহস করেননি সৌরকেন্দ্রিক মতামতটি প্রকাশ করতে! বৃদ্ধ গ্যালিলিও হাটু গেড়ে ক্ষমা চেয়ে প্রাণ ভিক্ষা পেলেন, সাহসী ব্রুনোকে তো প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে ....

সে যাই হোক, এখন তাহলে দেখা যাক, এই যাত্রায় মানব সভ্যতা কি করে বেড়িয়ে এসেছিল ছয় হাজার বছরের ভয়াবহ চক্রাবর্ত থেকে। চট করে একবার ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলিয়ে নিলেই আমরা দেখতে পাবো এখানেও সেই একই কাহিনী, ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সেই সংঘাতময় দ্বন্দ্বের ইতিহাস। সতেরশো শতাব্দীতে ধর্মভীরু জেমস আসার যখন জেনেসিস (বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত সৃষ্টতত্ত্ব বিষয়ক অংশ) থেকে হিসেব কষে পৃথিবীর বয়স বের করলেন তখন কিন্তু তার মনে সংশয়ের সৃষ্টি হল না। তিনি প্রশ্ন করলেন না যে তথ্যের ভিত্তিতে তিনি গণনা করছেন তা কি করে বা কোথা থেকে আসলো - দেড় হাজার বছর ধরে বাইবেলে স্রষ্টার বচন বলে যা বলা আছে তাকেই তিনি পরম সত্য বলে মেনে নিলেন। এর বেশ আগেই অন্ধকার মধ্যযুগের ইতি ঘটে গেছে ইউরোপে, রেনেসাঁর যুগ মোটে শেষ হয়েছে, আর বিজ্ঞান হাটি হাটি পা পা করে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিওর মত কিছু সাহসী বিজ্ঞানীর হাত ধরে পদার্থবিদ্যা এগিয়ে যেতে শুরু করলেও, জীববিজ্ঞান এবং ভুতত্ত্ববিদ্যা তখনও ধর্মের অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কারপুর্ণ ব্যাখ্যার কারাগারেই জিম্মি থেকে গিয়েছিল। পৃথিবীর বয়স, প্রাণের সৃষ্টি, বিকাশ, প্রজাতির সৃষ্টি বা বিলুপ্তির ব্যাখ্যার জন্য মানুষ তখন বাইবেল, কোরান বা অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থে বলা কাল্পনিক গল্পগুলোরই স্মরণাপন্ন হত। ষোলশ শতাব্দীর ইউরোপে যে কোন মানুষকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আপনি জেনেসিসের গল্প ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেতেন না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ইউরোপীয়ানদের জিজ্ঞেস করলেই হয়তো পেতেন বেশ অন্য ধরণের একটা উত্তর - পৃথিবীর বয়স আসলে অনেক অনেক বেশি, বাইবেলের কথাগুলোকে রূপক হিসেবেই নেওয়া উচিত, বিজ্ঞানের সাথে একে গুলিয়ে ফেলার

কোন দরকার নেই, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

চিন্তার এই উত্তরোণ কিন্তু একদিনে ঘটেনি। আসলে, বিজ্ঞানমনস্ক কিছু মানুষ আরও অনেক আগে থেকেই এ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে সেই ১৫১০ সালেই লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি (Leonardo Da Vinci, 1452 - 1519) সামুদ্রিক প্রাণী এবং ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরের শীলাস্তুপ পরীক্ষা করে তার ডাইরি তে লিখেছিলেন, পৃথিবী মোটেও ছয় হাজার বছরে বা নুহের প্লাবন থেকে তৈরি হয়নি, এর তৈরি হতে লেগেছে তার চেয়ে ঢের বেশি সময় [৯]। তারপর সতেরশো এবং আঠারশ শতাব্দীতে রেঁনে দেকার্তে (Rene Descartes, 1596 - 1650) থেকে শুরু করে বুঁফো (Comte de Buffon, 1707 - 1788), কান্ট (Imanuel Kant, 1724 - 1804) পর্যন্ত অনেকেই তখনকার দিনের সীমিত জ্ঞানের আলোকে পৃথিবীর বয়স নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন [৩]। তাদের মধ্যে অনেকেই ভুপৃষ্ঠ কিংবা পাহাড়ের গঠণ, ক্ষয়, শীলাস্তর, ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরে পাওয়া ফসিল ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন যে, পৃথিবীর বয়স ছয় হাজার বছরের চেয়ে অনেক অনেক বেশী। এত বড় বড় পরিবর্তন এত কম সময়ে ঘটা সম্ভব নয় - পৃথিবীর মাটি এবং জলের মধ্যে বহুবার স্থান বদল হয়েছে, আজকে যে পাহাড়গুলো মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে তারা অনেকেই হয়তো একসময় সমুদ্রের নীচে ছিলো! বুঁফো ১৭৭৪ সালে উত্তপ্ত অবস্থা থেকে পৃথিবীর ঠান্ডা হয়ে এই অবস্থায় আসতে কত সময় লাগতে পারে তার হিসেব করে প্রস্তাব করেন যে, পৃথিবীর বয়স ৭৫ হাজার বছর বা তারও বেশী হবে [১০]।

তার পরপরই ১৮০০ শতব্দীর বিজ্ঞানের রঙ্গমঞ্চে পা রাখেলন ভূতত্ত্ববিদ জেমস হাটন (James Hutton, 1726-1797), তিনি তার সারা জীবনের ভূতাত্ত্বিক গবেষণার জ্ঞান থেকে ১৭৮৫ সালে বললেন - পৃথিবীর বয়স আসলে অনেক অনেক বেশী, পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরে যে রকমের ব্যাপক পরিবর্তন এবং বিবর্তন দেখা যাচ্ছে তা কোন মতেই কয়েক হাজার বছরের সৃষ্টি হতে পারে না, বহু কোটি বছর ধরে ধীর গতিতে এই পরিবর্তন ঘটে আসছে।

> *অনেকে মনে করেন জেমস হাটনই হচ্ছেন ভূতত্ত্ববিদ্যার জনক এবং তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাইবেলের বিপর্যয়বাদ বা প্রলয়বাদের বিরোধিতা করে deep time বা সুদীর্ঘ সময়ের ধারনার প্রচলন ঘটান। তিনি বললেন, আরম্ভেরও যেমন কোন চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না তেমনি শেষ হওয়ারও কোন ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে না। সে সময় পৃথিবীর বয়স হিসেব করে বের করার মত প্রযুক্তি হাতে না থাকায় তিনি ধরে নেন যে এর বয়স অসীম।*

নারায়ণ সেন তার লেখা 'ডারউইন থেকে ডিএনএ' বইটিতে (২০০৪) চমৎকার কিছু পরিসংখ্যান এবং উদাহরণ দিয়েছেন - 'বিশদ ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের সূত্রে হাটন বুঝেছিলেন প্রকৃতি আদতে ধীর গতিতে পৃথিবীর চেহারা পালটায়, যতই আমরা ঝড়, ঝঞ্ঝা, তুফানে কাতর হই না কেন। এই ধীর গতির রূপটি কয়েকটি আধুনিক পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাবে। জমির ক্ষয়ের কারণে, গড়পড়তায় প্রতি হাজার বছরে, নিচু জমিতে আনুমানিক মাত্র এক থেকে তিন সেন্টিমিটার এবং পাহাড়ি এলাকায় কুড়ি থেকে নব্বই সেন্টিমিটার মতো উত্তোলিত হচ্ছে। পৌরাণিক কাল থেকে হিমালয়ের সম্ভবত তিনশো থেকে চারশো মিটারের মত উচ্চতা বেড়েছে। বস্তুত ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ বলছে ছয় কোটি বছর আগে হিমালয়ের

তখনকার মাটি ও স্তর সমষ্টি সমুদ্রের তলদেশে ছিল’ [১]। কিন্তু এসব পরিসংখ্যাণ তো তখন হাটনের হাতের সামনে ছিলো না, সে সময়ের রক্ষণশীল ইউরোপীয় সমাজ তাই হাটনের মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করে এবং এক সময় দেখা যায় তার নাম ইতিহাসের পাতা থেকে প্রায় মুছেই দেওয়া হয়েছে।

প্রায় এক প্রজন্ম পর যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন লায়েল। ১৮৩০ সালে লায়েল বললেন, পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের পরিবর্তনগুলো ক্রমাগতভাবে ধীর প্রক্রিয়ায় অসীম সময় ধরে ঘটেছে, বাইবেলের পথ ধরে শুধুমাত্র নুহের মহাপ্লাবনের প্রলয়বাদ দিয়ে এদেরকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তিনি অবশ্য শুধু এই ধীর এবং ক্রমাগত প্রক্রিয়াকেই ভূস্তরের পরিবর্তণের একমাত্র কারণ হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন যা পরে ভুল বলে প্রমানিত হয়; আসলে ধীর এবং আকস্মিক - দুই পদ্ধতিতেই কোটি কোটি বছর ধরে এই পরিবর্তন ঘটে আসছে। লায়েল সে সময় অত্যন্ত সুচারুভাবে তখনকার রক্ষণশীল ধার্মিক সমাজে তার এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সে সময় চার্চের মধ্যযুগীয় প্রবল প্রতাপ যেহেতু দুর্বল হয়ে আসতে শুরু করেছিলো তাই তাকে ব্রুনো বা গ্যালিলিওর মত অবস্থার শিকার হতে হয়নি। কিন্তু বিজ্ঞান তো আর সেখানে থেমে থাকেনি। ১৮৬২ সালে লর্ড কেলভিন তাপগতি বিদ্যার (Thermo dynamics) সূত্র ব্যবহার করে পৃথিবীর বয়স ৯৮ মিলিয়ন বা ৯ কোটি ৮০ লক্ষ বছর বলে ঘোষণা করলেও পরে ১৮৯৭ সালে তাকে সংশোধন করে ২০ -৪০ মিলিয়ন বছরে নামিয়ে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford) প্রথমবারের মত রেডিও অ্যাকটিভ পদ্ধতিতে পৃথিবীর বয়স মাপার কথা প্রস্তাব করেন। তার কয়েক দশকের মধ্যেই এই পদ্ধতি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা সঠিকভাবে প্রমাণ করেন যে, পৃথিবীর বয়স আসলে প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বা সাড়ে চারশো কোটি বছর [১০]।

সে যাই হোক, এবার আবার ফিরে আসা যাক ডারউইনের গল্পে। হাটন এবং লায়েলের এই অবদানের হাত ধরেই চার্লস ডারউইন প্রকৃতিবিজ্ঞান বা জীববিজ্ঞানকে নিয়ে গেলেন এক নতুন স্তরে। তারাই উন্মুক্ত করে দিলেন অসীম সময় নিয়ে কাজ করার বহু শতাব্দীর বন্ধ দুয়ারটি। আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি যে বীগেল যাত্রা থেকে ফিরে আসার সময়েই ডারউইন ক্রমশঃ জীবজগতের বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে উঠছেন। তিনি নিশ্চিতভাবেই বুঝতে শুরু করেছেন যে, জীবজগৎ স্থির নয়, কোন দিন ছিলোও না, সৃষ্টির আদি থেকেই এর বিবর্তন ঘটে আসছে। ইংল্যান্ডে ফিরে এসেই তিনি সারা পৃথিবী ঘুড়ে সংগ্রহ করা নমুনাগুলো নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজে লেগে যান। ১৮৩৮ সালে, আমরা দেখি, প্রথমবারের মত ডারউইন এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে লিখছেন [২],

> *‘এভাবেই মূল প্রজাতি থেকে প্রকারভেদরা (variation) বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত নতুন প্রজাতির জন্ম হয়, আর মূল প্রজাতিটি ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায়, এবং তার ফলে টিকে যাওয়া প্রজাতির মধ্য বিচ্ছিন্নতার পরিমান বৃদ্ধি পায় ...’ তিনি নিঃসংশয় হয়ে বললেন প্রজাতি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, একযুগ থেকে আরেক যুগে অভিযোজনের (adaptation) মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়।*

কিন্তু এখন সমস্যা হল কিভাবে সবাইকে তিনি বোঝাবেন যে এতো দিন ধরে তোমরা যা বিশ্বাস করে

এসেছো তা সবই ভুল! তোমাদের ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত কাহিনীগুলো শুধু কল্পনাপ্রসুতই নয়, চরম মিথ্যা আর ধোঁকায় ভরা! তিনি কি জানেন না বাইবেলের কোন কথাকে চ্যালেঞ্জ করার পরিণতি, তিনি কি ভুলে গেছেন তার পূর্বসূরী কোপার্নিকাস, বৃদ্ধ গ্যালিলিও বা সাহসী ব্রুনোর কথা! তাহলে ডারউইন এখন কি করবেন?

১৮৩৭ থেকে ১৮৫৮ - দীর্ঘ ২০ বছর! ডারউইন মনোনিবেশ করলেন তার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষায়। লোকজনের সাথে বেশী মেশেন না, নিজের মনে গাছপালা, পোকা মাকড় নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। এমনকি লন্ডন থেকে ১৬ মাইল দুরে বাড়ি কিনে পরিবার নিয়ে উঠে আসেন নিরিবিলিতে সময় কাটানোর জন্য। কিন্তু বারবারই অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকলেন তিনি, সে এক অদ্ভুত অসুস্থতা, প্রায়ই শরীরটা খারাপ থাকে, মাথা ব্যথা, পেটের অসুখ কখনই নাকি পিছ ছাড়ে না! কোন ডাক্তারই অসুখটা কি তা ধরতে পারেন না। অনেকেই এখন মনে করেন যে তার অসুখটা হয়তো ছিলো নিতান্তই মানসিক, এত বড় একটি আবিষ্কারকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখার অসহ্য ভার আর বইতে করতে পারছিলেন না তিনি। খুব সাবধানে এবং গোপনে কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন তিনি। ভূতত্ত্ব এবং জীববিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের উপর বই প্রকাশ করতে থাকলেও তার এই বিবর্তনের উপর কাজ সম্পর্কে লায়েল, হুকার, বা হাক্সলির মত দুই চারজন বিজ্ঞানী বন্ধু ছাড়া আর কাউকে কিছু জানাতেন না তিনি। বিবর্তন যে ঘটছে তা সম্পর্কে নিশ্চিত হলেও কি প্রক্রিয়ায় তা ঘটছে বা এর চালিকাশক্তি কি হতে পারে তা সম্পর্কে তখনও কোন নির্দিষ্ট ধারণায় পৌঁছাতে পারেননি। সিদ্ধান্ত নিলেন, বিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তারিত তথ্য প্রমাণসহ একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করতে না পারা পর্যন্ত কোনভাবেই এই আবিষ্কারের কথা জনসমক্ষে প্রচার করবেন না। তাই পরবর্তী বিশ বছর ধরে তিনি অত্যন্ত গভীর অধ্যাবসায়ের সাথে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো চালিয়ে যেতে থাকলেন।

১৮৫৮ সালে অপ্রত্যাশিত একটি চিঠি এসে পৌঁছায় ডারউইনের হাতে। তার ভিতরে ছিলো আলফ্রেড ওয়ালেসের (১৮২৩-১৯১৩) বিবর্তন নিয়ে লেখার একটি পান্ডুলিপি। ডারউইন বিস্ময়ের সাথে দেখলেন যে আজকে ২০ বছর ধরে যে তত্ত্ব নিয়ে তিনি গোপনে কাজ করে আসছেন তা মাত্র তিন বছরেই ওয়ালেস আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তিনি অত্যন্ত আশাহত মনে সিদ্ধান্ত নিলেন যে এখন পর্যন্ত করা সব কাজ ধ্বংস করে ফেলবেন। কিন্তু এরপর বন্ধুদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত 'On the origin of species by means of Natural Selection' বা 'প্রজাতির উৎপত্তি' বইটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রকাশ করে ফেলতে রাজী হলেন। তখনই ঠিক করা হয় যে, ১৮৫৮ সালে লন্ডনের লিনিয়ান সোসাইটির এক অধিবেশনে ডারউইনের এবং অ্যালফ্রেড ওয়ালেস (১৮২৩-১৯১৩) এর বিবর্তন তত্ত্ব আলাদা আলাদাভাবে প্রস্তাব করা হবে। অনেকে মনে করেন প্রজাতির উৎপত্তি বইটিতে ডারউইন যেভাবে অগুনতি উদাহরণ, পর্যবেক্ষণ এবং সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে তার তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন ওয়ালেস তার ধারে কাছেও যেতে পারেন নি। ডারউইন এত বিস্তারিতভাবে বইটি না লিখলে শুধুমাত্র ওয়ালেসের লেখা দিয়ে যুগান্তকারী এই বিবর্তনবাদ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা পেতে পারতো না। ওয়ালেস নিজেই পরবর্তীতে 'ডারউইনবাদ' নামক একটি বই লেখেন এবং তাতে বিবর্তন তত্ত্বের মূল কৃতিত্ব যে ডারউইনেরই, তা স্বীকার করে নেন [৩]।

এখন তাহলে দেখা যাক ডারউইন এমন কি সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন বিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে, যার ফলে জীববিজ্ঞানের ইতিহাসের মোড় ঘুরে গেলো চিরতরে। তিনি তার সময়ের থেকে এতখানিই অগ্রগামী ছিলেন যে, তার এই আবিষ্কারের প্রমাণ পেতে বিজ্ঞানীদের আরও প্রায় এক শতক সময় লেগে গেলো! ডারউইন দেখলেন, হাজার হাজার বছর ধরে কৃষকেরা এবং পশু পালকেরা কৃত্রিম নির্বাচনের (artificial

selection) মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বাড়িয়েছে, গৃহপালিত পশুর মধ্যে প্রয়োজন মত বিভিন্ন জাতের প্রাণীর সৃষ্টি করেছে। সে সময়ে জীববিজ্ঞান কিংবা এর শাখা জেনেটিক্স সম্পর্কে কিছুই না জেনেও, তারা শুধুমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সঠিকভাবেই বুঝেছিলো যে, অনেক বৈশিষ্ট্য বংশগতভাবে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে প্রবাহিত হয়। যেমন, যে ধানের গাছের জাত থেকে অনেক বেশী বা উন্নত মানের ধান উৎপন্ন হয়, ক্রমাগতভাবে শুধু সে ধরনের ধানের বীজই যদি চাষের জন্য নির্বাচন করা হয় তাহলে এক সময় দেখা যাবে শুধু উন্নত মানেরই ধান উৎপন্ন হচ্ছে। যে গরু বেশী দুধ দেয়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যদি শুধু সেই ধরনের গরুকেই বংশবৃদ্ধি করতে দেওয়া হয় তাহলে এক সময় দেখা যাবে যে পুরো গরুর পালের মধ্যেই গড়পড়তা দুধ দেওয়ার পরিমান বেড়ে গেছে। তার মানে কয়েক প্রজন্মের প্রচেষ্টায় ক্রমাগতভাবে সতর্ক, কৃত্রিম নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমন জাতের পশু বা উদ্ভিদ তৈরি করা সম্ভব যাদের মধ্যে শুধু কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলোই দেখা যাবে। এক সময় তাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যগুলো এত বেশী হয়ে যায় যে তারা সম্পুর্নভাবে এক নতুন প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদে পরিণত হয়ে যেতে পারে, যার সাথে তাদের পূর্বপুরুষের প্রজনন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এভাবেই মানুষ হাজার বছর ধরে বুনো নেকড়েকে পোষ মানিয়ে কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতের কুকুরের বিবর্তন ঘটিয়েছে [৪]। এখন যদি অন্য কোন গ্রহ থেকে কেউ আমাদের এই পৃথিবীতে এসে প্রথমবারের মত বিভিন্ন রকমের কুকুরগুলোকে দেখে, তাহলে তাদের পক্ষে কোনভাবেই অনুমান করা সম্ভব হবে না যে এরা এক সময় সবাই নেঁকড়ে প্রজাতির বংশধর ছিলো [৪]। ফার্মের মোটা মোটা মুরগী বা বিশাল বিশাল মাংসওয়ালা অস্ট্রেলিয়ান গরুগুলোকে দেখে আমাদের যে ভিমরি খাওয়ার জোগাড় হয় তাদেরকে

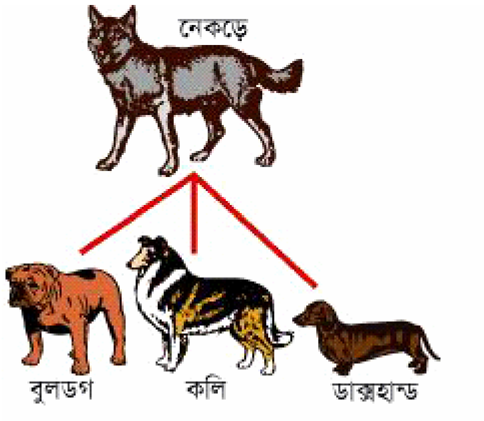

চিত্র ৩.১ : নেকড়ে থেকে কুকুরের বিবর্তন।
(সৌজন্যেঃ http://evolution.berkeley.edu/evosite/lines/images/le_dogs2.gif)

এভাবেই কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে (এখন অবশ্য অনেক ধরনের কৃত্রিম পদ্ধতি এবং ওষুধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে)। তার মানে মানুষ কৃত্রিমভাবে নির্বাচন করে নতুন নতুন প্রজাতি তৈরি করে আসছে সেই অনাদি কাল থেকেই! ডারউইন দেখলেন, এরকম কৃত্রিমভাবে নির্বাচিত প্রজননের মাধ্যমে তার আশে পাশে মানুষ প্রায় ১০ রকমের কবুতর তৈরি করেছে। এদের মধ্যে পার্থক্য এতখানিই যে, প্রকৃতিতে আগে থেকে দেখতে পেলে এদেরকে খুব সহজেই ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি বলে ধরে নেওয়া হত [৩]। তাহলে কি প্রকৃতিতেও এমনই কোন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন ঘটছে?

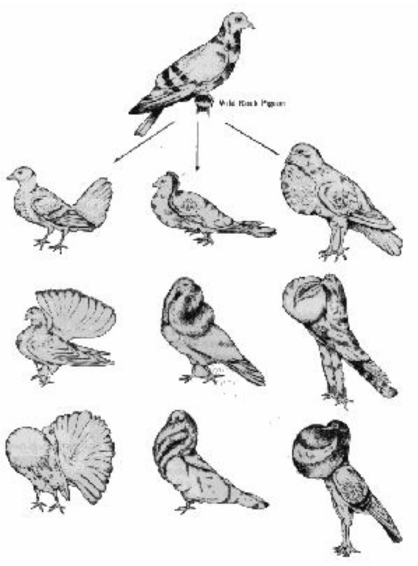

চিত্র ৩.২ : কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উৎপন্ন বিভিন্ন ধরণের কবুতর।
(সৌজন্যেঃ http://www.mun.ca/biology/scarr/Darwin's_pigeons.gif)

ডারউইন আরও লক্ষ্য করলেন, আমাদের চারপাশের উদ্ভিদ এবং প্রাণীরা যে পরিমাণে বংশবৃদ্ধি করে তার বেশীরভাগই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না। একটা পুরোপুরি বড় হওয়া কড মাছ বছরে প্রায় ২০ থেকে ৫০ লাখ ডিম পাড়ে, একটি মেপল বা আম বা জাম গাছে হাজার হাজার ফুল এবং ফল ধরে, কিন্তু এর বেশীরভাগই পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করার আগেই মৃত্যুবরণ করে, আমাদের দেশের ইলিশ মাছের কথাই চিন্তা করে দেখুন না। সমুদ্র থেকে নদীগুলোতে এসে তারা কি হারে ডিম পারে আর তাদের মধ্যে ক'টাই বা শেষ পর্যন্ত পুর্ণাঙ্গ মাছে পরিণত হয়ে টিকে থাকতে পারে! বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখিয়েছেন যে একটা কড মাছের ডিমের ৯৯% ই প্রথম মাসেই কোন না কোন ভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, বাকি যা বেঁচে থাকে তার প্রায় ৯০% জীবনের প্রথম বছরেই কোন না কোনভাবে মৃত্যুবরণ করে [৮]। ডারউইনও এই একই জিনিস দেখিয়েছেন হাতীর বংশবৃদ্ধির উদাহরণ দিয়ে। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় হাতীর বংশবৃদ্ধির হার তুলনামুলকভাবে খুবই কম, কিন্তু তারপরও একটা হাতী তার জীবনে যে ক'টা বাচ্চার জন্ম দেয় তার মধ্যেও সবগুলি শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে না। ডারউইন হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, হাতী অন্য সব প্রাণীর তুলনায় সবচেয়ে কম বংশবৃদ্ধি করেও তার ৯০-১০০ বছরের জীবনে প্রায় ৬ টি বাচ্চার জন্ম দিতে পারে। অর্থাৎ যদি সবগুলো বাচ্চা বেঁচে থাকে তাহলে এক জোড়া হাতী থেকে ৭০০-৭৫০ বছরে প্রায় ১৯০ লক্ষ হাতীর জন্ম হবে [৮]।

প্রকৃতিতে প্রায় সব জীবই এরকম বাড়তি শিশুর জন্ম দিয়ে থাকে, একটা ব্যকটেরিয়া প্রতি ২০ মিনিটে বিভক্ত হয়ে দুটো ব্যকটেরিয়ায় পরিণত হয়, হিসেব করে দেখা গেছে যে এরা সবাই বেঁচে থাকলে এক বছরে তারা বংশ বৃদ্ধি করে সারা পৃথিবী আড়াই ফুট উচু করে ঢেকে দিতে পারতো। একটা ঝিনুক কিংবা কাছিম একবারে লাখ লাখ ডিম ছাড়ে, একটা অর্কিড প্রায় ১০ লাখ বীজ তৈরী করতে পারে [৩]। মানুষের জনসংখ্যার কথাই চিন্তা করা যাক, চিকিৎসাবিজ্ঞানের এতখানি উন্নতি ঘটার আগে অর্থাৎ মাত্র এক-দেড়শো বছর আগেও শিশু মৃত্যুর হার ছিল অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক বেশী। (আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে,

কৃত্রিমভাবে আমরা এখন একদিকে জন্ম নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করছি, অন্যদিকে শিশু আধুনিক চিকিৎসার কল্যানে মৃত্যুর হারও কমিয়ে আনতে পেরেছি)। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এভাবেই সব জীব যদি বংশবৃদ্ধি করতে থাকতো, অর্থাৎ একেকটা জীব তার সারা জীবনে যতগুলো ডিম বা বাচ্চার জন্ম দিতে সক্ষম তার সব গুলো যদি টিকে থাকতো তাহলে এতদিনে পৃথিবীতে আর কারোরই থাকার ঠাঁই হতো না। আসলে খেয়াল করলে দেখা যায় যে, প্রকৃতিতে ঠিক এর উলটোটা ঘটছে - সংখ্যার দিক থেকে যত উদ্ভিদ বা প্রাণীর জন্ম হয় বা বেঁচে থাকে, তার তুলনায় তাদের বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা বহু গুণ বেশী। শেষ পর্যন্ত এর মধ্যের ছোটটো একটা অংশই শুধু বড় হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে। যে কোন প্রজাতি হঠাৎ করে অনেক বেশী হারে বংশবৃদ্ধি করে ফেলতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের বিস্তৃতি প্রাকৃতিক নিয়মেই বন্ধ হতে হবে। কারণ, তাদের সবার বেঁচে থাকার জন্য যে পরিমান খাদ্যের বা অন্যান্য সম্পদের প্রয়োজন তা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ডারউইন ভাবলেন, তাহলে প্রকৃতিতে প্রাণের এই বিশাল অপচয় এবং বাড়তি বংশবৃদ্ধির (Prodigality of Reproduction বা Over Production) ব্যাপারটার অবশ্যই কোন ব্যাখ্যা থাকতে হবে!

শুধু যে আমাদের চারপাশে অনেক বাড়তি প্রাণের জন্ম হয় তাই তো নয়, প্রত্যেক প্রজাতির জীবের নিজেদের মধ্যেই আবার অসংখ্য ছোট বড় পার্থক্য দেখা যায়। মানুষের কথাই ধরুন না, আমাদের একজনের সাথে আরেক জনের তো কোন মিল নেই। গায়ের রং এ পার্থক্য, চোখের রং এ, আকারে পার্থক্য, দেখতে একেক জন একেররকম, কেউ বা বেশী দিন বাঁচে, কেউ বা কম, কাউকে বেশী রোগে ধরে, কাউকে কম, কারও গায়ে বেশী শক্তি আবার কারও কম - এমন হাজারোতর পার্থক্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এর বিভিন্নরকম উদাহরণ দেখেছিলাম। বংশ পরম্পরায় বিভিন্ন প্রজাতির শিশুরা তাদের বাবা-মার থেকে বিভিন্ন রকমের বৈশিষ্ট্য পেয়ে থাকে, যৌন পদ্ধতি থেকে জন্মানো এই প্রতিটি প্রাণী বা উদ্ভিদ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। এর ফলে যে কোন প্রজাতির জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রচুর পরিমানে পার্থক্য বা *প্রকারণ* দেখা যায় । সে সময় জেনেটিক্স বা বংশগতিবিদ্যার আবিষ্কার না হওয়ায় ডারউইন প্রকারণ সম্পর্কে সঠিক ধারণায় পৌঁছুতে পারেন নি, কিন্তু তিনি এই সব পর্যবেক্ষণ থেকে সঠিকভাবেই সিধান্তে আসেন যে, প্রকৃতিতে সবসময় খাদ্য, বেঁচে থাকা, জায়গা, সঙ্গী নির্ধারণ, আশ্রয়, এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে একধরনের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। এই বেঁচে থাকার সংগ্রাম চলতে থাকে একই ধরনের প্রজাতির ভিতরের প্রতিটি জীবের মধ্যে এবং এক প্রজাতির সাথে আরেক প্রজাতির মধ্যে। আবার প্রতিটি জীবের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বা প্রকারণের কারণে এই অনন্ত প্রাকৃতিক সংগ্রামে কেউ বা সহজেই খাপ খাইয়ে নিয়ে বেশীদিন টিকে থাকতে সক্ষম হয়, আর অন্যরা আগেই শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রতিটি জীবের মধ্যে প্রকৃতি তুলনামুলকভাবে বেশী উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের টিকিয়ে রাখে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে,

> *একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে সংগ্রাম করে যারা টিকে থাকতে সক্ষম হয়, তারাই শুধু পরবর্তী প্রজন্মে বংশধর রেখে যেতে পারে, এবং তার ফলে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলোরই পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে অনেক বেশী প্রকটভাবে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ, যে প্রকারণগুলো তাদের পরিবেশের সাথে অপেক্ষাকৃত বেশি অভিযোজনের (adaptation) ক্ষমতা রাখে, তাদের বাহক জীবরাই বেশীদিন টিকে থাকে এবং বেশী পরিমানে বংশবৃদ্ধি*

করতে সক্ষম হয়। এভাবে প্রকৃতি প্রতিটা জীবের মধ্যে পরিবেশগতভাবে অনুকূল বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের নির্বাচন করতে থাকে এবং ডারউইন প্রকৃতির এই বিশেষ নির্বাচন প্রক্রিয়ারই নাম দেন প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection)

ডারউইনের সময় বিজ্ঞানীদের বংশগতিবিদ্যা (genetics) সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। জীবাশ্মবিদ্যা (Paleontology) বা ফসিল রেকর্ডও তখন তেমন জোড়দারভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভাবতেও অবাক লাগে ডারউইন কিভাবে এই সব জ্ঞান ছাড়াই বিবর্তনবাদ সম্পর্কে এত সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন! তার এই বিবর্তন তত্ত্ব ইউরোপের সেই সময়ের খ্রিষ্ট ধর্মসহ অন্যান্য সব ধর্মের ভিতকেই টলিয়ে দিলো, আদম হাওয়া থেকে শুরু করে আলাদা আলাদাভাবে প্রজাতির সৃষ্টির সব গল্পই হল পরিণত হল রূপকথায়, নুহের মহাপ্লাবনের সময় প্রজাতির নতুন করে টিকে যাওয়ার কেচ্ছা গেলো বানের জলে ভেসে। আগেই বলেছি, জীববিজ্ঞানে ডারউইনের মূল অবদান দু'টি, প্রথমত যুক্তি প্রমাণ উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করা যে, প্রাণের বিবর্তন ঘটছে এর উৎপত্তির পর থেকে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) আর দ্বিতীয়তঃ এই বিবর্তন ঘটছে প্রাকৃতিক নির্বাচন নামের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। হইচই পরে গেলো সারা দুনিয়া জুড়ে ১৯৫৮ সালে ডারউইন এবং ওয়ালেস এই তত্ত্বটা প্রস্তাব করার পর। যুগে যুগে বিভিন্ন প্রজাতি বদলাচ্ছে- তা বিশ্বাস করা এক কথা, আর প্রকৃতিতে হাজারো রকমের নতুন নতুন প্রজাতি তৈরি হচ্ছে এবং এই পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটছে সম্পুর্ণভাবে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় - কোন সৃষ্টিকর্তার হস্তক্ষেপ ছাড়াই, তা মেনে নেওয়া আরেক কথা!

সে সময়ের ইউরোপে প্রাণের উৎপত্তি সংক্রান্ত দর্শনের পুরোটাই ছিলো বিখ্যাত ঈশ্বরতত্ত্ববাদী উইলিয়াম প্যালের (William Paley, 1743-1805) সৃষ্টিতত্ত্ববাদ দিয়ে প্রভাবিত।

তিনিই বলেছিলেন যে প্রত্যেকটা ঘড়ির যেমন একজন কারিগর থাকে তেমনি প্রত্যেকটা প্রানেরও পিছনে একজন স্রষ্টা থাকতেই হবে। ঘড়ির মত একটা জটিল জিনিস যেমন কারিগর ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না তেমনি এত জটিল অংগ প্রত্যংগ সম্পন্ন জীবগুলোও সৃষ্টিকর্তা ছাড়া পৃথিবীতে জন্মাতে পারে না। তাই ডারউইন এবং ওয়ালেস যখন দেখালেন যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মত অন্ধ, অচেতন কিন্তু অনাকস্মিক এবং নিতান্তই একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুধু জীবের বিবর্তনই ঘটছে না, নতুন নতুন প্রজাতিরও উদ্ভব ঘটছে এবং ধাপে ধাপে জটিল থেকে জটিলতর প্রানেরও উন্মেষ ও বিলুপ্তি ঘটছে তখন স্বভাবতই ইউরোপের রক্ষনশীল এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মাথায় যেনো বাজ পড়লো।

তারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিবর্তনবাদ তত্ত্বের বিরুদ্ধে। রেঁনেসা, পুঁজিবাদের বিকাশ, শিল্প বিপ্লব ইত্যাদির কারণে তখন মহা প্রতাপশালী চার্চ্চের ক্ষমতা বেশ নড়বড়ে হয়ে উঠেছে ইওরোপে, ইচ্ছা করলেই তারা আর ডাইনী বানিয়ে কিংবা বাইবেলের বিরোধিতার অজুহাতে একে ওকে পুড়িয়ে মারতে পারছে না। তাই ডারউইন এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেলেও কম অপমান এবং সমালোচনার স্বীকার হতে হয়নি তাকে, ক্যারিক্যাচারি কার্টুন থেকে শুরু করে, গালিগালাজের ঝড় বয়ে যেতে থাকলো তার উপর। যেমন, নীচের ছবিটি (চিত্র ৩.৩) প্রকাশিত হয়েছিল হর্নেট ম্যাগাজিনে, ১৮৭১ সালে। এ ছবিটি দেখলে বোঝা যায় ডারউইনের তত্ত্ব সে সময় ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের কি পরিমান গাত্রদাহের কারণ ঘটিয়েছিল; তারা বানরের দেহের সাথে ডারউইনের মুখমন্ডল জুড়ে দিয়ে এ ধরণের নানা বিদ্রুপাত্মক ছবি এঁকে ডারউইনকে তাঁর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রচার থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিল।

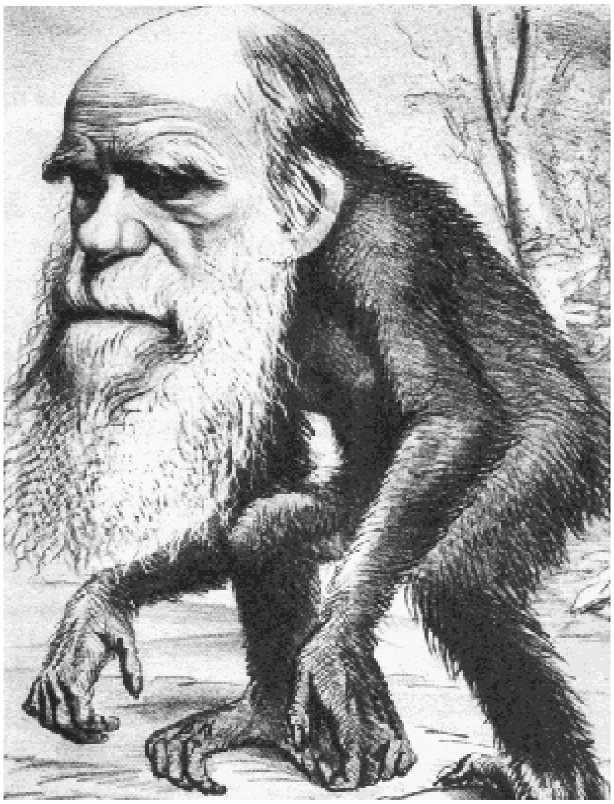

চিত্র ৩.৩ : হর্নেট ম্যাগাজিনে (১৮৭১) প্রকাশিত একটি বিদ্রূপাত্মক ছবি
(সৌজন্য : www.mun.ca/biology/ scarr/Darwin_as_Monkey.htm)

ডারউইন নিজে খুব বেশী উত্তর না দিলেও তার বন্ধুরা, টি এইচ হাক্সলি, জোসেফ ডাল্টন হুকার, অ্যাশা গ্রে প্রমুখ তার হয়ে লড়ে যেতে থাকেন। বিশেষ করে হাক্সলিকে তো তখন ‘ডারউইনের বুল ডগ’ বলেই ডাকা হত।

এ প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা না বললেই নয় - একবার অক্সফোর্ডে ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের সম্মেলনে বিবর্তনের তীব্র বিরোধিতাকারী খ্রিস্টান ধর্ম বিশপ স্যামুয়েল উইলবারফোর্স ডারউইনের তত্ত্বকে ঈশ্বরবিরোধী ব্যক্তিগত মতামত বলে আক্রমণ করেন। তখনই তিনি হঠাৎ করে সভায় উপস্থিত বিজ্ঞানী

হাক্সলিকে উদ্দেশ্য করে জানতে চান তার দাদা এবং দাদীর মধ্যে কে আসলে বানর ছিলেন। তারই উত্তরে হাক্সলি বিবর্তনবাদের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বিশপকে তুলাধুণা তো করে ছাড়েনই বক্তৃতার শেষে এসে তিনি এও বলেন যে,

> 'যে ব্যক্তি তার মেধা, বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জন ও বাগ্মিতাকে কুসংস্কার ও মিথ্যার পদতলে বলি দিয়ে বৌদ্ধিক বেশ্যাবৃত্তি করে, তার উত্তরসুরী না হয়ে আমি বরং সেইসব নিরীহ প্রাণীদের উত্তরসুরী হতে চাইবো যারা গাছে গাছে বাস করে, যারা কিচিরমিচির করে ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায় [৩]।'

এদিকে আবার বিগেল জাহাজের ক্যাপ্টেন ফিটজরয়ও আরেক কান্ড করে বসলেন সেই সভায়। তিনি বাইবেল হাতে চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করে বলতে থাকলেন যে, সব দোষ আসলে তারই, তিনি যদি ডারউইনকে তার জাহাজে করে বিশ্ব ভ্রমণে নিয়ে না যেতেন তাহলে ডারউইন এভাবে ধর্মের ক্ষতি করার সুযোগ পেতেন না। তবে অনেকেই মনে করেন যে, ফিটজরয়ের মানসিক সমস্যা ছিল এবং তিনি এর কিছুদিন পরে আত্মহত্যাও করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, বিবর্তন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন নিয়ে আজও অবধি বিতর্কের ও বিরোধিতার কোন শেষ নেই। যদিও মাইক্রো-বায়োলোজী, জেনেটিক্স, জিনোমিক্স ইত্যাদি আধুনিক জীববিজ্ঞানের শাখা যত এগিয়েছে, ততই অভ্রান্তভাবে প্রমাণ হয়েছে বিবর্তনবাদের সঠিকতা! কিন্তু তার ফলে ধর্মীয় অংশ থেমে যায়নি, বরং আমেরিকার মত জায়গায় তারা সরকার এবং প্রভাবশালী লোকদের সমর্থন পেয়ে ইদানীং মহাশক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করেছে। প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে আর কুলাচ্ছে না দেখে এখন ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন (Intelligent Design) বা আই.ডি (ID) নামের মোড়কে পুরে নতুন করে সৃষ্টিতত্ত্বকে প্রচার করার আপ্রাণ চেষ্টায় নেমেছে, এ নিয়ে দশম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইলো।

সে যাই হোক, চলুন আমরা আবার ফিরে যাই ডারউইনের গল্পে। বিজ্ঞান তো তার তত্ত্ব প্রচারের পর চুপ করে বসে থাকেনি, নতুন নতুন জ্ঞানের আলোকে বার বার পুরনো তত্ত্বকে ঝালাই করে নেওয়াই তার কাজ। ক্রমাগতভাবে পরিবর্তন, পরিবর্ধণ, এমনকি বর্জন করে হলেও সে আরও আধুনিক এবং উন্নত তত্ত্বকে সামনে নিয়ে আসে। ডারউইনের সময় পর্যন্ত বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলো ঠিক কিভাবে কাজ করে তা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোন স্পষ্ট ধারণাই ছিলো না। আমরা ল্যামার্কের (১৭৪৪-১৮২৯) কথা জেনেছি দ্বিতীয় অধ্যায়ে খুব সংক্ষিপ্তভাবে, ডারউইনের আগে তিনিই প্রথম সঠিকভাবে সিদ্ধান্তে আসেন যে প্রজাতি সুস্থির নয়, এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির বিবর্তন ঘটে। যদিও তিনি যে পদ্ধতিতে এই পরিবর্তন ঘটে বলে প্রকল্প দেন তা পরবর্তীতে সম্পূর্ণভাবে ভুল বলে প্রমাণিত হয়। তিনি মনে করতেন যে, জীবের যে অংগগুলো তার জীবনে বেশি ব্যবহৃত হয় সেগুলো আরও উন্নত হতে থাকে, আর যেগুলোর বেশী ব্যবহার হয় না সেগুলো ধীরে ধীরে ক্ষয় বা বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। তার মধ্যে একটা অত্যন্ত জনপ্রিয় উদাহরণ হচ্ছে জিরাফের গলা লম্বা হয়ে যাওয়ার গল্প, লম্বা লম্বা গাছের ডগা থেকে কঁচি পাতা পেরে খাওয়ার জন্য কসরত করতে করতে বহু প্রজন্মের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে জিরাফের গলা লম্বা হয়ে গিয়েছিলো। ল্যামার্ক আরও বললেন যে, একটি জীব তার জীবদ্দশায় ব্যবহার বা অব্যবহারের ফলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে সেগুলো তার পরবর্তী প্রজন্মে বংশগতভাবে সঞ্চারিত হয়। যেমন ধরুন, জুতো পরতে পরতে আপনার পায়ে যদি স্থায়ীভাবে ঠোসা পরে যায় তাহলে কি পরবর্তী প্রজন্মের পায়েও সেই ঠোসা দেখা যাবে! এখানেই কিন্তু শেষ নয়, তিনি সে সময়ের আরও অন্যান্য জীববিজ্ঞানীদের মত এটাও ভাবতেন যে, পরবর্তী প্রজন্মে বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে এক ধরণের মিশ্রণ ঘটে; যেমন ধরুন, বাবার গায়ের রং কালো আর মার গায়ের রং ফর্সা হলে ছেলেমেয়ের গায়ের রং মিশ্রিত হয়ে শ্যামলা হয়ে যেতে পারে! কিন্তু ডারউইন এটা ঠিকই বুঝে ছিলেন যে, কোন অঙ্গের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে জীবের

বিবর্তন ঘটে না, প্রাকৃতিক নির্বাচন কাজ করার জন্য শুধুমাত্র বংশগতভাবে যে বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তী প্রজন্মে দেখা যায় তারাই দায়ী। যে বৈশিষ্ট্যগুলো আপনি আপনার পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আপানার দেহে পান নি, তার উপর বিবর্তন কাজ করতে পারে না।

ল্যামার্কীয় বনাম ডারউইনীয় দৃষ্টিভঙ্গী

ল্যামার্কীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী পরিবেশের দাবী মেটানোর উদ্দেশ্যে আভ্যন্তরীণ চাহিদা বা প্রয়োজন থেকে জীবের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটে। এই দাবী মেটানোর জন্য কোন জীব যখন কোন এক বিশেষ অঙ্গের অধিকতর ব্যবহার শুরু করে তার ফলশ্রুতিতেই একসময় নতুন বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণার উদ্ভব ঘটে। এভাবে ক্রমাগত ব্যবহার বা অব্যবভার থেকেই অঙ্গের উৎপত্তি বা বিলুপ্তি ঘটে যেতে পারে। নীচের ছবিতে ল্যামার্কের সেই বহুল সমালোচিত জিরাফের উদাহরণটি দেখানো হয়েছে। প্রথম জিরাফটি হচ্ছে বেটে পুর্বপুরুষ যে উঁচু গাছের পাতা নাগাল পাওয়ার জন্য ক্রমাগতভাবে তার গলা লম্বা করার চেস্টা করছে। এভাবে চেস্টা করতে করতে একসময় তার গলা লম্বা হয়ে যায় এবং জীবের জীবনকালে অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চালিত হয়। এভাবেই ধীর প্রকিয়ায় পরিবর্তন হতে হতে একসময় নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে। অর্থাৎ বিবর্তন ঘটে সরলরেখায়।

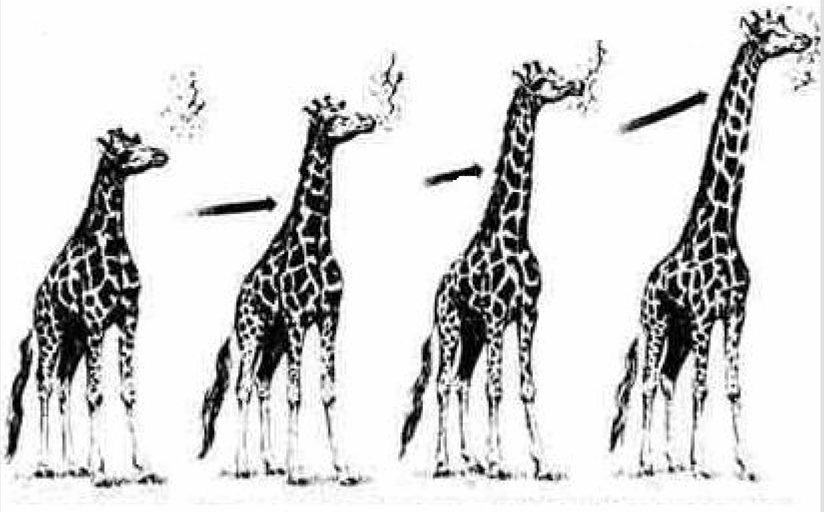

চিত্র ৩.৪ : ল্যামার্কীয় দৃষ্টিভঙ্গী

মেন্ডেলীয় আধুনিক বংশগতিবিদ্যা এবং ডারউইনের বিবর্তনর তত্ত্ব অনুযায়ী কোন জনপুঞ্জে মিউটেশন এবং জেনেটিক রিকম্বিনেশনের কারণে প্রচুর পরিমাণে প্রকারণ থাকে। যেমন ধরুন, নীচের উদাহরণে জিরাফের এই জনপুঞ্জে বেটে লম্বা মাঝারি সব ধরণের গলাবিশস্ট্য জিরাফ রয়েছে। প্রাকৃর্তিক নির্বাচনের কারণে লম্বা গলার জিরাফরা টিকে থাকার জন্য বেশী সুবিধা পাবে কারণ তারা সহজেই উঁচু ডালের পাতা নাগাল পেতে পারে। তার ফলে তারাই বেশী সফলভাবে টিকে থাকবে এবং পরবর্তী প্রজন্মে এই বৈশস্ট্যটিকে সঞ্চালিত করতে সক্ষম হবে। তার ফলে ধীরে ধীরে একসময় জনপুঞ্জে প্রকারণ থাকলেও লম্বা গলার জিরাফের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। এক্ষেত্রে ইচ্ছা, প্রয়োজন, চাহিদা বা জীবিতকালে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের কোন মূল্য নেই। জেনেটিকভাবে বৈশস্ট্যগুলো বিদ্যমান না থাকলে তা বিবর্তনে কোন ভুমিকা রাখবে না।

চিত্র ৩.৫ : ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব

কিন্তু ল্যামার্কের অন্য দু'টি তত্ত্ব নিয়ে ডারউইন বেশ বিপাকে পড়লেন, আসলেই কি জীবদ্দশায় অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়? সত্যিই কি বাবা মার বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তানের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে যায়? কিন্তু আসলেই যদি এভাবে বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ ঘটে তাহলে কি তার প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বই ভুল প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে না? আমরা আগেই দেখেছি যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের অন্যতম প্রধাণ শর্তই হচ্ছে যে, প্রজাতির জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রকারণ (Variation) থাকতে হবে, যার ফলশ্রুতিতেই জীবের মধ্যে বেঁচে থাকার যোগ্যতায় ভিন্নতা দেখা দেয়। কিন্তু এভাবে যদি কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলো মিশ্রিত হয়ে যেতে থাকে তাহলে তো হাজার প্রজন্ম পরে সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে, প্রকারণ থাকবে কি করে? তখনও জেনেটিক্সের আবিষ্কার না হওয়ায় ডারউইন এর সদুত্তর দিতে পারলেন না, এমনকি কখনও কখনও তিনি ল্যামার্কের তত্ত্বকেই সঠিক বলে ধরে নিলেন। বিবর্তনবাদের বিরোধীরা সে সময় তার এই সংশয়কে প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোড়ালোভাবে ব্যবহার করতেন।

অথচ তার সমস্যার সমাধান অবশ্যই দিতে পারতেন গ্রেগর মেন্ডেল (১৮২২-১৮৮৪), যিনি ১৮৬৫ সালেই তার জিনতত্ত্বটি (যদিও তিনি 'জিন' শব্দটি কথাও উল্লেখ করেন নি) প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি মা বাবার দুজনের মধ্যে বিদ্যমান বংশগতির একক বা বৈশিষ্ট্যগুলোকে 'ইউনিট ক্যারেক্টর' বলে আভিহিত করেছিলেন, তবে, পরবর্তীতে ১৯০৯ সালে উইলিয়াম জোহান্সেন (Wilhem Ludvig Johannsen) একে *জিন* হিসেবে নামকরণ করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ, ডারউইন মেন্ডেলের লেখাটা পড়ারই সুযোগ পেলেন না; আসলে সে সময় কেউই মেন্ডেলের আবিষ্কারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করায় তার এই গুরুত্বপুর্ণ কাজটা তখনকার মত হারিয়েই গেল কালের গহ্বরে। তারপর ১৯০০ সালের দিকে আবার নতুন করে আবিষ্কৃত হল তাঁর কাজ। আমরা অবাক হয়ে জানতে পারলাম, ডারউইন যে সমস্যাগুলো নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন তার সমাধান ছিলো একেবারেই তার হাতের ডগায়। মেন্ডেল দেখালেন যে, ছেলে মেয়ের প্রত্যেকটা বংশগত বৈশিষ্ট্য মা বাবার কোন না কোন 'ইউনিট ক্যারেক্টর' দিয়ে নির্ধারিত হচ্ছে। বাবা মার কোষের ভিতরের এই ফ্যাকটর বা জিনগুলো একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে তাদের সন্তানদের মধ্যে প্রবাহিত হয়। এখন আমরা জানি যে,

> জিন হচ্ছে ডি এন এ (DNA) দিয়ে তৈরি বংশগতির (inheritence) একক, যার মধ্যে কোষের বিভিন্ন রকমের প্রোটিন তৈরির (এবং তার ফলশ্রুতিতেই কোষ তৈরি হয়) তথ্য বা কোড জমা থাকে। বাবা এবং মার যৌন কোষে এই জিনগুলো থাকে, তাদের ছেলে মেয়েরা নিজেদের প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্যের জন্য দুজনের থেকে একটা করে জিন পেয়ে থাকে। এই জিনগুলোর মধ্যে কোনরকম কোন মিশ্রন ঘটে না এবং একটা বৈশিষ্ট্যের জিন আরেকটার উপর কোনভাবে নির্ভরশীল নয়।

অর্থাৎ, আপানার চোখের রং-এর বৈশিষ্ট্যের সাথে নাকের আকারের বৈশিষ্ট্যের কোন সম্পর্ক নেই, প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্যের জিন আলাদা আলাদাভাবে কাজ করে। উত্তরাধিকার সুত্রে আপনি আপনার বাবা বা মার কাছ থেকে কোন একটা জিন হয় পাবেন না হয় পাবেন না, এর মাঝামাঝি কোন ব্যবস্থা এখানে

নেই। একইভাবেই আপনার বাবা মাও তাদের পুর্বপুরুষ থেকে তাদের জিনগুলো পেয়ে এসেছে। এভাবেই, জিনগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রবাহিত হয়ে আসছে বিভিন্ন জীবের মাঝে। ডঃ রিচার্ড ডকিন্‌স খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এই ব্যাপারটাকে [৫], 'This argument can be applied repeatedly for an indefinite number of generations. Discrete single genes are shuffled independently through the generations like cards in a pack, rather than being mixed like the ingredients of a pudding'. আর এই আবিষ্কারটির ফলেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এসে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব সম্পর্কে অন্যতম প্রধান বিরোধটির নিরসন হলো।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় শিল্প বিপ্লবের আগে এবং পরে পেপার্‌ড মথের (Biston betularia) বিবর্তন থেকে। বিজ্ঞানীরা গত ১৪০ বছর ধরে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে পেপারড মথের এই পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে আসছেন। এই ইংলিশ মথ প্রজাতিটিকে হাল্কা এবং গাঢ় - দুটি রং এই দেখতে পাওয়া যায় এবং যেহেতু তারা একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত, তাদের মথের মধ্যে নিয়মিতভাবে প্রজননও ঘটতে দেখা যায়। শুধুমাত্র এক জোড়া জিন দিয়ে এদের গায়ের রং নির্য়ন্ত্রিত হয়। এদেরকে সাধারণত লাইকেন (lichen) নামের এক ধরনের পরজীবি ছত্রাক দিয়ে ঢাকা গাছের ডালের উপর দেখা যায়। ১৮৪৮ সালের যাদুঘরের এক সংগ্রহ থেকে পাওয়া পরিসংখ্যাণ থেকে জানা যায় যে, ইংল্যান্ডের ম্যঞ্চেস্টার শহরে সে সময়ে গাঢ় রং-এর মথের সংখ্যা ছিল ১% এরও কম, আর বাকি প্রায় ৯৯% মথই ছিলো হাল্কা রং-এর [৬]। এই পোকাগুলো পাখিদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। হাল্কা রং-এর লাইকেন দিয়ে ঘেড়া গাছের ডালগুলোতে বসে থাকা গাঢ় রং মথগুলো খুব সহজেই পাখিদের চোখে পড়তো এবং তাদের শিকারে পরিণত হত। অন্যদিকে হাল্কা রং-এর পোকাগুলো গাছের ডালের রং-এর সাথে মিশে থাকায় তাদেরকে পাখিরা সহজে আর দেখতে পেত না, এবং তার ফলে তারা শিকারি পাখিদের হাতে ধরাও পরতো কম। এর ফলশ্রুতিতে দেখা গেল যে, প্রতি প্রজন্মে হাল্কা রং-এর জিন ধারণকারী মথের সংখ্যা সমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডে প্রাকৃতিক পরিবেশের অনেক পরিবর্তন ঘটে, কারখানা থেকে আসা ঝুল, ময়লা দিয়ে বাতাস অনেক বেশী দুষিত হয়ে পরতে থাকে। এই পরিবেশ দূষণের কারণে গাছের ডালের উপরের লাইকেনগুলো হয় মারা যায় অথবা তাদের উপর এক ধরনের গাঢ় রং-এর প্রলেপ পরে যায়। তার ফলে দেখা গেলো যে, এই মথগুলোর চারপাশের পরিবেশই ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে, এখন গাঢ় রং-এর প্রলেপ পরা লাইকেন এর উপর বসে থাকা হাল্কা রং-এর মথগুলো আগের থেকে অনেক বেশী করে পাখিগুলোর চোখে পরছে। আর তার ফলে যা হবার তাই হল - এবার হাল্কা রং-এর মথের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে গেলো এবং গাঢ় রং-এর মথের সংখ্যা বেড়ে যেতে শুরু করলো। কিছুদিন পরে আরেক পরিসংখ্যানে দেখা গেলো যে, পেপারড মথের জনসংখ্যার ৯৫%-ই গাঢ় রং-এর মথে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এখানেই কিন্তু গল্পের শেষ নয়, এর পরপরই ইংল্যান্ডে বাতাসের দূষণ রোধের জন্য আইন পাশ করা হয় এবং দ্রুত বাতাসের দুষণও কমতে শুরু করে। আর প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে আবারও ঠিকই দেখা গেল যে, হাল্কা রং-এর মথের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে। পাখিদের দিয়ে আরোপিত প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে আমরা দেখলাম যে কি করে একটা জিন পুলের মধ্যে জিনের ফ্রিকোয়েন্সি বদলে যেতে পারে, এবং তার ফলে সেই জনপুঞ্জে কি করে বিবর্তন ঘটে।

গত একশ বছরে জেনেটিক্স এবং মাইক্রো-বায়োলজী বা অনু-জীববিদ্যা এগিয়ে গেছে অকল্পনীয় গতিতে, ক্রোমোসোম, ডিএনএ এবং মিউটেশন থেকে শুরু করে মানুষের জিনোমের পর্যন্ত হিসাব বের করে ফেলেছেন বিজ্ঞানীরা। এখন তো জীববিজ্ঞানীরা রীতিমত দাবী করছেন যে, যদি একটা ফসিলের

চিহ্নও পৃথিবীর বুকে কোনদিন না পাওয়া যেতো তাহলেও আজকের জেনেটিক্সের জ্ঞান এবং আমাদের ডিএনএ-এর মধ্যে লেখা পুর্ববর্তী প্রজন্মগুলোর হাজার বছরের ইতিহাস থেকেই বিবর্তনের তত্ত্ব প্রমাণ করে ফেলা যেতো। এখন খুব সংক্ষেপে দেখা যাক, জেনেটিক্স এবং গত দেরশো বছরে বৈজ্ঞানীক আবিষ্কারের আলোকে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বটি কিভাবে পরিবর্ধিত হয়ে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত রূপ ধারণ করলো।

ডারউইনের অবদানের পর থেকে বিজ্ঞানীরা কিন্তু বসে ছিলেন না, তারা বিবর্তন নিয়ে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং বিবর্তনের নানা প্রক্রিয়া এবং ধাপকে সনাক্ত করেছেন। আসলে সত্যি কথা বলতে কি , ডারউইনের তত্ত্বটি এতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক যে বিজ্ঞানীরা বিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত এ নিয়ে বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা নীরিক্ষা এবং বিতর্ক চালিয়ে যান। তবে মেন্ডেলের তত্ত্ব, ডিএনএর আবিষ্কারসহ বংশগতিবদ্যা, জনপুঞ্জ বংশগতবিদ্যা (Population Genetics), বা জিনোমিক্সসহ জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যত এগিয়ে গেছে ততই আরও বিস্তারিতভাবে বিবর্তন তত্ত্বের সঠিকতা প্রমাণিত হয়েছে। জনসাধারণের কাছে না হলেও, গত অর্ধ-শতকেরও বেশী সময় ধরে বিজ্ঞানীমহলে বিবর্তনতত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কি কি প্রক্রিয়ায় বিবর্তন ঘটে, তা শুধুই কি ধীর গতিতে ঘটে নাকি মাঝে মাঝে উল্লম্ফণও ঘটে, এধরণের বিষয়গুলো নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক হয়ে থাকলেও বিবর্তনবাদের সঠিকতা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আর কোন সন্দেহ নেই।

আগেই দেখেছি, জীবন সংগ্রামে যে সব *প্রকারণ* (variation) জীবকে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকতে বেশী সুবিধা করে দেয় সেই সব জিনের অধিকারী জীবই বড় হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকে এবং যারা পরিবেশের সাথে কম খাপ খাওয়াতে পারে তাদের তুলনায় তারা অনেক বেশী সন্তান রেখে যেতে সক্ষম হয়। ডারউইন বিবর্তনকে দেখেছিলেন ব্যক্তিগত প্রাণী বা উদ্ভিদ এবং প্রজাতি লেভেলে, এখন বোঝা যাচ্ছে যে, বিবর্তন ঘটছে জিন, বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য এবং জনপুঞ্জে [৭]। একটি প্রজাতির কতগুলো জীব যখন নিজেদের মধ্যে যৌন প্রজননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে তখন তাদের জনপুঞ্জের সবার জিনের সমষ্টিকে একসঙ্গে বলে *জিন সম্ভার* (gene pool)। একদিকে যৌন প্রজননের মাধ্যমে ছেলে মেয়ের মধ্যে বাবা মার জিনের যে জেনেটিক রিকম্বিনেশন হয় তার ফলে পরবর্তী প্রজন্মে জিনের অদলবদল ঘটে, আবার অন্য দিকে, জিনের মধ্যে আকস্মিকভাবে পরিবর্তন ঘটার ফলে কখনও কখনও তার ডিএনএর গঠন বা সংখ্যায়ও পরিবর্তন ঘটে, যাকে বলা হয় পরিব্যাক্তি (Mutation)। মিউটেশনের মাধ্যমেই প্রকারণের সৃষ্টি হচ্ছে আর তারপর যৌন প্রজননের মাধ্যমে তা সমগ্র জিন পুলে মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। তবে একটা জনপুঞ্জের মধ্যে শুধুমাত্র একটি বা দুটি জীবের জীনগত পরিবর্তনকেই বিবর্তন বলে ধরে নেওয়া যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সমগ্র জনপুঞ্জের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ছে এবং তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বলা যাবে না যে বিবর্তন ঘটছে। তার মানে ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে এরকম -

> বেশী উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীব বেশী দিন বেঁচে থাকে এবং বেশী বংশবৃদ্ধি করতে পারে, তার ফলে তাদের জিন অনেক বেশী পরিমানে প্রবাহিত হয় সন্তানদের মধ্যে। এর ফলে সময়ের সাথে সাথে একটি জীবের জনসংখ্যায় জিনের ফ্রিকোয়েন্সি বা মাত্রা বদলাতে থাকে – পরবর্তী প্রজন্মে কিছু জিন বেশী প্রবাহিত হয় আর কিছু জিনের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। এইভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জনপুঞ্জে জিনের পরিবর্তন ঘটতে

থাকাকেই বিবর্তন বলে। জেনেটিক্সের সংজ্ঞা অনুযায়ী, বংশগত প্রকারণগুলোর প্রভেদমূলক প্রজননকে (differential reproduction) বলে প্রাকৃতিক নির্বাচন; আর, প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া মাধ্যমে কোন প্রজাতির জনসংখ্যায় জিন ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন বলে বিবর্তন(৬)।

প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবের অভিযোজন (Adaptation) ক্ষমতা বাড়তে থাকে, আর তারই ফলশ্রুতিতে সে তার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে টিকে থাকার জন্য আরও যোগ্যতর হয়ে গড়ে ওঠে। তবে এখন আমরা জানি যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাড়াও আরও অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমেও বিবর্তন ঘটতে পারে। ডারউইন বিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার কথা বলে থাকলেও আজকের দিনের বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা অবশ্য প্রজাতির উৎপত্তির পেছনে প্রাকৃতিক নির্বাচনের পাশাপাশি বিবর্তনের জন্য অন্য বেশ কিছু ফ্যাক্টরকেও গন্য করে থাকেন, ফ্যাক্টরগুলো হল এই হল :

- জিন মিউটেশন
- ক্রোমজম মিউটেশন
- জেনেটিক রিকম্বিনেশন
- জিনের পুনরাগমন বা জিন প্রবাহ
- জেনেটিক ড্রিফট
- এবং অন্তরণ বা Isolation

বিবর্তনের এই আধুনিক সংশ্লেষণী তত্ত্ব (Synthetic theory of Evolution) অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, জনপুঞ্জে জিনের প্রকারণ রয়েছে এবং এই প্রকারণগুলো তৈরি হচ্ছে আকস্মিক মিউটেশন এবং জেনেটিক রিকম্বিনেশন থেকে, এদের পিছনে কোন নিয়ম, উদ্দেশ্য বা অভিযোজন কাজ করছে না। কোন জনপুঞ্জে এই মিউটেশন এবং জেনেটিক রিকম্বিনেশনের হারের উপর জিনের ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন নির্ভর করবে। কোন জনপুঞ্জে যদি মিউটেশনের হার বিরল হয় তবে জিনের ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনে এর ভুমিকাও হবে অত্যন্ত নগন্য। এখন কোন জনপুঞ্জে এই জিনের ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনের মাধ্যমে বিবর্তন ঘটার পিছনে প্রধাণ কারণগুলো হচ্ছে: জিন প্রবাহ, জেনেটিক ড্রিফট, অন্তরণ এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন। প্রাকৃতিক নির্বাচন কাকে বলে তা তো আমরা উপরে বিস্তারিতভাবে দেখেছিই, চলুন তাহলে খুব সংক্ষপে দেখে নেওয়া যাক বিজ্ঞানীরা জিন প্রবাহ, জেনেটিক ড্রিফট বা অন্তরণ বলতে কি বোঝাচ্ছেন। কোন জনপুঞ্জে বাইরে থেকে কেউ এসে বা চলে গিয়ে অর্থাৎ জিনের পুনরাগমনের মাধ্যমে নতুন জিনের প্রবাহ ঘটাতে পারে। জিনের প্রবাহজনিত ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন নির্ভর করবে স্থানীয় বাসিন্দা এবং নতুন অতিথিদের জিনের বিভিন্ন কপি বা অ্যালেল (Alleles, অর্থাৎ কোন জিনের বিভিন্ন রূপ, যেমন ধরুন রক্তের টিপের মধ্যে 'এ' 'বি' বা 'ও' টিপগুলোকে একই জিনের বিভিন্ন অ্যালেল বলা হবে) মধ্যে তারতম্যের হার এবং পুনরাগমনের হারের উপর। আবার ধরুন, অনেক সময় সময়ের সাথে সাথে আকস্মিকভাবে জনপুঞ্জে জিনের ফ্রিকোয়েন্সিতে পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে, এর পিছনে অভিযোজন বা টিকে থাকার যোগ্যতা বা প্রাকৃতিক নির্বাচন কোন ভুমিকা পালন করে না আর তাকেই বলে জেনেটিক ড্রিফট বা বাংলায় বললে বলতে হয় বংশানুসৃত সম্প্রবাহ। একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক ব্যাপারটা। ধরুন, কোন এক হলুদ ব্যাঙের জনপুঞ্জ রয়েছে, সেখানে মাত্র দুইটি ব্যাঙের মধ্যে সবুজ গায়ের রং এর বিরল জিনের অ্যালেল বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু প্রজননের আগেই তারা দুজনেই গাড়ি চাপা পরে মরে গেলো। তখন সেই জনপুঞ্জ থেকে এই

সবুজ রং এর অ্যালেলটি কিন্তু চিরতরে হারিয়ে গেলো, এই জনপুঞ্জে এই বৈশিষ্ট্যটি আর দেখা যাবে না, -এর পিছনে কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচনের কোন ভুমিকাই ছিলো না। বিবর্তনের মাধ্যমে প্রজাতির তৈরির ক্ষেত্রে আবার অন্তরণও খুব গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারে। আরেকটি মজার উদাহরণ দেওয়া যাক এ প্রসঙ্গেঃ ধরুন, একটি শামুকের জনপুঞ্জে হাল্কা , গাঢ় সব রং-এর শামুক আছে। একবার এক ঘূর্নিঝড়ে দুই একটি গাঢ় রং-এর শামুক উড়ে গিয়ে পড়লো আরেক দ্বীপে। এখন এখান থেকে নতুন এক প্রজন্মের শামুকের উৎপত্তি ঘটলো যাদের মধ্যে শুধুই গাঢ় রং-এর জিন বিদ্যমান। এছাড়াও এই নতুন জনপুঞ্জে শুধুমাত্র সেইসব জিনই উপস্থিত থাকবে যা তাদের ওই দুই একজন পূর্বপুরুষের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো, পুরনো সেই আসল জনপুঞ্জের জিন পুলে বহু কালের বিবর্তনের ফলশ্রুতিতে যে বহু রকমের জিনের উদ্ভব ঘটেছিলো তা কিন্তু এই জনপুঞ্জে আর থাকবে না, তার ফলে তাদের বিবর্তন ঘটতে শুরু করবে এক নতুন নিয়মে এবং গতিতে। আসলে জনপুঞ্জের মধ্যে ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা ঘটলে নতুন প্রজাতি তৈরির পথ সুগম হয়ে ওঠে। কারণ এর ফলে দ্'টি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া জনপুঞ্জের মধ্যে জিনের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং নতুন এই জনপুঞ্জের জিনপুলে নতুন ধরণের মিউটেশন, জিন প্রবাহ বা জেনেটিক রিকম্বিনেশনের মাধ্যমে নতুন নতুন পরিবর্তন ঘটতে থাকে। প্রকার্তিক নির্বাচন বা জেনেটিক ড্রিফটের ফলে ধীরে ধীরে এতই পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে যে, তাদের পক্ষে আর পুরনো সেই জনপুঞ্জের সাথে প্রজনন সক্ষম হবে না। আর তখনই উৎপত্তি ঘটে নতুন প্রজাতির।

অনেকেই অনেক রকমের সংগা দিয়েছেন প্রজাতির, কিন্তু ১৯৬৩ সালে বিজ্ঞানী আর্নেষ্ট মায়ার যে সংগাটি দেন তাকেই জীববিদ্যায় এখন সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংগা বলে ধরে নেওয়া হয়। তার সংগা মতে, ‘প্রজাতি হচ্ছে একটি প্রাকৃতিক জনপুঞ্জ যার সদস্যরা নিজেদের মধ্যে অবাধভাবে জননরত অথবা জনন করার ক্ষমতা রাখে, তাদের একটি সাধারণ জিন পুল আছে তবে তারা এ ধরণের অন্যান্য দল সাথে যৌনজননের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন।’ অর্থাৎ, এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতি উৎপত্তির পিছনে মুল বিষয়টি হল এক জনপুঞ্জ ভেঙ্গে আরেক জনপুঞ্জের উদ্ভব অথবা এক জিন পুল ভেঙ্গে একাধিক জিন পুলের উৎপত্তি (৩)। ডারউইন তার সময় উপরে বর্ণিত সবগুলো প্রক্রিয়ার কথা না জানলেও বিবর্তনবাদের মুল বিষয়টিকে সঠিকভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন: প্রথমতঃ প্রজাতির উদ্ভবের কারণ বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংগ্রাম নয় বরং একই প্রজাতির ভিতরে আন্ত-প্রজাতি সংগ্রাম, দ্বিতীয়তঃ নতুন নতুন প্রজাতির যেমন উৎপত্তি ঘটছে তেমনি অগুন্তি প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে এবং তৃতীয়তঃ বিবর্তন ল্যামার্কীয় ধারায় সরলরেখায় ঘটেনা বরং তা ঘটে গাছের শাখা প্রশাখার মত বিস্তৃত হয়ে [২]। প্রাকৃতিকভাবে, প্রাণের উৎপত্তির সেই আদি থেকেই জীবের বিবর্তন ঘটে চলেছে বলেই আমাদের চারপাশে প্রাণের এত বৈচিত্র। পরিবেশ এখানে নির্বাচনী শক্তি (Selection agent) হিসেবে কাজ করে, এবং যেহেতু সময় এবং অঞ্চল বিশেষে পরিবেশ বদলে যায় তাই বিভিন্ন পরিবেশে জীবের বিভিন্ন প্রকারণ নির্বাচিত হয়। আর তাই, কোন জায়গার জীবকে, সেখানকার সব প্রজাতিকে বিচার করতে হবে তার চারপাশের পরিবেশের আপেক্ষিকতায়।

আজকে প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান থেকে শুরু করে জেনেটিক্স, জিনোমিক্স, অনু-জীববিজ্ঞান কিংবা ওষুধ বা কিটনাশক তৈরি, এমনকি চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমস্ত শাখা অচল হয়ে পড়বে বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করলে। ডারউইন প্রায় দেড়শো বছর আগে যা বলে গেলেন তার সারকথা প্রমাণ করতে আমাদের এতদিন লেগে গেলো। আর জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যতই চাঞ্চল্যকর এবং আধুনিক আবিষ্কার দিয়ে ভরে উঠতে থাকলো ততই নতুন করে প্রমাণ হতে থাকলো বিবর্তনের যথার্থতা। এই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রজাতির জীবসহ দ্বিপদী এই মানব প্রজাতিরও সেই আদি এক কোষী প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়ে এখানে

এসে পৌছানোর জন্য কোন পরিকল্পনা বা ডিজাইন বা অতিপ্রাকৃত স্রষ্টার প্রয়োজন হয়নি, কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় উদ্ভব ঘটেছে তাদের। মানুষ যতই সে নিজেকে ঘিরে শ্রেষ্ঠত্বের মায়াজাল তৈরি করুক না কেনো, সে আর সব প্রাণীর মত এই প্রকৃতিরই একটি অংশমাত্র।

তথ্যসূত্র:

১. সেন না, ২০০৪, ডারউইন থেকে ডি এন এ এবং চারশো কোটি বছর, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ভারত।

২. মজুমদার সু, ২০০৩, চার্লস ডারউইন এবং বিবর্তনবাদ, প্রকাশকঃ সোমনাথ বল, কোলকাতা, ভারত।

৩. আখতারুজ্জামান ম, ২০০২, বিবর্তনবাদ। হাসান বুক হাউস, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৪. Artificial Selection, The University of California Museum of Paleontology, http://evolution.berkeley.edu/evosite/lines/IVAartselection.shtml

৫. Dawkins R, Darwin and Darwinism, Mukto-Mona Darwin Day celebration, http://www.mukto-mona.com/Articles/dawkins/darwin_and_darwinism120206.htm

৬. Berra, TM, 1990, Evolution and the Myth of Creationism. Stanford

৭. Laurence M, 1993, The Modern Synthesis of Genetics and Evolution, The Talk.Origins Archive,
http://www.talkorigins.org/faqs/modern-synthesis.html

৮. Ridley M, 2004, Evolution, BlackwellPublishing, Oxford, United Kingdom.

৯. Historic Figures: Leonardo Da Vinci, BBC History Archive
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/da_vinci_leonardo.shtml

১০. Harter R, Changing Views of the History of the Earth, The Talk.Origins Archive,
http://www.talkorigins.org/faqs/geohist.html

চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

{বন্যা আহমেদের *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটি অবসর প্রকাশনী থেকে ২০০৭ এর একুশে বইমেলায় প্রকাশিতব্য। এই অংশটি বইটির তৃতীয় অধ্যায়।}

চতুর্থ অধ্যায়

চোখের সামনেই ঘটছে বিবর্তন!

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পর

ভুরিভুরি বই রয়েছে বাজারে বিবর্তনের উপরে, বিজ্ঞানীরা প্রতিদিনই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে আমাদের চারপাশের প্রকৃতি, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিবর্তনের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। বিবর্তন তত্ত্ব আজকে আমাদের শুধু প্রাণের বিকাশ, বিলুপ্তি এবং টিকে থাকার ব্যাপারটাই বুঝতে সাহায্য করছে না, আজকের এই জীবজগৎ কি করে ক্রমাগতভাবে বদলে যাচ্ছে এবং তা আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রাকে কিভাবে প্রভাবিত করছে তার একটা পূর্ণাংগ ব্যাখ্যাও দিচ্ছে। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন বিবর্তনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে না দেখলে আজকের এই আধুনিক জীবনযাত্রা থেকে অবশ্য প্রয়োজনীয় অগ্রগতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের অনেকটুকুই বাদ দিয়ে দিতে হবে। আজকে বিবর্তন তত্ত্বকে বাদ দিলে - আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে, মানুষ বা অন্যান্য জীবের ডিএনএ র গঠন বুঝে জটিল অসুখের চিকিৎসা বের করা এবং রোগ প্রতিষেধক ভ্যাকসিন তৈরির কাজ বাদ দিয়ে দিতে হবে, পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষা, দূষণ রোধ, গ্লোবাল ওয়ারমিং সহ বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা বন্ধ করে দিতে হবে, উন্নত জাতের ফসল তৈরি করার কাজ বা কীটনাশকের ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হবে - বন্ধ করে দিতে হবে আরো হাজারটা গবেষণা ও আবিষ্কার যেগুলো লিখতে গেলে সত্যিকার অর্থেই প্রমাণ আকারের ‘মহাভারত’ হয়ে যাবে। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে বিবর্তন তত্ত্বের গুরুত্ব আজকে এতখানিই যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পর্যন্ত এখন বিবর্তনীয় জীববিদ্যা, বিবর্তনীয় চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি নামে নতুন সব শাখারও সৃষ্টি করা হচ্ছে [১]।

> বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত বিজ্ঞানী টি. ডবঝানস্কি (T. Dobzhansky, ১৯০০-১৯৭৫) ঠিকই বলেছিলেন যে বিবর্তনের আলোয় বিচার না করলে জীববিজ্ঞানের কোন কিছুরই কোন অর্থ হয় না [২]।

গত শতাব্দীতেই বিবর্তনবাদকে জীববিজ্ঞানের মূল শাখা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ডারউইন তার বিবর্তন তত্ত্ব প্রস্তাব করছিলেন প্রায় দেড়শো বছর আগে, তারপর থেকেই জেনেটিক্স, অনুজীববিদ্যা, জিনোমিক্সসহ জীববিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখায় যত অভাবনীয় আবিষ্কার হয়েছে তার সবই এক বাক্যে বিবর্তনবাদের পক্ষে রায় দিয়ে যাচ্ছে। লাখ লাখ ফসিলের মধ্যে এখন পর্যন্ত এমন একটাও ফসিল পাওয়া যায়নি যা কিনা প্রাণের বিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে ক্ষুন্ন করে। কিন্তু তাতেই বা কি? ধর্মীয় কুসংস্কার, গোড়ামী, নোংরা রাজনৈতিক কারণে আজও কিন্তু বিজ্ঞানের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটিকে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। আমেরিকাসহ সারা বিশ্বজুড়ে বিবর্তনবাদ বিরোধীরা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবেই তাদের অপ-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। ধর্মীয় এবং সামাজিক কুসংস্কারগুলোর বিরুদ্ধে ডারউইনের এই তত্ত্ব যে কত বড় আঘাত হেনেছে তা বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দী জুড়ে রক্ষণশীলদের চালানো আমরণ সংগ্রামের নমুনা দেখলেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তাদের একটা খুব প্রিয় যুক্তি হচ্ছে বিবর্তন নাকি চোখে দেখা যায় না, কাজেই তা অবৈজ্ঞানিক! হ্যা, এটা ঠিক কথা যে, প্রাণী বা উদ্ভিদের উপর বিবর্তন

সাদারণতঃ ঘটে খুবই ধীরে, মোটামুটি লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যায় এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির বিবর্তন ঘটতে, যা হয়তো এক প্রজন্মের জীবদ্দশায় দেখে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বিজ্ঞান তো শুধু যা চোখের সামনে দেখা যায় তাই নিয়ে কাজ করে না - যদি তাই করতো তাহলে তো ফসিলবিদ্যা, জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা, জৈব-ভূগোল কিংবা রসায়নবিদ্যার মত বিভিন্ন শাখাগুলোকে অনেক আগেই অবৈজ্ঞানিক বলে ধরে নিতে হত! পদার্থবিদ্যার কথাই ধরুন না, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কি চোখে দেখা যায়, পৃথিবীটা যে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে সেটাই বা কে চোখে দেখেছে? খালি চোখে দেখলে তো আসলেই মনে হয় সূর্যটা ঘুরে ঘুরে এদিক থেকে ওদিকে চলে যাচ্ছে, তাহলে কি প্রাচীনকালের মত আমরা তাই ভেবেই বসে থাকবো?

> *কিন্তু তার চেয়েও মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, আজকাল আমরা আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন উদ্ভিদ, কীট পতংগ, ভাইরাস এমনকি প্রাণীরও বিবর্তন যেমন পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছি, তেমনি অনেক ক্ষেত্রেই তা সরাসরি পর্যবেক্ষণও করতে পারছি।*

প্রকৃতিতে যেমন নিত্য নতুন প্রজাতির উৎপত্তি হচ্ছে তেমনি উন্নত ধরণের ফসল উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানীরা গবেষাণগারে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ তৈরি করছেন - শুধু একটু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে আমাদের চোখের সামনেই অহরহ ঘটে চলেছে প্রাকৃতিক নির্বাচনসহ বিবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার খেলা। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছিলাম পেপারড মথের বিবর্তন যেটা প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে ঘটেছিল আমাদের চোখের সামনেই। চলুন তাহলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলী থেকে নেওয়া কিছু জলজ্যান্ত উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যাক, দেখা যাক আমাদের চোখের সামনে আসলেই বিবর্তন ঘটছে কিনা।

কেনো নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না এইডস রোগের অপ্রতিরোধ্য এইচ আই ভি ভাইরাস?

এইডস রোগের জন্য দায়ী এইচ আই ভি (HIV, Human immunodeficiency Virus) ভাইরাস নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে আজ তোলপাড় চলছে। গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানীরা কেন নাকানি চুবানি খাচ্ছেন এই ভাইরাসটির প্রতিষেধক বা ভ্যাক্সিন (Vaccine) বের করতে? শুনলে হয়তো অবাক হবেন, আর কিছুই নয় - এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, আনুবীক্ষণীক ভাইরাসগুলো আমাদের সাথে খেলছে 'মিউটেশন' এবং 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের' মাধ্যমে ঘটানো বিবর্তনের এক ভয়াবহ লুকোচুরি খেলা। বিজ্ঞানীরা একে মোকাবিলা করার জন্য যেই না একটা ওষুধ প্রয়োগ করছেন সেই মাত্র তারা বিবর্তিত হয়ে নতুন রূপে দেখা দিচ্ছে, নতুন নতুন ওষুধগুলোকে আক্ষরিক অর্থেই যেন নাকে দঁড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। এই 'লুকোচুরির' ব্যাখ্যা তো বিবর্তনবাদ ছাড়া আর কোন কিছু দিয়েই দেওয়া সম্ভব নয়!

১৯৮১ সালে এইডস রোগ ধরা পড়ার পর এখন পর্যন্ত ২৫ মিলিয়ন বা আড়াই কোটি লোক মারা গেছে এই মারাত্মক রোগে, ২৫ বছর ধরে বিভিন্ন ওষুধের আবিষ্কারের পরও এর নিরাময়ের তেমন কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। বরং জাতিসংঘের এক সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বব্যাপী প্রায় ৪ কোটি

মানুষ ভুগছে আজ এইডস রোগে, শুধু ২০০৫ সালে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৪৩-৬৬ লক্ষ মানুষ, আর মারা গেছে ২৮-৩৬ লক্ষ মানুষ [৩]। তাহলে চলুন আরেকটু ভালো করে খতিয়ে দেখা যাক কেনো এখনও বিজ্ঞানীরা এই ভাইরাসটাকে কোন মতেই বাগে আনতে পারছেন না ।

এই এইচ আই ভি ভাইরাসগুলোর গঠন কিন্তু অত্যন্ত প্রাচীণ ধরণের, বংশগতির মূল উপাদান হিসেবে তারা আমাদের মত ডিএনএ (DNA, Deoxyribonucleic Acid) ব্যবহার করে না। তাদের এক কোষী দেহে ডিএনএ বলে কিছু নেই, আছে সেই প্রাচীণ আরএনএ (RNA, Ribonucleic Acid) - এই আরএনএ

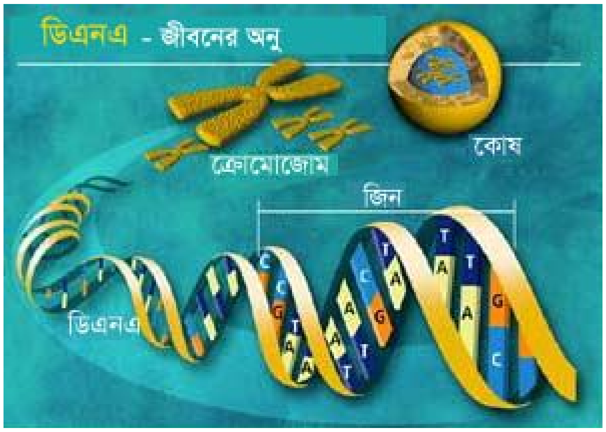

চিত্র : ৪.১ : মানুষের কোষের ভিতরের ক্রোমসম, ডি এন এর (DNA) এবং জিনের গঠন, ভাইরাসের এক কোষী দেহে এই ডি এন এ নেই, তার বদলে আছে আর এন এঃ (সৌজন্যঃ http://www.okstate.edu/artsci/zoology/ravdb/files/Chrom-dna.jpg)

এর মাধ্যমেই তারা পরবর্তী প্রজন্মে তাদের জিন ছড়িয়ে দেয়। আর গোল বাঁধলো সেখানেই - ডিএনএ নেই বলে তারা নিজে নিজে স্বাধীনভাবে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে না! বংশবৃদ্ধি করার জন্য ডিএনএ -ওয়ালা কোন উপযুক্ত পোষকের (host) দেহ কোষের ভিতরে ঢুকে পড়া ছাড়া আর উপায় কি? এক্ষেত্রে এইচ আই ভি ভাইরাসগুলো পোষক হিসেবে মানুষের দেহের কোষকে ব্যবহার করে (চিত্র ৪.১)। দেহকোষে একবার ঢুকে পরার পর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে লক্ষ লক্ষ কপি তৈরি করার মাধ্যমে নিজের বংশবৃদ্ধি করতে শুরু করে দেয়। মানুষের কোষে বিশেষ কিছু প্রোটিন আছে যাদেরকে বলা হয় গ্রাহক (Receptor, যেমন ধরুন, CD4, CCR5 ইত্যাদি); - এদের সাথে নিজেকে জুড়ে দিয়েই তারা কোষের ভিতর ঢুকে পরে। তারপর বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় সে মানুষের কোষের ডিএনএ-এর উপর ভর করে তার ভিতরেই আরএনএ-এর কপি তৈরি করে ফেলে।

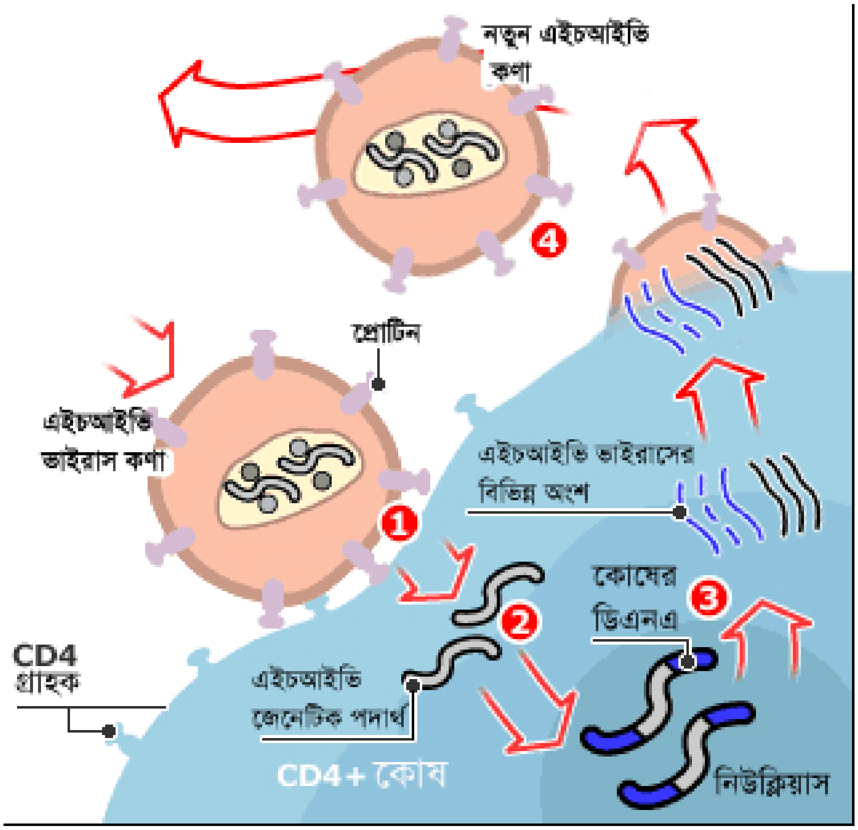

চিত্র : ৪.২: মানুষের কোষের (নীল অংশ) ভিতর এইচ আই ভি ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির বিভিন্ন ধাপ
(সৌজন্যঃ http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4434806.stm)

সেখান থেকেই ভাইরাসটির অসংখ্য কপি তৈরি হয়ে মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পরে এবং ধীরে ধীরে তার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে (immune system) ধ্বংস করে দিতে থাকে। আচ্ছা, এ ভাবেই না হয় ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করে, তাতে অসুবিধাটা কোথায়? এর সাথে তাকে প্রতিরোধ করার বা বিবর্তনেরই বা কি সম্পর্ক আছে?

আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছি, কোন জীবের উপর প্রাকৃতিক নির্বাচন কাজ করতে হলে তার নিজস্ব জনপুঞ্জের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রকারণ (Variation) থাকতে হয়। জীবন সংগ্রামে যে সব প্রকারণ জীবকে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকতে বেশী সুবিধা করে দেয় সেই সব জিনের অধিকারী জীবগুলোই বড় হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকে। আর অন্যদিকে যারা পরিবেশের সাথে কম খাপ খাওয়াতে পারে তারা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়। এটাই সংক্ষেপে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মুল কথা। আবার অন্যদিকে, জিনের মধ্যে বিভিন্ন সময় আকস্মিক কিছু পরিবর্তন ঘটে থাকে যার ফলশ্রুতিতে অনেক সময় ডি এন এর গঠন বা সংখ্যারও পরিবর্তন ঘটে যায় - আর একেই বলা হয় পরিব্যক্তি (mutation)। এই মিউটেশন কিন্তু প্রাণীর প্রয়োজনে ঘটে না, ঘটে একেবারেই বিক্ষপ্ত এবং এলোমেলোভাবে। অঙ্ক কষার সময় কখন আনমনা হয়ে একটা ভুল করে ফেলবেন সেটা যেমন আগে থেকে বলা যায় না তেমনি বংশবৃদ্ধি করার করার সময় আপনার জিনের কোন অংশটার কপি করতে ভুল হয়ে যাবে সেটাও বলার কোন উপায় নেই। পরিবেশ, প্রাণীর কোষের গঠন ইত্যাদির উপর এটা নির্ভর করলেও করতে পারে। কিন্তু এই মিউটেশনের

ফলে যে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যগুলো তৈরি হয় তা দিয়ে যদি কোন জীব বেঁচে থাকার জন্য বাড়তি কোন সুবিধা পায়, তাহলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মেই সেগুলো টিকে যায়। এখন ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির জন্য এক ধরনের বিশেষ এনজাইমের প্রয়োজন হয়, যেটা মানুষের শরীরে থাকে না, শুধুমাত্র ভাইরাসের কোষেই তা খুঁজে পাওয়া যায়। রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেস (Reverse Transcriptase) [8] নামের এই এনজাইমটি খুবই দুর্বল ধরণের প্রাচীন এক মেকানিজমে তৈরি, আর সে কারণেই দেখা যায় বংশবৃদ্ধির সময় সে জেনেটিক কোডগুলোকে সব সময় ঠিক মত প্রতিলিপি তৈরী করতে পারছে না। ফলে পরবর্তী প্রজন্মের ভাইরাসগুলোর মধ্যে অনবরতভাবে অসংখ্য মিউটেশন (Mutation) ঘটতে থাকে। আর তাই দেখা যায় যে, প্রতি নতুন প্রজন্মেই অসংখ্য রকমের নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ভাইরাসের উৎপত্তি হচ্ছে, অর্থাৎ মিউটেশনের কারণেই তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন প্রকারণের। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানুষের দেহের ভিতরে ভাইরাস যে শুধু অত্যন্ত দ্রুত হারে বংশবৃদ্ধি করে তাই ই নয়, তাদের মধ্যে এই মিউটেশনের কারনেই প্রকারণের হারও থাকে অত্যন্ত বেশি। প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মেই এইচ.আই.ভি ভাইরাসের মধ্যে পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটতে থাকে অত্যন্ত দ্রুত হারে, আর তারই ফলশ্রুতিতে মানুষের দেহে তারা খেলতে থাকে অদম্য এক ভয়াবহ বিবর্তনের খেলা। বিজ্ঞানীরা অতীতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এইচ.আই.ভি প্রতিষেধক ওষুধ আবিষ্কার করেছেন এবং এখনও নতুন নতুন ওষুধ তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যেমন ধরুন, এক ধরণের ওষুধ দিয়ে তারা চেষ্টা করেছেন ভাইরাসটির রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেসের কাজে বাঁধা দিতে, যাতে তারা মানুষের কোষের ডিএনএ-এর ভিতরে ঢুকতে না পারে। আবার অন্য আরেক ধরণের ওষুধ তৈরি করা হয়েছে যাতে করে ভাইরাসগুলো মানুষের দেহের কোষের গ্রাহকের সাথে জুড়তেই না পারে। কিন্তু ব্যাপারটা এত সোজা নয়, এখানে আরেকটু গোলমেলে ব্যাপার আছে! এই ওষুধগুলো দিয়ে আপাতভাবে এইডসের রোগীর দেহে ভাইরাসের প্রকোপ অল্প কিছু সময়ের জন্য বন্ধ করা গেলেও শেষ পর্যন্ত দেখা যায় এদের কোনটা দিয়েই কোন কাজ হচ্ছে না। কয়েক মাস বা বছর ফুরোলেই এইচআইভি ভাইরাসগুলো আবার প্রবল বিক্রমে রোগীর দেহে ফিরে আসে। চলুন তাহলে দেখা যাক কেনো এই ওষুধগুলো বারবার ব্যর্থ হচ্ছে।

ঘটনাটা আসলে আর কিছুই নয়। আমরা আগেই দেখেছি, ভাইরাস খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে এবং খুব কম সময়ে ভাইরাসগুলোর মধ্যে খুব বেশী হারে মিউটেশন হয় বলে এদের মধ্যে হাজারো রকমের বৈশিষ্ট্যের হের ফের দেখা যায়। তার ফলে রোগীর দেহে কোন একটা বিশেষ ওষুধ প্রয়োগ করার পর বেশীরভাগ ভাইরাস মরে গেলেও, এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের ভাইরাস সবসময়েই থেকে যায় যাদের উপর ওই ওষুধটা কোন কাজ করতে পারে না। তারাই বেঁচে থাকে এবং কিছুদিনের মধ্যে আবারো বংশবৃদ্ধি করে সারা দেহে ছড়িয়ে পরে। তবে এবার যে ভাইরাসগুলো বেঁচে থাকলো এবং তাদের থেকে যে এক নতুন ভাইরাসের প্রজন্ম উৎপত্তি হলো তাদের সবার মধ্যেই ওষুধটি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তৈরি হয়ে গেছে। তার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ওষুধটি সম্পুর্নভাবে অকেজো হয়ে যায় ওই রোগীর শরীরের রোগ নিরাময়ে।

আসলে এখানে আমরা খালি চোখেই দেখতে পাচ্ছি ডারউনের বলে যাওয়া সেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা বিবর্তনের এক মোক্ষম উদাহরন। পার্থক্য এতটুকুই যে এই বিবর্তনগুলো ঘটছে আমাদের চোখের সামনে, অতি দ্রুত, আনুবীক্ষনীকভাবে মানুষের শরীরের ভিতর; আর ডারউইন তাদেরকে দেখেছিলেন প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবেশে বা দক্ষিন আমেরিকার

গ্যালাপ্যগোস দ্বীপপুঞ্জে।

একেকটা রোগীর দেহ যেনো ডারউইনের সেই গ্যালাপ্যগাস দ্বীপপুঞ্জের একেকটা দ্বীপ - ফিঞ্চ পাখিগুলো যেমন তাদের নিজস্ব দ্বীপের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে স্বতন্ত্রভাবে বিবর্তিত হয়েছিলো, তেমনিভাবে ভাইরাসগুলোও প্রত্যেকটা মানব শরীরের ভিতরকার বিচ্ছিন্ন পরিবেশে অনবরত বদলে যাচ্ছে - পোষকের শরীরের বিশেষ সব বৈশিষ্ট্য, রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা, রোগের চিকিৎসার ধরণ, ওষুধের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে স্বতন্ত্রভাবে বিবর্তন ঘটে চলেছে এই ভয়াবহ ভাইরাসগুলোর! কখন, কিভাবে, কোন আকস্মিক মিউটেশনের ফলশ্রুতিতে ভাইরাসগুলোর কিরকম বিবর্তন ঘটবে তা আগে থেকে বলা মুশকিল। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, প্রত্যেক এইডসের রোগীর পরিস্থিতি এবং তার দেহের ভিতরে এইচআইভি ভাইরাসের বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করে তারপর বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন ধরনের ওষুধের আবিষ্কার করতে হবে, তবেই না এ রোগ সারানো যাবে! এখন তাহলে একবার ভেবে দেখুন তো, যে বিজ্ঞানীরা আজকে এইডস রোগের ভাইরাসের ওষুধ বের করার কাজে নিযুক্ত আছেন তাদের এই পরিস্থিতিতে নিজের মাথার চুল ছেঁড়া ছাড়া আর কিইবা করার থাকতে পারে! ওনারা কি বছরের পর বছর ধরে প্রত্যকটা রোগীকে আলাদা আলাদা করে পরীক্ষা করে প্রত্যেকের জন্য নতুন নতুন ওষুধ বানাবেন? এই জটিল সমস্যাটা সমাধানের জন্য চিকিৎসাবিদ এবং বিজ্ঞানীরা এখন দেখছেন শুধু একটি মাত্র ভ্যাক্সিন ব্যবহার না করে, অনেকগুলো ভ্যাক্সিনের ককটেল ব্যবহার করলে ঘটনা কি দাঁড়ায়; কয়েক বছর ধরে এ ধরনের ওষুধের প্রয়োগে এইডসের চিকিৎসার কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলেও শোনা যাচ্ছে। এ যেনো অন্ধের তীর ছোঁড়ার মত, কখন কোন্ তীরটা নিশানাকে ভেদ করবে, আদৌ করবে কিনা তা আগে থেকে নিশ্চিত করে বলার কোন উপায় নেই। বিজ্ঞানীরা আজকে মানুষের দেহে এইচ.আইভি ভাইরাসের এই দ্রুত বিবর্তনের প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন ধরণের ওষুধের প্রয়োগে তাদের প্রতিক্রিয়া কি হয় তা আরও ভালো করে বোঝার চেষ্টা করছেন।

বিবর্তনবাদকে গভীরভাবে বোঝা এবং তার যথাযথ প্রয়োগ ছাড়া এই মারাত্মক এইডস রোগের চিকিৎসা কি করে সম্ভব, বলুন তো? আজকে বিবর্তনবাদ বিরোধীরা যদি এই ওষুধ তৈরির কাজে নিয়োজিত হন তাহলে কোটি কোটি এইডসের রোগীর কপালে কি আছে তা তো আর বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না।

আজকে ‘বার্ড ফ্লু’ নিয়ে যে বিশ্বজোড়া মহামারীর আশঙ্কা করা হচ্ছে তার পিছনেও রয়েছে একই কারণ। এই বার্ড ফ্লুর ভাইরাসটিও খুব দ্রুত নিজেকে বদলে ফেলতে সক্ষম। আগে তারা শুধুমাত্র মুরগী বা পাখির মধ্যে রোগটির বিস্তার ঘটাতে পারতো, কিন্তু সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে যে এক ধরনের মিউটেশনের ফলে তারা ইদানীং পাখি থেকে মানুষের দেহেও রোগ বিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছে। এখন পর্যন্ত থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, তুরস্কসহ বেশ কয়েকটি দেশেই এই রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছু মানুষ মারা গেছে। বিজ্ঞানীরা ভয় পাচ্ছেন যে মিউটেশনের ফলে যদি এদের মধ্যে মানুষ থেকে মানুষের দেহে সরাসরি রোগ ছড়ানোর ক্ষমতা তৈরি হয়ে যায় তাহলে তো আর উপায়ই নেই, বিশ্বজোড়া এক ভয়াবহ মহামারী ছড়িয়ে পড়তে পারে যে কোন মুহূর্তে। আবার এ রোগের ওষুধ আগে থেকে তৈরি করে অনেকদিন রেখে দেওয়া যায় না, তাই মহামারী শুরু হওয়ার পর এই রোগের ভ্যাক্সিন তৈরি করতে লেগে যাবে প্রায় ৮ মাস,

ততদিনে হয়তো ভাইরাসগুলো বিবর্তিত হয়ে এমন একটা রূপ ধারণ করবে যে ওই ওষুধে আর কোন কাজই হবে না [৫]। ।২০০৫ সালের এক রিপোর্ট অনুযায়ী এখন আমরা জানতে পারছি যে, ১৯১৮ সালের বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া মহামারীতে যে দুই কোটি লোক মারা গিয়েছিলো তার কারণ ছিলো এই একই ভাইরাস। আকস্মিক এক মিউটেশনের ফলেই তারা হঠাৎ করে পাখির বদলে মানুষের দেহে রোগ বিস্তার করতে শুরু করে দেয় - যার ফলাফল হয়েছিলো ভয়াবহ । আজকে এই মারাত্মক জীবানুগুলোর বিবর্তনের ধারাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত ভ্যাক্সিন তৈরি করতে পারার উপরই নির্ভর করছে বিশ্বজোড়া মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়ার এক মাত্র উপায়।

কেনো ডি ডি টি দিয়ে আর ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না?

আমাদের মত দেশগুলোতে তো ম্যালেরিয়া কোন নতুন বিষয় নয়। আমরা সেই ছোটবেলা থেকেই জেনে এসেছি যে এ্যানোফিলিস নামের এক ধরণের মশার মাধ্যমেই এই ম্যালেরিয়া ছড়ায়। এই রোগের জীবাণুটা এক ধরণের পরজীবী প্রটোজোয়া (protozoa) যা রোগীর রক্তের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। ম্যালেরিয়া রোগীকে যখন এই মশা কাঁমড়ায় তখন তার মাধ্যমেই জীবাণুটা ছড়িয়ে পড়ে আবার আরেকজনের শরীরে। মশার দৌরত্ব কমাতে পারলেই যেহেতু এই রোগের বিস্তার থামানো সম্ভব তাই অনেক সময়ই ম্যালেরিয়া আক্রান্ত জায়গাগুলোতে কীটনাশক ডিডিটি পাউডার ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ডিডিটি হচ্ছে এক ধরণের মারাত্মক স্নায়বিক বিষ, মশার ঘাঁটিগুলোতে প্রথমবারের মত ডিডিটি ছড়ানোর সাথে সাথে মশার সংখ্যা এবং সেই সাথে ম্যালেরিয়ার প্রকোপও আশাতীতভাবে কমে যায়। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে কয়েক দশক আগে ভারত, বাংলাদেশসহ আমাদের এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিয়ে

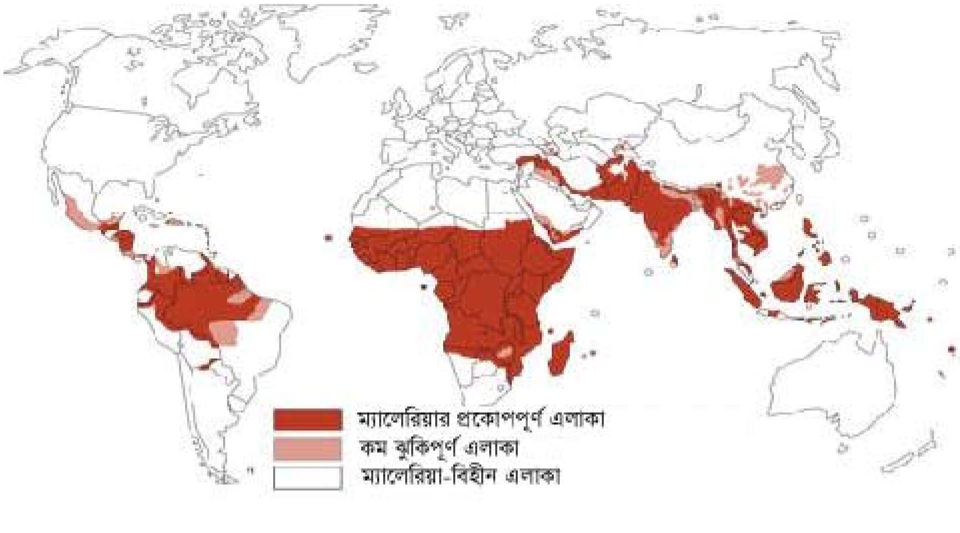

চিত্র : ৪.৩:পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার বিস্তার। সৌজন্যঃ (প্যান আফ্রিকান ম্যালেরিয়া কনফারেন্স-২০০৫)
http://www.mim.su.se/conference2005/eng/registration.html

আনা গেলেও এখন আবার নতুন করে তা ফিরে আসতে শুরু করেছে। ষাটের দশকে বিশ্বব্যাপী ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা কমিয়ে ৭৫ মিলিয়নে নামিয়ে আনা হয়েছিলো, অথচ এখন তা বেড়ে আবার ৩০০-৫০০ মিলিয়নে দাড়িয়েছে। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কেনো আবার প্রতি বছর প্রায় বিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে এই মারাত্মক রোগে? কেনো আবার নতুন করে ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ দেখা দিতে শুরু করেছে বিশ্বজুড়ে? আর কিছুই নয়, এখানেও আমরা দেখছি সেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের খেলা! যেমন ধরুণ, চল্লিশের দশকের দিকে ভারতে প্রথমবারের মত ব্যাপকভাবে ডিডিটি ব্যবহার করার পর প্রায় ১০-১২ বছর ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ এক্কেবারেই কমে গিয়েছিলো। তারপর কি হল? তারপর এক দশক বাদে দেখা গেলো, এতে আর কাজ হচ্ছে না, ডিডিটি ছড়ানোর সাথে সাথে, কয়েক মাসের মধ্যেই ডিডিটি প্রতিরোধক মশার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে অকল্পনীয়ভাবে। এখন অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, ডিডিটি ছড়ানোর সাথে সাথেই ডিডিটি প্রতিরোধক মশার পাল তৈরি হয়ে যায়। ১৯৫৯ সালের দিকে প্রথমবারের মত ভারতে এই ডিডিটি প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন মশা দেখতে পাওয়া গেলো। কিভাবে তাহলে উৎপত্তি হল এই ডিডিটি প্রতিরোধক মশার? সেই একই নিয়মে, বিবর্তনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের পথ ধরেই। সব জীবের মতই মশার মধ্যেও বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্য এবং প্রকারণ রয়েছে। সাধারণ অবস্থায় মশকপুঞ্জের মধ্যে ডিডিটি প্রতিরোধক মশা সংখ্যায় খুব কম থাকে, কোন একধরণের মিউটেশন থেকেই হয়তো এক সময় এই প্রকারনটির উৎপত্তি হয়েছিলো। সাধারন অবস্থায় ডিডিটি প্রতিরোধে অক্ষম অংশটিই প্রকৃতিতে বেশী যোগ্য হিসেবে পরিগনিত হয়, তাই তাদের সংখ্যাও থাকে অনেক বেশী। ডিডিটি ব্যবহার করার সাথে সাথেই এই অংশটি মরে যায় কিন্তু বেঁচে থাকে শুধু সেই সংখ্যালঘু মশাগুলো যাদের মধ্যে ডিডিটি প্রতিরোধক ক্ষমতা রয়েছে। আর তার ফলে যা হবার তাই হয় - গুটিকয়েক এধরণের মশাগুলোই শুধু প্রাণে বেঁচে যায় যাদের জিনের মধ্যে রয়েছে ডিডিটি প্রতিরোধক ক্ষমতা। এরাই শুধু বংশ বৃদ্ধি করে পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি করে এবং সংখ্যায় ফুলে ফেপে উঠতে থাকে। বেশ কিছু সময় পর স্বভাবতই দেখা যায় যে, মশার নতুন জনপুঞ্জের বেশীরভাগের মধ্যেই ডিডিটি প্রতিরোধক ক্ষমতা রয়েছে এবং যতই ডিডিটি ছড়ানো হোক না কেনো তাতে আর কোন কাজ হচ্ছে না।

একই রকম উদাহরণ দেখা যায় জমিতে কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও। বারবার একই ওষুধ জমিতে দিতে থাকলে বেশীরভাগ দূর্বল পোকাগুলো মরে যায় কিন্তু কীটনাশকের ক্রিয়া প্রতিরোধে সক্ষম কিছু শক্তিশালী পোকা-মাকড় রয়ে যায় বংশবৃদ্ধি করার জন্য। ব্যাকটেরিয়ার মত জমির এই পোকাগুলোও দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। অন্যদিকে ওষুধের কোম্পানীগুলোও দিন দিন আরও কড়া ওষুধ বের করতে থাকে এদেরকে দমন করার জন্য। এর ফলে একসময় দেখা যায় যে, জমিতে খুব বেশী কড়া ওষুধ প্রয়োগ করা ছাড়া আর কোন কাজই হচ্ছে না। আর অন্যদিকে যত তাড়াতাড়ি আমরা আরও জোড়ালো কীটনাশক ব্যবহার করি না কেন দেখা যায় তারা খুব কম সময়ের মধ্যেই বিবর্তিত হয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে ফেলছে। একটা মজার উদাহরণ দেওয়া যাক এখানে। নিউ ইয়র্কে প্রথমবারের মত যখন আলুর মধ্যে একধরনের গুবড়েপোকা ***কোলারাডো পটেটো বিটেল*** কে (Leptinotarsa septemlineata) মারার জন্য ডিডিটি ব্যবহার করা হয় তখন পোকাগুলোর লেগেছিলো ৭ বছর এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে। তারপর তাদেরকে দমন করার জন্য আরও শক্তিশালী azinphosmethyl যখন জমিতে ছড়ানো হল তখন তারা একে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অর্জন করে ফেললো পাঁচ বছরে। এর পরে আরও শক্তিশালী carbofuran-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করতে সময় লেগেছিলো দুই বছর, আর সম্প্রতি অত্যন্ত কড়া কীটনাশক ওষুধ pyrethroids এর বিরুদ্ধে লেগেছে মাত্র এক বছর।

এভাবে দিনের পর দিন শক্তিশালী কীটনাশক তৈরি করে আমরা আমাদের স্বাস্থ্যের এবং পরিবেশের কি পরিমান ক্ষতি করে চলেছি তা বোধ হয় ভেবে দেখার সময় হয়েছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই পোকা মাকড়, ব্যাকটেরিয়াগুলো প্রকৃতিতে যেন রাজার হালে রাজত্ব করেছে, কোন ধরনের প্রতিরোধের শিকার হয়নি, তাই তাদের বিবর্তন ঘটেছিলো অন্য নিয়মে; প্রকৃতির খেয়াল খুশী মত। এখন গত অর্ধ শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ এবং কীটনাশকের সামনে টিকে থাকার দায়ে তারা আমাদের চোখের সামনেই প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম কারণে।

ব্যাকটেরিয়াজনিত অসুখ সারানোর জন্য আমাদের প্রজন্ম অ্যান্টিবায়োটিককে একধরণের অপ্রতিরোধ্য অস্ত্র হিসেবেই ধরে নিয়েছিলো, কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার ক্রমাগত বিবর্তনের ফলে তা আজকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তা একটু ঝালিয়ে নিলে কিন্তু মন্দ হয় না। যথেচ্ছ ওষুধের ব্যবহারের পরিনতি কি হতে পারে তার এক মোক্ষম উদাহরণ হচ্ছে আমাদের চোখের সামনে ঘটা এই ব্যাকটেরিয়ার বিবর্তন।

ব্যাকটেরিয়ার বিবর্তন, অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং অপ্রতিরোধ্য ‘সুপার বাগ’

একজন ভাল ডাক্তার অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার সময় রোগীকে পই পই করে বলে দেন ওষুধের সবকটি ডোজ যেনো সে শেষ করে এবং সতর্ক করে দেন তিন চার দিন পর একটু ভালো লাগলেই ওষুধটা খাওয়া যেনো ছেড়ে না দেয়। তিন চার দিনের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক শরীরের ভিতরের বেশীরভাগ ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলে বলেই আমরা এত তাড়াতাড়ি সুস্থ বোধ করতে থাকি। এখন যদি হঠাৎ করে কেউ ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দেয় তাহলে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী এবং অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি অনেক বেশী প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন বাকী ব্যাকটেরিয়াগুলো আমাদের শরীরের ভিতরে রয়ে যাবে। এরাই তারপর বংশবৃদ্ধি করবে এবং পরবর্তী প্রজন্মের ব্যাকটেরিয়ায় তাদের জিনই প্রবাহিত হবে (ব্যাকটেরিয়া কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বংশবৃদ্ধি করে)। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা যাবে যে সেই রোগী আবার নতুন করে অনেক বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং এইবার আগের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ওষুধেও আর কাজ হচ্ছে না। প্রথমবার সবটুকু ওষুধ খেলে হয়ত সবগুলো ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলা সম্ভব হত, এখন হঠাৎ করে ওষুধটা খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার ফলে শুধুমাত্র ওষুধ প্রতিরোধকারী শক্তিশালী ব্যাকটেরিয়াগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা হলো।

একই পরিণতি লক্ষ্য করা যায় যখন ফ্লু বা ঠান্ডা লাগলে আমরা ডাক্তারকে *টেট্রাসাইক্লোন* জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার জন্য জোড়াজুড়ি করতে থাকি। ইনফ্লুয়েনজা বা ঠান্ডার কারণ ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া নয়; আর অ্যান্টিবায়োটিক শুধুমাত্র ব্যকেটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এর কোন ভুমিকাই নেই। ফ্লু বা ঠান্ডার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক তো কোন কাজে লাগেই না, বরং আমাদের শরীরের ভিতরের দুর্বল ব্যাকটেরিয়াগুলোকে মেরে ফেলে শক্তিশালী কিছু ব্যাকটেরিয়াকে জিইয়ে রাখতে সহায়তা করে। তারপর ক্রমশঃ অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি অনেক বেশী প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন এই

ব্যাকটেরিয়াগুলো আমাদের শরীরে বংশবৃদ্ধি করে এবং ভবিষ্যতে অসুস্থ হলে আরও কড়া অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া কোন কাজ হয় না। বাংলাদেশের অনেক ডাক্তারই যে কোন অসুখের চিকিৎসায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে অ্যান্টিবায়োটিক এবং একাধিক ওষুধ দিয়ে থাকেন। যেনো ভাবটা হচ্ছে, একটা না একটা ওষুধ তো কাজ করবেই। কিন্তু এর ফলে রোগীর শরীরে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং ভবিষ্যতে রোগ সারানোর জন্য অনেক কড়া ওষুধের প্রয়োজন হয়।

এতো গেলো একটা দিক, এরই আরেকটা ভয়াবহ দিক নিয়ে বিজ্ঞানীরা আজকাল বেশ দুশ্চিন্তায়ই পড়তে শুরু করছেন বলেই মনে হয়। আপনারা সুপারম্যান, সুপার গার্লের সিনেমা দেখছেন, কিন্তু কখনও কি সুপার বাগ বা সুপার ব্যাকটেরিয়ার নাম শুনেছেন? গত অর্ধ শতাব্দী ধরে অ্যন্টিবায়োটিকের ব্যাপক ব্যবহার যেমন লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে তেমনিভাবে তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে আজকে দেখা দিচ্ছে ’সুপার বাগ’। এমন কিছু ব্যাকটেরিয়ার উৎপত্তি হয়েছে যাদের উপর আজকের সবচেয়ে কড়া অ্যান্টিবায়োটিকটাও আর কাজ করছে না। আমরা যত শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করছি, ততই পাল্লা দিয়ে তারা বিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি ঘটে অত্যন্ত দ্রুত, তাদের মিউটেশনের হারও অত্যাধিক আর তার ফলে তাদের মধ্যে বিবর্তন ঘটতে থাকে অকল্পনীয়ভাবে দ্রুত গতিতে। মানুষের সাথে তুলনা করলে বোঝা যায় কত তাড়াতাড়ি ব্যাকটেরিয়ার বিবর্তন ঘটছে। শিকাগো ইউনিভারসিটির প্রফেসর রবার্ট ডম একবার বলেছিলেন ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে যে বিবর্তন ঘটতে লাগে ২০ মিনিট মানুষ প্রজাতিতে সেই বিবর্তন ঘটতে লাগে ২০ বছর [৬]।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মেই অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার জন্য মিউটেশনের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়ে তারা আজকে এমন অবস্থায় পৌছেছে যে, তারা সব ধরনের ওষুধই প্রতিরোধ করে টিকে থাকতে পারে। জানা গেছে, Staphylococcus aureus নামের ব্যাকটেরিয়াটি এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক Vancomycin এর বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে। ডিসকভারি পত্রিকার বিশেষ এক প্রতিবেদনে (Vol 27, No1) দেখা যাচ্ছে যে, ইরাকে যুদ্ধরত প্রায় ৩০০ আমেরিকান সৈন্যের মধ্যে ২০০৩ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে এক ধরণের ব্যাকটেরিয়া জনিত ইনফেকশন দেখা দিয়েছে যা কোন প্রচলিত ওষুধ দিয়েই সারানো যাচ্ছে না, এই ব্যাকটেরিয়াগুলো বিবর্তিত হয়ে অ্যন্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে এতখানিই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে যে ডাক্তাররা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন এদের চিকিৎসা করতে। ইতিমধ্যেই ৫ জন সৈন্য মৃত্যবরণ করেছে এই রোগে। ডাক্তাররা ভয় পাচ্ছেন যে জীবাণুগুলোর খুব দ্রুত বিবর্তনের কারণে হয়তো খুব তাড়াতাড়িই আমরা এদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবো।

যে টিবি রোগকে পৃথিবী থেকে নির্মুল হয়ে গিয়েছিলো বলে আমরা ধরে নিয়েছিলাম তা এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুরো দমে ফিরে এসেছে, রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় এখন নতুন করে টিবি রোগের উৎপাত শুরু হয়েছে, যার উপর আগের কোন অ্যান্টিবায়োটিকই আর কাজ করছে না। ডাক্তাররা এখন রোগীর ফুসফুসের আক্রান্ত টিস্যুগুলোকে কেটে ফেলে দিয়ে রোগ নিরাময়ের চেস্টা করছেন। আজকে আমেরিকার বিভিন্ন হাসপাতালে এমন কিছু ব্যাকটেরিয়া দেখা দিয়েছে যাদের মধ্যে সবচেয়ে কড়া অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখা দিয়েছে। হাসপাতালগুলোতে স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে বেশি অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়, ফলে সেখানে ব্যাকটেরিয়াগুলোও বিবর্তিত হয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করতে থাকে। আজকে হাসপাতালগুলোতে রোগীরা এক রোগ নিয়ে আসছেন আর

হাসপাতাল থেকেই আক্রান্ত হচ্ছেন আরেক ধরনের এই অপ্রতিরোধ্য ব্যাকটেরিয়া দিয়ে।

> বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন কামান গোলার মত অ্যান্টিবায়োটিককে অস্ত্র হিসেবে যত্রতত্র ব্যবহার না করে বরং এখন আমাদের প্রয়োজন বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং অন্যান্য জীবাণুর বিবর্তনের গতিটাকে ঠিক মত বোঝা এবং বিশ্লেষণ করা। তার উপর ভিত্তি করে পরিবেশের দূষণ কমানো, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করা ইত্যাদির মাধ্যমে একসময় হয়তো আমরা এদের বিবর্তনের গতিটাকেই ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হতে পারি। তখন হয়তো দেখা যাবে এই জীবাণুগুলোর ক্ষতিকর দিকটা বিবর্তিত হয়ে এতখানিই কমে গেছে যে, এরা আর মানুষের প্রাণহানির কারণ হতে পারছে না [৭]।

ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত আফ্রিকায় কেনো ভয়াবহ সিকেল সেল (Sickle Cell) রোগের জিনের ছড়াছড়ি?

আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে যে সিকেল সেল এ্যনেমিয়া (রক্তাল্পতা) রোগের বিষম প্রকোপ দেখা যায় তার সাথে ম্যলেরিয়া রোগের একটা আশ্চর্যরকম সম্পর্ক রয়েছে। আসুন দেখা যাক প্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এধরণের চাক্ষুষ উদাহরণগুলো কিভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মুলনীতিটাকে আমাদের সামনে তুলে ধরছে।

আফ্রিকা এবং ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সিকেল সেল এ্যনেমিয়া নামের এই ভয়াবহ রোগটার কারণ আর কিছুই নয়, মানুষের শরীরে একধরণের ত্রুটিপূর্ণ হিমগ্লোবিনের কারণে এই রোগের উৎপত্তি ঘটে এবং তারপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। হিমগ্লোবিন নামের এই জটিল অনুটির সাহায্যেই আমাদের রক্তের ভিতরের লোহিতকনিকাগুলো (red blood cells) শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন সরবরাহ করে। চারটি পাকানো পলিপেপটাইড চেইনের সমন্বয়ে একটি হিমোগ্লোবিন কণার সৃষ্টি হয় - তার মধ্যে দুটি আলফা চেইন এবং আর অন্য দুটি হচ্ছে বেটা চেইন। প্রত্যেকটি আলফা চেইনের মধ্যে ১৪১ টি এমাইনো এসিড আর প্রত্যেকটি বেটা চেইনের মধ্যে ১৪৬ টি এমাইনো এসিড থাকে, অর্থাৎ আমাদের একটি হিমোগ্লোবিন কণার মধ্যে ৫৭৪ টি এমাইনো এসিড থাকে । সুস্থ হিমোগ্লোবিন 'A' এবং সিকেল সেল হিমোগ্লোবিন 'S' এর মধ্যে গঠনগত পার্থক্য খুবই সামান্য; বেটা চেইনের ভিতরে গ্লুটামিন (Glutamin) নামের এমাইনো এসিডটি 'ভ্যালিন' (Valine) নামক এমাইনো এসিড দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে গেলেই অসুস্থ এই হিমোগ্লোবিনের উৎপত্তি হয়। হ্যা, ব্যাপারটা একটু গোলমেলেই বটে! ৫৭৪ র টির মধ্যে মাত্র একটা এমাইনো এসিড বদলে গেলেই কি এক ভয়াবহ রোগের জন্ম হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেহে! সিকেল সেল হিমোগ্লোবিনগুলো রক্তের ভিতরের লোহিতকনিকাকে বিকৃত করে ফেলে, সাধারণ অবস্থায় এরা দেখতে চাকতির মত হলেও এই রোগের ফলে তারা কাস্তের মত আকার ধারণ করে বসে। আর গোল বাঁধে সেখানেই। এই বিকৃত আকারের লোহিতকনিকাগুলো ছোট ছোট রক্তনালীগুলোর মুখ আটকে দেয়। আর আমাদের শরীর তখন প্রতিক্রিয়া হিসেবে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে

এই অস্বাভাবিক কোষগুলোকে ধ্বংস করে দিতে শুরু করে এবং তার ফলশ্রুতিতেই রোগীর শরীরে রক্তাল্পতা (Anemia) দেখা দেয়। সিকেল সেল এনেমিয়ায় আক্রান্ত কোষগুলো মাত্র ৩০ দিন বেঁচে থাকে, যেখানে রক্তের সুস্থ লোহিতকনিকাগুলো বেঁচে থাকে ১২০ দিন। অ্যানেমিয়ার কারণে এই রোগে আক্রান্ত শিশুরা খুব সহজেই বিভিন্ন ধরণের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে [৮]।

আমরা জানি যে, আমাদের দেহ কোষে প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের জন্য যে দুটি করে জিন রয়েছে তার একটি আসে মার কাছ থেকে আর আরেকটি দেয় বাবা। যারা বাবা এবং মা দুজনের কাছ থেকেই সিকেল সেলে আক্রান্ত হিমোগ্লোবিনের জিন পায় তারাই এই রোগ নিয়ে জন্মায় এবং শিশু বয়সেই মৃত্যুবরন করে। আর যাদের মধ্যে একটি স্বাভাবিক জিন এবং আরেকটি অসুস্থ জিন থাকে তাদের মধ্যে এই রোগের বৈশিষ্ট্য থাকলেও তা সব সময় চোখে ধরা পরে না বা এত চরম আকার ধারণ করে না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এরা সুস্থভাবে জীবন যাপন করে, শুধুমাত্র কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে এ্যনেমিয়ার লক্ষণ দেখা যায়। পশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকায় প্রচুর সিকেল সেল এ্যানেমিয়ার রুগী দেখা যায়, এমনকি এমনও দেখা গেছে কোন কোন গোষ্ঠীর শতকরা ৩০% লোকই এই রোগে আক্রান্ত। বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানীরা স্বভাবতই প্রশ্ন করলেন, কেমন করে একটা জনপুঞ্জের মধ্যে এরকম মারাত্মক একটি বিকৃত জিন এত বেশী হারে টিকে থাকতে পারলো? প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মে কি এর অনেক আগেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল না? আর এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ এক তথ্য আবিষ্কার করলেন।

ভৌগলিকভাবে সিকেল সেল এনেমিয়ার জিনের বিস্তৃতির প্যাটার্নটা খেয়াল করলে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করা যায় - যে যে এলাকায় এই রোগটি দেখা যায় ঠিক সেই সেই এলাকায় এবং তার আশে পাশে ম্যালারিয়া রোগেরও প্রকোপটাও বড়ডো বেশী। দীর্ঘদিনের চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণা থেকে দেখা গেলো যে, যাদের কোষের মধ্যে মাত্র একটি সিকেল সেল এ্যনেমিয়ার জিন থাকে (আরেকটি সুস্থ জিন) তাদের ম্যালেরিয়া প্রতিরোধকারী ক্ষমতা দুটি সুস্থ জিনের অধিকারী লোকদের চেয়ে অনেক বেশী। কি অদ্ভুত না ব্যাপারটা? কোন একসময় কোন এক মিউটেশনের ফলশ্রুতিতে হয়তো আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে এই বিকৃত

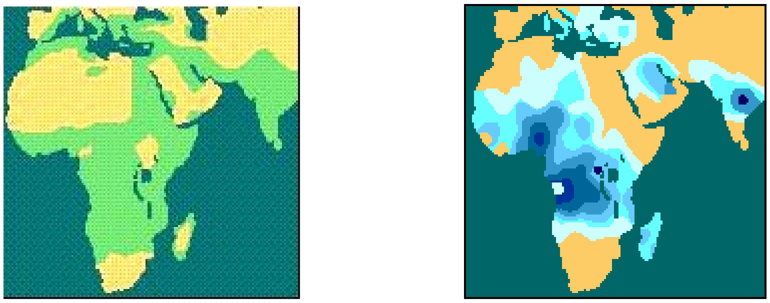

চিত্র ৪.৪ : প্রথম ছবিতে আফ্রিকা, ইওরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার বিস্তার দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় ছবিতে নীল রং দিয়ে দেখানো হয়েছে সিকেল সেল এনেমিয়া রোগের বিস্তার, নীল রং যত বেশী গাঢ়ো ততই প্রকোপ বেশী সেখানে এই রোগের।
(সৌজন্যঃ http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/history_19)

জিনটা ছড়িয়ে পড়েছিলো। প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম মেনে দেখা গেলো, যে অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ

বেশী সেখানে সিকেল সেল এনেমিয়ার একটা জিন ধারণকারী লোকের টিকে থাকার ক্ষমতাও বেড়ে যাচ্ছে, কারণ হিমোগ্লোবিনের এই রোগ বহনকারী জিনটা ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধে বেশী কার্যকরী ভুমিকা রাখতে পারছে। অন্যদিকে যাদের মধ্যে দুটিই সুস্থ জিন রয়েছে তারা ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে অনেক বেশী হারে। তাহলে এখন প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মে এখানে কি ঘটার কথা? হ্যা, এই ত্রুটিপূর্ণ জিনবহনকারী মানুষগুলোই শেষ পর্যন্ত ম্যালেরিয়া রোগের চোখ রাঙানীকে উপেক্ষা করে বেশীদিন টিকে থাকতে পারছে এবং বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে। তার ফলে যা হবার তাই হল, টিকে থাকার দায়েই শত শত প্রজন্ম পরে দেখা গেলো আফ্রিকাবাসীদের একটা বিশাল আংশের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে বিকৃত সিকেল সেল এনেমিয়ার জিন। কি চমৎকার একটি উদাহরণ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা বিবর্তন তত্ত্বের!

> *বিবর্তনের মাধ্যমে কোটি কোটি বছরের বিভিন্ন রকমের এবং মাপের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যদি আমাদের উৎপত্তি না হত তাহলে এ ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলোর কোন অর্থই থাকতো না। একজন বুদ্ধিদীপ্ত সৃষ্টিকর্তা কেনো এরকম হাজারো দুর্বলতা, বিকৃতি এবং গোঁজামিল দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে তৈরি করতে যাবেন? কেনো তাকে এক রোগ সারাতে গিয়ে জন্য আরেক রোগের বীজ পুরে দিতে হবে শরীরে? কাজেই মানুষের কল্পনায় সৃষ্টি আলৌকিকত্ব দিয়ে নয়, বরং একমাত্র বিবর্তনবাদের মাধ্যমেই এই ধরনের ঘটনাগুলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, প্রকৃতিতে এধরনের হাজারো ঘটনা রয়েছে যা প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্ব বা 'ইনটেলিজেন্ট ডিজাইন' তত্ত্ব দিয়ে কোনভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।*

এতক্ষণ আমরা দেখলাম বিভিন্ন ধরণের মাইক্রো বিবর্তনের (microevolution) উদাহরণ যেখানে প্রজাতির ভিতরেই বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটছে। এরকম হাজারটা উদাহরণ রয়েছে আমাদের চোখের সামনেই। আমরা আগের অধ্যায়ে দেখছি যে, ভৌগলিকভাবে একটা প্রজাতির কিছু অংশ আলাদা হয়ে গেলে তাদের মধ্যে এধরণের ছোট ছোট পরিবর্তনগুলো জমতে জমতে একসময় এমন অবস্থায় দাঁড়ায় যে তারা আগের সেই বিচ্ছিন্ন অংশের থেকে এক্কেবারেই আলাদা প্রজাতিতে পরিণত হয়। তখন চাইলেও আর আগের জাতভাইদের সাথে মানে আগের স্বজাতীয় প্রানীগুলোর সাথে তাদের অন্তঃপ্রজনন আর সম্ভব হয় না; ফলে একই প্রজাতির দুই দল সম্পুর্ণ দুটি আলাদা প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই রকম অবস্থা থেকেই ঘটে মাইক্রোবিবতনের 'বড়দা' macroevolution বা ম্যাক্রো-বিবর্তন। ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা ছাড়াও নতুন প্রজাতি তৈরি হতে দেখা গেছে, এমনকি বিজ্ঞানীরা ল্যবরেটরিতে নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ এবং প্রাণী তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন, ডবঝানস্কি এবং পাভলভস্কি ১৯৭১ সালে ড্রসোফিলা নিয়ে অন্তরনের পরীক্ষার মাধ্যমে ড্রসোফিলার ভিন্ন একটি প্রজাতি উদ্ভাবনে সমর্থ হয়েছিলেন [৯]। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পলিপ্লয়ড, এলোপলিপ্লয়ডের মাধ্যমে ল্যাবরেটরীতে কোয়ান্টাম প্রজাতি তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। বৈজ্ঞানিক জার্নালগুলোতে এ ধরনের সফল পরীক্ষার অনেক উদাহরণ আছে [১০]।

বস্তুতঃ বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ আজ এতোই বেশী যে সেগুলোকে অস্বীকার করার অর্থ অনেকটা পৃথিবীর গোলত্বকে অস্বীকার করার মতই। বিবর্তনের পক্ষে যে সমস্ত সাক্ষ্য হাজির করা যায় তা হল : প্রাণ রাসায়নিক প্রমাণ, কোষবিদ্যা বিষয়ক প্রমাণ, শরীরবৃত্তীয় প্রমাণ, সংযোগকারী জীবের (connecting link) প্রমাণ, ভৌগলিক বিস্তারের (Geographical distribution) প্রমাণ, তুলনামূলক অঙ্গসংস্থানের প্রমাণ, শ্রেনীকরণ সংক্রান্ত প্রমাণ, নিষ্ক্রিয় বা বিলুপ্তপ্রায় অঙ্গের প্রমাণ ইত্যাদি। আর ফসিল থেকে পাওয়া হাজারো সাক্ষ্য-প্রমাণ তো আছেই। আজকে সরীসৃপ থেকে কিভাবে পাখী বিবর্তিত হয়েছে তারও প্রায় সম্পূর্ণ ধাপগুলো পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে মাছ থেকে উভচর, উভচর থেকে সরীসৃপ, সরিসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিবর্তনের মধ্যবর্তী ধাপগুলোও। বিশেষ করে সরিসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী জীবে বিবর্তনের সম্পূর্ণ ধাপগুলো আজকে খুব ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত; মধ্যবর্তী ধাপগুলো এতোই পরিস্কার যে বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত দ্বিধায় পড়ে যান এই ভেবে যে এগুলোকে 'mammal-like reptile' বলবেন নাকি 'reptile-like mammal' বলবেন [১১]। Synapsids, Therapsida, Cynodonta থেকে শুরু করে আদি স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্যন্ত সবগুলো ধাপের একাধিক ফসিল পাওয়া গেছে। এমনকি তাদের চোয়াল কিভাবে ধাপে ধাপে বিবর্তিত হয়ছে সেগুলোও ফসিল থেকে উদ্ধার করা গেছে [১২]।

বিজ্ঞানীরা কেবল ফসিলের উপরেই নির্ভর করে বসে নেই, তারা প্রাণীদেহে ম্যাক্রো-বিবর্তনের জন্য দায়ী একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিন খুঁজে বের করেছেন যার নাম Ubx complex। এডোয়ার্ড লিউস এর জন্য ১৯৯৫ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই Ubx জিন আসলে বহুল-খ্যাত Hox জিনের একটি। এই জিনগুলোই আসলে প্রাণীদেহের কাঠামোর নিরব পরিকল্পনাকারী। এ জিনগুলোই বলে দিচ্ছে একটি মাছির কয়টি পাখা থাকবে আর মাকড়শার কয়টি পা থাকবে। এগুলো সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ফ্রুট-ফ্লাই-এ, পরে সেগুলো মাছ, ব্যাঙ কিংবা মানুষেও সমান গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে সনাক্ত করা হয়। এগুলোর সামান্য অদলবদলেই বাহ্যিক গঠনে যে বিপুল পরিবর্তন করা সম্ভব তা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আজ নিশ্চিত (এ বইয়ের পরিশিষ্টে এ নিয়ে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে)। আসলে জীববিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞান, জেনেটিক্স এবং আনবিক জীববিদ্যার কোন শাখাই বিবর্তনের কোন সাক্ষ্যের বিরোধিতা তো করছেই না, বরং যত দিন যাচ্ছে বিবর্তনের ধারাটি সবার কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে; বিবর্তনতত্ত্ব দিন দিন হয়ে উঠছে এক কথায় অপ্রতিরোধ্য।

বিবর্তনবাদ বিরোধীরা প্রায়ই বলে থাকেন যে, মাইক্রো-বিবর্তন ঘটতে দেখা গেলেও ম্যাক্রো-বিবর্তন নাকি কখনই দেখা যায়নি - মজার ব্যাপার হচ্ছে তাদের অন্যান্য প্রচারণাগুলোর মতই এটাও একেবারেই উদ্দেশ্যপ্রনোদিত এবং মিথ্যা। চলুন তাহলে এবার এধরণের কিছু উদাহরণ নিয়েই আলোচনা করা যাক। কোন জীবের চারিদিকের পারিপার্শ্বিকতা, বংশবৃদ্ধির এবং মিউটেশনের হার ও গতি প্রকৃতি, জিনপুলের প্রভাব ইত্যাদির অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে এই ম্যাক্রো-বিবর্তন ঘটবে কি ঘটবে না। সাধারণত আমাদের এক জীবনকালের সীমিত সময়ের মধ্যে এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির বিবর্তন ঘটতে দেখা যায় না। এটা ঘটতে হাজার, লক্ষ বা কোটি বছরও লেগে যেতে পারে। কিন্তু কখনো কখনো প্রকৃতিতে কোন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খুব দ্রুতও ঘটে যেতে পারে এই বিবর্তন প্রক্রিয়া। বিজ্ঞানীরা একটু অবাকই হয়েছিলেন প্রথমে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন যে, বিবর্তন দ্রুত, অত্যন্ত দ্রুত, ধীরে বা অত্যন্ত ধীরে - সব ভাবেই ঘটতে পারে। এ প্রসঙ্গে ডঃ রিচার্ড ডকিনসের সাম্প্রতিক মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য

: "Evolution, for instance, normally takes too long to make an impact within a human lifespan....... The amazing thing is how alarmingly fast evolution can sometimes go, when conditions are right. Let's hope bird flu won't turn out to be an example."

আগের লেখাগুলোতে বিভিন্ন ধরণের মাইক্রো বিবর্তনের উদাহরণ দেখেছি আমরা, এখন চলুন ম্যাক্রো বিবর্তনের কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

উদ্ভিদের নতুন নতুন প্রজাতি তৈরি হচ্ছে অহরহ

আমাদের চোখের সামনে প্রাকৃতিকভাবে মিউটেশনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উদ্ভবের ঘটনাটা একটু বিরলই বটে। তবে এধরনের ঘটনা যে একেবারে ঘটেই না তাও নয়। বিজ্ঞানীরা গত একশো বছরে বেশ কিছু উদ্ভিদের মধ্যে এধরণের নতুন প্রজাতি তৈরির ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন। আর ল্যাবরেটরিতে নতুন ধরনের আরও উন্নত ফলনশীল ধান, গম বা ভুট্টার প্রজাতি তৈরির ঘটনা তো হরহামেশা আমরা খবরের কাগজেই দেখতে পাই।

১৯১০-১৯৩০ এর মধ্যে আমেরিকার ওয়াশিংটন এবং আইডাহো স্টেটে স্যালসিফাই নামে অনেকটা মুলার মত দেখতে এক ধরণের খাদ্যযোগ্য মুলের গাছের তিনটি প্রজাতির (Tragapogon dubius, Tragapogon pratensis, Tragapogon porrifolius) চাষ শুরু করা হয়। এর আগে আমেরিকায় স্যালসিফাই এর কোন অস্তিত্বই ছিলোনা, এদেরকে ইউরোপ থেকে এনে প্রথমবারের মত এখানে বোনা হয় [১৩]। ১৯৫০ সালের দিকে বিজ্ঞানীরা আবাক হয়ে দেখলেন, তিনটি তো নয়, পাঁচ ধরণের স্যালসিফাই দেখা যাচ্ছে মাঠে! তাহলে এই নতুন দু'ধরণের প্রজাতি এলো কোথা থেকে? এরা তো ইউরোপ থেকে আনা প্রথম তিনটি প্রজাতির সাথেও প্রজননেও সক্ষম নয়, তাহলে কি এখানে সম্পুর্ণ দু'টি নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে এই কয়েক দশকের মধ্যেই? - ব্যাপারটা আসলেই তাই, বিস্মিত বিজ্ঞানীরা নিজের চোখে দেখলেন প্রকৃতিতে নতুন প্রজাতি সৃষ্টির ঘটনা। প্রথম তিনটি প্রজাতি থেকে পলিপ্লয়ড সংকরায়নের (poliploid hybridization) ফলে দুটি নতুন প্রজাতির জন্ম হয়েছে। আমরা জানি যে, সাধারণত সন্তানেরা তাদের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য বাবা এবং মার প্রত্যেকের থেকে একটি করে ক্রোমজোম পেয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটছে একটু গোলমেলে ভাবে। মিউটেশনের ফলে নতুন প্রজাতিগুলোর মধ্যে মা বাবার দুজনের থেকেই এক সেটের বদলে দুই সেট করে ক্রোমজোম এসেছে। এর ফলে এরা নিজেদের মধ্যে প্রজননে সক্ষম হলেও মা বাবার প্রজাতির স্যালসিফাই এর সাথে আর প্রজনন করতে পারছে না। তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, এখানে মিউটেশনের ফলশ্রুতিতে সম্পূর্ণ দুটি নতুন প্রজাতির জন্ম হয়েছে প্রাকৃতিকভাবে আমাদের চোখের সামনেই। গত কয়েক দশকে জেনেটিক্সের অভূতপূর্ব আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীরা এই নতুন প্রজাতিগুলোর ডিএনএ-র কোথায় কিভাবে এই মিউটেশনগুলো ঘটেছিলো তার সম্পূর্ণ চিত্রটি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন আমাদের সামনে ।

আমরা এখন কৃত্রিমভাবে পলিপ্লয়েড সংকরায়ন সহ অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের সংকরায়নের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ তৈরি করতে সক্ষম। আমাদের বাগানে যে সব ডালিয়া, টিউলিপ বা আইরিস ফুলের সমারোহ দেখা যায় তাদের বেশিরভাগ প্রজাতিকেই কিন্তু কোন না কোন সময় কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ধরণের ফসলের উদ্ভিদও তৈরি করা হচ্ছে এ নিয়মে। প্রকৃতিতেও, বিশেষ

করে উদ্ভিদের মধ্যে, এই পলিপ্লয়েড সংকরায়নের প্রচুর উদাহরণ দেখা যায়।

এক জেনারেশনেই কি বিবর্তন সম্ভব?

বিজ্ঞানীরা তো আজকে সেটাই বলছেন - বলছেন, প্রাণীর বিবর্তনের পদ্ধতিকে খুব জটিল এবং দীর্ঘ মেয়াদী হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। কোন কোন সময় এক জেনারেশনে কিংবা শুধুমাত্র একটি জীনের পরিবর্তনের ফলেই বিবর্তন ঘটে যাওয়া সম্ভব, এবং তারা তা ইতোমধ্যে প্রকৃতিতে এবং ল্যাবরেটরিতে প্রমাণও করে ছেড়েছেন। স্টিকেলব্যাক (sticlebacks) বলে এক ধরণের মাছ আছে, এদের বিভিন্ন প্রজাতিকে সমুদ্রের লোনা পানি এবং নদীর মিঠা পানিতেও সমানভাবে দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীদের মতে মাত্র হাজার দশেক আগে, সর্বশেষ বরফ যুগের শেষে, যখন পানির উচ্চতা বেড়েগিয়েছিলো তখনই তাদের একটা অংশ সমুদ্র থেকে নদীতে গিয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে নদীর পানির নতুন পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হয়ে যায়। সমুদ্রের মাছগুলোর গায়ে ৩৫টি বাড়তি প্লেটের মত হাডডি বা কাঁটার স্তর দেখা যায়, যা দিয়ে তারা নিজেদেরকে ভয়ঙ্কর সব সামুদ্রিক শিকারী প্রাণীর দাঁতালো আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু নদীতে বাস করা স্টিকেলব্যাকের প্রজাতিগুলোর জন্যে তো আর নিজের দেহে এত ভারী ভারী যুদ্ধাস্ত্র বয়ে বেড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই। তাই তারা বিবর্তনের প্রক্রিয়ায়ই অভিযোজিত হয়ে এই অপ্রয়োজনীয় স্তরটা থেকে রেহাই পেয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বের

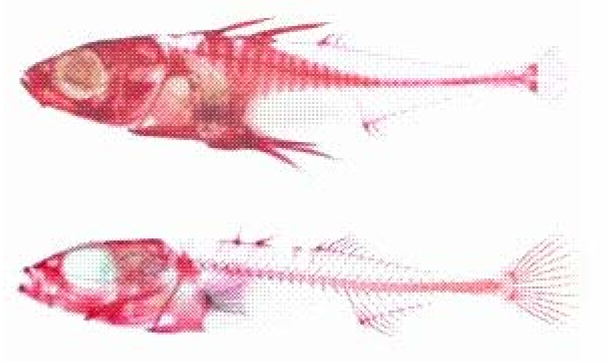

চিত্র ৪.৫: সামুদ্রিক(উপরে) এবং নদীর (নীচে) স্টিকেলব্যাকের গঠন
(সৌজন্যঃ http://www.sciencedaily.com/releases/2005/03/050325224057.htm)

করেছেন যে, এই বিবর্তনের পিছনে কাজ করছে Pitx1 gene নামে একটি মাত্র জিন। গত বছর বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলেন যে, সমুদ্র থেকে নদীর পানিতে মাছগুলোকে স্থানান্তরিত করা হলে তারা নাকি এক জেনারেশনেই এই বিবর্তনটা ঘটিয়ে ফেলতে পারে, এই বাড়তি স্তরটি আর থাকে না তাদের পরের প্রজন্মে। শুধু তাই নয়, আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে যে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভারসিটির জেনেটিসিস্ট ডঃ কিংসলির দলটি আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তা হাতে নাতে পরীক্ষা করেও দেখিয়ে দিয়েছেন। তারা এই বিশেষ জিনটিকে সমুদ্রের মাছের কোষ থেকে আলাদা করে নদীর মাছের ডিমের মধ্যে ইঞ্জেকশেন দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এই ডিম থেকে বের হওয়া মাছের পোনার মধ্যে ঠিকই বাড়তি কাঁটার স্তরটা

জন্ম লাভ করেছে যা তাদের পূর্ব প্রজন্মে ছিলো না।

> বিজ্ঞানীরা একটু অবাকই হয়েছেন প্রকৃতিতে বিবর্তনের এত সহজ এবং দ্রুত একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পেরে, এত বড় একটা পরিবর্তনের জন্য যে মাত্র একটা জীনই দায়ী হতে পারে তাও তারা আশা করেননি। তারা এখন বলছেন যে, প্রকৃতিতে হয়তো খুব খুব সরল উপায়েও বিবর্তন ঘটে এবং তা খুব সহজেই খুঁজে বের করা সম্ভব[১৪]।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ানের দু'পাড়ের কাঁঠবিড়ালীগুলো কিভাবে বদলে গেলো?

আমেরিকার গ্রান্ড ক্যানিয়ানেও দু ধারে খুব কাছাকাছি দেখতে দ'ূপ্রজাতির কাঠ বিড়ালী বা স্কুইরেল দেখা যায়। তারা দেখতে শুনতে ব্যবহারে প্রায় এক রকম হলেও একে অপরের সাথে প্রজননে অক্ষম। এই প্রকান্ড এবং দুর্ভেদ্য গিরিখাতের দক্ষিণ দিকের কালো পেট আর সাদা লেজ সহ প্রজাতিটির নাম হচ্ছে *কাইবাব* কাঠবিড়ালী আর উত্তর দিকের সাদা রং এর পেট এবং ধুসর রং এর লেজ সহ প্রজাতিটার নাম হচ্ছে *অ্যাবার্ট* কাঠবিড়ালী। সর্বশেষ বরফ যুগে গ্রান্ড ক্যানিয়ানের পরিবেশ এবং গাছগাছালিতে বিশাল পরিবর্তন ঘটে যায়। এর আগে কিন্তু তারা একই প্রজাতিই ছিলো এবং এক ধরনের বিশেষ পাইন গাছের কান্ড খেয়েই এরা বেচে থাকে। কিন্তু বরফযুগে গিরিখাতের মাঝখানের সমস্ত পাইন গাছ ধ্বংস হয়ে গেলে তাদের মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়, তারা হয়ে পড়ে ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন। আর তার ফলশ্রুতিতেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় তাদের বিবর্তন ঘটতে থাকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে, ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন নিয়মে। দীর্ঘ দিন ধরে স্বতন্ত্র ধারায় বিবর্তনের ফলে তারা আজকে সম্পুর্ন দু'টি ভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এরকমই একটা উদাহরণ দেখেছিলাম গ্যালাপ্যগাস দ্বীপপুঞ্জে ডারউইনের দেখা বিভিন্ন প্রজাতির ফিঞ্চদের মধ্যে। প্রায় ৫ লাখ বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এক ধরণের ফিঞ্চ পাখি থেকে এখন গ্যালাপ্যগাস দ্বীপপুঞ্জে ১৪ ধরণের স্বতন্ত্র প্রজাতির ফিঞ্চের জন্ম হয়েছে।

টিকটিকিগুলো এরকম রিং এর মত করে তাদের বাসা সাজালো কেনো?

আরও মজার মজার কিছু উদাহরণ রয়েছে আমাদের চোখের সামনেই। রিং বা চক্রাকার প্রজাতির উদাহরণটির কথা উল্লেখ না করলে বিবর্তনের গল্পটা যেনো অসম্পুর্ণই রয়ে যাবে। আমেরিকার দক্ষিণ পশ্চিম উপকুল এলাকা ধরে কয়েক প্রজাতির টিকটিকি (Ensatina eschscholtzii group) মিলে এধরনের একটা রিং তৈরি করেছে। গত শতাব্দীতে ডঃ রবার্ট স্টেবিনস প্রথম এদেরকে পর্যবেক্ষণ করে বলেছিলেন যে, এদের পুর্বপুরুষেরা যখন উত্তর থেকে দুই দিকে ভাগ হয়ে দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়তে থাকে (নীচের ছবিতে দেখুন) তখনই শুরু হয়েছিলো এই রিং তৈরির চক্রাকার খেলা[১৫]। তারপর যতই তারা দ'ুদিকে থেকে দুরে সরে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকলো ততই তাদের মধ্যে ভিন্ন ধারায় বিবর্তন ঘটতে শুরু করলো।

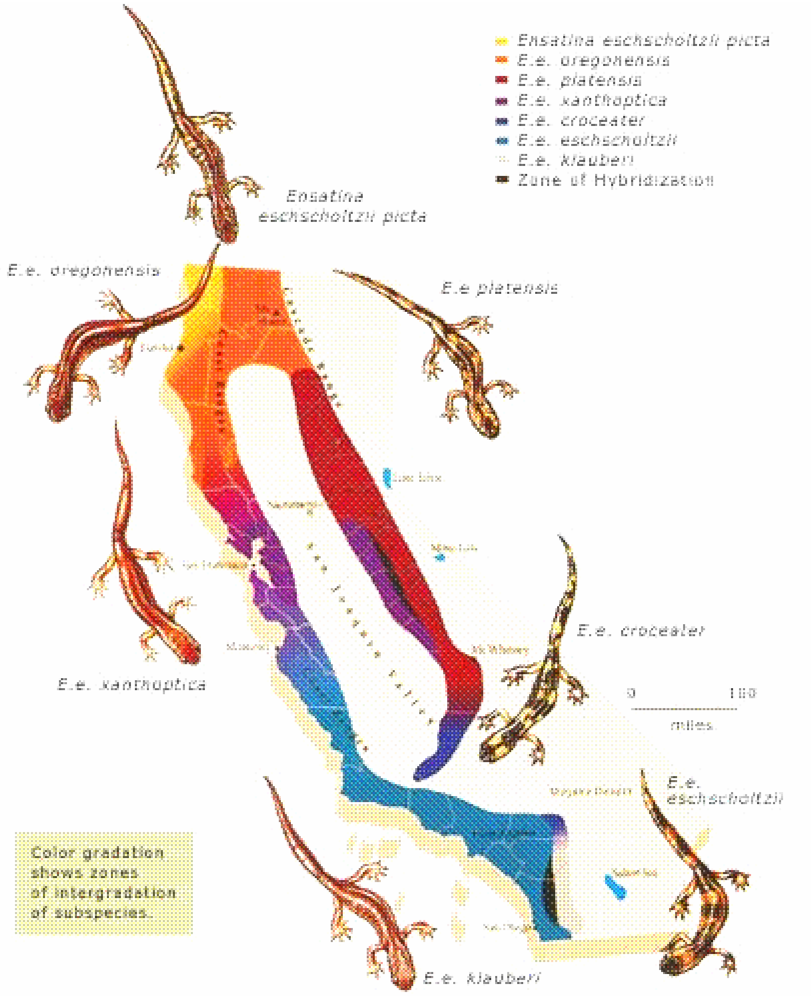

চিত্র ৪.৬: টিকটিকির চক্রাকার প্রজাতি সৃষ্টি (Ring Species of Salamanders in Western USA)
সৌজন্যঃ http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/05/2/images/l_052_05_l.jpg

তারপর দীর্ঘদিন পরে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া স্যান ডিয়াগোতে এসে যখন তারা আবার মিলিত হলো তখন ইতোমধ্যেই তারা দুটি ভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে আর প্রজনন সম্ভব হচ্ছে না । অনুজীববিদ্যা এবং ডি.এন.এ সিকোয়েন্সিং এর অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা এখন এদের জীনের বৈশিষ্ট্যগুলোও খুঁজে বের করেছেন [১৫], আর তাদের পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ডঃ স্টেবিনস ঠিকই ধরেছিলেন - ক্রমান্বয়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হতে হতেই এদের মধ্যে এক প্রজাতি থেকে বিভিন্ন প্রজাতির জন্ম হয়েছিলো। আপনি উত্তরে, রিং এর গোড়া থেকে জীনের ধারা পরীক্ষা করতে করতে যতই দু'ধার বেয়ে দক্ষিণে নেমে যেতে থাকবেন ততই দেখবেন ধারাবাহিকভাবে জীনের গঠন এবং বৈশিষ্ট্যগুলো বদলে যাচ্ছে।

এধরনের রিং প্রজাতিগুলো বিবর্তনবাদের মূল বক্তব্যকে অত্যন্ত

জোড়ালোভাবে তুলে ধরে – একদিকে তারা যেমন ক্রমান্বয়ে ঘটা বিবর্তনের

সহ-বিবর্তনের এক মজার উদাহরণ

বিজ্ঞানের চোখে একটা সুদৃঢ় তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এর সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎবানী করার ক্ষমতা। মানে, আপনার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটা যদি ঠিক হয়ে থাকে তা দিয়ে আপনি ভবিষ্যতের অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারবেন, যা হয়তো এখন চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে না। যেমন, পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আইনস্টাইন যখন সর্বপ্রথম আপেক্ষিকতার ব্যাপক তত্ত্বটি (General Theory of Relativity) প্রকাশ করলেন, তখন সেতত্ত্বের মধ্যেই কিন্তু লুকিয়ে ছিলো মহাবিশ্বের প্রসারণের সম্ভাবনা, কিংবা ব্ল্যাক হোল নামের রহস্যময় বস্তুর অস্তিত্বের আলামত যা থেকে আলো পর্যন্ত পালাতে পারে না। এগুলো সবগুলোই পরবর্তীতে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সত্যি বলে প্রমাণিত হয়। কাজেই আইনস্টাইনের তত্ত্বটি পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সার্থক একটি তত্ত্ব। আর ঠিক একইভাবে, জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা দেখি ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বের অকল্পনীয় সার্থকতা - আজ থেকে দেড়শো বছর আগে সীমিত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে তিনি এমনই এক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন যার সঠিকতা ও যৌক্তিকতা যে বারবার প্রমানিত হয়েছে তাই শুধু নয়, এমনকি এ প্রসঙ্গে তার দেওয়া বিভিন্ন প্রকল্প এবং ভবিষৎবানীগুলোও মিলে গেছে! মজার একটা কাহিনী শোনা যাক তাহলে এবার। ডারউইন লন্ডনের এক গ্রীন হাউসে মাদাগাস্কারের বিশেষ একটা অর্কিড দেখেন যার মধু রাখার পুষ্পাধারটি ১১ ইঞ্চি লম্বা (চিত্র ৪.৭ দ্রস্টব্য)। তিনি তা দেখে মন্তব্য করেন যে, মাদাগাস্কারের যে জায়গায় এই অর্কিডটা দেখা যায়, সেখানে এমন এক ধরনের মথ জাতীয় কোন পোকা থাকতেই হবে যাদের সুর বা হুল হবে একই রকমের লম্বা। কারণ এই লম্বা মধুর পুষ্পাধারের ভিতর শুর ঢুকিয়ে মধু খাওয়ার সময়ই মথগুলো অর্কিডটার পরগায়ন ঘটাবে। এবং তাইই হলো - কয়েক দশক পরে বিজ্ঞানীরা ঠিকই খুঁজে পেলেন সেই মাদাগাস্কার স্ফিংস মথ Xanthopan morganii praedicta। প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় বেঁচে থাকার সংগ্রামে

চিত্র ৪.৭: মাদাগাস্কার স্ফিংস মথ Xanthopan morganii praedicta এবং অর্কিড AngraecumSesquipedale

(সৌজন্যে : National Geographic ম্যাগাজিন)

টিকে থাকার জন্য অনেক প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যেই এ ধরণের সহযোগীতার সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা যায়, এবং তার প্রয়োজনেই তারা দুজনেই অভিযোজিত হতে থাকে। আর একেই বলে সহ-বিবর্তন (co-evolution)। প্রকৃতিতে এমন কোন জীব নেই যে শুধু নিঃস্বার্থভাবে অন্য প্রজাতির সেবা করার জন্য বেঁচে থাকে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মেই সে বিলুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য। ডারউইন তার *Origin Of Species* বইতে তার পাঠকদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এ ধরণের একটা প্রজাতি খুঁজে বের করার জন্য, এবং আজ পর্যন্ত কেউ সে চ্যালেঞ্জের উত্তর দিতে পারেনি।

বিভিন্ন ধাপগুলোকে স্পষ্ট করে প্রতিষ্ঠিত করে, আবার অন্যদিকে ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতার ফলে কিভাবে ধীরে ধীরে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়

তারও সাক্ষ্য বহন করে।

এ ধরণের পরীক্ষা করে ল্যাবরেটরিতে একই রকমের ফলাফল পাওয়া গেছে। ডড (Dodd, 1989), রাইস এবং হসটারট (Rice & Hostert, 1993) সহ আরও অনেক বিজ্ঞানীই ফ্রুট ফ্লাই নিয়ে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, কিছু ফ্রুট ফ্লাইকে প্রজননগতভাবে আলাদা করে ফেলে ভিন্ন পরিবেশে বড় করলে, বেশ কিছু জেনারেশন পরে তাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য তৈরি হতে দেখা যায়। নতুন পরিবেশের সাথে ক্রমাগতভাবে অভিযোজিত হতে হতে এক সময় তারা এতই বদলে যায় যে, আর একে অপরের সাথে প্রজনন করে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না, পরিণত হয় এক নতুন প্রজাতিতে [১৫]। এরকম ধরণের বহু পরীক্ষাই করা হয়েছে গবেষণাগারে গত এক শো বছরে, তাদের ফলাফলগুলোও আমাদের হাতের কাছেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আজকের দিনে বাজারে গিয়ে ট্যাকের পয়সা খরচ করে বই কিনে তো আর এগুলো তথ্য খুজে বের করার প্রয়োজন হয় না, যে কেউ ইচ্ছে মাফিক Google এ একটা সার্চ দিয়েই পেয়ে যেতে পারেন এধরণের উদাহরণ বা পরীক্ষার শ'য়ে শ'য়ে রিপোর্ট।

শেষের কিছু কথা

এ ধরণের উদাহরণের কিন্তু কোন শেষ নেই, বিজ্ঞানীরা গত একশো দেড়শো বছরে যে পরিমাণ গবেষণা করেছেন বিবর্তন নিয়ে তা এক কথায় 'অচিন্তনীয়', কোনটা ছেড়ে কোনটা লিখবো তা ঠিক করাই যেনো একটা কঠিন কাজ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন স্তরে পাওয়া ফসিল, বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে শারীরিক এবং জেনেটিক সাদৃশ্য, বিলুপ্তপ্রায় অংগগুলোসহ বিবর্তনবাদের পক্ষে পাওয়া বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এখন পর্যন্ত যত ফসিল রেকর্ড পাওয়া গেছে তার সবগুলোই একবাক্যে বিবর্তনবাদের পক্ষে রায় দিয়েছে। ফসিলবিদ এবং জীববিজ্ঞানীরা যখন প্রথমবারের মত বলেছিলেন যে ডলফিন এবং তিমি মাছ এক সময় বিবর্তিত হয়ে ডাঙ্গার প্রাণী থেকে জলচর প্রাণীতে পরিণত হয়েছে তা 'অসম্ভব' ভেবে নিয়ে বিবর্তনবাদ-বিরোধীরা মহা হইচই শুরু করে দিয়েছিলেন। অথচ আজকে ফসিলবিদরা এমন কিছু ফসিল খুঁজে পেয়েছেন যা দিয়ে তিমি বা ডলফিনের বিবর্তনের একটি বা দু'টি মধ্যবর্তী স্তর নয় বরং পাঁচ পাচটি স্তরকে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। বিবর্তনবাদের পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত চমৎকার উদাহরণ, এবং এ নিয়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে।

বিজ্ঞানীরা মাটির ভিন্ন স্তরে পাওয়া লাখ লাখ ফসিলের মধ্যে এমন একটি ফসিলও এখনও খুঁজে পাননি যা কিনা জীবের বিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে সমর্থন করে না। এরকম একটা ফসিলও যদি বের হয় এবং বিবর্তনবাদ দিয়ে যদি তার ব্যাখ্যা না দেওয়া যায় তাহলেই বিবর্তনবাদের তৈরি বিজ্ঞানের এই শক্ত ইমারতটি হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পরতে পারে। একবার বিখ্যাত

জীববিজ্ঞানী জে বি হ্যালডেন কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো কি দিয়ে বিবর্তনকে ভুল বলে প্রমান করা যাবে, তিনি উত্তরে বলেছিলেন যদি কেউ প্রিক্যাম্ব্রিয়ান যুগে একটা খরগোশের ফসিল খুঁজে বের করে দিতে পারে তাহলেই হবে। সব ভালো তত্ত্বের মতই বিবর্তনবাদও ভুল বলে প্রমানিত হতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তা তো ঘটেইনি , বরং এর উলটোটাই ঘটে চলেছে আজকে দেরশো বছর ধরে।

গত কয়েক দশক ধরে অনূজীববিদ্যা, জেনেটিক্স, জিনোমিক্সের কল্যাণে বিবর্তনের পক্ষে আরও সুক্ষ্ম এবং নিখুঁত সব প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর কিছু উদাহরণ আমরা উপরেও দেখেছি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে মেনডেল কতৃক জিনের আবিষ্কার আর ষাটের দশকে ডিএনএ-এর আবিষ্কার যেনো বিবর্তনবিদ্যার জন্য জীয়ণকাঠি হিসেবে কাজ করেছিলো। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী আর্নেস্ট মায়ার তার ২০০১ সালে প্রকাশিত *What Evolution Is* বইতে বলেছিলেন, অনুজীববিজ্ঞান যখন আবিষ্কার করলো যে, জীবের দেহের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুগুলোও (জীন, প্রোটিন ইত্যাদি) তার দেহের বিবর্তনের সাথে সাথে একইভাবে বিবর্তিত হয় সটি ছিলো আমাদের জন্য একটি অপ্রত্যাশিতরকম সুখের খবর। আমরা এখন আমাদের জীনের মধ্য থেকেই খুঁজে পেতে পারি বিবর্তনের কোটি কোটি বছরের অলিখিত ইতিহাস। Richard Dawkins তার ২০০৪ সালে প্রকাশিত Ancestor's Tale বইতে বলেছিলেন ,

> ’The DNA information in all living creatures has been handed down from remote ancestors with prodigious fidelity. The individual atoms in DNA are turning over continually, but the information they encode in the pattern of their arrangement is copied for millions, sometimes hundreds of millions, of years. We can read this record directly, using the arts of modern molecular biology to spell put the actual DNA letter sequences or, slightly more indirectly, the amino acid sequences of protein into which they are translated.' [১৬]

বিজ্ঞানীরা এখন এধরণের বিভিন্ন ধরণের গবেষণায় নিমগ্ন রয়েছেন, ২০০৩ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা মিলে প্রথমবারের মত মানুষের জীনের সিকোয়েন্সিং করে শেষ করেছেন। হিউমান জিনোম প্রজেকটের ডিরেকটর ফ্রান্সিস কলিন্স তার এক বক্তব্যে বলেছিলেন, আমাদের জিনোম (জীবের পুর্নাঙ্গ জেনেটিক তথ্য) আসলে একটি বইয়ের মত যাকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। একদিকে একে ইতিহাসের বই হিসেবে ব্যবহার করা যায় যেখানে আমাদের প্রজাতির বিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। অন্যদিকে এ হচ্ছে কোষ তৈরির একটি ব্লু প্রিন্ট যা অবিশ্বাস্যরকমের বিস্তারিত নির্দেশাবলী দিয়ে পরিপূর্ণ। আর চিকিৎসা জগতের জন্য এটি হচ্ছে এমনি একটি পাঠ্যবই যা কিনা বিভিন্ন ধরণের রোগ ঠেকানো এবং চিকিৎসার জন্য নতুন এক মহাশক্তি হিসেবে কাজ করবে [১৭]। বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীরা মানুষ, শিম্পাঞ্জী, ইঁদুর, কুকুর, গরু, ফ্রুট ফ্লাই সহ বিভিন্ন প্রাণীর জীনের সিকোয়েন্সিং করেছেন বা করার কাজে নিয়োজিত আছেন।

যে প্রাণী বিবর্তনের ঘড়ির হিসেব অনুযায়ী যত কাছাকাছি সম্পর্কিত ততই তাদের জেনেটিক গঠনও একই রকমের। আমাদের নিজেদের কথাই ধরা যাক, এতক্ষণ তো আমাদের চারপাশের গাছপালা, জীব জন্তুর বিবর্তনের গল্প শুনলাম, নিজেদের প্রজাতির কথাটা বলে লেখাটা শেষ না করলে হয়তো খামতি থেকে যাবে। আমরা এবং শিম্পাঞ্জীরা মাত্র ৫-৮ মিলিয়ন বছর আগে সাধারণ পূর্ব পুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষ নামের এই প্রজাতিতে পরিণত হয়েছিলাম। উনিশ শতাব্দীতে ডারউইন এবং টি এইচ হাক্সলি যখন প্রথম এই কথাটি বলেছিলেন তখন সারা পৃথিবী জুড়ে তীব্র সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিলো। ধর্মাপ্রাণ মানুষেরা তো বিবর্তনবাদকেই অস্বীকার করেছিলো, আর যারা অন্যান্য জীবের বিবর্তনকে যাওবা সঠিক বলে মনে করেছিলেন তাদের পক্ষেও নিজেকে ওই শিম্পাঞ্জীগুলোর উত্তরসুরী বলে মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে দাড়িয়েছিলো। এই তো সেদিন - ২০০৫ সালের সেপটেম্বর মাসে বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মত মানুষ এবং শিম্পাঞ্জীর জিনোমের পাশাপাশি বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত করলেন যে, বিজ্ঞানীরা এত দিন ধরে ঠিকই ধারণা করে আসছিলেন। আসলেই আমাদের সাথে আমাদের এই পুর্বপুরুষের ডি এন এ ৯৮.৭% ই এক - আমরাও আসলেই এক ধরণের উন্নত প্রজাতির বানর ছাড়া আর কিছুই নই [১৮]। আমাদের হিমোগ্লোবিনের সাথে শিম্পাঞ্জীর হিমোগ্লোবিনও প্রায় হুবহু মিলে যায়।

শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা কিছুদিন আগে তাদের আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ধাঁধারও উত্তর পেয়েছেন জেনেটিক্স এবং জিনোমিক্সের কল্যাণেই। আমরা বহুদিন ধরেই জানেন যে শিম্পাঞ্জীর কোষে ২৪ জোড়া ক্রোমজোম থাকলেও মানুষের কোষে আছে মাত্র ২৩ জোড়া। মানুষ এবং শিম্পাঞ্জী যদি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকেই বিবর্তিত হয়ে আসবে তাহলে আরেক জোড়া ক্রোমজোমের হোলটা কি? উধাও তো হয়ে যেতে পারে না হঠাৎ করে, আর সেটা হলে ব্যাপারটা মোটেও কোন ভালো দিকে গড়াতো না। তাই তারা ধারণা করে আসছিলেন যে নিশ্চয়ই বিবর্তনের কোন এক পর্যায়ে মানুষের কোন দু'টো ক্রোমজোম একে অপরের সাথে জোড়া লেগে গেছে বা মিলে গেছে। আর তা যদি না হয় তাহলে শিম্পাঞ্জীর সাথে সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকেথেকে মানুষের বিবর্তনের এই পুরো ধারণাটাকেই ভুল বলে ধরে নিতে হবে! বিজ্ঞানের বোধ হয় এখানেই মাহাত্ম্যটা, কোন যুক্তি প্রমাণ দিয়ে একে ভুল দেখানো গেলে তা যত বড় আবিষ্কারই হোক না কেনো তাকে বিনা দ্বিধায় আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলে দিতে কার্পণ্য করেন না বিজ্ঞানীরা। সাইটোজেনিক্স (Cytogenetics) গবেষণা থেকে ঠিকই বের হল যে, আমাদের ২ নম্বর ক্রোমজোমটির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে এর উত্তর। আমাদের পূর্বপুরষের দ'ুটি ক্রোমজোম এক হয়ে মিলে গেছে মানুষের এই ক্রোমজোমটির মধ্যে [১৯]। বিবর্তনের ধারা বুঝে জীন সিকোয়েনসিং করার মাধ্যমে শুধু যে আমরা আমাদের পূর্বসুরীদের সম্পর্কে জানতে পারছি তাই নয়, এর ফলে চিকিৎসাবিদ্যার অঙনে এক নীরব বিপ্লব ঘটে চলেছে। যেমন ধরুন না, এই আ্যলজাইমার রোগটির কথাই - একটিমাত্র জীনের (caspase-12 gene) অনুপস্থিতির কারণে স্মৃতিবিভ্রমজনিত যে রোগটি ঘটে, সেই রোগটি কিন্তু আমাদের পূর্বপুরষসহ বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে খুজে পাওয়া ভার। তার অর্থ দাড়াচ্ছে দু'টি, প্রথমতঃ বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় কোন একসময় এই জিনটা আমরা হারিয়েছি, আর দ্বিতীয়তঃ এই জিনটাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে অর্থাৎ কোন্ মেকানিজমের সাহায্যে এই রোগ থেকে তারা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে তা খুঁজে বের করতে পারলে হয়তো আমরা এই দুরারোগ্য ব্যাধিটা নিরাময়ের একটা উপায়ও পেয়ে যেতে পারি [২০]।

বিবর্তনের উদাহরণ আমাদের চারপাশে, ছোটটো পৃথিবীটার বুকে এই অফুরন্ত প্রাণের স্পন্দনের উৎসই হচ্ছে বিবর্তন। একটু চোখ মেলে বাইরের পৃথবীটার দিকে তাকিয়ে দেখলেই আর একে অস্বীকার করার কোন উপায়ই থাকে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল আজকে আমাদের সারা পৃথিবীর বেশীরভাগ মানুষই হয়

বিবর্তনবাদ সম্পর্কে কিছুই জানেন না, বা জানলেও তাতে বিশ্বাস করেন না অথবা আরেক ডিগ্রি অগ্রসর হয়ে এর বিরুদ্ধে যারপর নাই মিথ্যা প্রচারণা চালান। অথচ সাম্প্রতিককালে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের জয়জয়কারের পিছনে এর অবদান অপরিসীম। চিকিৎসাবিদ্যা, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা ওষুধ, কীটনাশক ও উচ্চফলনশীল শষ্য তৈরির ক্ষেত্রেই তো শুধু নয়, জীববিজ্ঞানের সবগুলো শাখার মিলনকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বিবর্তনবিদ্যা। আমাদের চারদিকের প্রাণের বিস্তৃতিকে বিবর্তনের আলোয় বিচার না করলে জীববিজ্ঞানের কোন শাখাই আর পুর্নাঙ্গতা লাভ করতে পারে না। আজকে পরিবেশ দূষণ বা গ্লোবাল ওয়ারমিং রোধে, গাছপালা, জংগল সংরক্ষণে, মাছ বা গৃহপালিত পশুর বংশবৃদ্ধিতে বিবর্তনবাদের জ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য। বিবর্তনবাদের চর্চ্চা কিন্তু শুধুমাত্র জীববিজ্ঞানের শাখাগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, আমাদের অস্তিত্বের সাথে জড়িয়ে গেছে সে ওতপ্রোতভাবে। আমাদের নিজেদের ইতিহাসটা সঠিকভাবে বোঝার জন্য কিংবা ভবিষ্যতে আরও বহুদিন কিভাবে আমাদের প্রজাতিটিকে পৃথিবীর বুকে টিকিয়ে রাখা যায় তা জানার জন্য অর্থাৎ আমাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষৎকে বুঝতে হলে বিবর্তন তত্ত্বের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর উপায় কি! আমাদেরকে উত্তর পেতে হবে হাজারো প্রশ্নের- বুঝতে হবে কখন কতগুলো প্রজাতির অস্তিত্ব ছিলো অতীতে, তারা কিভাবে নির্মুল হয়ে গেলো, কেনো ডাইনোসরগুলো হারিয়ে গেলো, কিন্তু টিকে গেলো ওই আরশোলাগুলো। জানতে হবে আমাদের মস্তিষ্কের আকার কখন হঠাৎ করে বড় হতে শুরু করেছিলো, ভাষার উৎপত্তি কখন কি করে হল, এর পিছনে মস্তিষ্কের বিবর্তন কি ভুমিকা পালন করেছিলো, আমাদের এই সভ্যতা সৃষ্টির পিছনে তাদের আবদানই বা কতটুকু? সমাজবিজ্ঞানীরাও আজকে বিবর্তনবাদের বিভিন্ন তত্ত্বের সাথে সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত ব্যভার ও বৈশিষ্ট্যগুলোকে মিলিয়ে দেখতে শুরু করেছেন - আমরা কেন শুধু নিজের ছেলেমেয়ে বা আত্মীয় স্বজনের কথাই ভাবি, কখনও কখনও আবার নিঃস্বার্থভাবে আত্মোৎসর্গ করি, কেনো বিভিন্ন প্রাণী দলবদ্ধ হয়ে বাস করে, কেনই বা মানুষ ভালোবাসে, প্রেমে পড়ে, সংসারের গন্ডিতে আবদ্ধ হয়ে জীবন কাটিয়ে দেয় - এর কতটুকু সামাজিক, সাংস্কৃতিক আব কতটুকুই বা জেনেটিকভাবে আমাদের দেহকোষেই লেখা রয়েছে তাও মিলিয়ে দেখবার সময় হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী এবং জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে এ নিয়ে তর্কের কোন সীমা পরিসীমা নেই, বিজ্ঞান যতই এগিয়ে যাবে ততই খোলাসা হয়ে উঠবে এর উত্তরগুলো। বিবর্তনবাদের আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকার কথা না বলে আজকের লেখাটা বোধ হয় শেষ করা ঠিক হবে না, আমাদের আধুনিক সভ্যতার চেতনা এবং মননশীলতায় এর ভুমিকা অত্যন্ত গভীর। বিবর্তনবাদ আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছে হাজার বছরের ধর্মীয় কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত ধারণাগুলো থেকে - নিজের সৃষ্টি রহস্যের উত্তর খুঁজতে গিয়ে হতবিহ্বল মানব প্রজাতি এক সময় নিজেকে যে আদিম রূপকথা আর অপ্রাকৃত কল্পনার জালে আটকে ফেলেছিলো তা থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছে ডারউইনের এই বিবর্তনবাদের তত্ত্বটিই। আশা করা যায় অচিরেই তার এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেখা যাবে আমাদের এই ক্ষণজন্মা প্রজাতিটির উপর।

তথ্যসূত্র:

১. Evolution's Importance to society: An Interview with renowned scientist Massimo Pigliucci, 2005, www.actionbioscience.org/evolution/pigliucci/html

২. Myer E, 2001, What is Evolution, Basic Books, New York, USA. p 39

৩. World Health Organization, AIDs Epidemic Update:2005, Global Estimates For

Adults and Children:
http://www.unaids.org/epi/2005/doc/EPIupdate2005_pdf_en/Epi05_13_en.pdf

৪. Ridley M, 2004, Evolution, BlackwellPublishing, Oxford, UK.

৫. New Bird Flu Vaccine Might Not Work in Time, Discover, Special Issue, vol 27, no 1, January 2006. p 44

৬. Bug Battle Enters New Century, 2000, BBC Health News.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/590915.stm

৭. Infectious Disease and the Evolution of Virulence, PBS Website
http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/01/6/text_pop/l_016_06.html

৮. Berra TM, 1990, Evolution and the Myth of Creationism. Stanford University Press, p 52

৯. Dobzhansky T, Pavlovsky O, Experimentally created incipient species of Drosophila, Nature. 1971 Apr 2;230(5292):289-92.

১০. Mosquin T, 1967. "Evidence for autopolyploidy in Epilobium angustifolium (Onaagraceae)", Evolution Vol. 21, pp713-719 ; Stanley, S., 1979; Macroevolution: Pattern and Process, SanFrancisco, W.H. Freeman and Company. p. 41; Mayr, E., 1970. Populations, Species, and Evolution, Massachusetts, Harvard University Press. p. 348; Bullini, L and Nascetti, G, 1991, Speciation by Hybridization in phasmids and other insects, Canadian Journal of Zoology, Vol. 68 (8), pp1747-1760; Nevo, E., 1991, Evolutionary Theory and process of active speciation and adaptive radiation in subterranean mole rats, spalax-ehrenbergi superspecies, in Israel, Evolutionary Biology, Volume 25, pp 1-125. etc.

১১. Collapse of Intelligent Design: Talk by Ken Miller, Professor of Biology, Brown University, http://www.mukto-mona.com

১২. Dr. Douglus J Futuyma (2005), Evolution, Sinauer Associates, INC, MA, USA

১৩. Tate J, Evolution of Polyploidy in Plants: http:// www.plaza.ufl.edu/jtate/

১৪. Single Gene Transforms Fish in One Genration, Discover, Special Issue, vol. 27, no.1, 2006. p 62

১৫. http://www.actionbioscience.org/evolution/irwin.html
and

Wake, DB and Yanev KP, 1986, Geographic variation in allozymes in a 'ring species,' the plethodontid salamander Ensatina eschscholtzii of western North America, Evolution, vol. 40, pp 702-715.

and

- Moritz C, Schneider CJ, and Wake DB, 1992, Evolutionary relationships within the Ensatina eschscholtzii complex confirm the ring species interpretation. Systematic Biology, vol 41, pp 273-291.

and

Wake, DB., and Schneider C J, 1998, Taxonomy of the plethodontid salamander genus Ensatina, Herpetologica vol. 54, pp 279-298.

১৬. Dawkins R, 2004, The Ancestors Tale, The Houghton Mifflin Company, Boston, NY, p 19.

১৭. Life Code of Chimps laid Bare, 2005, BBC News, http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4197844.stm

১৮. SEED, Year In Science 2005, Dec/Jan 2006. p 92

১৯. Initial sequence of the chimpanzeegenome and comparison with the human genome, 2005, Vol 437, doi:10.1038/nature04072.

২০. An Overview of Human Genome Project, 2006, National Human Genome Research Institute, http://www.genome.gov/12011238

পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

{বন্যা আহমেদের *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটি অবসর প্রকাশনী থেকে ২০০৭ এর একুশে বইমেলায় প্রকাশিতব্য। এই অংশটি বইটির চতুর্থ অধ্যায়।}

পঞ্চম অধ্যায়

ফসিল এবং প্রাচীন উপাখ্যানগুলো

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পর

প্রায় ৩৮০ কোটি বছর আগে প্রাণের উদ্ভবের এক উষালগ্নে যে যাত্রার সূচনা হয়েছিলো তা আর থমকে দাঁড়ায়নি এক মুহূর্তের জন্যও। কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের পথ ধরে সরলতম প্রাণ থেকে উৎপত্তি হয়েছে আজকের এই নিরন্তর প্রাণের মেলা, বৈচিত্রে, বিস্তৃতিতে, বিন্যাসে, হাজারো প্রাণের সমারোহে এর তুলনা পাওয়া ভার। ডারউইনের ভাষায় 'There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being evolved.' [১] । পথ যে খুব সুগম ছিলো তা বললে বোধ হয় ভুল হবে, নিঃসন্দেহে অজস্র বাধা পেরোতে হয়েছে তাকে - পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন ঘটেছে অহরহ, তার ফশ্রুতিতে প্রাকৃতিক বিন্যাসও বদলে গেছে, গণ-বিলুপ্তির পথ ধরে ইতিহাসের বুক থেকে খসে পড়েছে প্রজাতির পর প্রজাতি। কিন্তু তার পথ চলা থেমে থাকেনি, বিবর্তনের পথ ধরে পুরনোরা আভিযোজিত হয়ে খাপ খাইয়ে নিয়েছে প্রকৃতির সাথে, একের পর এক নতুন প্রজাতির উৎপত্তি হয়েছে, অন্তহীন এই মহাযাত্রা এগিয়ে গেছে স্বতঃস্ফুর্ত গতিতে, অনির্ধারিত ভবিষ্যতের দিকে। এই পথ চলার তো কোন গন্তব্য নেই, কেউ একে পথের নির্দেশনা দিয়ে ব্লু প্রিন্ট এঁকে দেয়নি, কোন কারিগরের কেরামতি নেই এখানে। প্রাণের এই মহা আয়োজন এগিয়ে চলেছে প্রকৃতির গতির সাথে তাল মিলিয়ে, প্রকৃতিরই অংগাঅংগি এক অংশ হয়ে। আর এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে সে ফেলে এসেছে তার পথ চলার বিভিন্ন ধরণের সাক্ষ্য, যদিও তার অর্থ বুঝতে আমাদের লেগে গেছে এতোগুলো শতাব্দী।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ফসিলের অস্তিত্ব জেনে আসলেও এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছে মাত্র কয়েক শো বছর আগে। ফসিল থেকে আমরা প্রাণের বিবর্তনের সরাসরি সাক্ষ্য খুঁজে পাই। ভূতত্ত্ববিদ এবং ফসিলবিদরা আঠারশো শতাব্দির শেষ দিক থেকে ফসিলগুলো আসলে কি তা বৈজ্ঞানিকভাবে বুঝতে শুরু করলেও চার্লস ডারউইনই প্রথম একে বিবর্তনের আলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেন। জেনেটিক্স, জিনোমিক্স এবং অনুজীববিদ্যার অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে আজকে জীবের ডি.এন.এ থেকেই বিবর্তনবাদের মূল তত্ত্বকে প্রমাণ করা গেলেও কয়েক দশক আগেও কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম ছিলো না। আমরা তো ডিএনএ-এর খবর জানলাম মাত্র সেদিন আধা শতাব্দী আগে (১৯৫৩ সালে), জিন বলে যে একটা কিছু আছে তাও জানতে পেরেছি মাত্র এক শতাব্দী আগে (মেন্ডেলের আবিষ্কার সম্পর্কে পৃথিবী জানতে পারে ১৯০০ সালে)! তার অনেক আগেই প্রজাতি যে স্থির নয়, কিংবা ধরুন পৃথিবীর বয়স যে আসলে বাইবেলে বলে যাওয়া ছয় হাজার বছরের চেয়ে অনেক বেশী, অথবা সবগুলো মহাদেশ যে একসময় এক সাথে যুক্ত ছিলো- এধরণের কিছু মৌলিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পিছনে ফসিল রেকর্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। সে সময় ফসিল রেকর্ডগুলো না থাকলে ডারউইনের দেওয়া বিবর্তনবাদ তত্ত্ব বা আলফ্রেড ওয়েজেনারের মহাদেশীয় সঞ্চরণের মত গুরুত্ত্বপূর্ণ তত্ত্বগুলো আমরা পেতাম কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখেছিলাম ডারউইন তার বিগেল যাত্রার সময় পৃথিবীর আনাচে কানাচে খুঁজে পাওয়া ফসিলগুলো দেখে কিভাবেই না প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এখন অনেক গবেষক আবার বলছেন, শুধু বিজ্ঞানের অঙ্গনেই নয়, আমাদের পূর্বপুরুষের এই ফসিলগুলোর নাকি অভুতপূর্ব অবদান রয়েছে আমাদের প্রাচীন লোককাহিনী, বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক ভুবনেও!

দানবীয় আকারের সামুদ্রিক সরীসৃপ বা ডায়নোসর জাতীয় বিভিন্ন প্রাণীর ফসিলের ধ্বংসাবশেষ দেখেই প্রাচীন আমলের মানুষেরা হয়তো অনেক ধরণের কল্পকাহিনী বা মিথের জন্ম দিয়েছিলো। লোককাহিনীর গবেষক আড্রিয়ানে মেয়র (Adrienne Mayor, 2000) এর লেখা The First Fossil Hunters বা প্রথম ফসিল শিকারীরা বইটা সম্প্রতি ভুতত্ত্ববিদ্যার অঙ্গনে সাড়া ফেলে দিয়েছে [২]। একটার পর একটা উদাহরণ টেনে, বিভিন্ন ধরণের লোকজ গল্পের অবলম্বনে তৈরি প্রাচীন ছবি বা ভাষ্কর্যের সাথে বিভিন্ন ফসিলের তুলনা করে, আড্রিয়ানে অত্যন্ত চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন যে আজকে আমরা যে সব মিথের কথা শুনি তার অনেকগুলোরই ভিত্তি হয়তো লুকিয়ে রয়েছে ফসিলের মধ্যেই। প্রাচীন আমলের মানুষ দৈত্যাকৃতি সব আদিম প্রাণীদের হাডডি বা ফসিল দেখে শুধু যে আতঙ্কিত হয়েছে তাইই নয়, নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে ত্রাস আর বিহ্বলতার মেলবন্ধনে সে সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন রূপকথার, এমনকি কখনও অজানা শ্রদ্ধায় তাদের স্থান করে দিয়েছে পূজার বেদীতে। ফসিল রেকর্ড নিয়ে গুরুগম্ভীর বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ঢোকার আগে মানব সভ্যতার ইতিহাসের পাতার এই মজার অধ্যায়টিতে একটু চোখ বুলিয়ে নিলে বোধ হয় মন্দ হয় না।

বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করলে ফসিলবিদ্যার ইতিহাস কিন্তু খুব বেশী দিনের নয়, সাধারণভাবে মাত্র ২০০ বছর আগের ফরাসী প্রকৃতিবিদ জর্জ কুভিয়েকে (Georges Cuvier, 1769 - 1832) এর জনক বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু আড্রিয়ানে ফসিলবিদ্যা চর্চার সেই সময় সীমাটাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন কয়েক হাজার বছরের বিস্তৃতিতে। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ জন বোর্ডম্যানের মতে, আড্রিয়ানায়ই প্রথমবারের মত ধারাবাহিকভাবে ফসিলের সাথে প্রাচীন মিথগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করে তাদেরকে নতুন করে অর্থবহ করে তুলেছেন আমাদের সামনে। প্রাচীন গ্রীক, রোমানসহ ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন সভ্যতাগুলো প্রাচীনকাল থেকেই ফসিল সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ এবং সংরক্ষণ পর্যন্ত করেছে, আর স্বভাবতই তাদের তদানীন্তন জ্ঞানের আলোয় মিলিয়ে এগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়ারও চেস্টা করেছে। সেখান থেকেই হয়তো সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরনের মিথের, সৃষ্টি হয়েছে মহাপরাক্রমশালী মহানায়ক থেকে শুরু করে ভয়ঙ্করী সর্পরাজ কিংবা সাইক্লোপের মত এক চোখী বিশালদেহী দৈত্যের। প্রাচীন গ্রীকরা যে প্রাচীন দৈত্যাকৃতি জিরাফ, ম্যামথ বা মাসটাডোনের মত বিলুপ্ত অতিকায় হাতীর ফসিলের সংস্পর্শে এসেছিলেন ইতিহাসে তার ভুড়িভুড়ি প্রমাণ পাওয়া যায়।

আডরিয়ানা গ্রীস এবং তার আশে পাশের অঞ্চলের প্রাচীন ধ্রুপদী লোককাহিনীর চরিত্র গ্রিফিনের সাথে অদ্ভুত সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন প্রোটোসেরাটপ নামের প্রাচীন এক ডায়নোসরের ফসিলের। আসলে গ্রিফিন কোন গ্রীক বা রোমান লোককাহিনীর চরিত্র নয়। শোনা যায়, খ্রীস্ট পূর্ব ৭০০-৬০০ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ার সাইথিয়ান নামের এক যাযাবর জাতির থেকে গ্রীক পর্যটক অ্যারিস্টিয়াস প্রথম এই গ্রিফিনের কথা জানতে পারেন। সে অর্ধেক পাখী, অর্ধেক সিংহ, তার শরীর সিংহের মত, মুখের আকৃতি ঈগলের মত, আর তার ছড়ানো পাঁজরের সাথে কল্পনার রং মিলিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে পাখীর ডানা। সিংহ এবং ঈগলের শক্তিতে বলীয়ান দুর্ধষ এই গ্রিফিন নাকি সেখানকার সোনার খনিগুলোকে পাহারা দেয়! পরবর্তীতে অ্যারিস্টিয়াসের লেখা গল্পে দেখা যায় মানুষ ঘোড়ায় চড়ে এই গ্রীফিনদের সাথে যুদ্ধ করছে সোনার খনিগুলো ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু এদিকে আবার ফসিল রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীর বুকে চড়ে বেড়ানো প্রোটোসেরাটপ নামের ডায়নোসরেরও মুখটা ছিলো

অনেকটা পাখির ঠোঁটের মত, পাগুলো ছিলো পাখির মতই সরু সরু। অবাক না হয়ে পারা যায় না যখন শুনি ডায়নোসারেরাই ছিলো আজকের যুগের আধুনিক পাখিদের পূর্বপুরুষ। অনেকদিন আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা ধারণাটি করে থাকলেও সম্প্রতি চায়নায় পাওয়া বেশ কিছু মধ্যবর্তী ফসিল থেকে তারা আরও নিশ্চিতভাবে প্রমাণ পেয়েছেন যে, এক ধরণের ডায়নোসর থেকেই আসলে পাখির বিবর্তন ঘটেছে। তবে সে আলোচনা এখনকার জন্য তোলা থাক, খানিক পরে এই অধ্যায়েই এই নতুন আবিষ্কারটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছে রইলো। এখন আপাতত আড্রিয়ানে মেয়রের লেখা The Fossil Hunter বই থেকে স্ক্যান করা একটা ছবি তুলে দেওয়া যাক পাঠকদের জন্য। প্রোটোসেরাটপের ফসিলের সাথে এই লোককাহিনীর চরিত্র গ্রিফিনের উড়ন্ত ছবি এবং পাশে রাখা প্রাচীন একটি গ্রিফিনের একটি মূর্তির মধ্যে এতো মিল দেখে যে কেউই হয়তো অবাক হবেন।

ছবি ৫.১ : আড্রিয়ানে মেয়রের লেখা The fossil Hunters বই থেকে স্ক্যান করা ছবিটাতে প্রোটোসেরাটপের ফসিলের সাথে এই লোককাহিনীর চরিত্র গ্রিফিনের উড়ন্ত ছবি এবং পাশে রাখা প্রাচীন একটি গ্রিফিনের একটি মূর্তি

প্রাচীন লোককাহিনীতে শোনা যায়, মহাপরাক্রমশীল রোমান সেনাপতি কুইন্টাস সারটোরিয়াস মরোক্কো দেশের প্রাচীন শহর টিঙ্গিস এ পৌঁছালে সেখানকার স্থানীয় আধিবাসীরা তাকে কুখ্যাত রাক্ষস অ্যান্টিয়াসের কবর দেখাতে নিয়ে যায়। সারটোরিয়াস নাকি ৮৫ ফুট দীর্ঘ এই কঙ্কাল দেখে এতই ভয় পেয়ে গিয়েছিলো যে সে তাকে আবার নিজের হাতে শ্রদ্ধাভরে তাকে দাফন করার ব্যবস্থা করে দেয়। অ্যান্টিয়াস গ্রীক পুরানের একজন সহিংস রাক্ষষ, যাকে পরে বিখ্যাত মহাবীর হারকিউলিস হত্যা করে মানব জাতিকে রক্ষা করেন! অনেকে মনে করেন যে বিশালাকার এক আদিম হাতী অ্যানানকাস (Anancus) এর ফসিল ছাড়া হয়ত এটি আর কিছুই ছিলো না। কুভিয়ের মতে, অনেক সময়ই স্থানীয় লোকেরা হঠাৎ করে খুঁজে পাওয়া ফসিলগুলোর আকারকে ৮-১০ গুণ হারে অতিরিঞ্জিত করে এই ধরনের বিভিন্ন রূপকাহিনীর জন্ম দিতো।

তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই অঞ্চলেই এধরণের প্রাচীন হাতী, ম্যামথ বা দৈত্যকার জিরাফ থেকে শুরু করে প্রাগঐতিহাসিক ইওসিন যুগের বিশাল তিমি মাছের (Eocene whales) ফসিলের ছড়াছড়ি দেখা যায়, যাদের কারও কারও হাড়ের দৈর্ঘ্য

ছবি ৫.২ : ফ্লোরেনস *মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি*তে অ্যানানকাস বা বিশালাকার সেই আদিম হাতীর ফসিল

ছবি ৫.৩ :ইওসিন যুগের বিশাল তিমি মাছের ফসিল

আবার ৭০ ফুট পর্যন্ত লম্বা ছিলো! এখান থেকে মাত্র ১৫০ মাইল দুরে অ্যাটলাস পাহাড়েই বিস্ময়কর রকমের বড় আকারের ডাইনোসরের কিছু ফসিল পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি গ্রীসের নিকটবর্তী ঐতিহাসিক ক্রীট দ্বীপে (এই ক্রীট দ্বীপের সাথেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা মহেঞ্জোদারোর বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিলো বলে ধারণা করা হয়) খুঁজে পেয়েছেন আদিম দানবাকৃতি হাতি Deinotherium giganteum-এর ফসিল [৩]। এই প্রকান্ড ১৫ ফুট লম্বা, সারে চার ফুট দাঁতওয়ালা স্তন্যপায়ী প্রাণীটাকে আজকের আধুনিক হাতীদের দুঃসম্পর্কের খালাতো ভাই হিসেবে ধরা যেতে পারে। আদি থেকে এখন পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে হেটে বেড়ানো বিশালতম প্রাণীদের মধ্যে এরা অন্যতম। আজকের যুগের বিজ্ঞানীরা যখন মাথার মাঝখানে বিশাল গোলাকৃতি গর্তসহ এদের মাথার

খুলির ফসিল খুঁজে পান তখন তারা বহু অভিজ্ঞতার আলোকে ধরে নেন যে এখানে নিশ্চয়ই লম্বা একটা শুড়ই ছিল। কিন্তু ভেবে দেখুন তো কয়েক হাজার বছর আগের আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা - পাহাড়ের গায়ে, নদীর পাড়ে বা মাটি খুঁড়ে ভাঙ্গাচোরা, আংশিক ফসিলগুলোর হাড়গোড়ের মধ্যে হঠাৎ করে এধরনের একটা দানবীয় মাথা ফুঁড়ে বেরোলে এমনিতেই তো তাদের চমকে ওঠার কথা, তার উপরে আবার যদি দেখা যায় সেই মাথার মাঝখানে এক বিশালাকার গর্ত, তাহলে তাকে একচোখা রাক্ষষ হিসেবে কল্পনা করা ছাড়া আর কিইবা উপায় খোলা থাকে তাদের সামনে? গ্রীক রূপকথায় বর্ণিত ভয়ানক মানুষ খেকো একচোখা দৈত্য সাইক্লোপের উৎপত্তি যদি এখান থেকেই ঘটে থাকে তাহলেও আবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। আমরা প্রাচীন কাব্যকার হোমারের গল্পেও এই একচোখা দৈত্য সাইক্লোপের কথা শুনতে পাই। ক্রীট দ্বীপের আশেপাশের এলাকায় এধরণের অনেক বিশাল বিশাল আদিম প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে, তাই অনেক গবেষক মনে করেন যে, এ অঞ্চলে তৈরি হওয়া মিথগুলোর সাথে হয়তো এদের একটা সম্পর্ক ছিলো।

ছবি ৫.৩ : (ক) ডায়নোসরের ফসিল (খ) কল্পনার তুলিতে আঁকা ড্রাগন

ড্রাগনের অস্তিত্ব দেখা যায় পৃথিবীর অনেক দেশের রূপকথায়ই, তবে চীন দেশের রংবেরং এর, মুখ থেকে আগুনের ফুল্‌কি ছোটানো, বিভিন্ন ধরণের ড্রাগনের গল্পই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী শোনা যায়। দুই হাজার বছরেরও আগে খ্রীষ্ট পূর্ব ৩০০ শতাব্দীতে চ্যাং কুর লেখায় আমরা যে ড্রাগনের হাড় খুঁজে পাওয়ার গল্প শুনি তাও মনে হয় ডায়নোসরের ফসিলই ছিলো। পাশাপাশি রাখা ডায়নোসরের ফসিল এবং আমাদের পুর্বপুরুষদের কল্পনার তুলিতে বানানো ড্রাগনের মধ্যে মিল দেখে এরকম সন্দেহ জাগাটাই বোধহয় স্বাভাবিক। এমনকি মধ্যযুগেও চীন থেকে শুরু করে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় দাঁতের ফসিল গুড়ো করে সর্বরোগের নিরামক হিসেবে ওষুধ বানানোর রেওয়াজ ছিলো।

ইউরোপে মনে করা হতো যে, এই ফসিলগুলো নূহের প্লাবনে ভেসে যাওয়া মৃত প্রাণীদের ধ্বংসাবশেষ।

অনেকেই ধারণা করেন যে, ভুমধ্যসাগরীয় এবং মধ্যপ্রাচ্যীয় অঞ্চলে বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণীর ফসিল পাওয়া যেতো বলেই প্রাচীনকালে সেখানকার মানুষের মনে মহাপ্লাবনের ধারণটা বদ্ধমূল হয়ে যায়। তারা বিশ্বাস করতো একসময় নিশ্চয়ই সমগ্র পৃথিবীটাই পানির নীচে ডুবে গিয়েছিলো, না হলে পাহাড়ের উপরে, উচ্চভূমির পাথরের বুকে কেনো এতো সামুদ্রিক প্রাণীর ধংসাবশেষ বা ফসিল খুঁজে পাওয়া যাবে! আর সেখান থেকেই শুরু হয় নুহের মহাপ্লাবনের কল্পকাহিনী। এখন আমরা আধুনিক ভুতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে

বুঝতে পারছি যে, বিভিন্ন সময়ে জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রের পানির লেভেল ওঠানামা করলেও এধরনের পৃথিবীব্যাপী মহাপ্লাবন আসলে কখনই ঘটেনি। তবে অবাক করা কান্ড হচ্ছে যে, প্রথমবারের মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই নুহের মহাপ্লাবনের ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করে দেন যে ব্যক্তি তিনি আর কেউ নন আমাদের সেই বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লিওনারদো দ্য ভিঞ্চি [৪]। হ্যাঁ, মোনালিসার চিত্রকর দ্য ভিঞ্চিকে আমরা সাধারণত একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হিসেবে গণ্য করলেও জ্ঞান বিজ্ঞানে তার বহুমূখী প্রতিভার কথা সর্বজনবিদিত। লিওনারদো দ্য ভিঞ্চির জীবনীকার জর্জিও ভাসারি তার বহুমুখী প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন,'তার এতই বিরল ধরণের প্রতিভা ছিলো যে তিনি যাতেই মনোনিবেশ করতেন তাতেই পান্ডিত্য অর্জন করে ফেলতেন। তিনি এতদিকে তার প্রতিভার উন্মেষ না ঘটালে হয়তো একজন

লিওনারদো দ্য ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci, 1452- 1519)

সেরা বৈজ্ঞানিক হতে পারতেন।' সে যাই হোক, এই কালজয়ী ব্যক্তির প্রসঙ্গে আমরা একটু পরে আসছি, আগে দেখা যাক তার পূর্বপুরুষেরা ইতিহাসের কোথায় কখন কিভাবে ফসিলের কথা উল্লেখ করে গেছেন।

কখন মানুষ প্রথম ফসিলের সংস্পর্শে আসে তা হয়তো আমাদের কখনই আর জানা হবে না। লিখিত ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় যে, প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কয়েকজন গ্রীক দার্শনিক তাদের লেখায় ফসিলের কথা উল্লেখ করেছিলন। সমসাময়িক ধর্মীয় উপকাথার উপর ভিত্তি করে লেখা হলেও প্রথম প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষ এবং পৃথিবী উৎপত্তির কথা শোনা যায় গ্রীক দার্শনিক অ্যানাক্সিম্যান্ডারের (Anaximander, 611 - 546 B. C.) কাছ থেকে। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে যে, সেই প্রাচীনকালেই তিনি মনে করতেন বিশ্বব্রক্ষ্মান্ডকে কেউ সৃষ্টি করেনি, এর উৎপত্তি হয়েছে বিবর্তনের ফলে! প্রাণের উৎপত্তির পিছনে রয়েছে ভিজা স্যাঁতস্যাঁতে এক ধরণের বস্তু, যা সুর্যের তাপে শুকিয়ে গিয়ে প্রাণ তৈরি করেছে এবং অন্যান্য অনেক প্রাণীর মতই মানুষের উৎপত্তি হয়েছে মাছ থেকে (৬)। তিনি ফসিলের সংস্পর্শে এসেছিলেন কিনা তা জানা না গেলেও পরবর্তীতে, তার শিষ্য জেনোফেন (Xenophanes of Colophon, death 490 B.C) তার এই ধারণাগুলোর বিস্তৃতি ঘটান, তিনিই প্রথমবারের মত পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে লিখতে গিয়ে ফসিলের প্রসংগ উল্লেখ করেন। তার মতে পৃথিবীর জন্ম হয়েছিলো পানির ঘনীভবন এবং আদিম কাঁদার মেলবন্ধনে। প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসবিদ, হেরোডোটাসও (Herodotus (484-425 B.C.) শামুকসহ বিভিন্ন ধরণের সামুদ্রিক প্রাণীর শেল বা খোলসের ফসিল দেখে সিধান্তে আসেন যে

মিশর দেশ একসময় পানির নীচে নিমজ্জিত ছিল। তিনি মোকাত্তাম নামের আরবের এক উপত্যকায় বর্ণনাতীত রকমের বিশাল আকারের মেরুদন্ডওয়ালা সাপের ফসিলের কথাও উল্লেখ করেন। এছাড়াও আরও কয়েকজন গ্রীক দার্শনিকের লেখায়ও আমরা ফসিলের কথা দেখতে পাই। তবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন বিখ্যাত প্রাচীন গ্রীক ডাক্তার হিপোক্রিটস (Hippocrates of Cos 460-357 B.C) যিনি নিজে একজন ফসিল সংগ্রাহক ছিলেন। সম্প্রতি প্রত্নতাত্তিক খননের সময় তার বিখ্যাত মেডিকেল স্কুলের ভিতর থেকে আদিম হাতীর দাঁতের ফসিলও পাওয়া গেছে (৫)।

তবে লিওনারদো দ্য ভিঞ্চি সেই পনেরশো শতাব্দীতে যে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিয়েছিলেন ইতিহাসে তার জুড়ি মেলা ভার। তিনি নিজে ইতালির মিলান শহরের সরকারি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, কিন্তু তার প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায় ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে চিত্রকলা, শারীরস্থানবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভুগোল, জোতির্বিদ্যা এমনকি ফসিলবিদ্যা পর্যন্ত। তিনিই বোধ হয় প্রথম আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ফসিলের ব্যাখ্যা দেন। ইঞ্জিনিয়র হিসেবে কাজ করার সময় তাকে প্রায়শই পাহাড়ের গা কেটে সুরংগ বা রাস্তা বানাতে হত। তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাহাড়ের স্তরীভুত শীলাগুলো বিভিন্ন সময়ের তলানি থেকে উৎপত্তি হয়ে বিভিন্ন স্তরের জন্ম দিয়েছে, তাই আমরা সবসময়ই পাহাড়ের গায়ে বা মাটিতে বিভিন্ন স্তর (strata) দেখতে পাই। অদ্ভুত ব্যাপার হল, তিনি সে সময়ই স্তরের পর্যায়ক্রম বা উপরিপাতন (Superposition) এর ব্যাপারগুলো বুঝতে পেরেছিলেন, যার ব্যাখ্যা পেতে পেতে আমাদের আরও প্রায় দু'শো বছর লেগে গিয়েছিলো! ১৬৬৯ সালে ডেনিশ বিজ্ঞানী নিকোলাস স্টোন প্রথম উপরিপাতন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাজির করেন। স্তরীভুত পাললিক শিলার সবচেয়ে নীচের স্তরটা হচ্ছে সবচেয়ে পুরনো, আর তার উপর ক্রমান্বয়িকভাবে একটার পর একটা স্তর তৈরি হয়েছে, তাই স্তরে স্তরে খুঁজে পাওয়া ফসিলগুলো থেকে আমরা বিভিন্ন যুগের জীবদের অস্তিত্ব কিংবা বিলুপ্তির ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারি। দ্য ভিঞ্চি বুঝেছিলেন যে, ফসিলগুলো আসলে পৃথিবীর আদিম জীবদের নিদর্শন এবং পাহাড়ের গায়ে যে সামুদ্রিক সব প্রাণীর ফসিল দেখা যাচ্ছে তার কারণ আর কিছুই নয়, একসময় আসলে এই পাহাড় গুলো সমুদ্রের নিচে ছিল। তবে বিশ্বব্যাপী প্লাবণের ধারণাটার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তাকেই প্রথম আমরা বলতে শুনি যে, বিশ্বব্যাপী নুহের প্লাবণের কাহিনীটা একটা অসম্ভব ঘটনা, সারা পৃথিবীই যদি পানির নিচে ডুবে যাবে তাহলে এই পরিমাণ পানি সরে গেলো কোথায়। আর এই ফসিলগুলো কোনভাবেই বন্যায় ভেসে যাওয়া প্রাণীদের দেহাবশেষ হতে পারে না, কারণ সব কিছু বানের জলে ভেসে গেলে তাদের বিস্তীর্ন এলাকাজুড়ে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কথা, তারা এ ভাবে সুগঠিতভাবে মাটির স্তরে স্তরে সাজানো থাকতে পারতো না [৪]।

তারপর আমরা আঠারশো শতাব্দীর শেষ দিকে এবং উনিশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'Age of enlightment' এর ফসিল সংগ্রহের অনেক কাহিনীই শুনতে পাই। এদিকে ফসিলবিদ্যার জনক জর্জ কুভিয়ে এবং ভূতত্ত্ববিদ্যার জনক উইলিয়াম স্মিথ শীলার গঠন, স্তর এবং সেই অনুযায়ী ফসিলের বিন্যাসেরও বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কুভিয়ে থেকে শুরু করে সব বিজ্ঞানীই বাইবেলের জ্ঞানানুযায়ী ছয় হাজার বছর বয়সের পৃথিবী এবং নুহের প্লাবনের মত কাহিনীগুলোকে বাস্তব সত্য বলে মেনে নিয়ে তাদের কাজ চলিয়ে গেছেন। তার ব্যতিক্রম আমরা প্রথম দেখলাম জেমস হাটনের ব্যাখ্যায় যিনি বললেন, একটা কোন বড় ধরণের দুর্যোগ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টি হতে পারেনা, এর পিছনে রয়েছে অত্যন্ত লম্বা সময় ধরে ধীরে ধীরে ঘটা পরিবর্তন। আমরা তৃতীয় অধ্যায়েই এই বিষয়ে হাটন এবং পরবর্তীতে চালর্স লায়েলের অবদানের কথা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম; এর উপর ভিত্তি করেই আসলে ডারউইন পরবর্তীতে বিবর্তনের তত্ত্ব প্রস্তাব করতে সক্ষম হন।

ফসিলের ইতিহাসের গল্প বলতে গিয়ে ফসিল জিনিসটা আসলে কী তাই এখনও বলা হয়ে ওঠেনি। আবার ওদিকে ফসিলের ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে হলে আরও কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আপনারা খেয়াল করেছেন বোধ হয় যে ফসিল নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রায়শই ভূতাত্ত্বিক সময়সীমা এবং বিভিন্ন যুগ বা পিরিয়ডের কথা এসে পড়ছে। এই যুগগুলোকে ঠিকমত না বুঝলে ফসিলের গুরুত্ব এবং অর্থও ঠিকমত বোঝা সম্ভব নয়। পৃথিবীর এই বিভিন্ন স্তরগুলো বুঝতে হলে তারা কিভাবে উৎপত্তি হল তার সম্পর্কেও একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন, আর সেখানেই চলে আসে *প্লেট টেকটনিক্স* এবং মহাদেশীয় সঞ্চরণের প্রসংগ। ওদিকে আবার ফসিলগুলোর বয়স কিভাবে আধুনিক উপায়ে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয় সেটা বুঝতে হলে দরকার তেজস্ক্রিয় কার্বন ডেটিং সহ বিভিন্ন ধরণের ডেটিং প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিতি। এই বিষয়গুলোকে নিয়েই লেখার আশা রইলো পরবর্তীতে।

তথ্যসূত্র:

১. Darwin C (1859) 1999, Origin of Species, (last line of the book) Bantam Books, USA.

২. Mayor A, 2000, The First Fossil Hunter, Princton University Press, NJ, USA.

৩. Mayell H, 2003, Cyclops Myth Spurred by One-Eyed Fossils?, National Geographic News, http://news.nationalgeographic.com/news/2003/02/0205_030205_cyclops.html

৪. Leonardo da Vinci, http://www.ucmp.berkeley.edu/history/vinci.html

৫. Evolution and Paleontology in the Ancient World, http://www.ucmp.berkeley.edu/history/ancient.html

৬. Bertrand Russel, 1946, History of Western Philosophy, p 36.

ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

{বন্যা আহমেদের *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটি অবসর প্রকাশনী থেকে ২০০৭ এর একুশে বইমেলায় প্রকাশিতব্য। এই অংশটি বইটির পঞ্চম অধ্যায়।}

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফসিলগুলো কোথা থেকে এলো

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পর

গত কয়েক বছরে ফসিলবিদেরা বেশ কিছু পালক এবং ডানা সহ ডায়নোসর এর ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন চায়নায়। বিজ্ঞানীরা বহুকাল ধরেই ধারণা করে আসছিলেন যে, ডায়নোসর থেকেই আধুনিক পাখীর বিবর্তন ঘটেছে। নব্য আবিষ্কৃত এই ফসিলগুলো ডায়নোসর এবং পাখির মধ্যবর্তী স্তরের মিসিং লিঙ্কের প্রতিনিধিত্ব করে (১)।

পাথরের গায়ে টারশিয়ারি যুগের (৫ থেকে ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে) *Salix sp* এর পাতার ফসিল (২)।

এটাই সেই বিখ্যাত 'লুসি'র কঙ্কালের ফসিল। ১৯৭৪ সালে ইথিওপিয়ায় প্রায় ৩২ লক্ষ বছরের পুরনো *Australopithecus afarensis*, এর এই ফসিলটি পাওয়া যায়। এ ধরণের বিভিন্ন ফসিল থেকেই বিজ্ঞানীরা আধুনিক মানুষের এবং তাদের পূর্ববর্তী প্রজাতি গুলোর বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পেরেছেন (৩)।

হ্যাঁ, এগুলো ফসিলেরই ছবি। বিজ্ঞানীরা বহু শতাব্দী ধরেই এ ধরনের বিভিন্ন ফসিলের নমুনা সংগ্রহ করে আসছেন, এরকম হাজার হাজার ফসিলের সংগ্রহ রয়েছে পৃথিবীর নানা যাদুঘরে। আগের পর্বে উল্লেখ করেছিলাম যে, ইদানীং অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, জীবের ডি.এন.এর মধ্যে লেখা ইতিহাস থেকেই বিবর্তনের সম্পুর্ণ ইতিহাসটা পড়ে ফেলা সম্ভব। কিন্তু ডি.এন.এর আবিষ্কার তো হয়েছে মাত্র অর্ধ শতাব্দী আগে, তার আগে ফসিল রেকর্ডই ছিলো বিবর্তনের অন্যতম প্রধান সাক্ষ্য। ভবিষ্যতে আমরা জীবের ডি.এন.এ থেকেই যে তার অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের অনেক কিছু বলে দিতে পারবো তাতে কোন সন্দেহই নেই। তবে এই মুহুর্তে হাঁটি হাঁটি পা পা করে জেনেটিক্সের বিভিন্ন শাখা বেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হলেও তারা এখনও শৈশবের চৌকাঠই পেরোতে পারেনি। বিবর্তনের বিভিন্ন তত্ত্বের প্রমাণ এবং সময়সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন ধরণের সীমাবদ্ধতার ফাঁক পূরণ করতে এখনও কিন্তু এই ফসিল

রেকর্ডগুলোই ভরসা! আসলে ফসিল রেকর্ডগুলো না থাকলে সেই উনিশ শতাব্দীতে বসে ডারউইনসহ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এত সহজে বিবর্তনের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

গত দেড়শো বছরে ফসিলবিদরা হাজার হাজার ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন, এবং সেগুলো বিবর্তনবাদের তত্ত্বকে আরও যে জোড়ালো করেছে শুধু তাইই নয়, এখন পর্যন্ত এমন একটাও ফসিল পাওয়া যায়নি যা প্রাণের বিবর্তনের ধারাবাহিকতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। যেমন ধরুন মানুষ প্রজাতির বিবর্তন ঘটেছে মাত্র ১৫০ হাজার বছর আগে, এখন যদি হঠাৎ করে মেসোজয়িক (প্রায় ২৫-১৫ কোটি বছর আগে), প্যালিওজয়িক (প্রায় ৫৪-২৫ কোটি বছর আগে), প্রিক্যাম্ব্রিয়ান (প্রায় ৩৫০-৫৪ কোটি বছর আগে) যুগে মানুষের ফসিল পাওয়া যেতে শুরু করে তাহলে তো বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানীদের সামনে নিজ পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন পেশা গ্রহণ করা করা ছাড়া আর কোন উপায় খোলা থাকবে বলে তো মনে হয় না। আবার ধরুন, প্রায় সময়ই বিবর্তন-বিরোধীরা বেশ জাঁকিয়ে বসে বিজ্ঞানীদের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেন - বাপু তোমরা ছোট খাটো পরিবর্তনগুলো নিয়ে হইচই করে কুল পাচ্ছো না, কই বড় বড় পরিবর্তনগুলোর (ম্যাক্রো-ইভলুশন) তো কোন প্রমাণ হাজির করতে পারছো না। বলছো ডায়নোসর থেকে পাখির বিবর্তন ঘটেছে, দেখাও তো দেখি তাদের মধ্যবর্তী স্তরগুলোরর বিবর্তনের নমুনা, কোথায় সেই মধ্যবর্তী ফসিল (transitional fossil) বা হারানো যোগসূত্রগুলো (missing link)? সমুদ্রের তিমি মাছ, ডলফিনরা নাকি একসময় জলহস্তিদের মত ডাঙ্গার প্রাণী ছিলো, তারপর কথা নেই বার্তা নেই একসময় নেমে গেলো পানিতে - এরকম অদ্ভুতুরে একটা পরিবর্তন ঘটে গেলো তার মধ্যবর্তী ফসিলগুলো গেলো কোথায়? এ ধরণের চটকদার প্রশ্নগুলো একসময় বিবর্তনকে ঠেকানোর জন্য অত্যন্ত কার্যকরী ‘অস্ত্র’ ছিলো, কিন্তু ওগুলোর আবেদন অনেক আগেই ফুরিয়েছে। আসলে বিবর্তনবাদ বিরোধীদের জন্য গত শতাব্দীটা আসলে বেশ দুঃখজনকই ছিলো বলতে হবে। বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের ফলে আমরা ক্রমাগত একটার পর একটা ফসিলের সন্ধান পেয়েছি, যা তাদের বেশীরভাগ প্রশ্নেরই সমাধান দিতে পারে। যদিও জীনের গঠন, কোষের ভিতরে মিউটেশন এর বিভিন্ন পর্যায় কিংবা ডি.এন.এ র গাঠনিক সংকেত ভেদ করার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা বিবর্তন সম্পর্কে অনেক তথ্যই বের করতে পেরেছেন, তারপরও ফসিল রেকর্ড ছাড়া বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা আক্ষরিক অর্থে অসম্ভবই বলতে হবে।

ফসিল রেকর্ডগুলো নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে আমরা প্রাণের বিবর্তন সম্পর্কে কিছু মৌলিক তথ্য জানতে পারি, যেগুলো হয়তো শুধুমাত্র বর্তমানের জীবগুলোকে পরীক্ষা করে এতো সহজে জানা সম্ভব হতো না। পৃথিবীর দীর্ঘ সাড়ে তিনশো কোটি বছরের প্রাণের ইতিহাসের সরাসরি সাক্ষী এই ফসিলগুলো, তারা ধারণ করে রেখেছে এই গ্রহে প্রাণের অফুরন্ত কোলাহলের নীরব পদচিহ্ন। আমরা বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগের প্রাণীদের দেহের গঠন, সময়ের সাথে সাথে তাদের তুলনামুলক পরিবর্তন দেখতে এবং তা পরিমাপ করতে পারি ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরে খুঁজে পাওয়া ফসিলগুলোর মাধ্যমে। তারাই আমাদের বলে দিচ্ছে কত বিচিত্র রকমের জীবের অস্তিত্ব ছিলো এই ধরণীতে, তাদের মধ্যে কেউবা এখনও প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে, কেউবা হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে। ফসিল রেকর্ড থেকে একদিকে যেমন আমরা প্রাণের বিকাশের এবং বিবর্তনের ধারার সরাসরি কালানুক্রমিক প্রমাণ পাচ্ছি, পাচ্ছি প্রাগৈতিহাসিক সময়কার আবহাওয়া, জলবায়ু কেমন ছিলো তার নমুনা, জানতে পারছি কখন কোন প্রজাতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, তেমনিভাবেই বুঝতে পারছি কখন গণবিলুপ্তির হাত ধরে হারিয়ে গেছে প্রজাতির পর প্রজাতি। আসলে আমরা ফসিল থেকে বিবর্তনের তত্ত্বের দু’টো মূল বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত পরিস্কার ধারণা পাই। এক হচ্ছে, প্রজাতির ভিতরেই কিভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটেছে বিভিন্ন জীবের গঠন এবং রূপের সেটি, আর তারপর এই ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলেই কখন জন্ম নিয়েছে নতুন

নতুন সব বৈচিত্রময় প্রজাতির।

আবার অন্যদিকে এই ফসিল রেকর্ডগুলো বিশেষ অবদান রেখেছে মহাদেশগুলো সরে যাওয়া বা মহাদেশীয় সঞ্চারণ এবং প্লেট টেকটোনিক্স এর তত্ত্ব আবিষ্কারের পিছনে। এই দু'টি বিষয় ভূতত্ত্ববিদ্যার জগতে বিপ্লব এনেছে - পদার্থবিদ্যা বা রসায়নবিদ্যায় অনু পরমানুর গঠন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, কিংবা জীববিদ্যায় বিবর্তনবাদ যেমন অপরিহার্য ঠিক তেমনিভাবে ভুতত্ত্ববিদ্যার ভুবনে মৌলিক একটি তত্ত্ব হচ্ছে এই প্লেট টেকটোনিক্স (৪)। ফসিলের কথা বলতে গেলেই বিভিন্ন ধরণের শিলা, শিলাস্তর, কোন্ শিলা স্তরে কেন এবং কিভাবে ফসিল তৈরি হয় এই ধরণের প্রসংগগুলো চলে আসে। একমাত্র প্লেট টেকটোনিক্সের মাধ্যমেই এদের উৎপত্তি, গঠন এবং সঞ্চরনের ব্যাপারটা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

সেই ষোল'শ শতাব্দীতে, ১৫৯২ সালে, হল্যান্ডের আব্রাহাম ওরটেলিয়াস (Dutch map maker Abraham Ortelius) প্রথম বলেছিলেন যে, আমেরিকা মহাদেশ আসলে ইউরোপ এবং আফ্রিকা থেকে ভেঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিলো। তারপর তিন শতাব্দীরও বেশী সময় কেটে গেলো, এবার জার্মান আবহাওয়াবিদ অ্যালফ্রেড ওয়েগেনার বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া এই তত্ত্বটিকে আবার নতুন আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলেন ১৯১৫ সালে। তিনি বললেন, আদিতে সবগুলো মহাদেশ আসলে একসাথে ছিলো এবং এর নাম দিলেন 'প্যনজিয়া' বা 'সমগ্র পৃথিবী'। প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর আগে এই প্রকান্ড সুপার মহাদেশটি ভাঙ্গতে শুরু করে, তারপর থেকে ক্রমাগতভাবে তারা সরে যাচ্ছে এবং সরতে সরতে আজকের এই অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। ওয়েগেনার বললেন, আফ্রিকার পশ্চিম ধার এবং দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব ধারের খাঁজগুলো এক্কেবারে যেনো খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে, আবার ওদিকে বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে খুঁজে পাওয়া ফসিলের সাদৃশ্য দেখলেও বোঝা যায় যে তারা একসময় একসাথেই ছিলো। কোন সৃষ্টিকর্তা বিভিন্ন জীবকে সৃষ্টি করে বিভিন্ন মহাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এই ব্যাখ্যাটা যেমন বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহনযোগ্য নয়, ঠিক তেমনিভাবেই সেই আদিম কালে সমুদ্র মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই প্রাণীগুলো হাজার হাজার মাইল দুরের বিভিন্ন মহাদেশে পৌঁছে গিয়েছিলো তাও সঠিক বলে মনে হয় না। বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে থাকা ফসিলগুলোর প্যাটার্ন দেখলে অবাক না হয়ে পারা যায় না। গ্রীষ্মমন্ডলীয় গাছের ফসিল কেনো পাওয়া যাচ্ছে বরফাচ্ছাদিত মহাদেশ অ্যান্টারকটিকায়, কিংবা গরম দেশের ফার্নগুলোর ফসিলই বা কেনো দেখা যাচ্ছে হিমশীতল মেরু অঞ্চলে? তাহলে কি এই অ্যান্টার্কটিকা একসময় দক্ষিণ মেরুর এত কাছাকাছি ছিলো না? বিজ্ঞানীরা পরবর্তীতে এধরনের আরও অনেক ফসিল খুঁজে পেয়েছেন - যেমন ধরুন, ডায়নোসরের চেয়েও পুরনো এক সরীসৃপ মেসোসরাসের ফসিল দক্ষিন আমেরিকা এবং আফ্রিকায় একই শীলাস্তরে খুঁজে পাওয়া গেছে, কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার লুপ্ত মারসুপিয়ালদের ফসিল পাওয়া গেছে অ্যান্টার্কটিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে। শুধু তাই নয়, দেখা গেলো দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগের এবং স্তরের শিলাগুলোও মিলে যাচ্ছে একে অপরের সাথে। বিভিন্ন মহাদেশের শীলাস্তর ও ফসিলের মধ্যে সাদৃশ্য এবং এরকম তীব্র জলবায়ুর পরিবর্তনের একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে - এই মহাদেশগুলো এখন যে অবস্থানে রয়েছে অতীতে তারা সেখানে ছিলো না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সে সময় বিজ্ঞানীরা মহাদেশগুলোর স্থিরতায় বিশ্বাস করতেন, ওদিকে আবার ওয়েগেনারও এই বিশাল সঞ্চরণের কারণ কি হতে পারে তার কোন গ্রহনযোগ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাজির করতে পারলেন না। আর তার ফলে যা হবার তাই হল, বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বটিকে আবারও অগ্রাহ্য করলেন। কিন্তু ষাটের দশকে প্লেট টেকটোনিক্স তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বোঝা গেলো যে ওয়েগেনারের মহাদেশীয় সঞ্চরণের ধারণাটি আসলে সঠিকই ছিলো। ভূতাত্ত্বিক ম্যাপের উপর বিস্তৃত বিভিন্ন ধরণের শিলার গঠন বা প্যটার্ন, পাহাড়, ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরীর উৎপত্তি অথবা মহাদেশীয় সঞ্চরনের মত ব্যাপারগুলোর ব্যাখ্যা পাওয়া

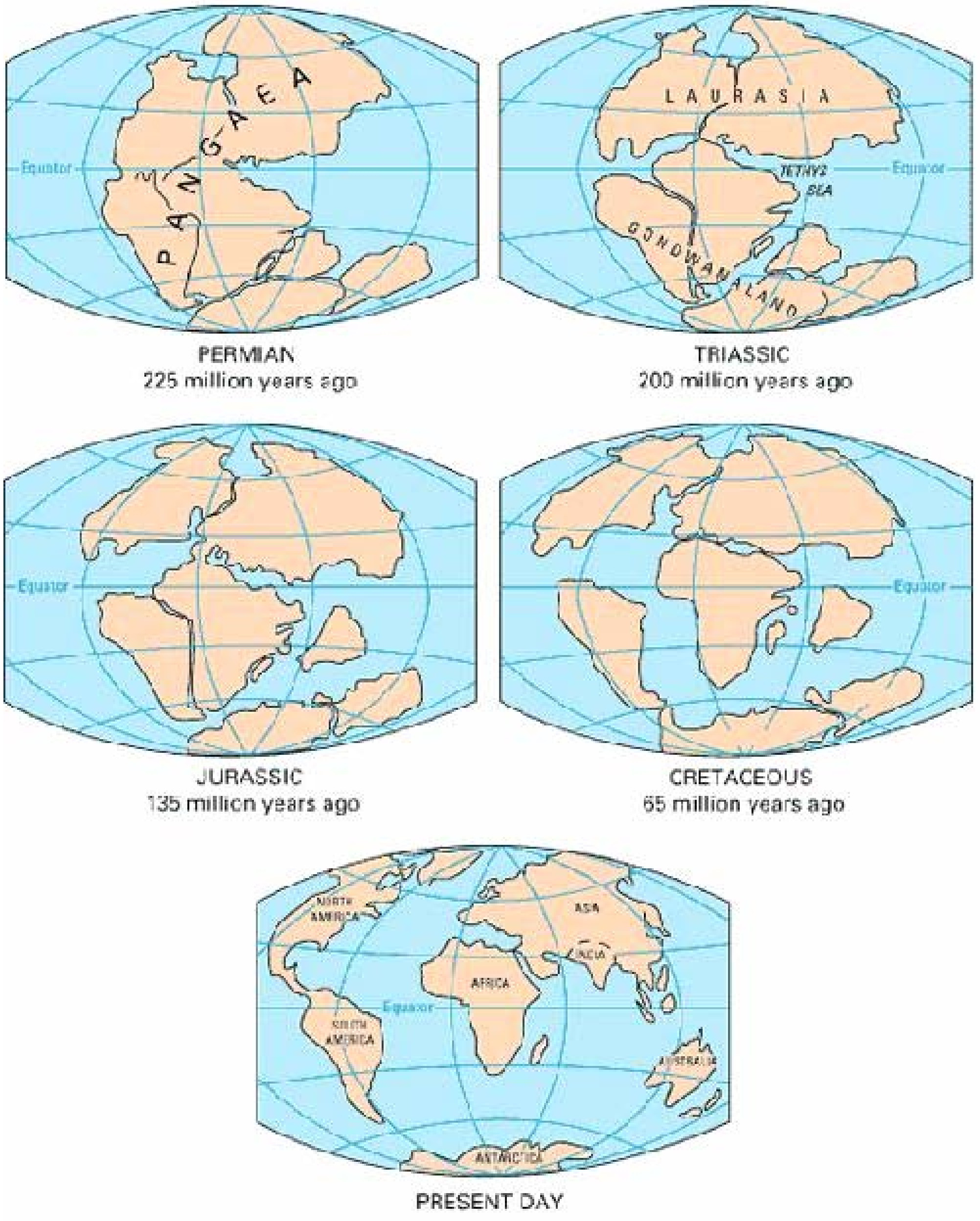

<u>**মহাদেশীয় সঞ্চরন এবং তার বিভিন্ন পর্যায়**</u>

সৌজন্যঃ http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/historical.html

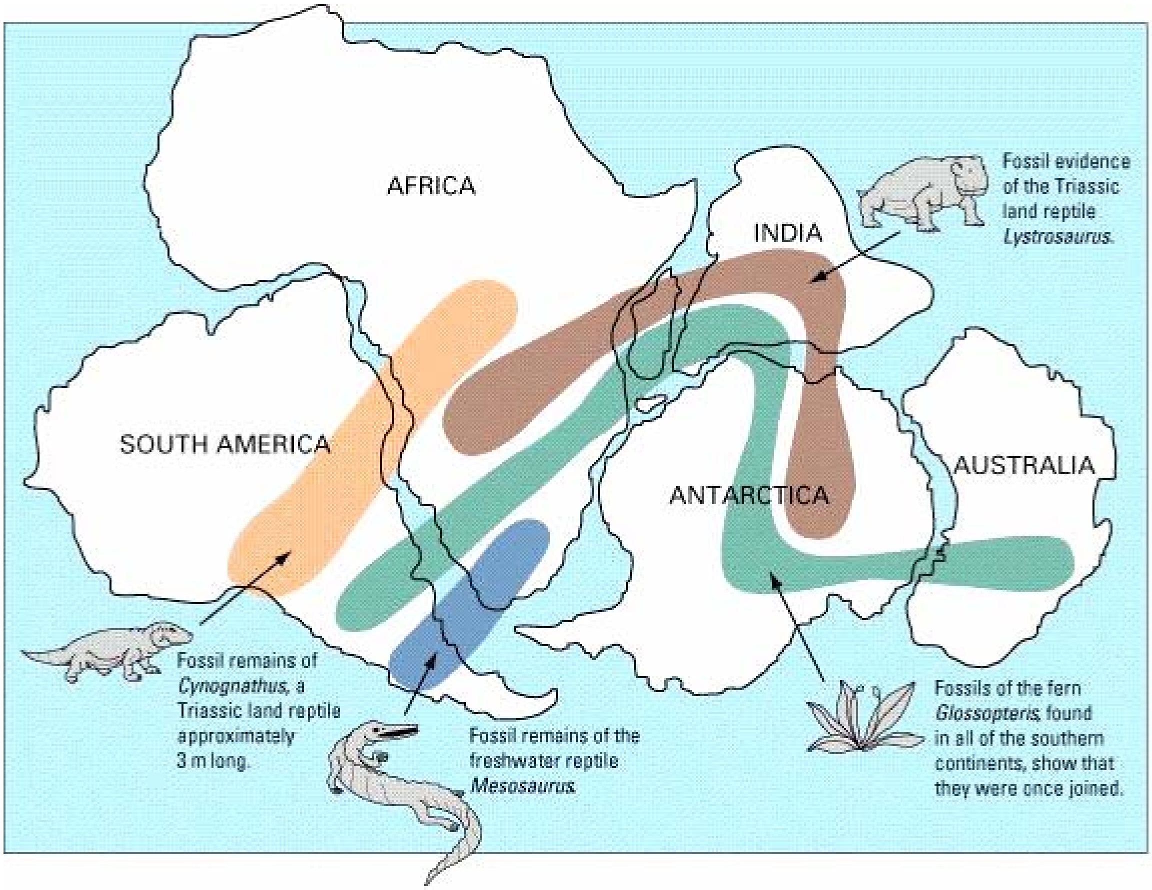

মহদেশীয় সঞ্চরণের তত্ত্ব যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে সব মহাদেশগুলোকে গুলোকে একত্রিত করে তাদের বিভিন্ন স্তরের ফসিল রেকর্ডগুলোকে দেখলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন দেখাতে বাধ্য হবে। ওয়েগেনার সহ অন্যান্য বিজ্ঞানীদের এই ধারণাই শেষ পর্যন্ত সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখানে মাত্র কয়েকটা ফসিলের প্যাটার্ন দেখানো হল।

সৌজন্যঃ http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/continents.html

সম্ভব এই তত্ত্বের মাধ্যমেই। খুব সংক্ষেপে প্লেট টেকটোনিক্স তত্ত্বটাকে ব্যাখ্যা করতে হলে, ব্যাপারটা অনেকটা এরকম দাঁড়ায় ঃ ভূতাত্ত্বিক পরিভাষায় প্লেট বলতে বিশাল সলিড শীলার পাত বা ফলককে বোঝায় আর গ্রীক শব্দ টেকটনিক্স এর অর্থ হচ্ছে 'তৈরি করা', অর্থাৎ, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ বিভিন্ন ধরনের প্লেট দিয়ে তৈরি। লিথোস্ফেয়ার বলে যে উপরের স্তরটা মহাদেশগুলোকে এবং সমুদ্রের নীচের ক্রাস্ট বা ভূত্বককে ধারণ করে আছে তা আসলে ৮টি প্রধান এবং বেশ কয়েকটা আরও ছোট ছোট প্লেটের সমন্বয়ে গঠিত (৫)। এই প্লেটগুলো অনবরত তাদের নীচের আরও ঘন এবং প্লাস্টিকের মত স্তর অ্যাস্থেনস্ফেয়ারে দিকে সরে যাচ্ছে। এদের এই সঞ্চালনের গতি বছরে গড়পড়তা ৫-১০ সেন্টিমিটারের মত। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের মত কঠিন একটা জিনিসের এই নিত্য গতিময়তার কারণটা কি হতে পারে? আসলে পৃথিবীর গভীরে আটকে থাকা তাপ এবং তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের কারণে অনবরত যে তাপের সৃষ্টি হচ্ছে তা থেকেই সব কিছু গলে গিয়ে তৈরি হয় গলিত শীলার ধারা বা ম্যাগমা। এই গলিত শিলাগুলো ধীরে ধীরে মধ্য-সামুদ্রিক ভূশিরার (mid-ocean ridge, নীচের ছবিতে দেখুন; আটলান্টিক মহাসমুদ্রে লম্বালম্বিভাবে এধরণের একটি রিজ রয়েছে) মধ্য দিয়ে উলটো পথে উপরের দিকে চাপ দিতে থাকে। এর ফলে একদিকে যেমন সমুদ্রের তলদেশ বিস্তৃত হতে শুরু করে অন্যদিকে তার ফলশ্রুতিতে মধ্য-সামুদ্রিক ভূশিরার মধ্যে ফাটল

বাড়তে থাকে। এই ম্যাগমাগুলো সমুদ্রের তলদেশ থেকে উপরে উঠে এসে ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে আবার নতুন ক্রাস্ট তৈরি করে (এই ম্যাগমা থেকেই সৃষ্টি হয় ইগনিয়াস শিলাস্তর) আর তাদের দুপাশের প্লেটগুলোকে বিপরীত দিকে ঠেলতে শুরু করে। এভাবে সরতে সরতে যখন কোন দু'টো প্লেটের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে তখন প্লেটগুলোর একটা আরেকটার নীচে চলে গিয়ে তাদের নীচের স্তর অ্যাস্থেনস্ফেয়ারের সাথে মিশে যেতে

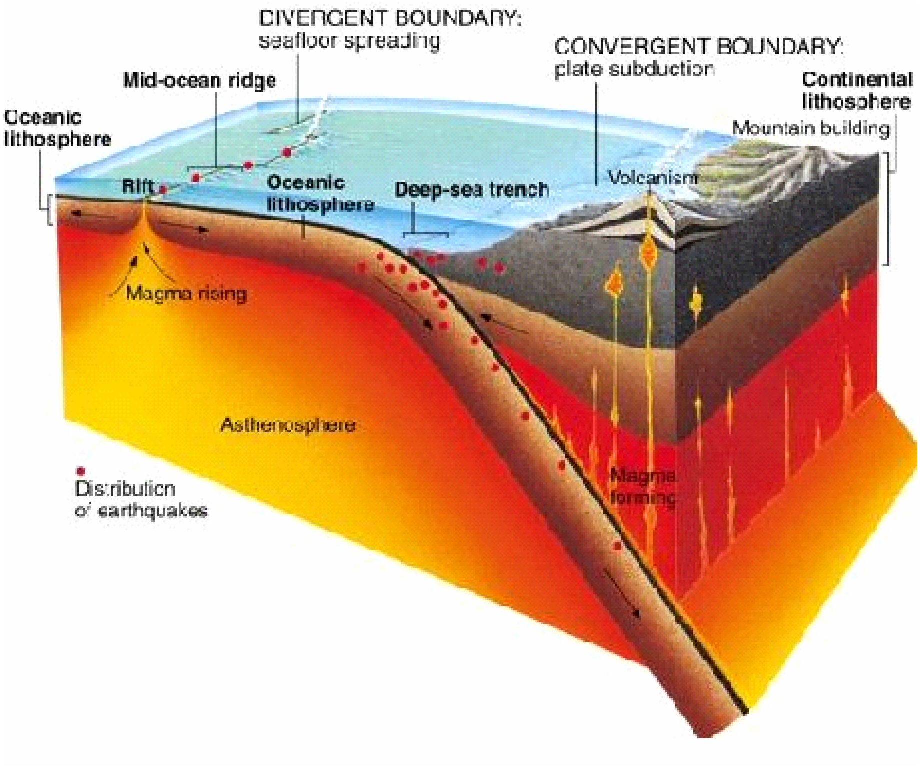

প্লেট টেকটনিক্স প্রক্রিয়া

সৌজন্যঃ http://earth.geol.ksu.edu/sgao/g100/plots/1203_03_plate.jpg

বাধ্য হয়। কিন্তু ভেবে দেখুন কি বিশাল এই সংঘর্ষ, ভূপৃষ্ঠের মত কঠিন একটা জিনিসের এক স্তর আরেক স্তরের মধ্যে ঢুকে গলে যাচ্ছে! এই সংঘর্ষের চাপে যে বিভিন্ন ধরনের প্রলয়ঙ্করী ঘটনার সুত্রপাত ঘটবে তাতে আর আবাক হওয়ার কি আছে? আর এ থেকেই সৃষ্টি হয় পর্বতমালার, ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে পৃথিবী, কিংবা কোন মহাদেশ ভেঙ্গে পরে। এরকম এক প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেটের সংঘর্ষ থেকে জেগে উঠেছে হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জ। প্রায় ৮ কোটি বছর ধরে দক্ষিন দিক থেকে ক্রমাগতভাবে উত্তরের দিকে সরে আসতে থাকা ইন্ডিয়ান মহাসামুদ্রিক প্লেটের দক্ষিণ এশিয়ার সাথে সংঘর্ষের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিলো আমাদের এই বিশাল হিমালয় পর্বতমালার। প্রায় এক কোটি বছর আগে বহুদূরের আচেনা প্রতিবেশী ইন্ডিয়া মহাদেশ তার সব দুরত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় এশিয়ার মহাদেশের সাথে। হ্যা, ঠিকই ধরেছেন- হিমালয় মহাদেশের কোন অস্তিত্বই ছিলো না আজ থেকে কোটি বছর আগে! আমরা যতই বলি না কেন 'পাহাড়ের মত স্থির' আসলে পাহাড় কোনদিনও স্থির ছিলো না, আমাদের চারপাশের প্রকৃতি থেকে শুরু করে, পাহাড় পর্বত, মহাদেশ, মহাসমুদ্র এমনকি আমরা নিজেরাই কখনও স্থির ছিলাম

না! অনবরত পরিবর্তন ঘটে চলেছে সব কিছুর। উপরের মহাদেশীয় সঞ্চরণের ছবিতেই খেয়াল করলে দেখতে পাবেন কিভাবে সময়ের সাথে সাথে পুরনো ইন্ডিয়া মহাদেশ সরতে সরতে এসে এশিয়া মহাদেশের সাথে মিলে গিয়েছিলো।

সে যাই হোক, চলুন আবার ফিরে যাওয়া যাক আমাদের সেই ফসিলের গল্পে। আসলে ফসিলের সাথে ভূতত্ত্ববিদ্যা এবং বিবর্তনবিদ্যার মৌলিক কিছু আবিষ্কার এত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে, তাদেরকে বাদ দিয়ে পুরো গল্পটা বলা একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। গত কয়েক শতাব্দীর বিভিন্ন ধরণের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পিছনেই ফসিল রেকর্ড অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ ভুমিকা রেখেছে। আবার ঠিক উলটোভাবে ফসিলের উৎপত্তি, গঠন এবং তাদের কালনির্ণয়ের কথা জানতে হলে প্লেট টেকটোনিক্স বা মহাদেশীয় সঞ্চরন বা কার্বন ডেটিং এর মত ব্যাপারগুলো না বুঝলেও তো আর চলছে না তাই ফসিলের কথা বলতে গেলেই বারবার চলে আসে ওই প্রসংগগুলো। কিন্তু এদিকে আবার সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা প্রায়ই আভিযোগ করে থাকেন যে, এত কম সংখ্যায় পাওয়া ফসিল দিয়ে নাকি বিবর্তনের তত্ত্ব কোনভাবেই প্রমাণিত হয় না। প্রমাণ হয় কি হয় না, সে প্রসঙ্গে না হয় একটু পরে আসছি; তবে ফসিলের অপ্রতুলতার কথাটা কিন্তু নিছক মনগড়া নয়। সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসীদের বিশ্বাসগুলো কল্পনাপ্রসুত হলেও তাদের এই অভিযোগটা কিন্তু বৈজ্ঞানিকই বলতে হবে! তারা ঠিকই বলেন যে ফসিলের সংখ্যা পৃথিবীর বুকে জন্ম নেওয়া বিভিন্ন প্রজাতির জীবের সংখ্যার তুলনায় সত্যিই তো খুবই কম। এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা যে, প্রায় আড়াই লাখ প্রজাতির ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন তা অতীত এবং বর্তমানের সমস্ত জীবের শতকরা একভাগেরও প্রতিনিধিত্ব করে কিনা সন্দেহ আছে(৪)। কিন্তু এই ফসিলগুলো আসলে কি? কিভাবেই বা মাটি বা পাথরের ভাঁজে ভাঁজে তারা সংরক্ষিত হয়ে যায়, লক্ষ কোটি বছর পরেও তারা কিভাবে প্রমাণ দিয়ে যায় সেই সময়ের জীবনের অস্তিত্বের? অতীতের বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক সময়ের জীবের দেহাবশেষ বা চিহ্নগুলো যখন পাললিক শিলার স্তরে স্তরে সংরক্ষিত হয়ে যায় তাকেই বিজ্ঞানীরা ফসিল বলেন। যদিও ফসিলে পরিণত হতে হাজার হাজার বছর লেগে যায়, ঠিক কতদিন পরে কোন জীবের দেহাবশেষকে ফসিল বলে ধরা হবে তা নিয়ে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন ধরণের শিলা থাকলেও শুধুমাত্র পাললিক শীলার বিভিন্ন স্তরেই ফসিল তৈরি হতে পারে, ইগনিয়াস বা মেটামরফিক শীলার মধ্যে জীবদেহ ফসিল হিসেবে সংরক্ষিত হতে পারে না।

গাছের কষের মধ্যে সংরক্ষিত বিলুপ্ত একধরণের বিছার ফসিল

সৌজন্যঃ ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্টরীঃ http://www.a mnh.org/exhibitions/amber/scorpion.html

ফসিল কিভাবে তৈরি হয় তা বুঝলে হয়তো এই সমস্যাটার অর্থপূর্ণ একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। একটা জীবের দেহের মৃত্যু বরণ করা থেকে শুরু করে তার ফসিলে পরিণত হওয়া এবং একজন বিজ্ঞানীর তা আবিষ্কার করা পর্যন্ত ধাপে ধাপে যে পদ্ধতিগুলোর মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়, তা শুধু দীর্ঘই নয়, অত্যন্ত আকস্মিকও বটে। ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা এই ঘটনাগুলো ঘটাটাই যেনো এক অস্বাভাবিক ঘটনা! কিন্তু তারপরও আমরা কিভাবে যে হাজার হাজার ফসিলের সন্ধান পেয়েছি এবং এখনও পেয়ে যাচ্ছি তা ভেবেই অবাক না হয়ে পারা যায় না। মৃত প্রাণীদেহের নরম অংশগুলো খুব সহজেই পঁচে গলে নষ্ট হয়ে যায় বা অন্য কোন প্রাণীর খাদ্যে পরিণত হয়। তাই যে সব প্রাণীদের দেহে শক্ত হাড়, দাঁত, শেল বা কাঁটা নেই সেগুলোর ফসিলও খুব সহজে পাওয়া যায় না। তবে মাঝে মাঝে দু'একটা যে পাওয়া যায় না তাও কিন্তু নয়, সেগুলো হয়তো বিশেষ কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। যেমন ধরুন গাছের কষের মধ্যে বেশ কিছু পিঁপড়া বা পোকা মাকড়ের ফসিল পাওয়া গেছে যারা বেশ ভালোভাবেই সংরক্ষিত হয়ে ছিলো, আবার উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর হিমশীতল তুষারস্তূপের মধ্যে জমে গেছে এমন কিছু অতিকায় ম্যামথেরও ফসিল পাওয়া গেছে। অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের লতাপাতা বা গাছের ফসিলগুলো শিলাস্তরের চাপের ফলে চ্যাপ্টা হয়ে গিয়ে পাথরের উপর একধরনের প্রিন্ট বা ছাপের মত তৈরি করে। কয়লার খনিতে এরকমের প্রচুর ফসিল দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি কোন কোন সময় বিভিন্ন প্রাণীর পায়ের ছাপ বা মলও ফসিলে পরিণত হয়ে যায়। যেমন ধরুন প্রায় ৩৬ লক্ষ বছর আগে

জুরাসিক পিরিয়ডের (২০০ মিলিয়ন বছর আগের) ডাইনোসর এর পায়ের ছাপের ফসিল সৌজন্যঃ

http://www.paleoportal.org/fossil_gallery/taxon.php?taxon_id=111

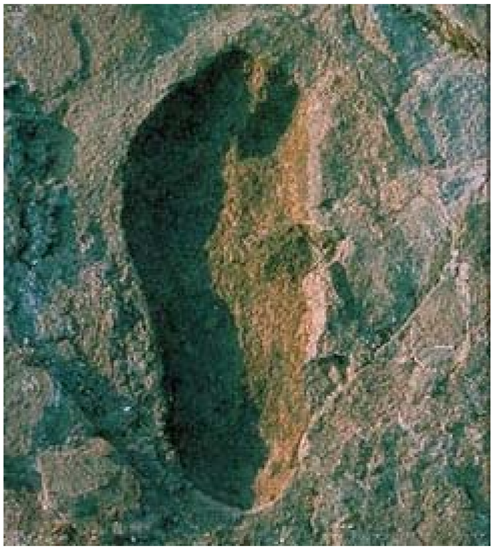

প্রায় ৩৬ লক্ষ বছর আগের মানুষের পূর্বপুরুষ প্রজাতি *Australopithecus afarensis* এর পায়ের ছাপ। সৌজন্যঃ

http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/ha/laetoli.htm

তানজেনিয়ার কোন বিস্তীর্ণ জনপদে আগ্নেয়গিরি থেকে ছড়িয়ে পড়া ভস্মের মধ্যে হঠাৎ করে সংরক্ষিত হয়ে যাওয়া *Australopithecus afarensis* প্রজাতির পায়ের ছাপগুলো এখনও আমাদের পূর্বপুরুষের দু'পায়ে চলে বেড়ানোর সাক্ষ্যবহন করে চলেছে। ফসিল হয়ে যাওয়া মল বা বিষ্ঠা থেকেও আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারি, যেমন কি ধরণের খাদ্য খেতো তারা, সেই অঞ্চলে কি ধরণের গাছপালা বা

পশু পাখি জন্ম নিত সে সময়ে, সেই রকমের গাছপালার জন্য কি রকম জলবায়ুর প্রয়োজন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তবে, সাধারণত প্রাণী বা উদ্ভিদের এই নরম অংশগুলো নয়, বরং দাঁত, হাড়, শক্ত খোলস বা শেল, শক্ত বীজ বা বীজগুটি জাতীয় অংশগুলোই ফসিলে পরিণত হয়। কিন্তু এই শক্ত অংশগুলোর ফসিল হওয়ার সম্ভবনা সবচেয়ে বেশী থাকলেও তাদের বেশীরভাগই তো পাথরের চাপে, শক্ত কিছুর আঘাতে বা পানির স্রোতের ঘষায় বা অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে ভেঙ্গেচুড়ে একাকার হয়ে যায়!

এ তো না হয় গেলো জীবের দেহের কোন অংশ ফসিল হতে পারবে আর কোন অংশ পারবে না তার বর্ণনা। কিন্তু সমস্যার তো আর এখানেই শেষ নয়, বরং যেনো অনেকটা শুরুই বলা চলে। ফসিল তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়ার মাঝেও যেনো লুকিয়ে রয়েছে একের পর এক আকস্মিকতার বেড়াজাল ডিঙোনোর প্রতিযোগীতা! একটা জীবের দেহকে ফসিল হিসেবে সংরক্ষিত হতে হলে ধাপে ধাপে কতগুলো বিশেষ অবস্থা এবং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। পলি মাটির দেশের মানুষ হওয়ার কারণে আমরা সবাই হয়তো জানি পলি বলতে কি বোঝায়। পানি বা বাতাসের ফলে বড় বড় শীলা ক্ষয় হয়ে হয়ে ছোট ছোট কণায় পরিণত হয়ে পলি মাটির সৃষ্টি করে। এর বিভিন্ন অংশ, বালু, মাটি, কাঁদা ইত্যাদি ধীরে ধীরে জমতে থাকে এবং কালের বিস্তৃতিতে এক সময় পাললিক শীলায় পরিণত হয়। আর শুধুমাত্র এই পাললিক শিলার মধ্যেই ফসিলের সংরক্ষণ ঘটতে পারে, তাই পলি অঞ্চলের কাছাকাছি জায়গাগুলোতে বাস করা জীবদের দেহ খুব সহজেই ফসিলে পরিণত হয়ে যেতে পারে। আর স্বাভাবিক কারণেই এরকম অঞ্চল থেকে যত দূরে সরে যেতে থাকবেন ততই কমতে থাকবে ফসিলের পরিমাণ(৬)। অর্থাৎ, এইসব পলি অঞ্চলে যে সব জীব বাস করতো সেইসব প্রজাতির হয়ত ভুরিভুরি ফসিল পাওয়া যাবে, কিন্তু অন্যান্য প্রজাতির অস্তিত্বই কখনও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন ধরুন, কোন জীবের দেহ প্রাথমিক এই বাঁধাগুলো পেরিয়ে ফসিল তৈরির জন্য মোক্ষম কোন পরিবেশে সঠিকভাবেই সংরক্ষিত হলো। এর পরেও কিন্তু তাকে আবার ভুমিকম্প, অগ্নুৎপাত বা প্লেট টেকটোনিক্সের কারণে পৃথিবীর বুকে যে ভাঙ্গা গড়ার অবিরাম খেলা চলছে তার ধাক্কা এড়িয়ে হাজার হাজার বছর ধরে টিকে থাকতে হবে যাতে করে আমাদের প্রজন্মের কোন বিজ্ঞানী তা খুঁজে বের করতে পারেন। এখন পৃথিবীর ভিতরে লুকিয়ে থাকা এই শিলা স্তরটি টেকটোনিক সঞ্চালনের মাধ্যমে যদি অনাবৃত বা প্রকাশিত হয়ে না পড়ে বা বিশেষ কোন কারণে বিজ্ঞানীরা যদি সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন না করেন তাহলে হয়তো সেই ফসিলগুলো অচেনাই থেকে যাবে আমাদের কাছে চিরতরে।

চলুন,কঠিন বৈজ্ঞানিক পরিভাষাগুলোকে বাদ দিয়ে, খুব সহজ একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখা যাক ফসিল কিভাবে তৈরি হয়ঃ লন্ডনের ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্টরির ওয়েব সাইটে বিলুপ্ত এক সামুদ্রিক স্কুইডের ফসিলে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটাকে বেশ সহজ করে ব্যখ্যা করা হয়েছে। ধরুন জুরাসিক যুগের এক স্কুইড বিশাল সমুদ্রে ঘুরে ফিরে বেড়াতে বেড়াতে বুড়ো হয়ে একদিন মরে গেলো, তারপর তার মৃতদেহটা গিয়ে পড়লো সমুদ্রের তলদেশে। বড় কোন মাছ বা হাঙ্গড়ের শিকার হল না সে, ছোট ছোট মাছগুলো ঠুকড়ে ঠুকড়ে তার শরীরের নরম অংশগুলো খেয়ে শক্ত কঙ্কালটাকে ফেলে চলে গেলো। এ সময়েই বেশ বড়সড় একটা ঝড় উঠলো আর এই স্কুইডের কঙ্কালটা পঁচে গলে মিশে যাওয়ার আগেই কাঁদামাটি বালি এসে একরাশ পলির স্তর তৈরি করে ফেললো তার উপর। এভাবে হাজার, লক্ষ, এমনকি কোটি বছর ধরে যত পলির স্তর বাড়তে থাকলো ক্রমশঃ ততই সে মাটির আরও গভীরে ঢুকে যেতে থাকলো। এদিকে আবার পলি মাটির ভিতরের স্তরের সব পানি ধীরে ধীরে নিংড়ে বের হয়ে গিয়ে তা সিমেন্টের মত শক্ত হয়ে যেতে থাকে এবং একসময় তা পাললিক শিলায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর দেখা গেলো, আমাদের সেই ভাগ্যবান (ভাগ্যবতী) স্কুইডটি আবারও এই শিলা তৈরির প্রক্রিয়ায় ধ্বংস হয়ে না

গিয়ে দিব্যি ফসিলে পরিণত হয়ে গেছে। তার হাড়ের অপেক্ষাকৃত ভঙ্গুর অংশগুলো গুড়িয়ে গেলেও, দ্রবীভুত হয়ে যেতে পারে এমন অংশগুলো পানিতে মিশে গেলেও, ক্যালসাইট নামক অত্যন্ত শক্ত খনিজ পদার্থ দিয়ে তৈরি চারপাশের আবরণটি কিন্তু ঠিকই ফসিল হিসেবে টিকে গেছে!

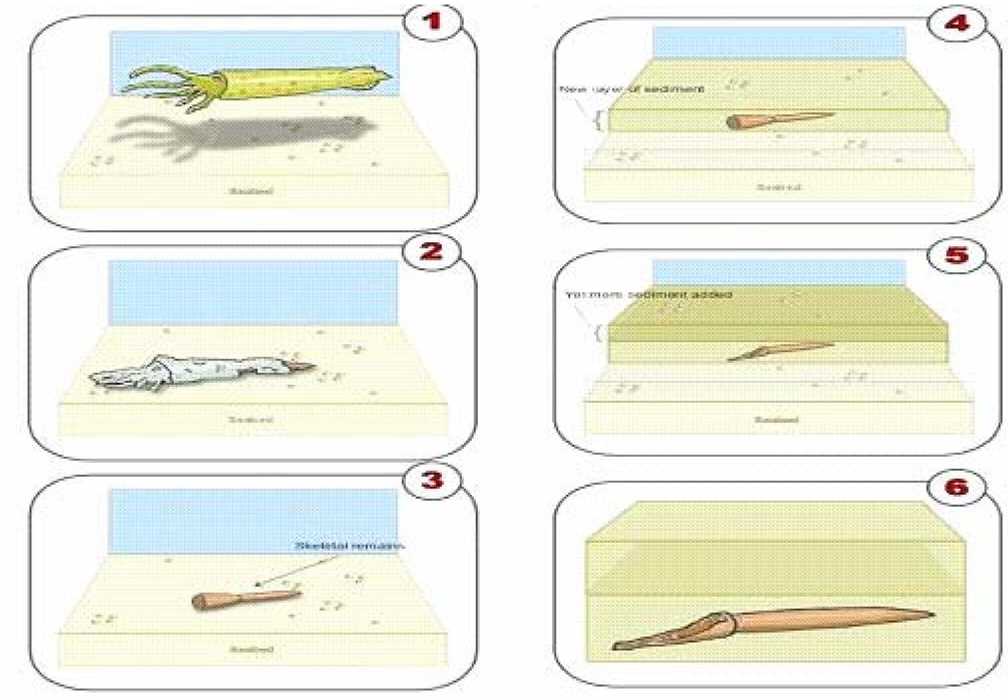

ফসিল তৈরির বিভিন্ন পর্যায়ঃ
সৌজন্যঃ http://www.nhm.ac.uk/nature-online/earth/fossils/fossil-folklore/how_are_fossils.htm#

তাহলে দেখা যাচ্ছে ফসিল তৈরির পদ্ধতিটা নিতান্তই আকস্মিক, এবং বহু চড়াই উৎড়াই পেড়িয়ে এই ফসিল রেকর্ডগুলোকে টিকে থাকতে হয়। আসলেই এটা আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতার জন্য একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার যে এত ঝক্কি ঝামেলা পেরিয়েও কোন না কোন ভাবে কিছু জীবের ফসিল সংরক্ষিত হয়ে যাচ্ছে আর আমরা প্রতিদিনই হাজার হাজার ফসিলের সন্ধান পেয়ে যাচ্ছি। আর বিজ্ঞানীরা যেরকম নিয়মিতভাবে একটার পর একটা নতুন নতুন ফসিল আবিষ্কার করে চলেছেন তাতে করে এটাও তো আর বুঝতে বাকি থাকে না যে নিশ্চয়ই আরও অসংখ্য প্রজাতির জীবের ফসিল মাটির বুকে বা গাছের কষে বা হিম শীতল তুষার স্তুপে লুকিয়ে রয়েছে। আমি যখন এই অধ্যায়টা নিয়ে লিখতে বসেছি তখনই বিজ্ঞানীরা কানাডার উত্তর মেরুতে খুঁজে পেয়েছেন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী ফসিল বা মিসিং লিঙ্ক। প্রায় ৩৮ কোটি বছর আগের চারপায়ী এই মাছটি জলের মাছ এবং জল থেকে চার পায়ে ভর করে ডাঙ্গায় উঠে আসা প্রাণীগুলোর মধ্যে পরিষ্কার যোগসূত্র স্থাপণ করেছে। বিজ্ঞানীরা জল থেকে ডাঙ্গায় বিবর্তনের এই তত্ত্ব আনেক আগেই দিয়েছিলেন, কিন্তু এত পরিষ্কারভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো প্রমাণ বোধ হয় পেলেন এই প্রথম। এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ মিসিং লিঙ্কগুলো নিয়ে এর পরে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছে আছে।

ডাইনোসর থেকে পাখির রূপান্তরই বলুন আর তিমি মাছের ডাঙ্গা থেকে আপাতদৃষ্টিতে উলটো পথে জল-

গমনের বিবর্তনের উপাখ্যানই বলুন - এই মিসিং লিঙ্কগুলো কিন্তু বিবর্তনের গল্পের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়, এদের বাদ দিয়ে বিবর্তনের কোন গল্পই সম্পুর্ন হতে পারে না। আর এ ধরণের আবিষ্কারগুলোর পিছনে রয়েছে আমাদের সেই প্রাচীন ফসিল রেকর্ডগুলো। এরা যেন সেই বহুকল্পিত টাইম মেশিন, যার মাধ্যমে আমরা অতীতের কোটি কোটি বছরের প্রাণের মহাযাত্রায় শরীক হতে পারি, পৌঁছে যেতে পারি বিবর্তনের ইতিহাসের সেই অজানা প্রাগৈতিহাসিক অধ্যায়গুলোতে। হ্যাঁ, পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া লক্ষ লক্ষ জীবের তুলনায় খুঁজে পাওয়া ফসিলের সংখ্যা নিতান্তই কম, কিন্তু ঘুড়ে দাঁড়িয়ে উলটো করে প্রশ্ন করতে হলে বলতে হয়, তারা জীবের বিবর্তনের পক্ষে কতটুকু দৃঢ় সাক্ষ্য বহন করে চলেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানীরা চোখ বন্ধ করে বলবেন যে, ফসিল রেকর্ডগুলোর মাধ্যমে আমরা বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপগুলোকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর এখনও না পাওয়া গেলেও এর থেকে আমরা প্রাণের বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে যে একটা ব্যাপক ধারণা আমরা লাভ করি তাকে কোনভাবেই নগন্য বলে ফেলে দেওয়া যায় না। এ যেনো অনেকটা যাদুঘরে সংরক্ষিত হাজার বছরের পুরনো অতিকায় সেই প্রাচীন পুঁথিটা - তার অনেক পৃষ্ঠা ছিঁড়ে গেছে, কখনও কখনও অধ্যায় ধরেই হয়তো হারিয়ে গেছে, কিন্তু তারপরও বাকি হাজারও পৃষ্ঠায় যে কাহিনী এবং জোড়ালো প্রমাণগুলো লিপিবদ্ধ করা আছে তা দিয়ে আমরা দিব্যি সে সময়টা সম্পর্কে অত্যন্ত স্বচ্ছ একটা ধারণা লাভ করতে পারি, দৃঢ় আস্থা নিয়ে উপসংহারটাও টানতেও পারি। আর প্রতিদিনই আমরা যত নতুন নতুন ফসিল খুঁজে পাচ্ছি ততই যেনো একটা একটা করে সেই ছেঁড়া পৃষ্ঠাগুলো জুড়ে দেওয়া হচ্ছে বইটার ভিতর আর ক্রমশঃ জ্বলজ্বল করে পরিষ্কার হয়ে উঠছে ইতিহাসের রং তুলিতে আঁকা প্রাণের বিবর্তনের ছবিটা।

চার্লস ডারউইন যখন তার 'অরিজিন অফ স্পিশিজ' বইটাতে বিবর্তনের সাক্ষ্য হিসেবে ফসিল রেকর্ডগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত লিখছিলেন তার অনেক আগেই বিজ্ঞানীরা বুঝতে শুরু করেছিলেন যে, এই বুড়ো পৃথিবী ধাপে ধাপে সৃষ্টি হয়েছে(৭)। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন শীলার স্তরে স্তরে ক্রমান্বয়িকভাবে খুঁজে পাওয়া ফসিলগুলো তাদের এই সন্দেহকে আরও সুদৃঢ় করে তুলেছিলো। আর তারপর গত শতাব্দীতে যে অসংখ্য পরিমাণ ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে তা দিয়ে আমরা বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে অত্যন্ত জোড়ালো প্রমাণ পাই। আর আজকে তো বিজ্ঞান আর সেখানেই আটকে নেই, বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ দিয়ে চলেছে বিজ্ঞানের আরও বিভিন্ন শাখা। জেনেটিক্সের আলোয় আমরা এই ফসিল রেকর্ডগুলোকে আবার নতুন করে খতিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছি। এটা তো আর কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে না যে, ফসিল রেকর্ডগুলো আমাদেরকে শত শত বছর ধরে যা বলে আসছে, বিজ্ঞানীরা তাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার সাথে গত কয়েক দশকের অনু জীববিদ্যা এবং জেনেটিক্সের আবিষ্কারগুলো হুবহু মিলে গেলো! বিভিন্ন জীবের ডি.এন.এ থেকেই আজকে আমাদের পক্ষে সম্ভব তার বিবর্তনের ইতিহাসটা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা, আর ফসিল রেকর্ডগুলো তো আছেই তার পাশাপাশি সম্যক প্রমাণ হিসেবে।

এর পরে ভূতাত্ত্বিক বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্তরে বিবর্তনের সাক্ষী হিসেবে ব্যাপক পরিমাণে যে সব ফসিল পাওয়া গেছে এবং তার সাথে ভুতাত্ত্বিক সময় ও কার্বন ডেটিং এর পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে রইলো।

তথ্যসূত্র:

১. Futuyma DJ (2005), Fossil 1. Feathered bird: Evolution, p.75, Sinauer Associates, INC, MA, USA.

And:

http://www.cbc.ca/story/news/national/2003/01/22/dino_wings030122.html

২. Fossil2: salix sp.from Tertiary Period:
http://www.paleoportal.org/fossil_gallery/search.php?taxon_id=&period_id=8

৩. Fossil 3. Lucy: Natural history Museum, London: http://www.nhm.ac.uk/about-us/news/2005/july/news_5976.html

৪. Futuyma DJ (2005), Evolution, p.71 Sinauer Associates, INC, MA, USA

৫. Futuyma DJ (2005), Evolution, p.68 Sinauer Associates, INC, MA, USA

৬. Ridley, Mark (2004), Evolution, p 384; BlackwellPublishing, Oxford, UK

৭. Berra, TM (1990), Evolution and the Myth of Creationism. Stanford p. 52

সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

{বন্যা আহমেদের *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটি অবসর প্রকাশনী থেকে ২০০৭-এর একুশে বইমেলায় প্রকাশিতব্য। এই অংশটি বইটির ষষ্ঠ অধ্যায়।}

সপ্তম অধ্যায়

এই প্রাণের মেলা কত পুরনো?

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পর

মহাজাগতিক কালের পাল্লায় ফেলে হিসেব করলে 'হাজার বছর' চট করে পার হয়ে যাওয়া এক ধূসর সন্ধ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। মোটা মোটা বই লেখা হয় মহামনিষীদের জীবন কাহিনী নিয়ে, কিন্তু কতদিনের জীবন সেটা? সত্তর-আশি-নব্বই বা একশো বছর? আর ওদিকে আমাদের এই বুড়ো পৃথিবীর বয়স হাজার নয়, লক্ষ নয়, এমনকি দুই এক কোটিও নয়, প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর। মহাকালের বিস্তৃতিকে ঠিকমত উপলব্ধি করে ওঠা বা মাথা দিয়ে বুঝতে পারা আমাদের মত স্বল্পায়ু প্রাণীর জন্য এক দুসাঃধ্য প্রচেষ্টাই বলতে হবে। আমরা যখন আমাদের ইতিহাসের কথা বলি আমরা হিসেব করি বছর, যুগ, শতাব্দীর বা খুব বেশি হলে সহস্রাব্দের। কিন্তু পৃথিবীর বয়সের হিসেব তো আর সেভাবে করলে হবে না! মহাজগতের সওয়ারী হয়ে ছুটে চলা আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহটার ইতিহাস বিচার করতে হবে মহাকালের ঘড়ির কাঁটার হিসেব দিয়ে। শুধু প্রচলিত হিসেবের পদ্ধতিটাকেই নয়, আমাদের চিন্তার পদ্ধতিটাকেও বদলে ফেলতে হবে, টেনে লম্বা করে নিয়ে যেতে হবে অনেকখানি - লক্ষ, কোটি বছরের চৌহদ্দিতে।

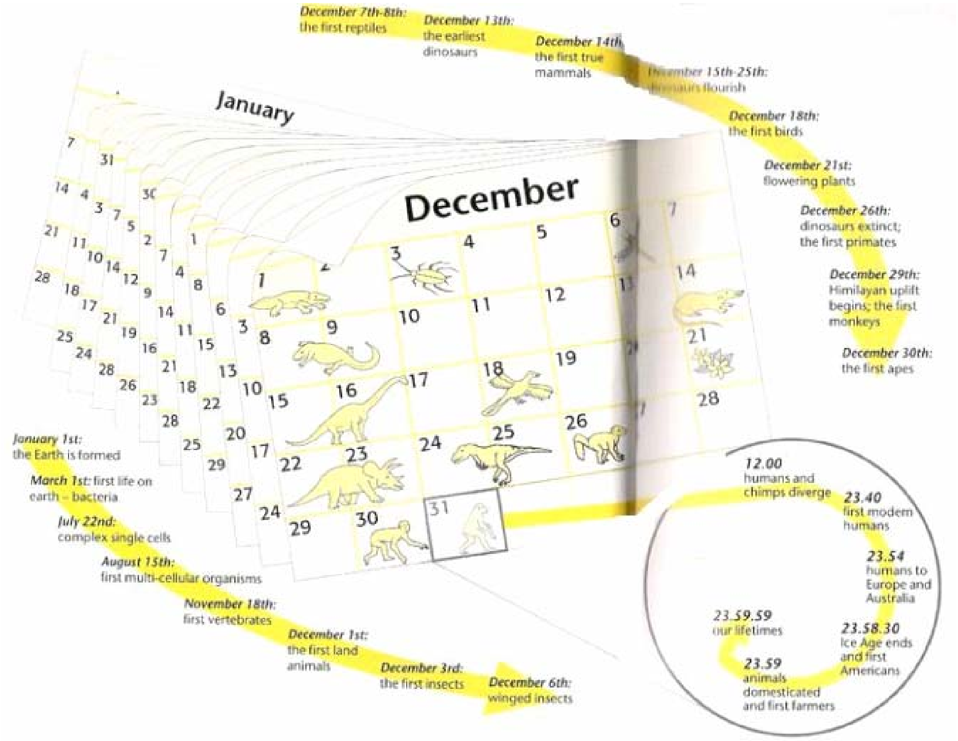

চিত্র ৭.১ : মহাজাগতিক ক্যালেন্ডার

চলুন, এই কোটি কোটি বছরের বিশাল ব্যপ্তিটাকে একটা সহজ এবং বোধগম্য উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। ধরুন, সাড়ে চারশো কোটি বছর ইতিহাসটাকে আমরা ১২ মাসের ক্যালেন্ডারে ফেলে প্রাণের

বিকাশের সময়সীমাগুলো সম্পর্কে একটা আপেক্ষিক বা তুলনামুলক ধারণা পেতে চাই।

সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা দাঁড়াবে অনেকটা এরকমঃ পৃথিবীর জন্ম প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিলো বছরের প্রথম দিন বা পয়লা জানুয়ারীতে, আর ফেব্রুয়ারী বা মার্চে প্রথম উৎপত্তি ঘটলো ব্যকটেরিয়া বা নীলাভ শৈবাল জাতীয় প্রথম আদি প্রাণের। এই আদি জীবদের প্রতিপত্তি চলেছে বহুকাল ধরে। বছরের অর্ধেকেরও বেশী পেরিয়ে অক্টোবর মাস এসে গেছে বহুকোষী জীবের বিকাশ হতে হতে। জটিল ধরণের কোন প্রাণীর সন্ধান পেতে হলে আপনাকে কিন্তু সেই নভেম্বর মাসে এসে পৌঁছাতে হবে, যদিও তাদের রাজত্ব তখনও শুধুমাত্র পানিতেই সীমিত। নভেম্বরের শেষের দিকে প্রথমবারের মত পানিতে চোয়ালওয়ালা মাছ আর মাটিতে উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, আর ওদিকে পানি থেকে ডাঙ্গায় বিবর্তিত হওয়া প্রাণীগুলো পৃথিবীর মাটিতে রীতিমত জাঁকিয়ে বসেছে ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে। জুরাসিক পার্ক সিনেমায় দেখা সেই বড় বড় ডায়নোসরগুলোর আধিপত্য শুরু হলো এ মাসের মাঝামাঝি, কিন্তু ২৬ তারিখ আসতে না আসতেই তারা আবার চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেলো পৃথিবীর বুক থেকে। খেয়াল করে দেখুন যে বছর শেষ হতে আর মাত্র ৫ দিন বাকি, কিন্তু এখনও মানুষ নামক আমাদের এই বিশেষ প্রজাতিটির কোন নাম গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে না পৃথিবীর বুকে। ডিসেম্বরের ২৬ তারিখের দিকে আমাদের পুর্বপুরুষের বিবর্তন শুরু হয়ে গেলেও বানর জাতীয় প্রাণীর দেখা মিলছে ২৯ তারিখে আর নর বানরের উৎপত্তি ঘটতে দেখা যাচ্ছে ৩০ তারিখে। বছরের শেষ দিনে এসে উৎপত্তি ঘটলো শিম্পাঞ্জির আর আমাদের এই মানুষ প্রজাতির কথা যদি বলেন তাহলে তাদের দেখা মিললো বছর শেষের ঘন্টা বাজার মাত্র ২০ মিনিট আগে। আমরা এই আধুনিক মানুষেরা ইউরোপ অস্ট্রেলিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছি এই তো মাত্র ৬ মিনিট আগে আর কৃষি কাজ করতে শিখেছি ঘড়িতে রাত বারোটা বাজার ১ মিনিট আগে [১]!

এক্কেবারে হলফ করে সঠিক বয়সটা নির্ধারণ করতে না পারলেও ডারউইনের অনেক আগেই ভূতত্ত্ববিদেরা মোটামুটি ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের আপেক্ষিক বয়সের ব্যাপারটা বের করে ফেলেছিলেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়েই আমরা দেখছি যে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব আবিষ্কারের পিছনে পৃথিবীর এই দীর্ঘ বয়সের ব্যাপ্তি এক অনিবার্য ভুমিকা পালন করেছিলো। ধীরে ধীরে কোটি কোটি বছরের্ সময়ের বিস্তৃতিতে জীবের মধ্যে গড়ে ওঠা মিউটেশন, হাজারো রকমের প্রকরণ, ভৌগলিকভাবে একত্রীকরণ বা বিচ্ছিন্নতা, তাদের টিকে থাকার জন্য নিয়ত সংগ্রাম ইত্যাদির সমন্বয় ঘটাতে না পারলে ডারউইনের পক্ষে প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বকে কোনভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হত না।

বিংশ শতাব্দীর বেশ কিছুটা সময় পার করে দেওয়ার পরও কিন্তু বিজ্ঞানীদের ভূতাত্ত্বিক সময় মাপার জন্য আপেক্ষিক সময় নিরূপন বা আপেক্ষিক ডেটিং পদ্ধতি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিলো। শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে রেডিওমেট্রিক ডেটিং বা তেজস্ক্রিয় সময় নিরূপন পদ্ধতির মাধ্যমে পরম সময় (Absolute Time) নির্ধারণের উপায় আবিস্কৃত হওয়ার আগে পর্যন্ত আপেক্ষিক পদ্ধতিতেই শীলাস্তর বা ফসিলের বয়স নির্ধারণ করা হত। কিন্তু আপেক্ষিক বা পরম ডেটিং পদ্ধতি বলতে কি বোঝায়? এখনও যেহেতু আপেক্ষিক এবং পরম উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করেই ভুত্বক, শিলাস্তর বা ফসিলের বয়স নির্ধারণ করা হয়, তাই পদ্ধতিগুলো নিয়ে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলে বোধ হয় মন্দ হয় না। ফসিল কিভাবে তৈরি হয়, সেগুলো কিভাবে প্রাণের বিবর্তনের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে, তা নিয়ে আগে অনেক কথাই বলা হয়েছে, বিজ্ঞানমনষ্ক কৌতুহলী পাঠকের মনে এখন প্রশ্ন আসাই স্বাভাবিক - তাহলে বিজ্ঞানীরা কিভাবে এত নিশ্চিত হয়ে বলে দিচ্ছেন কোন ফসিলের বয়স কত, তারা কোন ভূতাত্ত্বিক সময়সীমার প্রতিনিধিত্ব করে, কি করেই বা ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরের বয়স নির্ধারণ করা হয়, এর জন্য কোন্ ধরণের বৈজ্ঞানিক

পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি?

ডারউইনের বেশ আগে উনবিংশ শতাব্দীতেই ভূতত্ত্ববিদেরা যে ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরের আপেক্ষিক বয়স নির্ধারণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তার ভিত্তি ছিলো কিন্তু বেশ সহজ। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, আগের পাললিক শীলা স্তরের উপর ধীরে ধীরে নতুন পলিমাটি এসে জমা হতে হতে নতুন শীলাস্তরের জন্ম হয়, অর্থাৎ, খুব বেশি বড় ধরণের কোন ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন বা ওলটপালট ঘটে না গেলে আগের স্তরটি পরবর্তী সময়ে তৈরি নতুন স্তরের নীচেই অবস্থান করে। এগুলোকে বলে স্ট্র্যাটা (strata) বা স্তর। নীচে, বিশ্ব বিখ্যাত গ্রান্ড ক্যানিয়নের ছবিতে, পরিষ্কারভাবে এই বিভিন্ন স্তরের খাঁজগুলো দেখা যাচ্ছে, এখানকার অনেক শীলাস্তরই তাদের সেই উৎপত্তির সময় থেকে এখন পর্যন্ত একই অবস্থাতে রয়ে গেছে। ষোল'শ শতাব্দীতেই বিখ্যাত ডেনিশ বিজ্ঞানী নিকোলাস স্টেনো এই শীলাস্তরের আপেক্ষিক অবস্থানের ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। স্তরে স্তরে জমা হওয়াটা পাললিক শীলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এভাবে পুরনো স্তরের উপর নতুন স্তরের জমা হওয়ার পদ্ধতিকেই বলে স্তরের পর্যায়ক্রমিক উপরিপাতন (superposition)। আর এ থেকেই হিসেব কষে বের করা সম্ভব বিভিন্ন স্তরের আপেক্ষিক বয়স। তারপর জেমস হাটন এবং চার্লস লায়েল যে পৃথিবী এবং তার বিভিন্ন শীলাস্তরের বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে এক বিশাল ভুমিকা রেখেছিলেন তা তো আমরা আগের আধ্যায়েই দেখেছি। বিভিন্ন শীলাস্তরের আপেক্ষিক বয়স নির্ধারণের ব্যাপারে স্তরে স্তরে খুঁজে পাওয়া ফসিলগুলোও এক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিলো। সেই সময়েই বিজ্ঞানীরা খেয়াল করতে শুরু করেন যে, একেক স্তরে একেক ধরণের ফসিল পাওয়া যাচ্ছে।

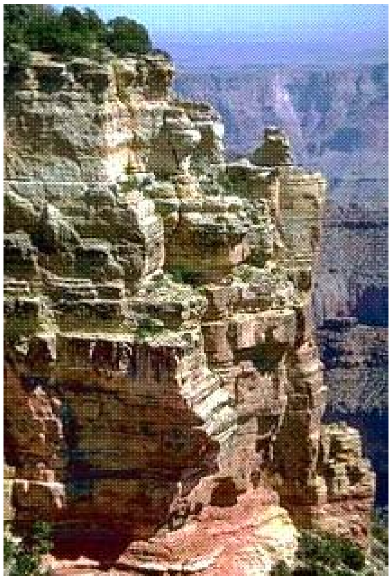

http://www.edu-source.com/CVOsuprt/gcstrata3.jpg

চিত্র ৭.২ :বিখ্যাত গিরিখাত গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের স্তর

আঠার এবং উনিশ শতাব্দীতে ভুতত্ত্ববিদ উইলিয়াম স্মিথ এবং ফসিলবিদ জর্জ কুঁভিয়ে প্রথম দেখালেনঃ একই বয়সের পাথর বা শীলাস্তরে সাধারণভাবে একই রকমের ফসিল পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি এই

শীলাস্তরগুলো একটা আরেকটা থেকে অনেক দুরে অবস্থিত হলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের ভিতর একই রকমের ফসিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। হাজার হাজার মাইল দুরের শীলাস্তরে যখন একই ধরণের প্রাণীগুলোর ফসিল পাওয়া যায় তখন তাদেরকে বলা হয় নির্দেশক ফসিল (Indicator Fossil)। এদের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা শীলাস্তরের বয়স সম্পর্কে একটা আপাত ধারণায় পৌছুতে পারেন। শীলাস্তরগুলো একটা আরেকটা থেকে বহুদূরে অবস্থিত হলেও তারা আসলে একই ভূতাত্ত্বিক সময়ের প্রতিনিধিত্ব করে কারণ সেই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই শুধুমাত্র এ ধরণের প্রাণীর অস্তিত্ব ছিলো।

এরকম বিভিন্ন ধরণের পর্যবেক্ষণ থেকেই বিজ্ঞানীরা ধীরে ধীরে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত দু'টো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসতে শুরু করেন, ব্যাপারটা যেনো অনেকটা একই মুদ্রার এ পিঠ আর ও'পিঠ। একদিকে তারা বিভিন্ন স্তরের অবস্থান অনুযায়ী ফসিলের আপেক্ষিক বয়স বের করতে শুরু করলেন, আর ঠিক উল্টোভাবে একেক স্তরে পাওয়া ফসিলের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যেগুলোর উপর নির্ভর করে ভূতাত্ত্বিক স্তরগুলোর আপেক্ষিক বয়স এবং নামকরণ করলেন। উনিশ'শো শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারছিলেন যে, নীচের স্তরগুলো অপেক্ষাকৃত আদিমতর জীবের ফসিল বহন করে চলেছে, ধীরে ধীরে যতই উপরের স্তরে উঠে আসা হচ্ছে ততই আধুনিকতর জীবের ফসিল দেখা যেতে শুরু করছে [২]। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম : ধরুন, আমি বা আপনি, ভূতত্ত্ববিদ্যা এবং ফসিলবিদ্যা সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানী দু'জন ব্যক্তি, মাটি খুঁড়তে শুরু করলাম - আর আমরা এমনি ভাগ্যবান বা বুদ্ধিমান যেটাই বলুন না কেনো, এমন সব জায়গায়ই খোড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম যেখানে ভুরিভুরি ফসিল পাওয়া যাচ্ছে (যুক্তির খাতিরেই কেবল এটা ধরে নিচ্ছি, বাস্তবে মাটি খুড়লেই যে ফসিল পাওয়া যাবে না সেটা নিয়ে তো আগেই আলোচনা করেছি)। সেক্ষেত্রে যতই আমরা নীচের দিকে খুড়তে থাকবো ততই আমরা কি দেখবো? আমরা যা দেখবো তার সারাংশ অনেকটা এরকমঃ উপরের দিকের স্তরে পর্যায়ক্রমিকভাবে খুঁজে পাবো মানুষ, তারপর বন মানুষ এবং বানরের ফসিল। কিন্তু যত নীচের দিকে যেতে থাকবো সময়ের সাথে সাথে ততই আর এদের ফসিলগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে না। একটা একটা করে আরও নীচের দিকের স্তরগুলোতে নামতে থাকলে পর্যায়ক্রমিকভাবে দেখা যাবে প্রথমে সপুষ্পক উদ্ভিদের ফসিলগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে পাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ, চারপায়ী মেরুদন্ডী প্রাণী, স্থলজ উদ্ভিদ, মাছগুলো, শেল বা খোলস-ওয়ালা শামুকজাতীয় প্রাণীগুলো, আদিম সরল বহুকোষী এবং এক কোষী জীবগুলোর ফসিল [৩]। আর তারপর এক্কেবারে নীচে, প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি বছরের চেয়েও পুরনো স্তরগুলোতে নেমে আসলে কোনরকম কোন প্রাণেরই হদিস পাওয়া যাবে না!

অর্থাৎ, সঠিক সময়সীমাটা না জানলেও উনবিংশ শতাব্দীতেই এই আপেক্ষিক ভূতাত্ত্বিক সময়ের স্কেলটি তৈরি করা ফেলা হয়েছিল। এখানে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন শিলাস্তরে ধারাবাহিকভাবে পাওয়া ফসিল রেকর্ডগুলো এই সময়ক্রম নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্তপূর্ণ ভুমিকা রাখলেও, ডারউইনের পূর্ববর্তী সময়ের এই বিজ্ঞানীরা কিন্তু প্রাণের বিবর্তনের ধারণাটাকে গ্রহনযোগ্য মনে করতেন না। অথচ, এই সময়সীমাগুলোকে ভাগ করা হয়েছিলো ফসিল রেকর্ডে পাওয়া প্রাণীকুলের বিবর্তনের অনুক্রম এবং বিভিন্ন যুগে ঘটা বিশাল গণ-বিলুপ্তিগুলোর উপর ভিত্তি করেই। তারপর ১৮৫৯ সালে ডারউইন তার অরিজিন অফ স্পেশিজ বইটি বের করার পর সব কিছুই আমাদের সামনে পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেলো - বিবর্তনের ব্যাপারটা অস্বীকার করেই হোক বা না বুঝেই হোক বিজ্ঞানীরা এতদিন ধরে যে ভুতাত্ত্বিক সময়ক্রমটি তৈরি করেছেন তা আসলে সামগ্রিকভাবে প্রাণের বিবর্তনের ধারাবাহিকতাকেই যথাযথভাবে তুলে ধরে!

তবে প্রতিনিয়ত বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ভিত্তিতে এই ভুতাত্ত্বিক সময়ের স্কেল বা অনুক্রমটিকেও অনবরত আপডেট করার প্রয়োজন হয় বৈকি। বিজ্ঞান বলেই তা করতে হয়। বিজ্ঞান তো স্থবির নয়, সতত গতিশীল সে। সে যাই হোক, এখন তাহলে চলুন দেখা যাক, এই ভুতাত্ত্বিক সময়ের স্কেল বা সময়ক্রমটিকে কিভাবে ভাগ করা হয়েছে। আমাদের এই ইতিহাসকে প্রথমে ৪ টি বড় ইয়ন বা অতিকল্পে ভাগ করা হয়েছেঃ ৪৫০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর উৎপত্তি থেকে শুরু করে প্রায় ৩৮০ কোটি বছর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে প্রি-আরকিয়ান যে সময়টাতে কোন জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তারপর থেকে শুরু করে প্রায় ২৫০ কোটি বছর আগে পর্যন্ত সময়টাকে বলা হয় আরকিয়ান। এ সময়ই ব্যাকটেরিয়া জাতীয় বিভিন্ন ধরণের আদি কোষীজীবের উৎপত্তি ঘটতে শুরু করে। এর পরে প্রটেরোযোয়িক অতি কল্পটির বিস্তৃতি ব্যাপক, ২৫০ কোটি বছর আগে থেকে শুর করে প্রায় ৫৫ কোটি বছর পর্যন্ত। এ সময়েই বহুকোষী জীবের বিবর্তন ঘটে, আর তার সাথে সাথে দেখা যায় নরম শরীরের কিছু অমেরুদন্ডী প্রাণী। এর পরের সময়টিকে বলা হয় ফ্যানেরোযোয়িক

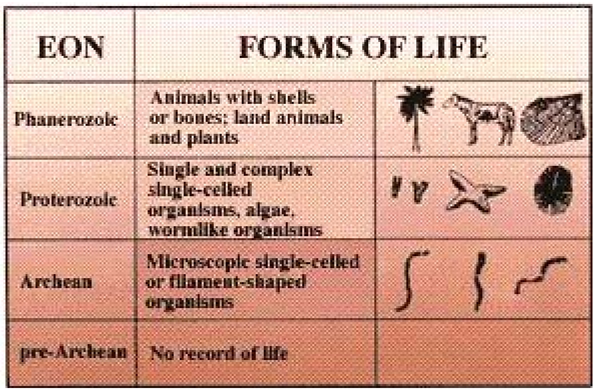

চিত্র ৭.৩ :বিভিন্ন ইয়ন বা কল্পে প্রধান ধরণের প্রাণগুলোর উৎপত্তিঃ http://pubs.usgs.gov/gip/fossils/rocks-layers.html

অতিকল্প, যাকে পর্যায়ক্রমিকভাবে শুরু থেকে আজকের আধুনিক সময় পর্যন্ত তিনটি ইরা বা কল্পে ভাগ করা হয়: প্যালিওযোয়িক, মেসযোয়িক এবং সিনযোয়িক। জীবের বিকাশের ধারার উপর ভিত্তি করে এই কল্পগুলোকে আবার বিভিন্ন পিরিয়ড বা কালে ভাগ করা হয়েছে। এই তিনটি কালেই পৃথিবী বিভিন্ন ধরণের আধুনিক প্রাণী এবং উদ্ভিদের সমারোহে মুখরিত হয়ে উঠেছে। আমাদের কাছে কালগুলোর নাম বেশ খটমটা শোনালেও ভূতত্ত্ববিদদের কাছে তারা কিন্তু বিশেষ অর্থ বহন করে। যেমন ধরুন, 'যোয়িক' অর্থ হচ্ছে প্রাণীর জীবন, আর 'প্যালিও' মানে প্রাচীন, 'মেসো' মানে মধ্যবর্তী এবং 'সিন'-এর অর্থ হচ্ছে আধুনিক। সুতরাং, সময়ের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী জীবের বিকাশের সাথে অর্থবহুল করেই কল্পগুলোর নাম রাখা হয়েছে: প্যালিওযোয়িক, মেসোযোয়িক এবং সিনোযোয়িক। পাশের টেবিলটিতে এই অতিকল্প, কল্প, কাল এবং যুগের ভাগগুলোকে

EON	ERA	PERIOD	EPOCH
Phanerozoic	Cenozoic	Quaternary	Holocene Pleistocene
		Tertiary	Pliocene Miocene Oligocene Eocene Paleocene
	Mesozoic	Cretaceous	Late Early
		Jurassic	Late Middle Early
		Triassic	Late Early
	Paleozoic	Permian	Late Early
		Pennsylvanian	Late Middle Early
		Mississippian	Late Early
		Devonian	Late Middle Early
		Silurian	Late Middle Early
		Ordovician	Late Middle Early
		Cambrian	Late Middle Early
Proterozoic	Late Proterozoic Middle Proterozoic Early Proterozoic		
Archean	Late Archean Middle Archean Early Archean		
pre-Archean			

সারনি ৭.১ আপেক্ষিক ভূতাত্ত্বিক স্কেলঃ

খুব সহজ করে দেখানো হয়েছে। আর নীচের http://pubs.usgs.gov/gip/fossils/scale.html

সারণিটিতে চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন কালের সাপেক্ষে প্রাণের সামগ্রিক বিবর্তনের ধারাটিকে। এরকম ধারাভিকভাবে বিভিন্ন স্তরে ফসিল পাওয়া যাওয়াটকে বলে ফসিলের পর্যায়ক্রমের নীতি (Law of Fossil Succession), যা থেকে আমরা ৩ টি বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত স্বচ্ছ ধারণা পাই : প্রথমতঃ ফসিলগুলো কোন এক সময়ের জীবিত প্রাণের নিদর্শন বহন করে, দ্বিতীয়তঃ এদের মধ্যে অনেকের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে এবং তৃতীয়তঃ বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক স্তরে এত ধরণের ফসিল পাওয়া যাওয়ার কারণ একটাই, আর তা হল সুদীর্ঘ সময়ের বিস্তৃতিতে প্রাণের বিবর্তন ঘটে অনবরতই নতুন নতুন প্রজাতির জন্ম হয়ে চলেছে। ফসিলের পর্যায়ক্রম এবং শিলাস্তরের পর্যায়ক্রমিক উপরিপাতনের নীতির উপর ভিত্তি করে ভূতত্ত্ববিদ এবং ফসিলবিদরা ১৮৪১ সালে, ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব আবিষ্কারেরও প্রায় ১৮ বছর আগেই, আপেক্ষিক সময়ক্রমের ছকটি তৈরি করে ফেলেন। অবাক করা ব্যাপার হল যে, তারপর গত দেড়শো বছরে কালজয়ী সব আবিষ্কারের ভিত্তিতে এর অনেক পরিবর্তন করা হলেও মূল ছকটি আজও প্রায় একই

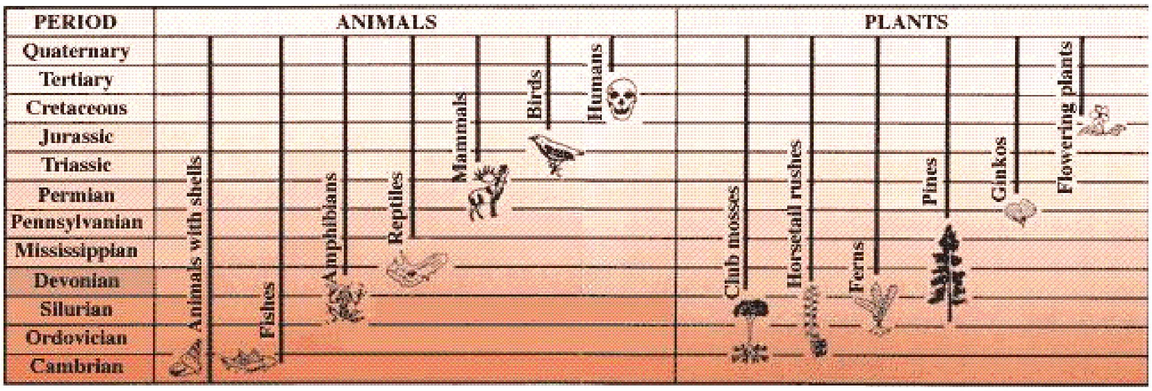

সারনি ৭.২: বিভিন্ন কালে প্রধান প্রধান প্রাণী এবং উদ্ভিদের বিবর্তনের আরেকটু বিস্তারিত চিত্রঃ http://pubs.usgs.gov/gip/fossils/succession.html

রকমই রয়ে গেছে। আধুনিক সব ডেটিং পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা আজকে বেশীরভাগ ফসিলের বয়সই আরও সঠিক এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলে দিতে পারছি, এবং তার ফলে এই টেবিলটি প্রতিদিনই আরও সঠিক এবং পুর্নাংগ রূপ ধারণ করছে। এক নজরে এই বিশাল সময় ধরে প্রাণের বিবর্তনের ধারাটিকে তুলে ধরার জন্য নীচের টেবিলটিতে ভূতাত্ত্বিক সময়সীমা এবং বিভিন্ন যুগে প্রাণের বিবর্তনের প্রধান ঘটনাগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল। কয়েকটি বিভিন্ন ধরণের ভূতাত্ত্বিক সময়ক্রমের প্রচলন থাকলেও বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে বহুলভাবে ব্যবহৃত ছকটাই এখানে তুলে ধরা হল। সেই প্রাণের উৎপত্তি শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কতদিন এই যুগগুলো টিকে ছিলো তার একটা মোটামুটি সময়সীমা এবং সেই সময়ে প্রাণের বিবর্তনের প্রধান ঘটনাগুলো দেখানো হলো নীচের সারণিতে।

সারনি ৭.৩ : এক নজরে ভূতাত্ত্বিক সময়সীমা এবং বিবর্তনের প্রধান ঘটনাগুলো [২]

কল্প (Era)	কাল (Period)	যুগ(Epoch) এবং সময়কাল (যুগের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কত বছর) M = মিলিয়ন বছর, B = বিলিয়ন বছর	বিবর্তনের মূল ঘটনা বা ধাপগুলো
আরকিয়ান	প্রিক্যাম্ব্রিয়ান	২৫০ কোটি বছরেরও আগের সময়। (~ 2.5B – 4.5B)	পৃথিবী উৎপত্তি থেকে পাললিক শীলার উৎপত্তি হওয়ার আগে পর্যন্ত সময়ে কোন ফসিল পাওয়া যায়নি, ৩৯০ কোটি বছর আগে পাললিক শীলার উৎপত্তি ঘটে। ঠিক কখন প্রাণের জন্ম হয় তা এক্কেবারে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা না গেলেও বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি বছর আগের প্রাণের ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন। এ সময়ই নীলাভ সবুজ শৈবাল, আরকিয়ান এবং ব্যাকটেরিয়া জাতীয় বিভিন্ন প্রোক্যারিয়ট বা আদি কোষী জীবের বিবর্তন ঘটে; অবায়ুজীবী বা অ্যনারোবিক ব্যকটেরিয়াদের সালোকসংশ্লেষন বা ফটোসিন্থেসিসের ফলে ধীরে ধীরে বায়ুমন্ডলে মুক্ত অক্সিজেনের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলশ্রুতিতেই এ সময়ের শেষ দিকে জীবের মধ্যে প্রথম অ্যারোবিক বা বায়ুজীবী শ্বাসপ্রক্রিয়ার বিবর্তন ঘটে।
প্রটেরোজোয়িক	প্রিক্যাম্ব্রিয়ান	প্রায় ৫৫ কোটি বছর থেকে ২৫০ কোটি বছর আগে পর্যন্ত (~ 490 M- 2.5 B)	প্রায় ১৭০-১৯০ কোটি বছর আগে প্রথম ইউক্যারিয়ট (সুগঠিত নিউক্লিয়াস সহ জীব) বা প্রকৃতকোষী জীবের উৎপত্তি ঘটে। বড় আকারের ইউক্যারিয়ট প্রাণী বিকাশ লাভ করতে থাকে এবং যৌন প্রজননের উদ্ভব ঘটে; প্রায় সাড়ে পয়ষট্টি কোটি বছর আগে দেখা যেতে শুরু করে বহুকোষী প্রাণী। সম্ভবত এই সময়েই আর্থপপোড়া, আনেলিডা জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব ঘটে। এসময়ের অনেক বহুকোষী জেলিফিস, কৃমিজাতীয় প্রাণী, শৈবাল ইত্যাদির ফসিল পাওয়া গেছে।
প্যালিওজোয়িক	ক্যাম্ব্রিয়ান	প্রায় ৪৯ কোটি বছর থেকে ৫৪.৩ কোটি বছর আগে পর্যন্ত (~ 490M- 543 M)	এই যুগেই, খুব কম সময়ের ব্যবধানে, বিভিন্ন ধরণের প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন পর্বের (phyla) এবং শ্রেণীর (class) বিবর্তন ঘটে। অনেকে একে ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণ (Cambrian Explosion) হিসেবে আভিহিত করে থাকেন। প্রথম আদিম মেরুদন্ডী প্রাণী, শেল যুক্ত বিভিন্ন ধরণের সামুদ্রিক প্রাণী এবং শৈবালের বিকাশ ঘটতে থাকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। এক বিশাল গণ-বিলুপ্তি ঘটে এ সময়ে, যার ফলশ্রুতিতে প্রায় ৫০% জীবের বিলুপ্তি ঘটে যায়।

	অরডোভিসিয়ান	প্রায় ৪৪.৩ কোটি বছর থেকে ৪৯ কোটি বছর আগে পর্যন্ত (~ 443M- 490 M)	প্রথম চোয়ালহীন মাছ এবং প্রবালের আবির্ভাব ঘটে, আদি মেরুদন্ডী প্রাণী দেখা গেলেও, বিভিন্ন ধরণের অমেরুদন্ডী প্রাণীরই প্রাধান্য চলতে থাকে। আদি স্থলজ উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটে। সম্ভবত, হিমায়নের ফলে এই যুগের শেষের দিকেও আরেক বিশাল গণ-বিলুপ্তি ঘটে।
	সিলুরিয়ান	প্রায় ৪১.৭ কোটি বছর থেকে ৪৪.৩ কোটি বছর আগে পর্যন্ত (~417M- 443 M)	প্রথম চোয়ালসহ মাছের আবির্ভাব ঘটে। টিস্যু বা সংবহনতন্ত্রসহ আদি স্থলজ উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায় এসময়ে। বিভিন্ন ধরণের শামুক জাতীয় প্রাণীর বিকাশ ঘটতে থাকে।
	ডেভোনিয়ান	প্রায় ৩৫.৪ কোটি বছর থেকে ৪১.৭ কোটি বছর আগে পর্যন্ত (~354M - 417 M)	প্রথম উভচর প্রাণী, ফার্ণ, বীজসহ উদ্ভিদ, পাখাহীন পতঙ্গের উৎপত্তি ঘটে। স্থলজ উদ্ভিদ এবং মাছেরও প্রাধান্য দেখা যায়। আরেক গণ-বিলুপ্তির নিদর্শন পাওয়া যায় এই যুগে।
	কারবোনিফেরাস	প্রায় ২৯ কোটি বছর থেকে ৩৫.৪ কোটি বছর আগে পর্যন্ত (~290M - 354 M)	প্রথম সরীসৃপের আবির্ভাব ঘটলো, পাখাওয়ালা পতঙ্গ, আদিম হাঙ্গরের দেখা মিললো। উভচর প্রাণী, ফার্ণ, আদি উদ্ভিদের বিস্তার ঘটতে থাকে এসময়েই।
	পারমিয়ান	প্রায় ২৫.১ কোটি বছর থেকে ২৯ কোটি বছর আগে পর্যন্ত (~251M- 290 M)	মহাদেশগুলো একসাথে হয়ে প্রকান্ড প্যাঞ্জিয়া গঠন করেছে। হিমায়নের ফলে সমুদ্রের উচ্চতা নীচে নেমে এসেছে, আর ওদিকে উভচর প্রাণীর সংখ্যাও কমে যেতে শুরু করেছে। সরীসৃপ, বিভিন্ন ধরণের উন্নত জাতের মাছ এবং পতঙ্গের দ্রুত বিকাশ ঘটছে। সামুদ্রিক জীবের গণ-বিলুপ্তি ঘটতে শুরু করে এই যুগে.
মেসোজোয়িক	ট্রায়াসিক	প্রায় ২০.৬ কোটি বছর থেকে ২৫.১ কোটি বছর আগে পর্যন্ত (~206M - 251 M)	মহাদেশগুলো আলাদা হতে শুরু করেছে, প্রথম ডায়নোসরের উৎপত্তি ঘটে, সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী জাতীয় সরীসৃপ এবং প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটলো এ সময়েই।
	জুরাসিক	প্রায় ১৪.৪ কোটি বছর থেকে ২০.৬ কোটি বছর (~144M -206 M)	প্রথম পাখী এবং সপুষ্পক উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটলো এসময়ে, ডায়নোসর প্রবল প্রতাপ চলেছে সারাটা যুগ ধরে, সাথে সাথে অন্যান্য সরীসৃপেরও দ্রুত প্রসার ঘটছে।
	[illegible]	৬.৫ কোটি থেকে ১৪.৪	

		কোটি বছর (65M - 144 M)	ইতোমধ্যেই বেশীরভাগ মহাদেশগুলোই আলাদা হয়ে গেছে, স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি এবং সপুষ্পক উদ্ভিদের বিকাশ অব্যাহত থাকে। আদি মারসুপিয়াল, সাপ, মৌমাছির উৎপত্তি ঘটে। এই ক্রেটাসিয়াস যুগের শেষের দিকেই ডায়নোসরের বিলুপ্তি ঘটে যায়।
সিনোযোয়িক	টারশিয়ারি	**প্যালিয়োসিন যুগঃ** ৫.৫ কোটি থেকে ৬.৫ কোটি বছর (55-65 M) **ইয়োসিন যুগঃ** ৩.৪ কোটি থেকে ৫.৫ কোটি বছর(~34-55 M) **ওলিগোসিন যুগঃ** ২.৪ কোটি থেকে ৩.৪ কোটি বছর (24M-3.4M) **মিয়োসিন যুগঃ** ৫৩ লক্ষ থেকে ২.৪ কোটি বছর (~ 5.3M – 24M) **প্লিয়োসিন যুগঃ** ২০ লক্ষ থেকে ৫৩ লক্ষ বছর (~2.0M-5.3 M)	মহাদেশগুলো আধুনিক অবস্থানের কাছাকাছি পৌছুতে শুরু করেছে। জলবায়ু ক্রমাগতভাবে ঠান্ডা এবং শুকনো হয়ে যেতে শুরু করেছে যার ফলশ্রুতিতে দেখা দিতে শুরু করেছে বিস্তীর্ণ তৃণভুমির এবং সেই সঙ্গে বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে তার সাথে খাপ খাওয়ানো প্রাণী এবং উদ্ভিদের। এসময়েই স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, সাপ, ফুলের পরাগ ঘটানো পোকা মাকড়ের বিকাশ ঘটতে শুরু করে। প্রাইমেটের বিবর্তন ঘটে প্যালিওসিন যুগে, লেমুর বা টারসিয়ারদের ইয়োসিন যুগে, বানরদের দেখা পাওয়া যায় ওলিগোসিন যুগে, বন মানুষ বা এপদের বিকাশ ঘটে মিয়োসিন যুগে, মানুষের আদি পুর্ব পুরুষ *Australopithecus* এর দেখা মিলছে প্লিয়োসিন যুগে এসে.
	কোয়াটারনারি	**প্লিস্টোসিন যুগঃ** ১০ হাজার থেকে ২০ লক্ষ বছর (~ .01-2.0 M) **হলোসিন যুগঃ** এখন থেকে ১০ হাজার বছর আগে পর্যন্ত। (.Recent time-.01 M)	গত ১৮ লক্ষ বছরে, কোয়াটারনারি যুগে, ক্রমাগত ধীর সঞ্চরণের ফলশ্রুতিতে মহাদেশগুলো এখনকার এই আধুনিক অবস্থানে এসে পৌছেছে, ম্যামথ, প্রকান্ড আকৃতির স্লথসহ বিভিন্ন বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখির বিলুপ্তি ঘটেছে। প্লিস্টোসিন যুগে ঘন ঘন হিমায়নের ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা নীচে নেমে যেতে থাকে। শেষ বরফ যুগের সমাপ্তি ঘটে হলোসিন যুগে, এই যুগকেই মানব সভ্যতা বিকাশের যুগ হিসেবে ধরা হয়। এতদিন বিজ্ঞানীরা ধারণা করতেন যে, দেড় লক্ষ বছর আগে আধুনিক মানুষ *Homo sapiens*(আমাদের প্রজাতি) এর বিবর্তন ঘটেছে *homo erectus* থেকে। এখন উন্নত ধরণের ডেটিং পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে মনে হচ্ছে যে, আধুনিক মানুষ হয়তো তারও কিছু সময় আগেই বিকাশ লাভ করেছিলো। পরবর্তী অধ্যায়ে আমাদের নিজেদের বিবর্তন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইলো।

এই আপেক্ষিক সময় নিরূপণ বা ডেটিং পদ্ধতি দিয়ে মোটামুটিভাবে একটা আপেক্ষিক বয়স নির্ধারণ করা গেলেও কোন একটা ফসিলের আসল বয়সটা কত তা তো আর বলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এর জন্য বিজ্ঞানীদের অপেক্ষা করতে হয়েছে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত। পরম ডেটিং পদ্ধতি দিয়ে আজকে আমরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বলে দিতে পারি কত বছর আগে কোন শীলাটি তৈরি হয়েছিলো, পৃথিবীর বয়স কত এবং কোন একটা ফসিলেরই বা বয়সটা কত! আর এর জন্য প্রধানত রেডিওমেট্রিক বা তেজস্ক্রিয় ডেটিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। আপেক্ষিক ডেটিং ঘটনাগুলোকে তাদের ক্রমানুসারে সাজিয়ে দেয় আর তেজস্ক্রিয় ডেটিং তাদেরকে বেঁধে দেয় নির্দিষ্ট সময়ের ছকে। স্বাভাবতই প্রশ্ন জাগে, হিসেব নিকেশ করে সুনির্দিষ্ট বয়সটাই যদি বলে দেওয়া যায় তবে আর আপেক্ষিক বয়স নিয়ে মাথা ঘামানো দরকারটা কি!

আসলে শুনতে যতটা সহজ শোনায় ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়, ভূপৃষ্ঠের সব শীলা বা ফসিলের বয়স এই তেজষ্ক্রিয় ডেটিং পদ্ধতি দিয়ে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, তাই সেসব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের আপেক্ষিক ডেটিং এর আশ্রয় নিতে হয়। আর তা ছাড়া, এই কোটি কোটি বছরের পুরনো শীলা বা ফসিলের বয়স বের করাটা তো আর কোন মুখের কথা নয়, এর জন্য বিজ্ঞানীদের বহু রকমের পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়। অনেক সময়ই বিজ্ঞানীরা একাধিক পরম এবং আপেক্ষিক পদ্ধতি ব্যবহার করে তবেই নিশ্চিতভাবে একটা ফসিলের বা শীলার বয়স নির্ধারণ করতে পারেন। একদিক থেকে চিন্তা করলে স্বীকার করতেই হয় যে, আমরা এ ব্যাপারে বেশ সৌভাগ্যবান, এত ধরণের পদ্ধতি না থাকলে বিজ্ঞানীরা বারবার ক্রস-নিরীক্ষণ করে এতো আস্থা নিয়ে হয়তো বয়সগুলো বলে দিতে পারতেন না।

সুনির্দিষ্টভাবে সময় নির্ধারণের জন্য প্রয়োজন ছিলো একধরণের ভূতাত্ত্বিক ঘড়ির, যা আমাদেরকে বলে দিবে পৃথিবীর বিভিন্ন শীলাস্তরের কবে তৈরি হয়েছিলো আর কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের ফসিলটির বয়সই বা কত। আর বিজ্ঞানীরা সেটাই খুজেঁ পেলেন বিভিন্ন ধরণের তেজষ্ক্রিয় (Radioactive) পদার্থের মধ্যে, এই ভুতাত্ত্বিক ঘড়িগুলোকে বলা হয় রেডিওমেট্রিক ঘড়ি। কারণ, তারা প্রাকৃতিক তেজষ্ক্রিয়তার মাপ থেকে আমাদেরকে সময়ের হিসেব বলে দেয়। পদার্থের তেজষ্ক্রিয়তার ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝতে হলে আমাদেরকে একটু জীববিদ্যার আঙিনা পেরিয়ে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার উঠোনে পা রাখতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞান আজকে এমনি এক অবস্থায় চলে এসেছে যে, তার এক শাখা আরেক শাখার সাথে ওতপ্রতোভাবে জড়িয়ে গেছে, কোন এক শাখার মধ্যে গন্ডীবদ্ধ থেকে পুরোটা বোঝা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে যাই হোক, চলুন দেখা যাক, এত যে আমরা অহরহ তেজষ্ক্রিয়তা, তেজষ্ক্রিয় ক্ষয় (Radioactive decay) অথবা রাসায়নিক বা নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার কথা শুনি তার মুলে আসলে কি রয়েছে। চট করে, খুব সংক্ষেপে, একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক অণু পরমাণুর গঠন এবং তাদের মধ্যে ঘটা বিভিন্ন বিক্রিয়া এবং তেজষ্ক্রিয়তার মূল বিষয়টির উপর।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্তও কিন্তু আমরা ভেবে এসেছি যে, কোন পদার্থের পরমাণু অবিভাজ্য, তাকে আর কোন মৌলিক অংশে ভাগ করা যায় না। একশোটির মত মৌলিক পদার্থ রয়েছে - লোহা, সোনা, অক্সিজেন, ক্লোরিন বা হাইড্রোজেনের মত মৌলিক পদার্থগুলোর পরমাণুই হচ্ছে তার সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশ, একে আর ছোট অংশে ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব নয়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান আমাদেরকে নিয়ে গেছে জ্ঞানের এক নতুন দিগন্তে। আমরা এখন জানি যে, প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুই ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রনের সমন্বয়ে তৈরি। পরমাণুর মাঝখানে কেন্দ্রে রয়েছে নিউক্লিয়াস যা প্রোটন এবং নিউট্রনের সমন্বয়ে তৈরি আর তার চারপাশের অক্ষে ঘুরছে ইলেকট্রনগুলো। নিউট্রনের কোন চার্জ নেই, সে নিরপেক্ষ, ইলেকট্রন ঋণাত্মক আর প্রোটন ধ্বনাত্মক চার্জবিশিষ্ট্য। সাধারণতঃ একটি পরমাণুতে ইলেকট্রন, প্রটোনের সংখ্যা

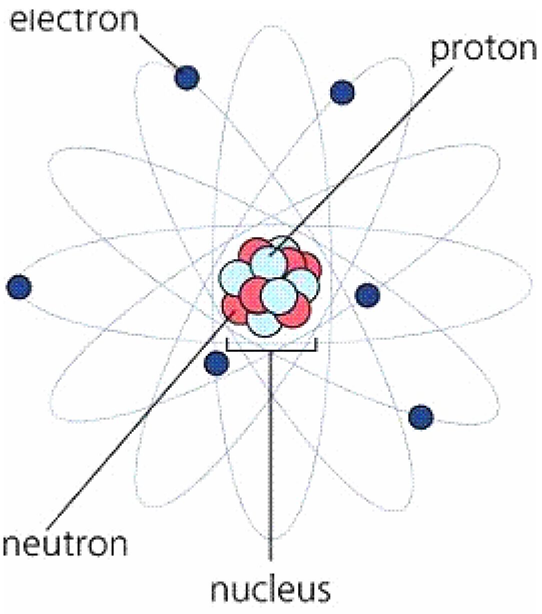

চিত্র ৭.৪ : পরমাণুর গঠন

সমান থাকে বলে তাদের ধ্বনাত্মক এবং ঋণাত্মক চার্জ কাটাকাটি হয়ে তার মধ্যে নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। মৌলিক পদার্থগুলোর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা যে আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখি তার কারণ আর কিছুই নয়, তাদের পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রনের সংখ্যার তারতম্য। অর্থাৎ সোনার পরমাণু বা নিউক্লিয়াস কিন্তু সোনা দিয়ে তৈরি নয়, তাদের মধ্যে সোনার কোন নাম গন্ধও নেই। অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন বলুন, সোনা বলুন, রূপা বলুন, হেলাফেলা করা তামা বা সীসাই বলুন সব মৌলিক পদার্থই এই তিনটি মুল কণা, ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রনের সমন্বয়েই গঠিত। লোহার সাথে সোনার পার্থক্যের কারণ এই নয় যে তার নিউক্লিয়াস সোনার মত দামী বা চকচকে কণা দিয়ে তৈরি! এর কারণ তাদের পরামাণুর ভিতরে এই মুল কণাগুলোর সংখ্যার পার্থক্য- সোনার নিউক্লিয়াসে রয়েছে ৭৯টি প্রোটন এবং ১১৮টি নিউট্রন; আর ওদিকে লোহার নিউক্লিয়াসে রয়েছে ২৬টি প্রোটন এবং ৩০টি নিউট্রন। একই ধরণের ব্যাপার দেখা যায় আমাদের ডিএনএ-এর গঠনের ক্ষেত্রেও। মানুষ, ঘোড়া, ফুলকপি বা আরশোলার জিনের উপাদানে তাদের আলাদা আলাদা কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে না, তারা সবাই ডিএনএ-এর সেই চারটি নিউক্লিওটাইডের (A=adenine, G= guanine, C=cytosine T=thymine) বিভিন্ন রকমফেরে তৈরি [৫]।

আমাদের চারদিকে আমরা যে সব পদার্থ দেখি তার বেশীরভাগই যৌগিক পদার্থ, সাধারণভাবে বলতে গেলে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থগুলোর মধ্যে ইলেকট্রন বিনিময়ের ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমেই এই যৌগিক পদার্থগুলোর উৎপত্তি হয়। একটা ইলেকট্রন কণা শুষে নিয়ে একটা প্রোটন কণা নিউট্রনে পরিণত হয়ে যেতে পারে, আবার ঠিক উলটোভাবে একটা নিউট্রন তার ভিতরের একটি ঋণাত্মক চার্জ বের করে দিয়ে পরিণত হতে পারে প্রোটন কণায়। কিন্তু শুনতে যতটা সোজা সাপ্টা শোনাচ্ছে ব্যাপারটা আসলে কিন্তু ঠিক সেরকম নয়। এ ধরণের পরিবর্তন সম্ভব শুধুমাত্র নিয়ক্লিয়ার বা পারমাণবিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে। এর জন্য প্রয়োজন হয় বিশাল পরিমাণ শক্তির (energy), আর তাই যে কোন পারমাণবিক বিক্রিয়া থেকে যে শক্তি নির্গত হয় তার সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়ার কোন তুলনাই করা সম্ভব নয়। সাধারণ বোমার চেয়ে নিউক্লিয়ার বোমা বহুগুণ শক্তিশালী। হিরোসিমায় পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ভয়াবহতা তাই আমাদেরকে স্তম্ভিত করে দেয়। নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার ফলে পরমাণুর নিউক্লিউয়াসের গঠন বদলে যায়, কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নিউক্লিয়াসের কোন পরিবর্তন ঘটে না। আর ঠিক এ কারণেই সেই আরবীয় অ্যালকেমিষ্টরা বহু শতকের চেষ্টায়ও অন্য ধাতুকে সোনায় পরিণত করতে পারেননি, কারণ এর জন্য প্রয়োজন ছিলো নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার। প্রায় হাজার বছর আগে, সে সময়ে পরমাণুর গঠন বা পারমাণবিক বিক্রিয়ার কথা জানা না থাকায় তারা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমেই মৌলিক ধাতুর পরিবর্তনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন যুগ যুগ ধরে [৫]।

প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের নিউক্লিউয়াসেই নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন কণা থাকে, আর নিউক্লিয়াসে প্রটোনের এই সংখ্যাকে বলে পারমাণবিক সংখ্যা (atomic number) যা দিয়ে মুলতঃ মৌলিক পদার্থের বেশীরভাগ রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় (পরোক্ষভাবে একে ইলেকট্রনের সংখ্যাও বলা যেতে পারে কারণ সাধারণভাবে পরামাণুর কক্ষ পথে বিপরীত চার্জবিশিষ্ট্য ইলেকট্রনের সংখ্যাও সমান থাকে)। ইলেকট্রনের তুলনায় প্রোটন এবং নিউট্রনের ভার অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী, তাই কোন পদার্থের ভর সংখ্যা (mass number) মাপা হয় তার প্রোটন এবং নিউট্রনের সংখ্যা দিয়ে। যেমন ধরুন, সাধারণত কার্বনের নিউক্লিউয়াসে ৬টি প্রোটন এবং ৬টি নিউট্রন থাকে, তাই তার ভর সংখ্যা হচ্ছে ১২, একে বলে কার্বন-১২। সাধারণভাবে নিউক্লিউয়াসে নিউট্রনের সংখ্যা প্রটোনের সংখ্যার সমান বা কয়েকটা বেশী থাকে। কিন্তু আবার কখনও কখনও কোন কোন পদার্থের নিউক্লিয়াসে সমান সংখ্যক প্রোটন থাকলেও তাদের বিভিন্ন ভারশান এর মধ্যে নিউট্রনের সংখ্যায় ভিন্নতা দেখা যায়। যেমন, কার্বন-১৩ এ রয়েছে ৭টি

নিউট্রন আর কার্বন-১৪এ থাকে ৮টি নিউট্রন, যদিও তাদের প্রত্যেকেরই প্রটোনের সংখ্যা সেই ৬টিই। আর মৌলিক পদার্থগুলোর মধ্যে যখন প্রটোনের সংখ্যা সমান থাকে কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যায় তারতম্য দেখা যায় তখন তাদেরকে বলা হয় আইসোটোপ (Isotope)। তেজস্ক্রিয় ক্ষয় এবং তেজস্ক্রিয় ডেটিং বুঝতে হলে এই আইসোটোপের ব্যাপারটা ভালো করে বোঝা দরকার। এই আইসোটোপগুলোরই কোন কোনটা প্রকৃতিতে অস্থিত অবস্থায় থাকে এবং তারা ধীরে ধীরে ক্ষয়ের মাধ্যমে নিজেদের নিউক্লিয়াসের গঠনের পরিবর্তনের মাধ্যমে আরেক মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। আইসোটোপের এই অস্থিরতারই আরেক নাম হচ্ছে 'রেডিওঅ্যাকটিভিটি' বা 'তেজস্ক্রিয়তা'। আর যে পদ্ধতিতে ক্ষয় হতে হতে তারা আরেক পদার্থে পরিণত হয় তাকেই বলে 'তেজস্ক্রিয় ক্ষয়'। যেমন ধরুন, সীসার ৪টি সুস্থিত, কিন্তু ২৫টি অস্থিত আইসোটোপ আছে, আর এই ২৫টি অস্থিত আইসোটোপই হচ্ছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ। আবার ইউরেনিয়ামের সবগুলো আইসোটোপই অস্থিত এবং তেজস্ক্রিয় [৫]। আর আমাদের এই পরম ডেটিং পদ্ধতির মুল চাবিকাঠিই হচ্ছে পদার্থের এই তেজস্ক্রিয় বৈশিষ্ট্য এবং তার ফলশ্রুতিতে ঘটা তেজস্ক্রিয় ক্ষয়।

এই তেজস্ক্রিয় ক্ষয় ঘটতে পারে বিভিন্নভাবে। আলফা এবং বেটা ক্ষয়ের কথা অনেক শুনি আমরা। আলফা ক্ষয়ের সময় আইসোটোপটি একটা আলফা কণা (দু'টো প্রোটন এবং দু'টো নিউট্রনের সমন্বয়ে তৈরি এই আলফা কণা) হারায় তার নিউক্লিয়াস থেকে। অর্থাৎ তার ভারসংখ্যা ৪ একক কমে গেলেও পারমাণবিক সংখ্যা বা প্রটোনের সংখ্যা কমছে মাত্র ২ একক। কিন্তু এর ফলাফল কি দাঁড়াচ্ছে? আর কিছুই নয়, নিউক্লিউয়াসের গঠনের পরিবর্তন হয়ে আইসোটোপটি এক মৌলিক পদার্থ থেকে আরেক মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। একটা উদাহরণ দিলে বোধ হয় ব্যাপারটা আরেকটু খোলাসা হবে - আলফা ক্ষয়ের ফলে ইউরেনিয়াম ২৩৮ (৯২ টি প্রোটন এবং ১৪৬ নিউট্রনের সমন্বয়ে তৈরি এই মৌলিক পদার্থটি) পরিণত হচ্ছে সম্পুর্ণ নতুন এক মৌলিক পদার্থ থোরিয়াম ২৩৪-এ (৯০ টি প্রোটন এবং ১৪৪ নিউট্রনের সমন্বয়ে তৈরি)। ওদিকে আবার বেটা ক্ষয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু ঘটে আরেক ঘটনা। আইসোটোপের পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন বের করে দিয়ে নিউক্লিয়াসের ভিতরের একটি নিউট্রন প্রোটনে পরিণত হয়ে যায়। আরও বিভিন্ন ধরণের প্রক্রিয়ায় তেজস্ক্রিয় ক্ষয় ঘটতে পারে, সময় এবং জায়গার অভাবে এখন আর বিস্তারিত বর্ণনায় যাচ্ছি না। তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের মুলে রয়েছে বিভিন্ন আইসোটোপের ভিতরের নিউক্লিয়াসের গঠনের পরিবর্তন বা পারমাণবিক পরিবর্তন এবং তার ফলশ্রুতিতেই এক মৌলিক পদার্থ থেকে আরেক নতুন মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয় - এই ব্যাপারটা বোধ হয় এতক্ষনে আমাদের কাছে বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আর যেহেতু ভূত্বকের বিভিন্ন শীলাস্তরে বিভিন্ন ধরনের আইসোটোপ পাওয়া যায় তাই এই তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে শীলা বা ফসিলের বয়স নির্ধারণ করা হয়। চলুন তাহলে দেখা যাক কিভাবে এই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলোকে ভূতাত্ত্বিক ঘড়ি হিসেবে ব্যবহার করে পৃথিবী এবং তার প্রাণের বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাসের চিত্রটিকে বিজ্ঞানীরা কালি কলমে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

বিভিন্ন শীলার মধ্যে বিভিন্ন ধরণের খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকে, আর এই খনিজ পদার্থের মধ্যেই থাকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলো। আধুনিক তেজস্ক্রিয় ডেটিং পদ্ধতিগুলোর মধ্যে ইউরেনিয়াম-সিরিজ ডেটিং বহুলভাবে ব্যবহৃত। তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম-২৩৮ ক্ষয় হতে হতে সীসা-২০৬ এ পরিণত হয় সুদীর্ঘ সাড়ে চারশো কোটি বছরে। এক এক করে, পুর্বনির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট হারে এই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলো নতুন এক স্থিত এবং অতেজস্ক্রিয় পদার্থে পরিণত হয়ে যেতে থাকে। দীর্ঘ সময়ের বিস্তৃতিতে ঘটতে থাকলেও এই ক্ষয় কিন্তু ঘটে একটি সুনির্দিষ্ট হারে, আর সেখানেই লুকিয়ে রয়েছে আমাদের রেডিওমেট্রিক বা তেজস্ক্রিয় ডেটিং পদ্ধতির জীয়ণকাঠি। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এই ক্ষয়ের হার মাপার জন্য আইসোটোপের

হাফ-লাইফ (Half-Life) বা অর্ধ-জীবন -এর হিসাবটি ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞানীরা প্রথমে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে, কোন এক আইসোটোপের নমুনার পারমাণূর অর্ধেকাংশের ক্ষয় হয়ে যেতে কত সময় লাগবে তার হিসেবটা বের করে ফেলেন। আইসোটোপের অর্ধ-জীবনের ব্যাপারটা একটা উদাহরণের মধ্যমে ব্যাখ্যা করে দেখা যাকঃ ধরুন, কোন একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ 'ক' -এর অর্দ্ধ-জীবন এক লাখ বছর, সে ধীরে ধীরে তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের মাধ্যমে মৌলিক পদার্থ 'ক' থেকে 'খ' এ পরিণত হয় এবং এক লাখ বছরের শুরুতে পরমাণুর সংখ্যা ছিলো ১০০০। এখন প্রথম এক লাখ বছর বা এক অর্দ্ধ-জীবন পার করে দেওয়ার পর আমরা আইসোটোপটিকে কি অবস্থায় দেখতে পাবো? আইসোটোপ 'ক' -এর ১০০০ পরমাণুর অর্ধেক ৫০০ পরামাণু এখনও সেই আগের অবস্থা 'ক' তেই রয়ে গেছে আর বাকী অর্দ্ধেক বা ৫০০ পরমাণু 'খ'তে পরিণত হয়ে গেছে। তাহলে কি ২ লাখ বছর 'ক' -এর সবটাই 'খ' তে পরিণত হয়ে যাবে? না, অর্দ্ধ-জীবনের হিসেবের কায়দাটা বেশ সোজা হলেও ঠিক এরকম সরলরৈখিক নয়। দুই লাখ বছর পরে দেখা যাবে যে, 'ক' -এর অবশিষ্ট ৫০০ পরমাণুর অর্দ্ধেক অর্থাৎ আরও ২৫০টি 'খ' তে পরিণত হয়ে 'খ' -এর পরমাণুর মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৫০ এ, আর তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের ফলশ্রুতিতে 'ক' তে এখন অবশিষ্ট রয়েছে ২৫০টি পরমাণু [৬]। তারপর তিন লাখ বছর পর 'খ' -এর পরমাণুর সংখ্যা এসে দাঁড়াবে ৮৭৫ এ। এখন ধরুন, তিন লাখ বছর পর আজকে এখানে দাঁড়িয়ে একজন বিজ্ঞানী খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারবেন এই আইসোপটিসহ শীলাটির বয়স কত। আর তার জন্য তাকে জানতে হবে দু'টো তথ্যঃ আইসোটোপ 'ক' -এর অর্দ্ধ-জীবন কত (বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যেই তার বিস্তারিত তালিকা তৈরি করে রেখেছেন), আর ওই শীলায় 'ক' এবং 'খ' -এর পরিমানের আনুপাতিক হার কত।

ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরী ইত্যাদির ফলশ্রুতিতে ভুপৃষ্ঠে লাভা নির্গত হয়। লাভা যে মুহূর্তে ঠান্ডা এবং শক্ত হয়ে কেলাষিত হতে শুরু করে, তখন থেকেই ঘুরতে শুরু করে এই তেজস্ক্রিয় ঘড়ির কাঁটা। তখন থেকেই ক্রমাগতভাবে নির্দিষ্ট হারে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ এবং ক্ষয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়, নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এই তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থগুলো রূপান্তরিত হতে শুরু করে আরও সুস্থিত অন্য কোন মৌলিক পদার্থে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া যখন চলতে থাকে তখন আংশিকভাবে রূপান্তরিত পদার্থটির অংশটিও শিলাস্তরে ভিতরেই রয়ে যায়। তাই এদের দু'টোর পরিমাণের আনুপাতিক হার নির্ধারণ করা কোন কঠিন কাজ নয়। যেমন ধরুন, পটাসিয়াম-৪০ যখন সুস্থিত আর্গন-৪০ এ পরিণত হতে থাকে, তখন আর্গন-৪০ লাভার কেলাষের মধ্যে গ্যাসের আকারে আটকে থাকে। বিভিন্ন শীলার মধ্যে বহুল পরিমাণে পটাসিয়াম-আর্গন পাওয়া যায় বলে বিজ্ঞানীরা বহুলভাবে পটাসিয়াম-আর্গন ডেটিং পদ্ধতি ব্যবহার করেন। ইউরেনিয়াম সিরিজের ডেটিং -এর কথা আগেই উল্লেখ করেছিলাম। ইউরেনিয়াম ২৩৮ -এর অর্ধ-জীবন সাড়ে চারশো কোটি বছর, পটাসিয়াম ৪০ -এর হচ্ছে ১৩০ কোটি বছর, ইউরেনিয়াম ২৩৫ -এর ৭৫ কোটি বছর, ওদিকে আবার কার্বন ১৫ -এর অর্দ্ধ-জীবন হচ্ছে মাত্র ২.৪ সেকেন্ড। এত বিশাল সময়ের পরিসরে বিস্তৃত অর্ধ- জীবন সম্পন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো রয়েছে বলেই বিজ্ঞানীরা আজকে একটি দু'টি নয়, বহু রকমের তেজস্ক্রিয় ডেটিং বা অন্যান্য ডেটিং -এর সাহায্য নিতে পারেন কোন ফসিলের বয়স নির্ধারণের জন্য। ফসিলের আপেক্ষিক বয়স সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারলে সেই অনুযায়ী প্রযোজ্য ডেটিং পদ্ধতিটা ব্যবহার করেন তারা। বিভিন্ন পদ্ধতিতে ক্রস-নিরীক্ষণ করে তবেই তারা নিশ্চিত হন ফলাফল সম্পর্কে। আর তার ফলেই সম্ভব হয়ে ওঠে এত সুনির্দিষ্টভাবে এত প্রাচীন সব ফসিলের বয়স নির্ধারণ করা। চলুন দেখা যাক বিভিন্ন ধরণের ডেটিং পদ্ধতি ব্যবহার করে কি করে ফসিলের বয়স বের করা হয়।

অনেক শীলাস্তরে বিশেষ করে আগ্নেয় শীলাস্তরে প্রচুর পরিমাণে ইউরেনিয়াম, পটাসিয়াম জাতীয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া যায়। আবার পাললিক শীলার মধ্যে তেমন কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের অস্তিতই থাকে না।

কিন্তু আমরা জানি যে, আগ্নেয় শীলায় ফসিল সংরক্ষিত হয় না, ফসিল পাওয়া যায় শুধু পাললিক শীলাস্তরে। তাহলে পাললিক শীলাস্তরের এই ফসিলগুলোর বয়স কিভাবে নির্ধারণ করা হয়? এক্ষেত্রে আপেক্ষিক এবং পরম দু'টো পদ্ধতিই ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথমে পাললিক শীলা স্তরের উপরে এবং নীচে যে আগ্নেয় শিলাস্তর দু'টো তাকে স্যান্ডুইচের মত আটকে রেখেছে, তাদের বয়স নির্ধারণ করা হয়। এখান থেকে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন যে মধ্যবর্তী পাললিক শিলাস্তরে সংরক্ষিত ফসিলের বয়স এই দুই আগ্নেয় শিলাস্তরের বয়সের মাঝামাঝিই হবে। এখন যদি দেখা যায় যে, ফসিলটির নিজের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ আটকে গেছে তাহলে তেজস্ক্রিয় ডেটিং -এর মাধ্যমে ফসিলটির বয়স সরাসরিই নির্ধারণ করা যেতে পারে। সরাসরি ফসিলের বয়স হিসেব করার জন্য তেজস্ক্রিয় ডেটিং পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রেডিওকার্বন ডেটিং হচ্ছে অত্যন্ত বহুলভাবে ব্যবহৃত আরেকটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতি দিয়ে শিলাস্তরের বয়স নয়, ফসিলের মধ্যে মৃত টিস্যুরই বয়স সরাসরি নির্ধারণ করে ফেলা যায়। কয়েক হাজার বছরের অর্থাৎ ভূতাত্ত্বিক সময়ের বিচারে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস জানার জন্য এই পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। বিশেষ করে মানুষ এবং তার পূর্বপুরুষদের ফসিলের বয়স নির্ধারণে ব্যাপকভাবে রেডিও কার্বন ডেটিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

সাধারণত আমরা প্রকৃতিতে যে কার্বনের কথা শুনি তার প্রায় সবটাই সুস্থিত আইসোটোপ কার্বন ১২। তবে খুবই সামান্য পরিমাণে হলেও অস্থিত কার্বন-১৪ -এর অস্তিত্বও দেখতে পাওয়া যায় প্রকৃতিতে। কসমিক রেডিয়েশন বা বিচ্ছুরণের ফলে বায়ুমন্ডলে অনবরতই একটি নির্দিষ্ট হারে সুস্থিত নাইট্রজেন ১৪ থেকে এই কার্বন-১৪ তৈরি হতে থাকে। এই কার্বন-১৪ -এর অর্ধ-জীবন হচ্ছে ৫,৭৩০ বছর, অর্থাৎ প্রতি ৫৭৩০ বছরে কার্বন-১৪ -এর অর্ধেকাংশ তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের মাধ্যমে নাইট্রোজেন-১৪ এ রূপান্তরিত হয়। কার্বন-১৪ -এর অর্ধ-জীবন এত ছোট যে, খুবই অল্প পরিমাণে হলেও ক্রমাগতভাবে নাইট্রজেন ১৪ থেকে কার্বন ১৪ তৈরি হতে না থাকলে প্রকৃতিতে এর অস্তিত বেশীদিন টিকে থাকতে পারতো না। যাই হোক, এর উৎপত্তি এবং ক্ষয়ের হার ধ্রুব হওয়ার কারণে প্রকৃতিতে কার্বন-১২ আর কার্বন-১৪ -এর আনুপাতিক হার সব সময় সমান থাকে। এই দুই রকমের কার্বন আইসোটোপই বায়ুমন্ডলে রাসায়নিকভাবে অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইডে পরিণত হয়ে যায়। উদ্ভিদ তার খাদ্য তৈরির জন্য এই কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহন করে, আর ওদিকে প্রাণীকুল গ্রহন করে উদ্ভিদকে তার খাদ্য হিসেবে, আবার তারাই হয়তো পরিণত হয় অন্য কোন প্রাণীর খাদ্যে। উদ্ভিদ যেহেতু কার্বন-১২ আর কার্বন-১৪ দিয়ে তৈরি উভয় কার্বন ডাই অক্সাইডই গ্রহন করে তাই সমগ্র ফুড চেইন বা খাদ্য শৃংখল জুড়েই এই দুই কার্বন আনুপাতিক হারে সমানভাবেই বিরাজ করে। বায়মন্ডল থেকে উদ্ভদে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীর দেহে সঞ্চারিত হয় এই কার্বন ১২ এবং কার্বন ১৪। কিন্তু এই চক্রের সব কিছুই বদলে যায় যেই মাত্র প্রাণী বা উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটে, সে আর নতুন কোন কার্বন ১৪ গ্রহন করতে পারে না, তখন তার দেহে বিদ্যমান কার্বন-১৪ একটি নির্দিষ্ট হারে নাইট্রজেন ১৪ এ রূপান্তরিত হতে থাকে। সুতরাং একটা মৃত জীবের দেহে কার্বন-১২ -এর তুলনায় কার্বন ১৪ -এর পরিমান আনুপাতিক হারে কমে যেতে শুরু করে। আর সে কারণেই ফসিলের দেহে বিদ্যমান কার্বন-১২ এবং কার্বন-১৪ -এর এই আনুপাতিক হার হিসেব করে সহজেই তার বয়স নির্ধারণ করে ফেলা যায়। তবে রেডিও কার্বন ডেটিং পদ্ধতি দিয়ে শুধুমাত্র অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের ফসিলের বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব, ৩০ হাজার থেকে খুব বেশী হলে ৫০ হাজার বছরের পুরনো ফসিলের বয়স বের করা সম্ভব এই পদ্ধতিতে। আমরা আগেই দেখেছি, কার্বন-১৪ -এর অর্ধ-জীবন ভূতাত্ত্বিক সময়ের অনুপাতে খুবই ক্ষদ্র, মাত্র ৫৭৩০ বছর [৬]। তাই, ৩০-৫০ হাজার বছরের চেয়েও পুরনো ফসিলে যে অতি সামান্য পরিমাণে কার্বন ১৪ বিদ্যমান থাকে তা দিয়ে আর যাই হোক সঠিকভাবে তার বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে কয়েক হাজার বছরের ফসিলের ডেটিং -এর জন্য এই পদ্ধতির জুড়ি

মেলা ভার।

তাহলে দেখা যাছে যে, তেজষ্ক্রিয় পদার্থগুলোর এই সুনির্দিষ্ট অর্দ্ধ-জীবনের ব্যাপারটি আমাদের সামনে শীলাস্তরের এবং ফসিলের বয়স বের করার এই অনবদ্য সুযোগের দরজাটি খুলে দিয়েছে। বহু আগে থেকেই ধারণা করে আসলেও ১৯২০ সালের দিকেই প্রথম তেজষ্ক্রিয় ডেটিং পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখানো হয়েছিলো যে, পৃথিবীর বয়স কয়েকশো কোটি বছর [৭]। তারপর থেকে বিজ্ঞানীরা নানাভাবেই নানা রকমের তেজষ্ক্রিয় পদ্ধতিতে ভূতাত্ত্বিক বয়স নির্ধারণের উপায় বের করেছেন। আর শুধু তেজষ্ক্রিয় ডেটিং ই তো নয়, এর সাথে সাথে আরও বিভিন্ন ধরণের আধুনিক পদ্ধতিও আবিষ্কার করা হয়েছে পৃথিবীর এই মহাযাত্রার সময়কাল নির্ধারণের জন্য। যেমন ধরুন, বিজ্ঞানীরা এখন জানেন যে, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র প্রায়শঃই তার দিক পরিবর্তন করে। 'প্রায়শঃ' বলতে আমাদের সাধারণ হিসেবে নয়, ভুতাত্ত্বিক বিশাল সময়ের তুলনায় 'প্রায়শঃই' বোঝানো হচ্ছে এখানে। গত এক কোটি বছরে পৃথিবী নাকি মোট ২৮২ বার উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ থেকে উত্তরে তার চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক পরিবর্তন করেছে [৫]। আর তার সাথে সাথে আমাদের পৃথিবীর অভ্যন্তরের আগ্নেয়গিরীর গলিত শীলার ভিতরের খনিজ পদার্থগুলোও কম্পাসের মতই দিক পরিবর্তন করে এবং তার একটা সুনির্দিষ্ট রেকর্ড রেখে দেয়। তারপর যখন এই লাভাগুলো শক্ত হয়ে শীলাস্তরে পরিণত হয় তখন এই রেকর্ডগুলো অবিকৃত অবস্থায় ওইভাবেই থেকে যায়। এ থেকেও ভূতত্ত্ববিদেরা অনেক শিলাস্তরেরই আপেক্ষিক বয়স নির্ধারণ করতে পারেন। এছাড়া আরও মজার মজার ধরণের কিছু ডেটিং পদ্ধতি রয়েছে, যেমন ধরুন, বড় বড় গাছের কান্ডে যে রিং বা বৃত্ত তৈরি হয় তার মাধ্যমেও উদ্ভিদের ফসিলের বা কাঠের বয়স বের করে ফেলা সম্ভব। বাৎসরিক বৃদ্ধির ফলে গাছের গোড়ায় যে স্তর বা বৃক্ষ-বৃত্তের সৃষ্টি হয় তা এক ধরণের প্রাকৃতিক নিয়ম মেনেই ঘটে, আর এর থেকেই বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বের করতে পারেন তার বয়স। এরকম আরও বহু ধরণের ডেটিং পদ্ধতি রয়েছে, নীচের ছবিটিতে (চিত্র ৭.৫) এরকম বিভিন্ন ধরণের ডেটিং পদ্ধতি এবং তাদের দিয়ে কোন কোন সময়ের সীমা নির্ধারণ করা যায় তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল [৮]। এখন আর আমাদের একটি বা দু'টি ডেটিং পদ্ধতির উপর নির্ভর করে শীলাস্তর বা ফসিলের বয়স নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয় না।

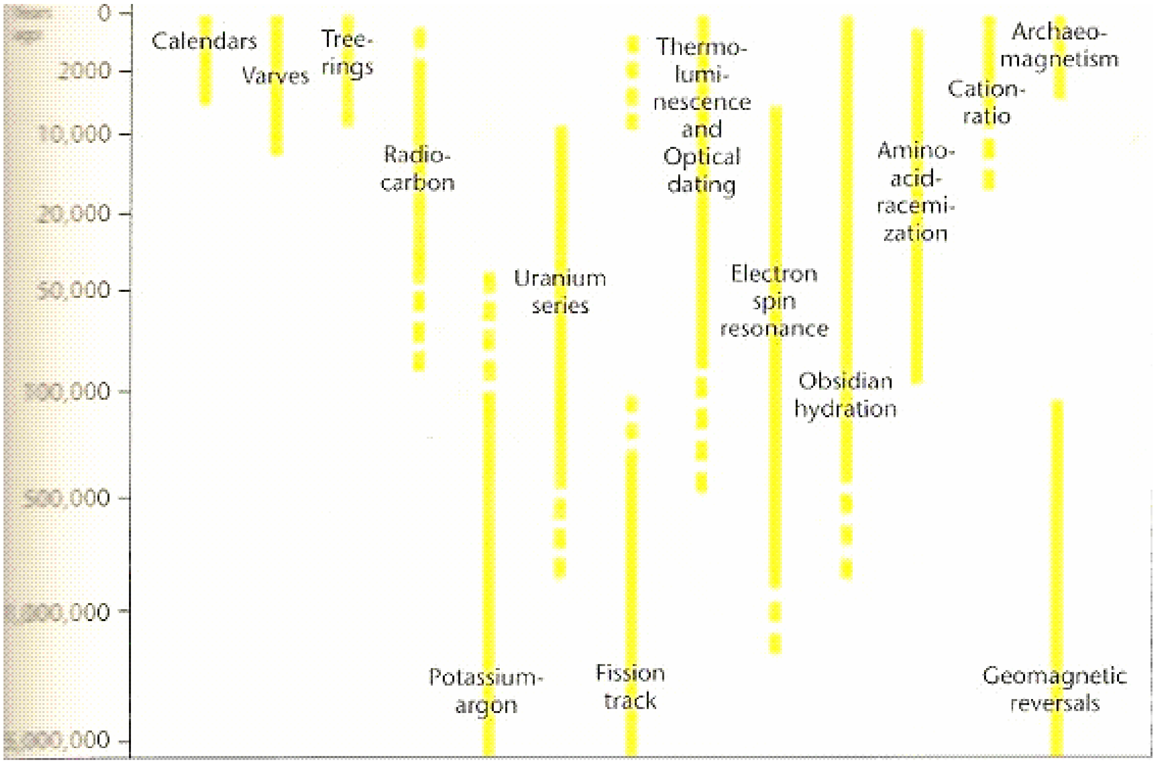

চিত্র ৭.৫ : পরমাণুর গঠন বিভিন্ন রেঞ্জের সময়ের জন্য বিভিন্ন ধরণের ডেটিং পদ্ধতি:

আমাদের হাতে আছে বহু রকমের পদ্ধতি যা দিয়ে কোন একটা ফলাফলকে বারবার বিভিন্নভাবে ক্রস চেক বা নিরীক্ষণ করে নিতে পারি। পদ্ধতিগুলো শুধু যে বৈজ্ঞানিক তাইই নয়, প্রয়োজন এবং গুরুত্ব অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা এত রকমের পদ্ধতি ব্যবহার করেন যে, এর ফলাফলের সঠিকতা নিয়ে আর দ্বিমত বা সন্দেহ প্রকাশ করার তেমন অবকাশ থাকে না। খ্রিষ্টীয় ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন রক্ষণশীল দলগুলো এখনও যখন বাইবেলের সেই ছয় হাজার বছরের পৃথিবীর সৃষ্টির ইতিহাস নিয়ে হইচই করেন এবং এই ডেটিং পদ্ধতিগুলোকে ভুল বলে চালিয়ে দেওয়ার প্রচারণায় লিপ্ত হন তখন তাদের অজ্ঞতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কি বা করার থাকে? উট পাখীর মত বালিতে মাথা গুঁজে পড়ে থাকলেই তো আর বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যাবে না। সত্যকে মেনে নিয়ে জ্ঞানের সীমাকে প্রসারিত করাই হচ্ছে মানব সভ্যতার রীতি, এভাবেই আমরা এগিয়েছি। একটু একটু করে, সেই গুহাবাস থেকে আজকের এই সীমাহীন মহাজাগতিক এক আধুনিক ভবিষ্যতের দিগন্তরেখার দিকে।

তথ্যসূত্র:

১. Stringer C and Andrews P, 2005, The Complete World of Human Evolution, Thames and Hudson Ltd, London, p 22.

২. http://www.actionbioscience.org/evolution/benton.html

৩. http://pubs.usgs.gov/gip/fossils/intro.html

৪. - Ridley M, 2004, Evolution, BlackwellPublishing, Oxford, UK, p 526.

- Futuyma DJ, 2005, Evolution, Sinauer Associates, INC, MA, USA, p.70

- Berra TM, 1990, Evolution and the Myth of Creationism, StanfordUniversity Press, Stanford, California, pp 35-78.

- আখতারজ্জামান ম , ২০০২, বিবর্তনবাদ, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃঃ ১৮১।

- http://www.enchantedlearning.com/subjects/Geologictime.html

৫. Dawkins, R, 2004, The Ancester's tale, Houghton Miffin Company, NY, Boston: USA, pp 516-523.

৬. Berra TM, 1990, Evolution and the Myth of Creationism, Stanford University Press, Stanford, California, pp 36-37.

৭. http://www.actionbioscience.org/evolution/benton.html

৮. Stringer C and Andrews P, 2005, The Complete Wrold of Human Evolution, Thames and Hudson Ltd, London, p 32

অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

{বন্যা আহমেদের *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটি অবসর প্রকাশনী থেকে ২০০৭-এর একুশে বইমেলায় প্রকাশিতব্য। এই অংশটি বইটির সপ্তম অধ্যায়।}

অষ্টম অধ্যায়

মিসিং লিংকগুলো আর মিসিং নেই

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পর

ফসিলের কথা লিখতে গিয়ে আগের অধ্যায়গুলোতে প্রাসঙ্গিকভাবেই প্লেট টেকটনিক্স, মহাদেশীয় সঞ্চরণ, রেডিওঅ্যাকটিভ ডেটিংসহ এন্তার বিষয়ের আলোচনা চলে এসেছে । তবে এবার বোধ হয় অধ্যায়টি শেষ করার সময় এসেছে, চলুন, বিবর্তনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ের আলোচনার মধ্য দিয়েই ইতি টানা যাক ফসিলের আলোচনার। তত্ত্বকথা তো অনেক হলো এই অধ্যায়ে, তাই এবার চেষ্টা করবো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে না ঢুকে একেবারে সহজ ভাষায় মিসিং লিঙ্ক-এর ব্যাপারগুলো ব্যাখ্যা করার। 'মিসিং লিঙ্ক'বা 'হারানো যোগসূত্র' কথাটা বহুলভাবে প্রচলিত হলেও এটা কিন্তু ঠিক বৈজ্ঞানিক কোন শব্দ নয়। এই মিসিং লিঙ্কগুলো হচ্ছে জীবের বিবর্তনের মধ্যবর্তী স্তরের এমন কিছু ফসিল যারা তাদের আজকের আধুনিক প্রজাতি এবং তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে বিশাল কোন গ্যাপ বা ফাঁক পুরণ করে। অর্থাৎ, আগের প্রজাতি এবং তার থেকে বিবর্তিত হওয়া পরের প্রজাতি - এই দুই প্রজাতি বা ট্যাক্সোনমিক (Taxanomic, শ্রেণীবিন্যাসগত) গ্রুপেরই কিছু কিছু বা মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করে এমন জীবের ফসিলকে অবস্থান্তরিত বা মধ্যবর্তী ফসিল (Transitional Fossil) বা সাধারণভাবে মিসিং লিঙ্ক বলা হয়।

বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই ধারণা করে আসছেন যে, বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সেই ডায়নোসরগুলো থেকেই আজকের আধুনিক পাখির উৎপত্তি ঘটেছে। কিন্তু বললেই তো হল না, এটা তো আর মুখের কথা নয়, কোথায় ডায়নোসর আর কোথায় পাখি! ডায়নোসর কথাটা শুনলেই আমাদের মনে যে দৈত্যের মত দেখতে প্রাণীগুলোর চেহারা ভেসে ওঠে তাদেরকে দোয়েল বা ময়নার মত গোবেচারী পাখিগুলোর পূর্বপুরুষ বানিয়ে দিলেই হল নাকি? কিংবা ধরুন, বেশীরভাগ প্রাণীর বিবর্তনের ইতিহাস বেশ সহজেই নির্ধারণ করা গেলেও তিমি (মাছ!) বা ডলফিনদের নিয়ে বডড বিপাকে পড়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। কি সৃষ্টি ছাড়া জীবই না এই বিশাল-বপু সামুদ্রিক প্রাণীগুলো! সমুদ্রেই থাকে ষোল আনা সময়, সাতরে বেড়ায় মাছের মতই, কিন্তু বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিচার করলে তো এদেরকে কোনভাবেই মাছ বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না! মাছের কি এদের মত ফুসফুস থাকে নাকি তারা বাচ্চা প্রসব করে? আসলে তারা স্তন্যপায়ী প্রাণী, কিন্তু তাহলে তারা পানিতে নেমে এলো কখন বা কি করে? বিজ্ঞানীরা যখন বললেন, এরা আসলে ডাঙ্গার জীবন থেকে সমুদ্রে বিবর্তিত হয়েছে তখন কি মহা হৈ চৈ না পড়ে গিয়েছিলো চারদিকে! বিবর্তনবাদ বিরোধীরা রীতিমত দাবী করতে শুরু করলো মিসিং লিঙ্কগুলো দেখাও, আর না হলে এরকম ভাঁওতাবাজী বন্ধ কর। মাটি থেকে তিমি মাছের পূর্বপুরুষের পানিতে বিবর্তনের মধ্যবর্তী ধাপগুলো দেখাতে না পারলে এই দাবীর কোন যৌক্তিকতাই নেই! ব্যাপারটা আসলেই তো গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতিতে এরকম বড় বড় পরিবর্তন যদি ঘটেই থাকে এবং বিবর্তনের নিয়মানুযায়ী অত্যন্ত ধীর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোটি কোটি বছর ধরেই তা যদি ঘটে থাকে,তাহলে তো তাদের বিভিন্ন মধ্যবর্তী স্তরের ফসিল বা অন্য কোন প্রমাণও তো থাকতে হবে! এরকম উদাহরণ কিন্তু বিবর্তনবাদের জগতে অনেকেই আছে। তাদের সম্পর্কে এই প্রশ্ন জাগাই স্বভাবিক যে কোথায় গেলো মাঝামাঝি স্তরের প্রাণীগুলো বা তাদের মধ্যবর্তী ফসিলগুলো?

আমরা জানি যে, মূলত প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ বছরের ধীর পরিবর্তনের মাধ্যমে এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির উৎপত্তি ঘটে। আমরা আগে এও দেখেছি যে, এক প্রজাতির বিভিন্ন

জীবদের মধ্যেই বিভিন্ন রকমের প্রকরণ থাকে, ধীর গতিতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারায় অধিক সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অংশটি হয়তো দ্রুত গতিতে সংখ্যায় বাড়তে থাকে। তার ফলে প্রজাতির এই অংশের মধ্যে এই ধরনের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত এবং সঞ্চিত হতে হতে এক সময় তারা উপ-প্রজাতিতে পরিণত হয়ে যায় [১]। এই নতুন উপ-প্রজাতির বেশ কয়েক রকমেরই পরিণতি হতে পারে - তারা এরকম একটা উপপ্রজাতি হয়েই চিরতরে টিকে থাকতে পারে, বিলুপ্তও হয়ে যেতে পারে, অথবা আবার বিবর্তনের মাধ্যমে এক নতুন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। আর যদি প্রজাতির একটি অংশ তার মুল প্রজাতি থেকে ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে বিবর্তনের প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত গতিতে তরান্বিত হতে পারে। নিজস্ব গতিতে বিবর্তিত হতে হতে তারা তাদের পূর্বপুরুষের থেকে এতই বদলে যায় যে, তাদের মধ্যে আর প্রজনন ঘটা সম্ভব হয় না। সাধারণত, তখনি আমরা তাদেরকে নতুন প্রজাতি বলে ধরে নেই।

তারপর এই নতুন প্রজাতি এবং তাদের পূর্বপুরুষেরা বিবর্তনের ধারায় নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলে, ফলে বিলুপ্ত হয়ে না গেলে ক্রমাগতভাবে নতুন প্রজাতির সাথে তার পূর্বপুরুষদের বৈশিষ্ট্যগত বিচ্ছিন্নতা বাড়তেই থাকে। কোটি কোটি বছরের ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে এক সময় তাদের মধ্যে পার্থক্য বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়াতে পারে যে এরা একসময় সম্পর্কযুক্ত ছিলো তা নির্ধারণ করাই হয়তো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এমন অবস্থায় আমাদের সেই ফসিল রেকর্ডই ভরসা, মধ্যবর্তী যে স্তরগুলো তারা পার করে এসেছে লক্ষ কোটি বছরের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায়, তার প্রমাণগুলো লুকিয়ে আছে সেই প্রাণীগুলোর অতীতের ফসিলের মধ্যে। যেমন ধরুন, আমার জানি যে, জলের প্রাণীর থেকেই বিবর্তিত হয়ে ডাঙ্গার প্রাণীর উৎপত্তি ঘটেছিলো প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি বছর আগে ডেভোনিয়ান যুগে। এটা তো আর রাতারাতি ঘটেনি। বিবর্তনের তত্ত্ব যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে ধাপে ধাপে এই পরিবর্তন ঘটেছে, ধীরে ধীরে পানি থেকে উঠে এসে লক্ষ কোটি বছরের ছোট ছোট পরিবর্তনের মাধ্যমে মাটির জীবনে অভ্যস্ত হতে হয়েছে তাদের। সেভাবে হিসেব করলে তো নিশ্চয়ই একটা সময় ছিলো যখন পা বা কোন অংগের উপর ভর করা মাছের বিবর্তন ঘটেছিলো যারা হয়তো পানি এবং মাটি দু'জায়গাতেই আংশিকভাবে টিকে থাকতে পারতো, যাদের থেকেই হয়তো এক সময় উভচর প্রাণী এবং পরে সরীসৃপের বিবর্তন ঘটেছে। নিশ্চয়ই তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে কালের পরিণতিতে একসময়ে। অনেকদিন পর্যন্ত এরকম কোন ফসিল পাওয়া না গেলেও বিজ্ঞানীরা একরকম নিশ্চিতই ছিলেন যে এই পথেই বিবর্তন ঘটেছে মাটিতে বাস করা প্রাণীগুলোর। সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা প্রায়ই ফসিল রেকর্ডের এই গ্যাপ বা ফাঁকটি তুলে ধরে বিবর্তন তত্ত্বের ত্রুটি প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন। তাদের মুখে ছাই দিয়ে, গত শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা মাছ থেকে উভচর প্রাণীর বিবর্তনের প্রায় প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী ধাপের ফসিলই আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই তো কিছুদিন আগে ২০০৬ সালের প্রথম দিকে বিজ্ঞানীরা চার পাওয়ালা এমনই এক মাছের ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন যা দিয়ে আসলে এখন এই বিবর্তনের মোটামুটি প্রত্যেকটা ধাপই দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে আমাদের সামনে। এ রকম ধরণের গুরুত্বপুর্ণ মিসিং লিঙ্কগুলোর আবিষ্কার বিবর্তনের তত্ত্বকে শুধু যে শক্তিশালীই করেছে তাই নয়, বিবর্তনবাদ তত্ত্ব যে কতখানি সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাও জোরালোভাবে প্রমাণ করে ছেড়েছে। চলুন তাহলে এবার এরকম কিছু উদাহরণ নিয়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক।

পাখি তাহলে ডায়নোসরেরই উত্তরসুরি!ঃ ১৮৫৯ সালে ডারউইন যখন বিবর্তনের তত্তট্বি প্রস্তাব করেন তখন পাখির বিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে কিন্তু তিনি বেশ মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলেন। বিবর্তনের অনুক্রমে

পাখি ঠিক কোথায় পড়বে? আপাতদৃষ্টিতে এখনকার বা জানামতে আগেকার কোন প্রাণীর সাথেই তো এর তেমন মিল পাওয়া যাচ্ছে না! অনেকেই তখন এই দুর্বলতাটকে কাজে লাগিয়ে বিবর্তন তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। ডারউইনের আমরণ বন্ধু, হ্যা, আমাদের সেই থমাস হাক্সলি (যাকে কিনা ডারউইনের 'বুল ডগ' বলে ডাকা হত) আবারও এগিয়ে এলেন তাকে সেই যাত্রায় রক্ষা করতে। ১৮৬০ সালে বিজ্ঞানীরা প্রায় ১৫ কোটি বছরের পুরনো জুরাসিক যুগের একেবারে শেষের দিকের সময়ের কোন এক অজানা জীবের পালক আবিষ্কার করেন। তার পরের বছরই তারা জার্মানীতে খুঁজে পেলেন অদ্ভুত একটি প্রাণীর ফসিল - আর্কিওপটেরিক্স (*Archaeopteryx*) - একদিকে তার যেমন আছে পাখির মত পাখা এবং পালক, আবার অন্য দিকে দিব্যি পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে ডায়নোসরের মত লম্বা লেজ এবং দাঁতয়ালা চোয়ালের অস্তিত্ব। তবে তার মধ্যে আধুনিক পাখির কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও বেশীর ভাগ বৈশিষ্ট্যই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ডায়নোসর থেরাপডের (therapod) সাথেই বেশী মিলে যায় [২]। এই আর্কিওপটেরিক্স এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া মিসিং লিঙ্ক বা মধ্যবর্তী ফসিলের মধ্যে সবচেয়ে বহুলভাবে আলোচিত একটি ফসিল। হাক্সলি সেই সময়েই সদ্য পাওয়া এই ফসিলটি পরীক্ষা করে বললেন, মনে হচ্ছে, আসলে পাখিগুলো হয়তো একধরণের ডায়নোসর থেকেই বিবর্তিত হয়েছে। সেদিন ফসিলবিদ্যার জগতে মহা হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল ব্যাপারটি নিয়ে। তারপর আরও বেশ কয়েকটি এ ধরণের ফসিলই পাওয়া গেছে গত প্রায় দেড়শো বছরে। কিন্তু তাদের সবারই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পাখির কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও বেশীরভাগ বৈশিষ্ট্যই ছিলো একধরনের ছোট আকারের থেরাপড ডায়নোসর বৈশিষ্ট্যের কাছাকাছি [৩]। তাই খুব পরিষ্কার একটা ধারণা থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা তাদের ডায়নোসর থেকে পাখির বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটিকে এতদিন তত্ত্বে রূপ দিতে পারছিলেন না। আরও কিছু মধ্যবর্তী ফসিলের অস্তিত্ব না খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত এই গোলমেলে ব্যাপারটা নিয়ে শেষ সিদ্ধান্তে পৌছুনো একটু কঠিনই হয়ে যাচ্ছিলো।

চিত্র ১.১ : আর্কিওপটেরিক্সের ফসিল
(সৌজন্যঃ
http://www.ruf.rice.edu/~queller/Bios334/links.htm)

দেড় শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে বিজ্ঞানীদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছে ব্যাপারটার একটা দফা রফা হতে চলেছে। গত কয়েক বছরে চীনে যে অসংখ্য ফসিল পাওয়া গেছে তারা থেরাপড ডায়নোসর থেকে ক্রমান্বয়ে পাখিতে রূপান্তরের বিভিন্ন স্তরকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছে আমাদের চোখের সামনে। সম্প্রতি চীনে পাওয়া সায়নোসরপটেরিক্সের ফসিলের গায়ে ছোট ছোট পালকের নমুনা পাওয়া গেছে, কডিপটেরিক্সের হাতে এবং লেজে পাওয়া গেছে বেশ চওড়া ধরণের পালক, আবার বিজ্ঞানীরা মায়ক্রোর্যাপ্টর গুই নামে এক অদ্ভুত চার পাখাওয়ালা ডায়নোসরের ফসিল আবিষ্কার করেছেন যার সবগুলো পাখায়ই উড়ার সহযোগী পালক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে (চিত্র ৮.২ -৮.৪)।

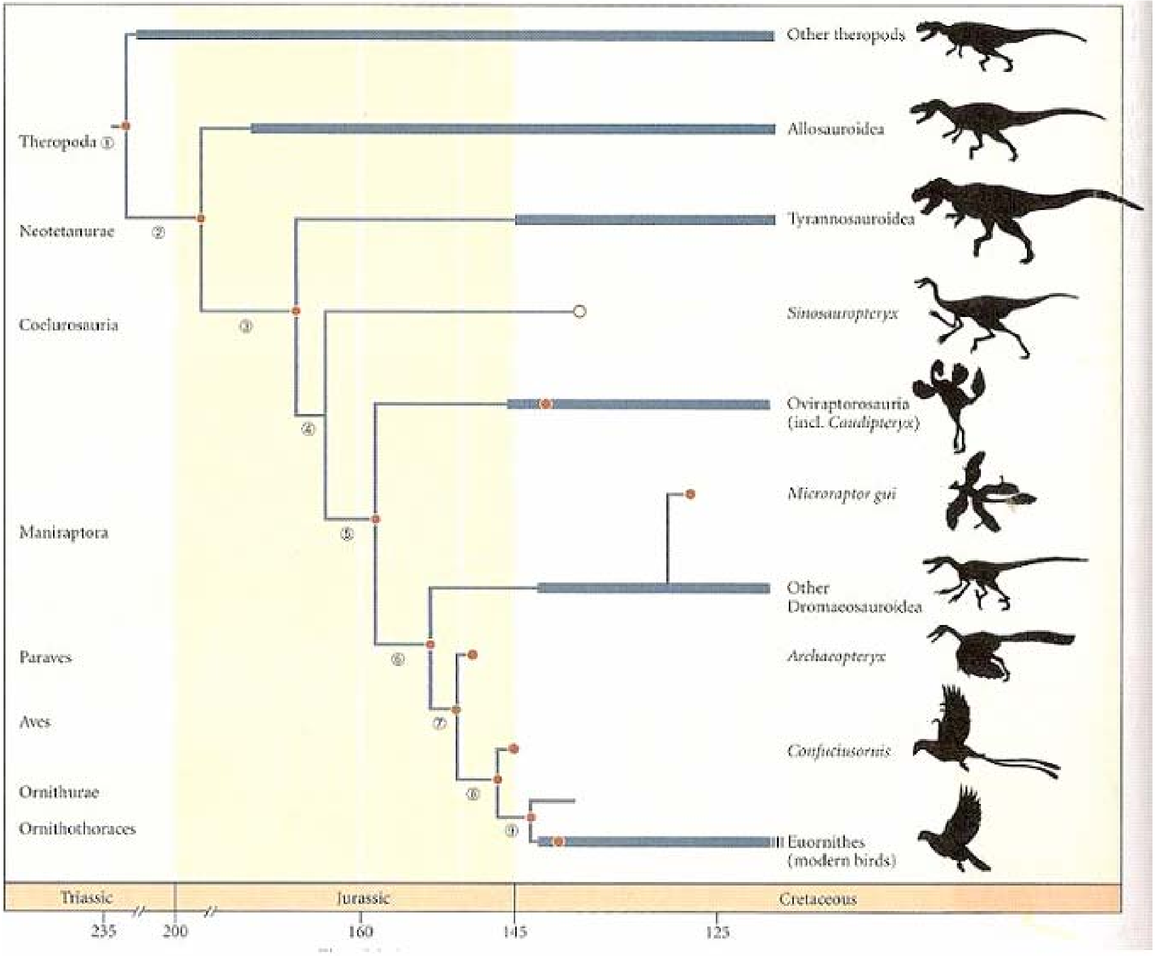

চিত্র ৮.২ : সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হওয়া বিভিন্ন ধরণের থেরাপড ডায়নোসরের বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে উপরের ছবিতে[৩]

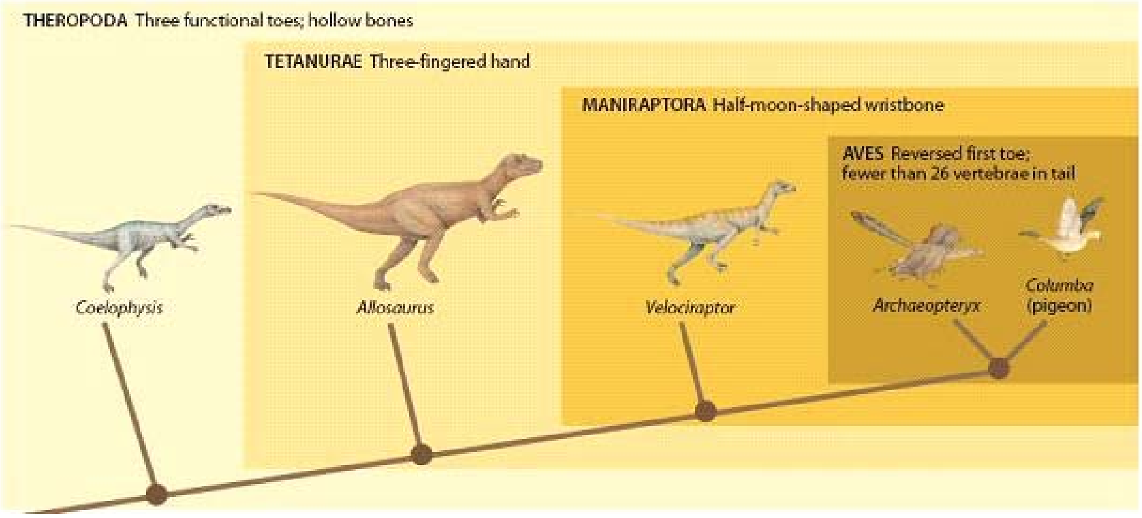

চিত্র ৮.৩ : থেরাপড ডায়নোসর থেকে আধুনিক পাখির বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপের ছবি।
(সৌজন্যঃ Scientific American, Feb 1998, 'The Origin of Birds and their Flight')

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকমের পালকের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া গেছে এই ফসিলগুলোর মধ্যে। আসলে পাখিতে বিবর্তিত হওয়ার অনেক আগেই বিভিন্ন ধরণের থেরাপড ডায়নোসরের মধ্যে পালকের উদ্ভব ঘটে। পালক বা পাখা থাকলেই যে ওড়া যাবে তাও তো নয়, ওড়ার জন্য এক ধরনের বিশেষ ধরণের পালকের প্রয়োজন হয়। তাই পালকের উন্মেষ ঘটার অনেক পরে বিশেষ ধরণের অপ্রতিসম আকারের পালকের বিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত আসলে এই ডায়নোসরগুলোর পক্ষে উড়াল দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এ ধরণের যত নতুন নতুন ফসিলের আবিষ্কার হচ্ছে ততই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারছেন যে, আর্কিওপটেরিক্সের অনেক আগেই ডায়নোসরদের মধ্যে তথাকথিত পাখিসুলভ কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা দিতে শুরু করেছিলো, যেমন ধরুন সরু সরু হাত পার গঠন, বা পালকের বিবর্তন। আবার আধুনিক পাখিগুলোর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন, লেজের হাড়ডিগুলোর জোড়া লেগে ছোট হয়ে যাওয়া, দাঁত বা হাতের নখরের বিলুপ্তি

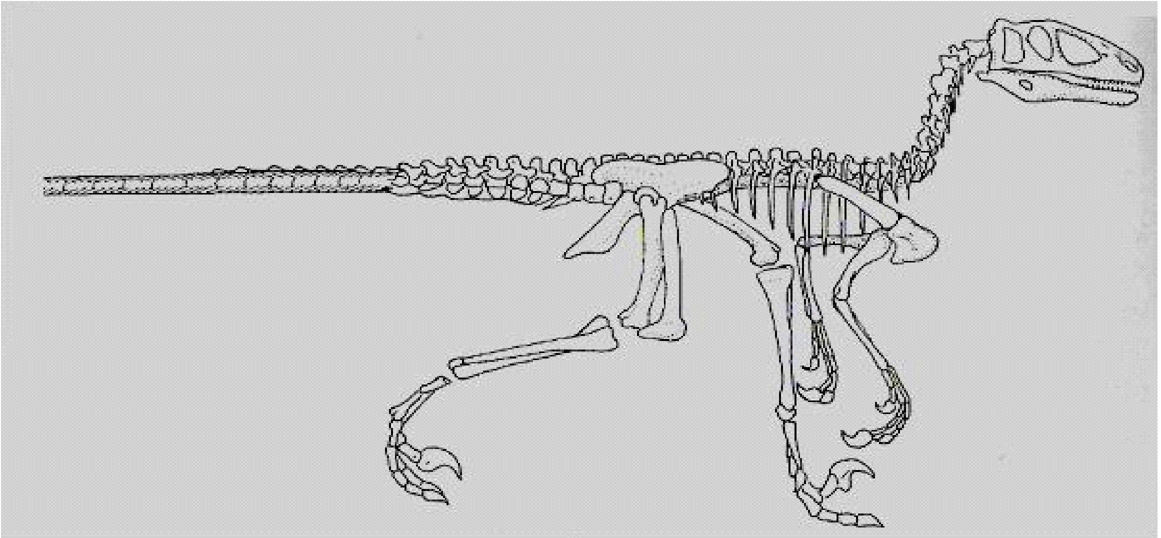

চিত্র ৮.৪ : (ক) থেরাপড ডায়নোসর [১৫]

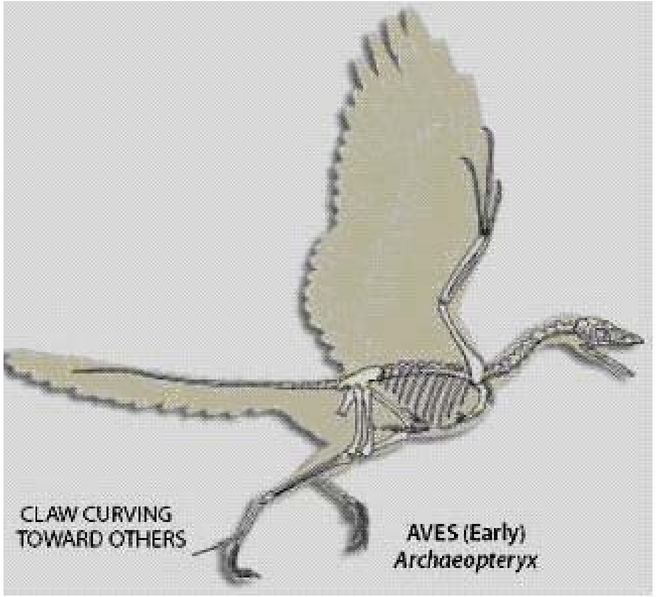

চিত্র ৮.৪ : (খ) আর্কিওপটেরিক্স (*Archaeopteryx*)

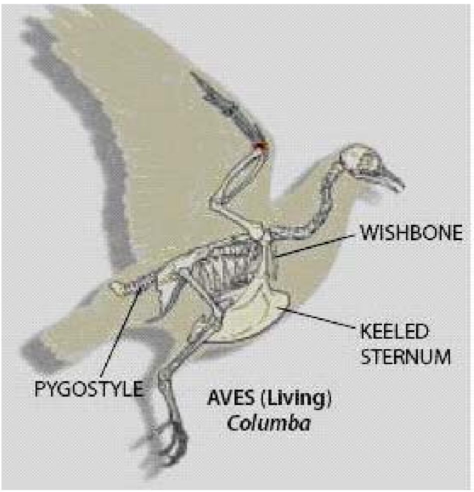

চিত্র ৮.৪ : (গ) আধুনিক পাখি (*Aves*)

ঘটার মত ঘটনাগুলো ঘটেছে আর্কিওপটেরিক্সেরও বেশ পরে। থেরাপড ডায়নোসরের সাথে আর্কিওপটেরিক্স এবং আধুনিক পাখীর শারীরিক গঠনের তুলনামুলক চিত্রটি (চিত্র ৮.৪) দেখলে বিবর্তনের এই পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো বেশ পরিষ্কারভাবে ধরা পরে। এই তুলনামুলক পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা যে শুধু ডায়নোসরের সাথে আধুনিক পাখির বিবর্তনের সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন তাইই নয়, এই পরিবর্তনগুলো কিভাবে ঘটেছিলো তা সম্পর্কেও একটা পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, কিছুদিন আগে ঘুমন্ত অবস্থায় ফসিল হয়ে যাওয়া হাঁসের মত আকারের এক ধরণের ডায়নোসরের ফসিল পাওয়া গেছে যাকে দেখলে মনে হবে আজকের দিনের কোন পাখি যেনো ঘুমিয়ে আছে তার শরীরের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিয়ে [৪]। এইসব থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে পাখি হিসেবে

চিত্র ৮.৫ : (ক) চীনদেশের উত্তরাঞ্চলে পাওয়া ঘুমন্ত ডায়নোসরের ফসিল এবং (খ) হাতে আঁকা সম্ভাব্য প্রতিকৃতি। [৪]

বিবর্তিত হওয়ার অনেক আগেই সেই প্রাচিন ডায়নোসরদের মধ্যেই তথাকথিত পাখিসুলভ বৈশঈ্যগুলো দেখা দিতে শুরু করে। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে - মোটেও ওড়ার জন্য ডায়নোসরের মধ্যে পালকের বিবর্তন ঘটেনি, এর উদ্ভব ঘটেছিলো নিতান্তই তাদের চামড়ায় ঘটা এক বিশেষ পরিবর্তনের ফলে। এর পর তাপ সংরক্ষেণে সুবিধা করে দেওয়ার মাধ্যমে বা অন্য যে কারণেই হোক তা তাদেরকে টিকে থাকতে বাড়তি কোন সুবিধা জুগিয়েছিলো বলেই এই বৈশিষ্ট্যটি টিকে গিয়েছিলো থেরাপড ডায়নোসরগুলোর মধ্যে। অর্থাৎ উড়ার জন্য পালকের উদ্ভব ঘটেনি, বরং ব্যাপারটা ঠিক তার উলটো - কোন এক মিউটেশন বা পরিবর্তনের মাধ্যমে হঠাৎ করেই পালকের উৎপত্তি ঘটে আর তারই ফলশ্রুতিতে এক সময় কোন এক

পরিস্থিতে ডায়নোসরগুলো উড়তে সক্ষম হয়। সৃষ্টতত্ত্ববাদীরা যদিও বলে থাকেন, পৃথিবীর সব কিছুই নাকি নীল নক্সা অনুযায়ী প্ল্যান করে তৈরি করা হয়েছে, অর্থাৎ পাখি উড়বে বলেই নাকি পরিকল্পনা করে তার শরীরে পালকের সৃষ্টি করা হয়েছে! কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাকৃতিতে কিছুই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি নয়, কেমন যেনো এলোমেলোভাবে উদ্দেশ্য ছাড়াই তাদের উৎপত্তি ঘটে প্রাকৃতিক নিয়মেই। আর কোটি কোটি বছর ধরে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর ক্রমাগতভাবে ঘটতে থাকা প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে উৎপত্তি হয়েছে এতো রকমের প্রাণীর, এত রকমের উন্নত এবং জটিল সব জীবের। বিখ্যাত বিবর্তনবাদী রিচার্ড ডকিনস ঠিকই বলেন 'আমাদের চারপাশে বিশ্বজগতে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলো দেখলেই বোঝা যায় এর মধ্যে কোন পরিকল্পনা নেই, উদ্দেশ্য নেই, নেই কোন অশুভ কিংবা শুভের অস্তিত্ব। আসলে অন্ধ, কেবল করুণাহীন উদাসীনতা ছাড়া এখানে আর কিছুই চোখে পড়ে না।' [১০]। ডায়নোসরের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে পালকের উদ্ভব, সেখান থেকে ধীরে ধীরে কোটি কোটি বছরের ব্যবধানে উড়তে পারা পাখির বিবর্তন আবারও আমাদেরকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা বিবর্তন তত্ত্বের সঠিকতাকে মনে করিয়ে দেয়। এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় যে বিভিন্ন ধরণের জটিল এবং উন্নত প্রাণের উদ্ভব ঘটা সম্ভব তারই এক চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়ে চলেছে ডায়নোসর থেকে পাখির এই বিবর্তনের কাহিনী।

পা ওয়ালা মাছের ডাঙ্গায় উঠে আসাঃ প্রায় ৪০ কোটি বছর আগে প্রাণীজগতের বিবর্তনের ইতিহাসে যেনো এক বিপ্লব ঘটে গেলো। প্রায় একশো কোটি বছর আগে পৃথিবীর মাটিতে আদি কোষী জীবের অস্তিত্ব দেখা গেলেও তা শুধু বিভিন্ন ধরণের সরল প্রকৃতির জীবাণুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। ৪৭-৫৫ কোটি বছর আগে প্রথমবারের মত পৃথিবীর মাটিতে আদি উদ্ভিদ এবং ফার্নের অস্তিত্ব দেখা দেয় কিন্তু তখনও প্রাণীর বিকাশ সীমাবদ্ধ ছিলো শুধুমাত্র জলেই, ডাঙ্গায় উঠে আসার আয়োজন আসলে শুরু হয়েছিলো তারও অনেক পরে [৫]। ফসিল রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ৪০ কোটি বছর আগে ডেভোনিয়ান যুগে জল থেকে ডাঙ্গায় প্রাণীর বিবর্তন ঘটতে শুরু করে। ডেভোনিয়ান যুগটি ছিলো খরার যুগ, পানির উচ্চতা কমে আসছিলো তখন পুকুর, নদী, সমুদ্রে। আর এ সময়েই এক ধরণের মাংসল পিন্ডের মত পাখনা বিশিষ্ট (Lobe Finned Fish বলা হয় এদেরকে, Lungfish এবং Coelocanth উভয়েই এই দলের অন্তর্ভুক্ত; আর এখন আমরা যে আধুনিক মাছ দেখি তার বেশীর ভাগই ছড়ানো পাখা বিশিষ্ট মাছের উত্তরসুরী যাদেরকে বলে Ray Finned Fish) এক ধরণের মাছের বিবর্তন ঘটে, তাদের এই মাংসল পাখনার সাথে চতুষ্পদী প্রাণীর হাত পা'র প্রচুর মিল রয়েছে। ফুলকার সাহায্যেই বেশীর ভাগ সময় শ্বাস প্রশ্বাস চালালেও ফুসফুসের সাহায্যে তারা আবার মুক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করতেও সক্ষম ছিলো। অর্থাৎ ডেভোনিয়ান যুগের খরার সময় তাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলো অল্প পানিতে বা পানির মাঝখানের শুকনোয় চলে ফিরে বেড়াতে সাহায্য করতো।[৬] আর ওদিকে খরা যত বাড়তে থাকলো, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মেই, ততই এ ধরণের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাণীগুলোই টিকে থাকার জন্য বিশেষ সুবিধা পেতে থাকলো। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ডাঙ্গায় উঠে আসার জন্য কিন্তু চতুষ্পদী প্রাণীর মধ্যে হাত পার উদ্ভব ঘটেনি, এর বিবর্তন ঘটেছিলো ক্ষরার সময় পানিতে টিকে থাকার জন্য, যা পরবর্তীতে তাদেরকে ডাঙ্গার জীবনে অভিযোজিত হতে সাহায্য করেছিলো। একই ধরণের ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করেছিলাম পাখা এবং পালকের বিবর্তনের ক্ষেত্রেও, উড়ার জন্য তাদের পালকের উৎপত্তি ঘটেনি, কিন্তু পরবর্তীতে তাই ডায়নোসরদের উড়তে সাহায্য করেছিলো। অনেকে মনে করেন যে, ডেভোনিয়ান যুগে মাটিতে উদ্ভিদের ব্যাপক বিকাশও সাহায্য করেছিলো প্রাণীদেরকে মাটিতে উঠে আসতে। পানির ধারে মাটিতে বিভিন্ন

ধরনের উদ্ভিদ এবং তাদের পানিতে ছড়িয়ে থাকা মূলগুলো বিভিন্ন প্রাণীর খাদ্য হিসেবে কাজ করেছিলো।

সে যাই হোক, বিজ্ঞানীরা মাছ থেকে উভচর প্রাণীতে রূপান্তরের এই ধীর প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপের প্রাণীরই ফসিল খুঁজে পেয়েছেন। ১৯৩৮ সালে আফ্রিকার মাদাগাস্কারের উপকুল এলাকায় এমন এক জীবন্ত মাছ

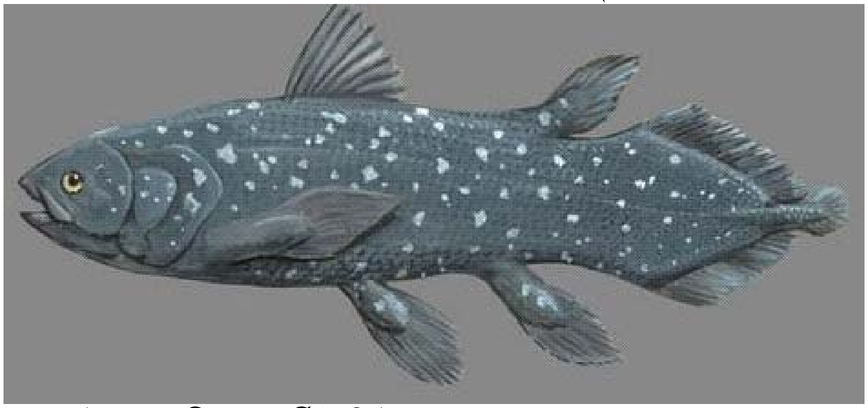

চিত্র ৮.৬ : মাছ এবং উভচর প্রাণীর মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মাছঃ coelacanth: *Laimeria chalumnae*
(সৌজন্যঃ University of Michigan: Museum of Zoology
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/resources/Grzimek_fish/Coelacanthiformes/Latimeria_chalumnae.jpg/view.html

(*Laimeria chalumnae)* ধরা পড়ে যাকে ৭-৮ কোটি বছর আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে করা হত। এর মধ্যে মাছ থেকে উভচর প্রাণীর বিবর্তনের এতগুলো মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যে, একে যেনো রীতিমত এক 'জীবন্ত ফসিল'ই বলা যায়। অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বিজ্ঞানীরা এই মিসিং লিঙ্কটিকে 'অতীতের সময় পড়ার যন্ত্র' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। মাংসল পাখনাবিশিষ্ট এই মাছ ৬ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে, আর তারা অন্যান্য মাছের মত ডিম পারে না, সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে। পরবর্তীতে এই প্রজাতির আরও বেশ কিছু মাছই ধরা পড়েছে।

আগেই বলেছিলাম যে, দুই ধরণের মাংসল পাখনা বা লোব ফিনযুক্ত মাছ রয়েছেঃ কোলাকান্থ (Coelocanth) এবং লাং ফিশ (Lungfish)। এদের দুই গোত্রের মধ্যেই মাছ থেকে উভচরে পরিণত হওয়ার মধ্যবর্তী ফসিল পাওয়া গেলেও বিজ্ঞানীরা আধুনিক অনূজীববিদ্যার পরীক্ষার ফলাফল থেকে এখন মনে করেন যে আজকের চতুষ্পদী প্রাণীগুলো আসলে লাং ফিস থেকেই বিবর্তিত হয়েছিলো [৫]। লাং ফিস থেকে উভচরে উত্তরণের এই দীর্ঘ বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তী ধাপগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে এমন বহু ফসিলের অস্তিতত্ব খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বেশীর ভাগ মাছের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন *Eusthenopteron* থেকে শুরু করে, অর্ধেক পানি অর্ধেক মাটিতে বাস করা *Acanthostega* র মত চতুষ্পদী প্রাণী কিংবা তার পরবর্তী ধাপের আদি উভচর (Amphibian) প্রাণী পর্যন্ত সবারই ফসিল খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা (চিত্র ৮.৭-এ বিবর্তনের ধাপগুলো দেখুন)।

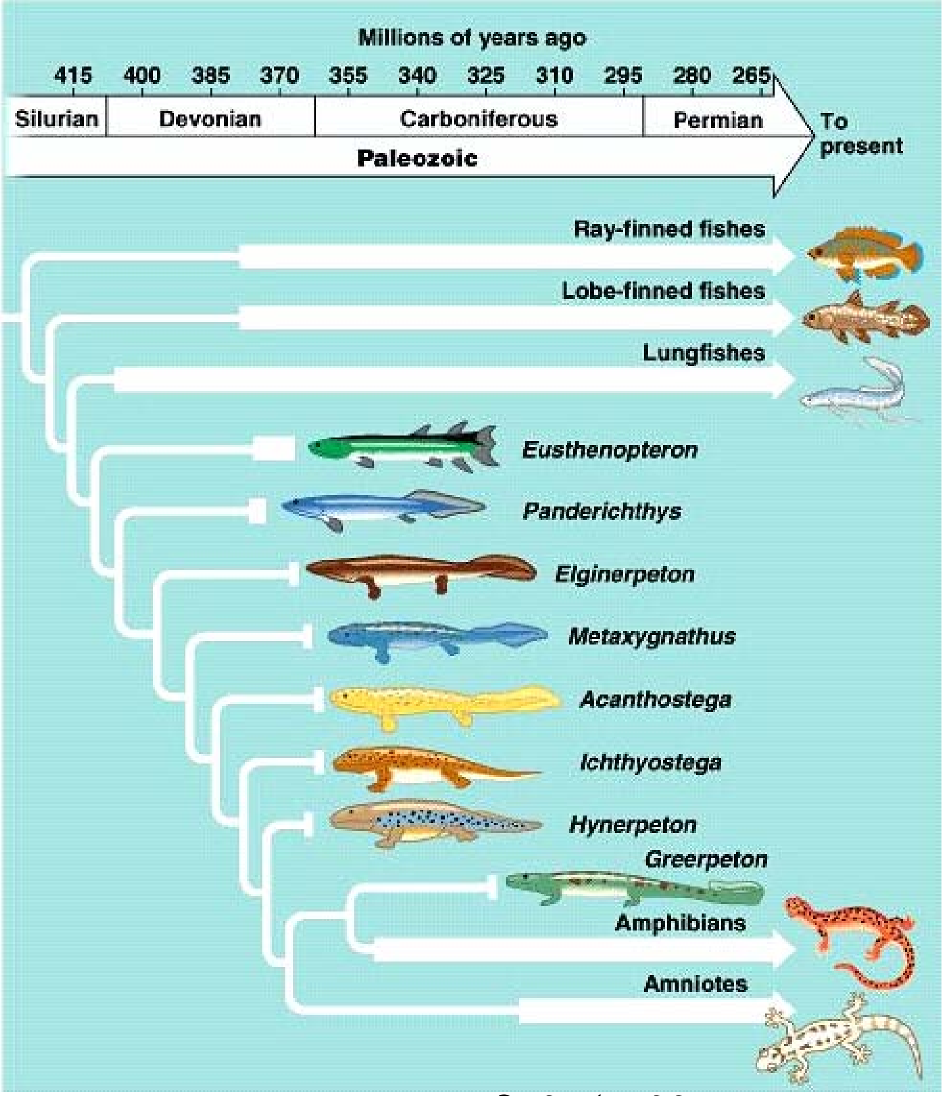

চিত্র ৮.৭ :মাছ থেকে ডাঙ্গায় প্রাণীর বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর

(সৌজন্যঃ http://www.anselm.edu/homepage/jpitocch/genbios/34-15-TetrapodOrigin-L.gif)

এই *Acanthostega* র বিড়াল বা টিকটিকির মত দিব্যি চার পায়ের অস্তিত্ব থাকলেও তখনও তার মধ্যে ফুলকা এবং সাতার কাটার জন্য প্রয়োজনীয় মাছের মত লেজটি রয়ে গেছে। এখান থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে, চতুষ্পদী প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলো ডাঙ্গায় উঠে আসার জন্য আলাদাভাবে তৈরি হয়নি, তাদের বিবর্তন ঘটেছিলো অনেক আগেই পানিতেই। ধাপে ধাপে ঘটা এই রূপান্তরের এতগুলো ধারাবাহিক ফসিল পাওয়া গেছে যে প্রাণীর বিবর্তনের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টি নিয়ে অনেকদিন ধরেই সন্দেহের কোন আবকাশই নেই। ফসিলবিদ্যার জগতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ধীর গতিতে কোটি কোটি বছরের পরিবর্তনের মাধ্যমে বিবর্তনের চিত্রটির এত চমৎকার প্রতিফলন খুব কমই পাওয়া যায়।

তবে গল্পের তো এখানেই শেষ নয়, খুব সাম্প্রতিক একটা আবিষ্কারের কথা না উল্লেখ করলে গল্পটা হয়তো শেষ হয়েও ঠিক পুরোপুরি শেষ হবে না। এই তো কিছুদিন আগে ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে

কানাডার উত্তর মেরুতে এমনি এক মধ্যবর্তী ফসিল বা মিসিং লিঙ্কের সন্ধান পাওয়া গেছে যা মাছ থেকে উভচর প্রাণীতে বিবর্তিত হওয়ার ধারাবাহিকতার ছকটিকে যেনো আরও পূর্ণ করে তুলেছে। কানাডার এই

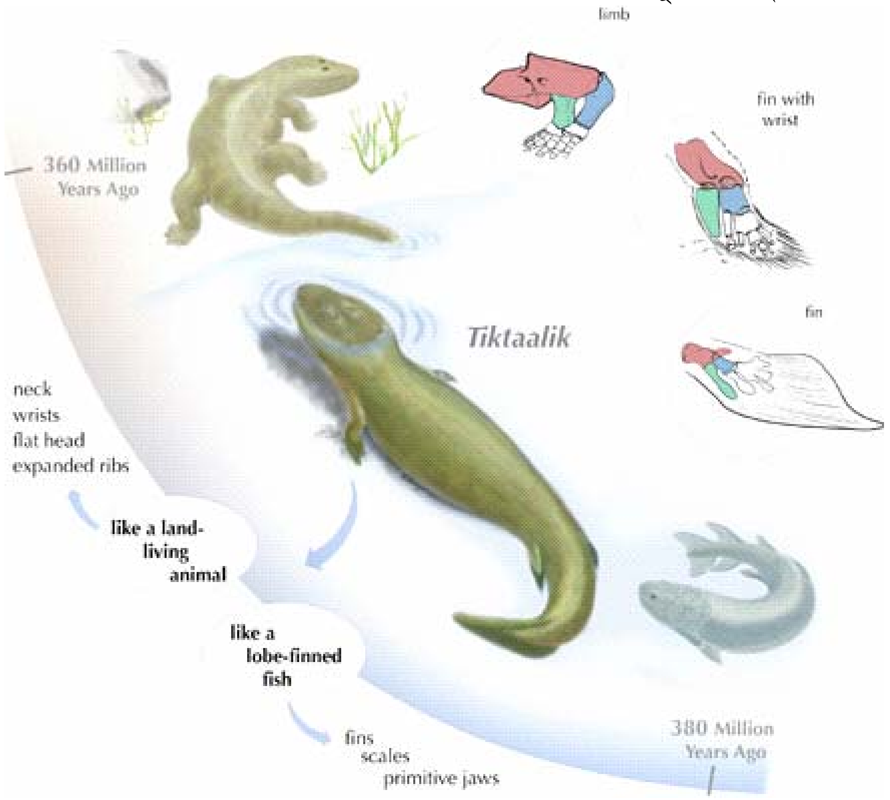

চিত্র ৮.৮ :পানির মাছ থেকে মাটিতে চড়ে বেড়ানো প্রাণীর বিবর্তনের হাতে আঁকা চিত্র। মাঝখানে রয়েছে সদ্য আবিষ্কৃত টিকটালিকের ছবি যা খুব পরিস্কারভাবে মাছ এবং উভচর প্রাণীর মধ্যবর্তী অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে।
(সৌজন্যঃ Harvard University Gazette
http://www.news.harvard.edu/gazette/2006/04.06/09-missinglink.html)

অঞ্চলের আদিবাসীরা অনেকটা কুমীরের মত দেখতে চার পাওয়ালা এই মাছটির নাম দিয়েছেন টিকটালিক (Tiktaalik roseae) [৭]। প্রায় সাড়ে ৩৭ কোটি বছর আগের এই প্রাণীটির মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে মাছের মত পাখনা, আদি চোয়াল এবং আঁশ, আবার অন্যদিকে আছে চতুষ্পদী প্রাণীর মত করোটি, ঘাড়,পাঁজড়ের হাড় এবং আংশিক হাত পায়ের অস্তিত্ব! ডেভোনিয়ান যুগের মাছ Panderichthys, যার মধ্যে সবে অল্প কিছু চতুষ্পদী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য দেখা দিতে শুরু করেছে এবং তখনও কিছু মাছের মত বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে এমন আদি চতুষ্পদী প্রাণী Acanthostega (চিত্র ৮.৮-এ মাছ থেকে ডাঙ্গায় প্রাণীর বিবর্তনের ছবিটিতে দেখুন) এর মধ্যবর্তী এক অবস্থার প্রাণী এই টিকটালিক [৮]। ফসিলের অবস্থান এবং গঠন দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, এরা খুবই অল্প পানিতে অথবা কখনও কখনও এমনকি অল্প সময়ের জন্য শুকনো মাটিতেও বেঁচে থাকতে পারতো। পানি থেকে মাটিতে উঠে আসার ফলে তাদের উপর যে বাড়তি মাধ্যাকর্ষন শক্তির চাপ পড়ে তা সামাল দিতে গিয়ে তাদের পাঁজরের হাড়েরও পরিবর্তন ঘটেছে। আবার পানিতে বাস করা মাছের কোন ঘাড় বা গলা থাকে না, তারা সমস্ত শরীর দিয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে শিকার করে। কিন্তু মাটিতে বাস করা চতুষ্পদী প্রাণীদের বেশীরভাগেরই নমনীয় ধরনের গলা এবং ঘাড় থাকে, বাকী শরীরের সাহায্য ছাড়াই সে তার

চিত্র ৮.৯ :সদ্য পাওয়া টিকটালিকের এই ফসিলের নমুনাগুলো এত ভালোভাবে সংরক্ষিত ছিলো যে এদের থেকে বিজ্ঞানীরা তাদের গঠন এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত সব তথ্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন। সাধারণত এত পুরনো আমলের ফসিল্গুলো শিলাস্তরের চাপে চ্যাপটা হয়ে যায়, এরা কিন্তু তা হয়নি, এদেরকে ত্রিমাত্রিক অবস্থায়ই পাওয়া গেছে।[৮]

মাথা এবং ঘাড় স্বাধীনভাবে নাড়াতে পারে। টিকটালিকের মধ্যেও এধরণের গলার অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে যা দিয়ে সে সহজেই তার মাথা ঘুরাতে সক্ষম হতো। এত চমৎকার একটি মধ্যবর্তী অবস্থার ফসিল খুঁজে পেয়ে বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত আনন্দিত। তাদের মতে, এই ধরণের ফসিলগুলো মাছ থেকে ডাঙ্গার চতুষ্পদী প্রাণীর বিবর্তন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে এক বিশেষ পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ইউনিভারসিটি অফ শিকাগোর জীববিদ্যা বিভাগের প্রধান নীল শুবিনের মতে, শারীরিক গঠন এবং জীবনযাত্রার দিক থেকে বিচার করলে এই প্রাণীর মধ্যে এমনই সব মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে তা দিয়ে আজকের দিনের মাছ এবং উভচরের মধ্যে পার্থক্যগুলো যেনো বিলীন হয়ে যায়[৮]।

স্থলচর প্রাণীর বিবর্তনের এর পরের একটা বড় ধাপ হচ্ছে আবরণ বিশিষ্ট ডিম ধারণকারী সরীসৃপের উদ্ভব। আসলে সরীসৃপ, পাখি, এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীরা সবাই এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, এরা উভচরের মত জীবনের প্রথম ধাপে পানিতে ফিরে যায় না। উভচর এবং সরীসৃপের মাঝামাঝি অবস্থার এবং আদি সরীসৃপেরও বহু ফসিল পাওয়া গেছে, যা দিয়ে উভচর থেকে সরীসৃপের উৎপত্তির ধাপগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারপর সেই ৩৫ কোটি বছর আগের কার্বোনিফেরাস যুগ থেকে শুরু করে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বছর আগের টারশিয়ারি যুগের শুরু পর্যন্ত পৃথিবী জোড়া চলতে থাকে জলচর এবং স্থলচর সরীসৃপদের একক আধিপত্য [৫]। প্রায় ২০ কোটি বছর আগে সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী জীবের বিবর্তন ঘটতে শুরু করলেও সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ডায়নোসরের বিলুপ্তির আগে পর্যন্ত তাদের তেমন একটা বিকাশ ঘটতে দেখা যায়নি। প্রায় ১০ কোটি বছর ধরে তাদের ধীর রূপান্তর ঘটতে থাকে, এই সময়ে বিভিন্ন ধরণের মধ্যবর্তী স্তরের 'সরীসৃপ জাতীয় স্তন্যপায়ী' প্রাণীর ফসিলের সন্ধান পাওয়া যায় [৫]। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বিবর্তনের পর্যায়ক্রমিক সবগুলো ধাপেরই বহু ফসিল খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এই ব্যাপারটি এতখনিই সুপ্রতিষ্ঠিত যে এখানে আর তা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি না।

তিমি মাছের উলটো পথে যাত্রাঃ বিবর্তনের কিছু কাহিনী যদি বিজ্ঞানীদের ভীষণভাবে অবাক করে থাকে তাহলে তিমি মাছের বিবর্তনের গল্পই বোধ হয় সেই তালিকার সবচেয়ে উপরে স্থান পাবে। এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু বিচলিত হয়ে ডারউইন যখন বলেছিলেন যে, ভালুকের মত কোন প্রাণী থেকে তিমি মাছের বিবর্তন ঘটে থাকলেও তিনি মোটেও আবাক হবেন না, তখন অনেকেই হেসেছিলেন। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে তো বটেই! সমুদ্রে বসবাস তাদের, মাছের মতই সাঁতরে বেড়ায় তারা, কিন্তু মেরুদন্ড থেকে শুরু করে পুরো শরীরের গঠনটায় আবার স্তন্যপায়ী প্রাণীর মত। সামনের হাতদুটো সাতারে কাজে লাগে, পিছনে কোন পা দেখা না থাকলেও শরীরের ভিতরে পেলভিসের বা বস্তিদেশের অবশিষ্টাংশ এখনও দিব্যি বয়ে বেড়াচ্ছে সে। ডারউইনের কথা না হয় বাদই দিলাম, প্রায় দেড়শো বছর পর আধুনিক অনুজীববিদ্যা এবং ফসিলবিদ্যার আবিষ্কার থেকে যখন আমরা জানতে পারি যে আসলে প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে জলহস্তির পূর্বপুরুষের মত একধরণের স্তন্যপায়ী চতুষ্পদী ডাঙ্গার প্রাণী থেকে আজকে তিমি মাছের

বিবর্তন ঘটেছে তখন রিচার্ড ডকিনসের মত বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীর পক্ষেও আঁতকে না উঠে উপায় থাকে না। তিনি ২০০৪ সালে লেখা The Ancestor's Tale বইতে লিখেছেন [৯] 'I have now learned something so shocking that I am still reluctant to believe it, but it looks as though I am going to have to. Hippo's closest living relatives are whales.... Whales are wonders of the world. They include the largest organisms that have ever moved.... All this supposes that we believe the testimony of the molecules. What do fossils say? To my initial surprise, the new theory fits quite nicely"

তিমি এবং ডলফিনদেরকে বলা হয় সিটাসিন (cetacean), এরা স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়ে পানিতে অভিযোজিত হয়েছে। বিবর্তনের হিসেবে বংশ পরিচয় বিচার করলে যে কোন মাছের তুলনায় জলহস্তি, উট, গরু বা ভেড়ার সাথে তিমি মাছের আত্মীয়তা অনেক কাছের। আধুনিক অনুজীববিদ্যার জিনোমিক টেস্টের ফলাফল অনুযায়ী তো তারা জলহস্তিদের খালাতো ভাই বলেই মনে হচ্ছে। ওদিকে আবার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ ফিলিপ গিংরিচ এবং তার সহযোগীরা গত ৩০ বছরের গবেষণার ফলাফল হিসেবে যেসব ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন তাও এই জেনেটিক টেস্টের সাথে যেন হুবহু মিলে যাচ্ছে [১১]। ইওসিন যুগে (সাড়ে ৫ কোটি বছর আগে থেকে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি বছর আগে পর্যন্ত) তিমি মাছের পুর্বপুরুষের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের বহু ফসিল আবিষ্কার করেছেন তারা পাকিস্তান এবং মিশরে। বেশ অনেক আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা খুরবিশিষ্ট বিলুপ্ত প্রাণী এলোমেরিক্স (*Elomoryx*) কে সিটাসিনের পূর্বপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। ৭০ দশকের শেষের দিকে

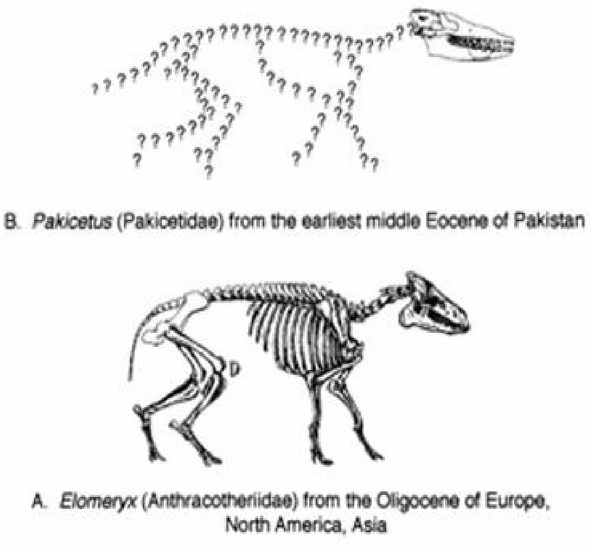

চিত্র ৮.১০ :এলোমেরিক্স (*Elomoryx*), পাকিসিটাস (*Pakicetus*) তুলনামুলক চিত্র [১১]

ডঃ গিংরিচ পাকিস্তানে তিমি মাছের সবচেয়ে পুরনো যে ফসিল পাকিসিটাসের (Pakicetus, ৫.৩ কোটি থেকে ৪.৮ কোটি বছর আগের) সন্ধান পান, তার সাথে এলোমেরিক্সের তেমন বেশী কোন পার্থক্য দেখা যায় না। তার চেয়ে বয়সে একটু ছোট অ্যাম্বুলোসিটাস (Ambulocetus, ৪.৮ কোটি থেকে ৪.৭

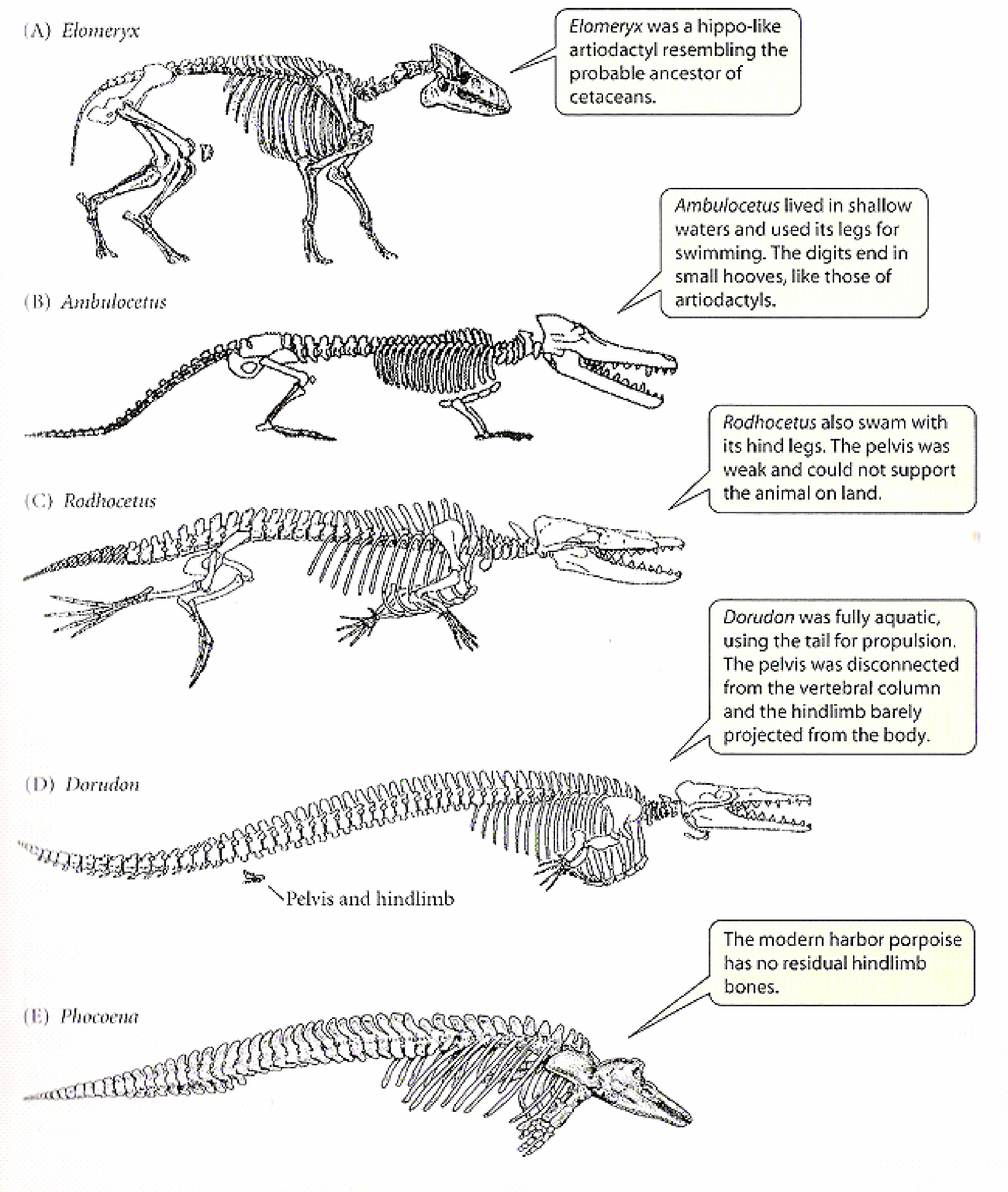

চিত্র ৮.১১ :স্থলচর স্তন্যপ্যায়ী প্রাণী থেকে তিমি মাছের বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপের চিত্র [৩]

তাদের দৈর্ঘ্যও বাড়তে শুরু করে। তারপরের স্তরের রোডসিটাসে (*Rodhocetus*, ৪.৯ কোটি থেকে ৩.৯ কোটি বছর আগের) এর ফসিলের গঠন থেকে দেখা যায় যে তারা ইতোমধ্যেই উপকূলবর্তী অল্প পানির জীবনে অভিযোজিত হয়ে গেছে। এখান থেকেই ক্রমান্বয়ে কোটি বছর আগের) মেরুদন্ড এবং দাঁতের

বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আর তার সাথে আরেকটি লক্ষণীয় জিনিষ চোখে পড়ে যে, তাদের নাকের ছিদ্র ক্রমশঃ পিঠের পিছনের দিকে সরে যেতে শুরু করেছে। এখনও খুরের অবশিষ্টাংশ রয়ে গেলেও পিছনের পাগুলো যেন মাটির উপরে তাদের ভার বহন করার জন্য অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর পরের পর্যায়ের ফসিল ৩.৫ কোটি বছর আগের ডরুডনের (Dorudon) মধ্যে পানিতে সম্পুর্ণভাবে অভিযোজনের নমুনা দেখতে পাই। নাকের ছিদ্র আরও পিছিয়ে গেছে, সামনের পা ফ্লিপারের মত আকার ধারণ করছে, পিছনের পা এবং বস্তিদেশ আর অকেজো হয়ে পড়েছে, বস্তিদেশটি আলাদা হয়ে পড়েছে মেরুদন্ড থেকে। তাদের সাথে আধুনিক তিমি মাছের (Phocona) পার্থক্য খুব সামন্যই [৩]। তিমি মাছের এই বিবর্তনকে অনেক বিজ্ঞানী ইওসিন এবং ওলগোসিন যুগের ব্যাপক জলবায়ু এবং মহাসমুদ্রগুলোর পানির গতির পরিবর্তনের সাথে জড়িত বলে মনে করেন।

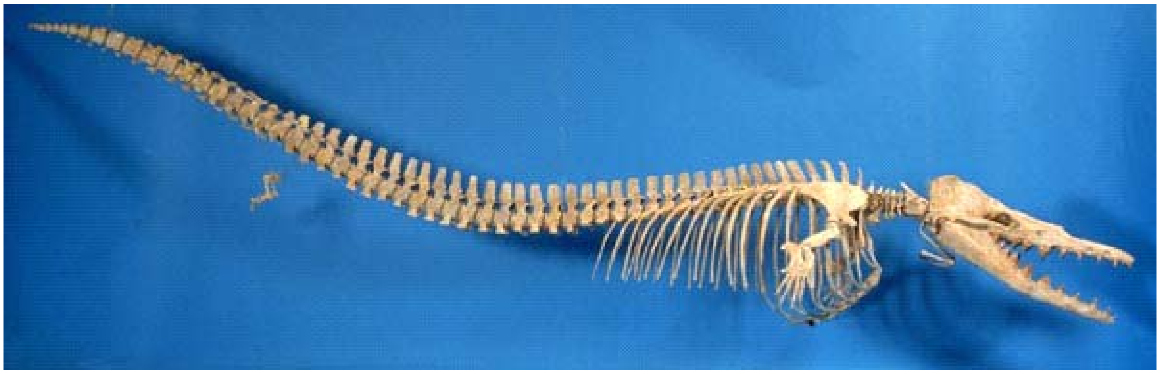

চিত্র ৮.১২ :ডঃ গিংরিচের দল তিমি মাছের পূর্বপুরুষ ডরুডনের প্রায় সম্পুর্ন এই ফসিলটি আবিষ্কার করেন। মিশরের ওয়াডি হিটানে পাওয়া এই ফসিলটি প্রায় ৫ মিটার লম্বা।
(সৌজন্যঃ http://www-personal.umich.edu/~gingeric/PDGwhales/Whales.htm)

লুসি হচ্ছে মানুষ আর এপের মধ্যে মিসিং লিঙ্ক: এর আগের আরও কিছু ফসিল পাওয়া গেলেও 'লুসি'কেই এখনও আনেক বিজ্ঞানী আধুনিক মানুষ (*Homo sapiens*) এবং এপ বা বনমানুষের মধ্যবর্তী ফসিল বা মিসিং লিঙ্ক বলে মনে করেন। ১৯৭৮ সালে তানজেনিয়ায় পাওয়া, প্রায় ৩২ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে বেড়ানো Australopithecus afarensis প্রজাতির এক মহিলার, ফসিলকেই 'লুসি' নাম দেওয়া হয় [১৪]। লুসির প্রায়-সম্পূর্ণ ফসিল, মস্তিষ্কের খুলি, পাঁজরের হাড় এমনকি সেই সময়ের পাওয়া পায়ের ছাপের ফসিল থেকে এটা খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যে, তারা ইতোমধ্যেই সোজা হয়ে হাটতে শিখেছিলো। কিন্তু তাদের মস্তিষ্ক, চোয়াল এবং শরীরের আকার তখনও কিন্তু তাদের পূর্বপুরষের মতই রয়ে গিয়েছিলো। সেজন্যই অনেকে তাদের গলার উপরে বনমানুষের মত আর গলার নীচে মানুষের মত একধরনের 'মাঝামাঝি মানুষ' বলে অভিহিত করেন। সে যাই হোক, এ আলোচনা আপাতত তোলা থাক, এর পরের অধ্যায়ে আমাদের নিজেদের প্রজাতি অর্থাৎ আধুনিক মানুষের বিবর্তন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা বিবর্তনের তত্ত্ব বলে, খুব ধীরে ধীরে ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমেই জীবের পরিবর্তন ঘটে। কোন প্রজাতি যখন তার মূল প্রজাতি থেকে কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন এই প্রক্রিয়া আরও তরান্বিত হতে পারে কারণ এই বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে বিবর্তন ঘটতে থাকে

তাদের নিজস্ব গতিতে। যদিও স্টিফেন জে গুল্‌ডের মত কয়েকজন বিখ্যাত ফসিলবিদ বিবর্তনের গতিতে হঠাৎ হঠাৎ উল্লম্ফন বা বড় ধরনের কোন পরিবর্তন (Punctuated Equilibrium theory)ঘটে যেতে পারে মনে করেন, বেশীর ভাগ জীববিদই কিন্তু ডারউইনের এই ধীর এবং ধারাবাহিক বিবর্তনের প্রক্রিয়াকেই সমর্থন করেন [১২]। ডারউইনও বুঝেছিলেন যে, কোন কোন সময় খুব আকস্মিক বা দ্রুত প্রাকৃতিক পরিবর্তন এই বিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে দিতে পারে, তবে তা কোন মতেই দুই একশো বছরের ব্যাপার নয়। সাধারণ অবস্থায় যা ঘটতে লাগে লাখ লাখ বা কোটি কোটি বছর তা হয়তো ঘটে কয়েক হাজার বছরে। এর কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই, চার পাশের পরিবেশ, মিউটেশনের হার, ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা, আকস্মিকভাবে ঘটা কোন প্রাকৃতিক পরিবর্তন বা বিপর্যয়, প্রজাতির নিজস্ব জনন বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সহ বহু কারণেই এর রকম ফের ঘটতে পারে। তবে কোন ভালো জীববিদই, এমনকি উল্লম্ফন মতবাদের প্রবর্তক বিজ্ঞানীরাও, মনে করেন না যে, এই পরিবর্তন এক বা দুই প্রজন্মে ঘটতে পারে। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আধুনিক ঘোড়ার বিবর্তনের যে স্তরগুলো দেখেছিলাম ফসিল রেকর্ডগুলো বলে তাও এভাবেই ঘটেছিলো। তাদের বিভিন্ন ধরণের প্রজাতির মধ্যে এককেকটা অবস্থা বা দশা বহুদিন ধরে বিরাজ করেছে, খুব অল্প অল্প করে হয়তো নগন্য কিছু পরিবর্তন ঘটেছে কয়েক লক্ষ এমনকি কোটি বছরে, তারপর হঠাৎ করেই কয়েক হাজার বছরে অত্যন্ত দ্রুত কিছু বড় বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে। ভূতাত্ত্বিক সময়ের পরিপ্রক্ষিতে তাদেরকে খুব দ্রুত বলে মনে হলেও আসলে তো আমাদের হিসেবে হাজার হাজার বছর পেরিয়ে গেছে, কোন পরিবর্তনই হঠাৎ করে রাতারাতি ঘটেনি। অনেক সময়ই ফসিল রেকর্ডে আমরা এই ধারাবাহিক পরিবর্তনের সব ধাপগুলো দেখতে পাই না। তার কারণ এই নয় যে, হঠাৎ করে আকাশ ফুঁড়ে তাদের সৃষ্টি হয়েছে বা রাতারাতি তাদের বিবর্তন ঘটে গেছে। বরং বোধগম্য কারণেই আমরা তা দেখতে পাচ্ছি না [১৩]। আমরা ফসিল নিয়ে আলোচনার সময়ই দেখেছি যে, যত জীব এই পৃথিবীর বুকে চড়ে বেড়িয়েছে তাদের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশই শুধু ফসিলে পরিণত হয়েছে। তাই বেশীর ভাগ জীবের ফসিলই আমরা হয়তো কোনদিনও খুঁজে পাবো না, অথবা তিমি বা পা-ওয়ালা মাছ বা উড়ন্ত ডায়নোসরের মত দুই একটা মিসিং লিঙ্ক পেয়েও যাবো হঠাৎ করে, যারা কিনা হঠাৎ করেই বিবর্তনবাদ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের মাত্রার উল্লম্ফন ঘটিয়ে দেবে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে।

তথ্যসূত্র:

১. মজুমদার, সুশান্ত (২০০৩), চার্লস ডারউইন এবং বিবর্তনবাদ, পৃঃ ৯২, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, কোলকাতা, ইন্ডিয়া।

২. Which Came Frist the Feather Or Birds?, 2003, Scientific American, March edition.

৩. Futuyma, Douglus (2005), Evolution, pg.74-78 Sinauer Associates, INC, MA, USA

৪. National Geographic: http://news.nationalgeographic.com/news/2004/10/1013_041013_sleepy_dino.html

৫. Ridley M, 2004, Evolution, Blackwell Publishing Company; USA, UK, Australlia, pp. 538-542.

৬. Berra TM, 1990, Evolution and the Myth of Creationism, Stanford University Press, Stanford, California, pp 84-87.

৭. Harvard University Gazette: April 6, 2006 edition. http://www.news.harvard.edu/gazette/2006/04.06/09-missinglink.html

৮. Natural History Museum, London, England. http://www.nhm.ac.uk/about-us/news/2006/apr/news_7948.html

৯. Dawkins R, 2004, The Ancester's tale, Houghton Miffin Company, NY, Boston: USA, pp 196-202

১০. http://www.mukto-mona.com/Articles/bonna/menace_darwinism.pdf

১১. http://www-personal.umich.edu/~gingeric/PDGwhales/Whales.htm

১২. Berra TM, 1990, Evolution and the Myth of Creationism, Stanford University Press, Stanford, California, pp 47-48.

১৩. Mayr E, 2001, What Evolution Is, Basic Books, USA, pp 13-19.

১৪. http://www.talkorigins.org/faqs/homs/specimen.html#afarensis

১৫. Padian, Chiappe, Origin Of Birds and Their Flight, 1998, Scientific American, Feb edition.

নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

{বন্যা আহমেদের *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটি অবসর প্রকাশনী থেকে ২০০৭ এর একুশে বইমেলায় প্রকাশিতব্য। এই অংশটি বইটির অষ্টম অধ্যায়।}

নবম অধ্যায়

আমাদের গল্প

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পর

ধরুন, দেড় দুই লক্ষ বছর আগে কোন এক বুদ্ধিমান মহাজাগতিক প্রাণী, আমাদের কল্পনার সেই উড়ন্ত সসারে করে পৃথিবীতে পদার্পণ করলো। সেই সময়ে আফ্রিকার এক কোণে ঘুড়ে বেড়ানো আমাদের আধুনিক মানুষের প্রজাতি *Homo sapiens* দের দেখে কি ভাবতো তারা? তারা কি বিবর্তনের পরিক্রমায় এই পৃথিবীতে আমাদের টিকে থাকা নিয়ে কোন বড়সড় বাজী ধরতে রাজী হত? তারা কি ভুলেও কল্পণা করতে পারতো যে এই প্রজাতিটিই খুব নিকট ভবিষ্যতে সারা পৃথিবীটাকে দখল করে নেবে? চারদিকের নির্মম প্রকৃতির সাথে টেক্কা দিয়ে টিকে থাকার জন্য কি আছে তাদের? প্রয়োজনীয় কিছুই নেই - থাবা নেই, ধারালো দাঁত নেই, শিং বা লোম কিছুই নেই, অত্যন্ত দুর্বল দেখতে অদ্ভুত এক দ্বিপদী প্রাণী! জানি, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর মতই শোনাচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটাকে ঠিক উড়িয়েও দেওয়া যায় না। এখন স্বভাবতই তাহলে প্রশ্ন করতে হয়, সে অবস্থা থেকে আমরা টিকে গেলাম কি করে? শুধু টিকে গেছি বললেও তো ভুল বলা হবে - মাত্র দেড় দুই লাখ বছরে ফুলে ফেপে সংখ্যায় ছয়শো কোটি তো ছাড়িয়ে গেছিই, পৃথিবীব্যাপী প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করছি, ইদানীংকালে আবার পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে মহাবিশ্বের দিকেও দিয়েছি হাত বাড়িয়ে। কিন্তু কি করে সম্ভব হল সেটা? বৈচিত্রময় এই বিশাল প্রকৃতি জগতের এক ক্ষুদ্র অংশ এই মানব প্রজাতির অনন্যতার উৎসটি আসলে কোথায়? দু'টি বৈশিষ্ট্যের কথা তো চোখ বন্ধ করেই বলা যায়ঃ মানুষই একমাত্র প্রাণী যে দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে শিখেছে, আর ওদিকে আবার খুব অসাধারণ রকমের বড় মস্তিষ্কেরও বিবর্তন ঘটেছে যা অন্য কোন প্রাণীতে ঘটতে দেখা যায় নি। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অত্যন্ত সুপরিচিত জীববিজ্ঞানী, এডওয়ার্ড উইলসনের গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০ লক্ষ বছর আগে থেকে শুরু করে আড়াই লাখ বছর আগে পর্যন্তও আমাদের মস্তিষ্কের আকার প্রতি এক লাখ বছরে প্রায় এক চামচের সমান করে বেড়েছিলো [১]। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ধীর গতিতে হলেও এখনও আমাদের মস্তিষ্কের বিবর্ধন ঘটে চলেছে। আমাদের মস্তিষ্কের যে অংশটি আমাদের বুদ্ধিমত্তার সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সেই সেরিব্রেল করটেক্স কে যদি টেনে ফ্ল্যাট করে বিছিয়ে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে তা চার পৃষ্ঠা জুড়ে জায়গা করে নিচ্ছে। আমাদের সবচেয়ে কাছের পূর্বসুরী শিম্পাঞ্জীদের সেরিব্রেল করটেক্স নেবে মাত্র এক পাতার সমান জায়গা, বানরেরটা নেবে একটি পোস্টকার্ডের সমান আর ইঁদুরের ক্ষেত্রে তা নেবে মাত্র একটা স্ট্যাম্পের সমান জায়গা [২]।

পার্থক্যটা চোখে পড়ার মতই, তাই হয়তো সাফল্যের পাল্লাটাও বেশ ভারী। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, উহু, মস্তিষ্কের আকারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেটাই বোধ হয় একমাত্র কারণ নয়! তাহলে তো আমাদের মত বড় মস্তিষ্কের অধিকারী নিয়ান্ডারথাল প্রজাতির মানুষরাও একই রকম সাফল্য অর্জন করতে পারতো - তাদের মত প্রজাতির তো তাহলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা নয়। একদিকে মস্তিষ্কের বিকাশ আবার অন্যদিকে আমাদের শরীরে সময় মত সাহায্যকারী মিউটেশনগুলোর ফলশ্রুতিতেই ঘটেছে ভাষার উৎপত্তি ও ব্যবহার, তার সাথে পাল্লা দিয়ে ঘটেছে সাংস্কৃতিক বিবর্তন এবং বিকাশ ঘটেছে জটিল এক সামাজিক ব্যবস্থার। এখানেই তো শেষ নয়, গত কয়েক লক্ষ বছরে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকা পরিবেশগত পরিবর্তনের ব্যাপারটাকেও তো এই সমীকরণ থেকে বাদ দিয়ে দিলে চলবে না। এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে টিকে থাকার জন্য মানুষ যত নতুন ভাবে অভিযোজিত হয়েছে বিবর্তনের নিয়মে ততই বিকশিত হয়েছে তার নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ,

আজকে মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে পূর্ণাংগ কোন ধারণা পেতে হলে শুধু তার বিবর্তনের পিছনের বিজ্ঞানটা পড়লেই হবে না। বরং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে মানুষের চারপাশের পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তনের ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিকাশের জটিল প্রেক্ষাপটটাকেও ঠিক মত বিশ্লেষণ করতে হবে।

আমরা জানি যে, এই মহাবিশ্ব প্রায় ১৪'শ কোটি বছর আগে সৃষ্টি হলেও আমাদের এই বুড়ো পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে প্রায় সাড়ে ৪ শ' কোটি বছর আগে। এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, প্রাণের জন্ম হতে লেগে গিয়েছিলো আরও প্রায় একশো কোটি বছর। আর মানুষের উৎপত্তি? সে তো সে দিনকার কথা! আদিম এক কোষী প্রাণ, ব্যকটেরিয়া, বহুকোষী প্রাণী, অ্যালজি, অমেরুদন্ডী প্রাণী, বিভিন্ন মেরুদন্ডী প্রাণীর উৎপত্তি, বিকাশ বা বিলুপ্তির ধাপ বেয়ে, বিবর্তনের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে মানুষের আদি পূর্বপুরুষদের উদ্ভব ঘটলো মাত্র ৫০-৬০ লাখ বছর আগে। সে সময়ে মানুষ এবং অন্যান্য বনমানুষের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কিছু প্রজাতিরা পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে শিখলেও তার থেকে আধুনিক মানুষের পুর্বপুরুষদের উদ্ভব ঘটতে লেগে গেছে আরও প্রায় ৩০ লক্ষ বছর। আর আমাদের নিজেদের প্রজাতি অর্থাৎ *Homo sapiens* দের গল্পের শুরু তো সেদিন, মাত্র দেড় লাখ খানেক বছর আগে। ভূতাত্ত্বিক নিয়মে হিসাব করলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের ব্যাপারটা এক্কেবারেই আনকোরা। শুধু তো তাইই নয়, বিবর্তনের ধারায় যেমন অগুনতি জীবের উৎপত্তি ঘটেছে ঠিক তেমনি তাদের একটা বড় অংশ বিলুপ্তও হয়ে গেছে। একইভাবে আমরা ফসিল রেকর্ড থেকে দেখতে পাই যে, মানুষেরও বিভিন্ন প্রজাতির উৎপত্তি ঘটেছে, আবার আমাদের প্রজাতি ছাড়া বাকিরা বিলীন হয়ে গেছে ইতিহাসের পাতায়। বিবর্তনের ইতিহাসে অনিয়শ্চতার তো কোন শেষ নেই, ডাইনোসরের মত অতিকায় প্রাণী বহুকাল ধরে পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করেও শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গেছে। সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ভয়ঙ্কর কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মহাপরাক্রমশালী ডায়নোসরগুলো বিলুপ্ত হয়ে না গেলে সেই সময়ের অত্যন্ত নগন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলো হয়তো এত বিকশিত হতে পারতো না। অর্থাৎ, অন্যান্য সব প্রাণীর মতই আমাদের উদ্ভবও তো কোন পূর্ব-নির্ধারিত ব্যাপার নয়। আমরা আজকে এখানে আছি কোন 'নীল নক্সা'র ফলশ্রুতিতে নয়, বরং ঠিক তার উলটো কারণে, বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটেছে তা না ঘটলেই হয়তো আজকে আর আমরা এখানে থাকতাম না। প্রখ্যাত বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী এবং ফসিলবিদ স্টিফেন জে.

গুল্ড তাই বলেছিলেন, 'মানুষ আগে থেকে নির্ধারিত বিবর্তনের কোন ধারার শেষ ফসল নয় বরং মানুষ হচ্ছে আকষ্মিকভাবে উদ্ভুত মহাজাগতিক এক অনুচিন্তার ফলাফল। বিশাল শাখা প্রশাখাসহ যে প্রাণবৃক্ষের বিবর্তন ঘটেছে মানুষ হচ্ছে তার একটা ছোট্টো শাখামাত্র। একরকম নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, এই গাছের বীজটাকে যদি আবার নতুন করে বপন করা হয় তাহলে এই শাখাটা আবার একই রকমভাবে একই জায়গায় জন্ম নেবে না' ৩।

আসলে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসটা যে একটু অদ্ভুত এবং অন্য প্রাণীদের থেকে একটু বেশী জটিল সেটা কিন্তু স্বীকার করে নিতেই হবে! একদিক দিয়ে বিচার করলে, তা অন্যান্য সব প্রাণীর মতই প্রাকৃতিক নিয়মে বিবর্তনের ধারায় ঘটে যাওয়া এক আকস্মিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়, আর অন্যদিকে থেকে চিন্তা করলে, তা হচ্ছে অকল্পনীয় বুদ্ধিমত্তা, ভাষা ও সভ্যতার বিকাশের এবং সেই সাথে প্রকৃতির সাথে টেক্কা দেওয়ার এক অনন্য ইতিহাস। মানুষের এই অভুতপূর্ব বুদ্ধিমত্তা একদিকে যেমন তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে সামনের দিকে তেমনি তাকে উৎসাহী করে তুলেছে নিজের উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে প্রশ্ন করতে। অদম্য কৌতুহল ছিলো তার, কিন্তু জ্ঞানের মাত্রা তখনও এমন অবস্থায় পৌঁছেনি যে সে তার নিজের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে বের করতে পারবে বা উপলব্ধি করতে পারবে যে, কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও সে আসলে প্রকৃতির অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে তো মানুষের পক্ষে তার উৎপত্তির রহস্য বৈজ্ঞানিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব ছিলো না। যেখানেই তার জ্ঞানের পরিসীমা আটকে গেছে সেখানেই সে জন্ম দিয়েছে হাজারো কল্পকাহিনী, উপাখ্যান আর নানা রকমের সৃষ্টিতত্ত্বের। তাই সবার মত প্রকৃতির অধীন হয়ে থেকে তার তো আর পোষালো না, সে আরও অনেক বেশী জানতে চায়, বুঝতে চায়, নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা চায়, প্রকৃতিকে জয় করতে চায়। প্রকৃতির বিশালত্ব, নির্মমতা, হিংস্রতার সামনে 'অসহায় কিন্তু বুদ্ধিমান' মানুষ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অনবরত লড়াই করেছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে, আবার অন্যদিকে তার সামনেই মাথা নুইয়ে তৈরি করেছে নানা ধরণের কাল্পনিক স্রষ্টার। সহজাত বুদ্ধি আর অদম্য কৌতুহল আছে তার, কিন্তু অজ্ঞতা এবং কালের সীমাবদ্ধতাও তো অপরিসীম! আসলেই তো অবাক করা ব্যাপার - চারদিকে ফুলে ফলে সম্পদে ভরা পৃথিবী, তেষ্টা মেটাতে, বেঁচে থাকতে, ফসল ফলাতে পানির দরকার, অজানা কারণে বৃষ্টি হয়ে তা ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে, তাকে তাপ দেওয়ার জন্য সূর্য উঠছে একদিকে, দিনের শেষে ডুবে যাচ্ছে আরেক দিকে - এর সবই তার জন্য তৈরি নয় তো কি? আবার ওদিকে আগুন, মহাপ্লাবন, বজ্রপাত, সাইক্লোনগুলো কি যেনো এক আজানা কারণে তাকে শাস্তি দিয়ে যাচ্ছে! মহাবিশ্বের ছোট্টো এক গ্রহের আরও ছোট্টো এই মানুষ প্রজাতি তার চারদিকের প্রকৃতি এবং মহাবিশ্বের বিশালতায় পুলকিত, অভিভুত এবং ভীত! আর তা থেকেই সে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য দেব দেবতা, অলৌকিক সব সৃষ্টিকর্তার এবং সৃষ্টিতত্ত্বের, আর তারপর মহা গর্বে, মিথ্যা আস্ফালনে নিজেকে বসিয়েছে তার কেন্দ্রে। মহাবিশ্বের সমস্ত আয়োজনের উপলক্ষ্য নাকি সে, সেই নাকি 'সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি'!

কিছুদিন আগে মিশরের এক ফেরাউনের কয়েক হাজার বছরের পুরনো সমাধি খুঁড়ে বিচিত্র সব জিনিষ পাওয়া গেছে, নরবলি দেওয়া কঙ্কাল থেকে শুরু করে ৭০ ফুট লম্বা ১৪টি নৌকার পর্যন্ত কি না পাওয়া গেছে সেই সমাধির ভিতরে! পরজন্মে রাজাদের দাস দাসী তো লাগবেই, সে জন্যই এ নরবলি; তার সাথে নৌকাগুলোও দিয়ে দেওয়া হয়েছিলো যাতে চরে ফেরাউনের আত্মা পরপারে পাড়ি জমাতে পারবে! এখন হয়তো এ ধরণের কাহিনীগুলো শুনলে আমরা চমকে উঠি কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখুন - আমাদের চারপাশে পৃথিবীর আনাচে কানাচে, সব জাতি, গোষ্ঠি, সমাজ এবং সভ্যতার মধ্যেই বহু রকমের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং ধর্মীয় রীতিনীতির অস্তিত্ব দেখা যায়। বহুকালের সঞ্চিত সামাজিক অভিজ্ঞতার সাথে নিজের মনের

মাধুরী মিশিয়ে আমরা তৈরি করেছি এই সৃষ্টিতত্ত্বগুলো, আর তদানিন্তন সামাজিক রীতিগুলোকে তার সাথে বেঁধে দিয়ে বলেছি এটাই নিয়ম, এটাই ধর্ম এবং একমাত্র জীবন বিধান। শুধুই যে অজ্ঞতা থেকে, ভীতি থেকেই কল্পকাহিনীগুলোর জন্ম দিয়েছে তাও কিন্তু নয়, সমাজের অধিপতিরা তাদের শাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্যও ভর করেছে ধর্মের উপর, একে পুঁজি করে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শোষণকে বৈধতা দিয়েছে। আর সত্যিকারের জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা যেনো সাধারণ মানুষ পর্যন্ত না পৌঁছায় তার জন্য তৈরি করে রেখেছে বিভিন্ন নিয়মাবলীর। আড়াই হাজার বছর আগে সেই প্রাচীণ গ্রীস দেশে বিজ্ঞান তার সঠিক গতিতেই এগুতে শুরু করেছিলো। কিন্তু প্লেটো এবং বিশেষ করে এরিস্টোটল সেই সময়ের দাসপ্রথাভিত্তিক নিবর্তনমুলক সমাজব্যবস্থাকে গ্রহনযোগ্যতা দেওয়ার জন্য শক্তিশালী এক ভাববাদী দর্শনের জন্ম দিলেন যার মূলে ছিলো অপরিবর্তনশীলতা এবং জীবের শ্বাসত স্থায়ীত্বের তত্ত্ব ৪। আর এই স্থবির ধারণার উপর ভর করেই রোমান সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠলো খ্রীস্টিয় ধর্ম। গত হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে শাষকচক্রের সাথে মিলে ধর্মীয় অনুশাষণগুলো কিভাবে বৈজ্ঞানিক অগ্রসরতার টুঁটি চেপে ধরেছে সেই কাহিনীতে এখন আর ঢুকছিনা, যারা মানব সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে কিছু হলেও ধারণা রাখেন তারা সবাই এ সম্পর্কে কম বা বেশী জানেন। এটুকুই শুধু বলা যায় যে, এখনও আমাদের চারপাশে এ রকম দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার কোন শেষ নেই। কিন্তু মানুষের ইতিহাসের আরেকটি দিক না বললে গল্পটার একটা দিক না বলাই থেকে যাবে। আমরা উপরে মানুষের কল্পনার কথা বলেছি, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিরোধের কথা বলেছি কিন্তু তার বিরুদ্ধে মানব সভ্যতার অনন্ত সংগ্রামের কথাটা এখনও বলা হয়নি। যুগে যুগে মানুষের সৃজণীশক্তি, অজানাকে জানার অদম্য কৌতুহল এবং বুদ্ধিমত্তা তাকে একদিকে যেমন কল্পণা করতে শিখিয়েছে তেমনি আবার নতুন নতুন চিন্তা এবং আবিষ্কারেরও খোরাক জুগিয়েছে। কালের পরিক্রমায় নতুন নতুন জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে সে যখন অজানা বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে, তখনই সব বাঁধা অতিক্রম করে, পুরনো ভুলের এবং প্রতিরোধের দেওয়ালগুলোকে ভেঙ্গে চুড়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে, সত্যকে প্রতিস্ঠা করতে গিয়ে মানুষ শত অত্যাচার সহ্য করেছে, এমনকি মৃত্যকেও বরণ করে নিয়েছে। তাই আমাদের সভ্যতার ইতিহাসে এ ধরণের প্রতিরোধ এবং সংগ্রামের কাহিনীর কোন শেষ নেই। তার এই কল্পণাশক্তি এবং সেই সাথে যুক্তি দিয়ে, বস্তুবাদী চিন্তা দিয়ে তার চারদিকের সব কিছুকে বিশ্লেষণ করে দেখার অসীম ইচ্ছা এবং সর্বোপরি সত্যকে প্রতিস্ঠা করার নিরন্তর সংগ্রামের কারণেই জ্ঞান-বিজ্ঞান আজকে এখানে এসে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

সে যাই হোক, চলুন আমরা ফিরে যাই মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের গল্পে। আমরা জানি যে, ষোড়শ শতাব্দীতে এসে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের ধারণাটা হাজার বছর ধরে টিকে থাকা মধ্যযুগীয় ধর্মীয় এবং সামাজিক স্থবিরতার ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপরও তো প্রায় কয়েকশ বছর লেগে গিয়েছিল সেই সত্যকে প্রতিস্ঠিত করতে। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখেছি কিভাবে বহু বাঁধা বিঘ্ন পেরিয়ে জীববিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেরিয়ে এসেছিলো সেই 'প্রজাতির পৃথক পৃথক সৃষ্টি' এবং স্থির প্রজাতির মতবাদের ভ্রান্তি থেকে! প্রথমাবারের মত আমরা জানতে পেরেছিলাম আমাদের উৎপত্তি এবং বিকাশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা। তারপর প্রায় দেড়শো বছর কেটে গেছে, বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক শাখাগুলো প্রতিদিনিই আরও জোরালোভাবে এই বিবর্তন তত্ত্বের সঠিকতা প্রমাণ করে চলেছে, কিন্তু প্রাচীন চিন্তার আচলায়তন ভেঙ্গে আমাদের সমাজে তা কিন্তু এখনও জায়গা করে নিতে পারেনি। পৃথিবীতে যে গুটিকয়েক তত্ত্ব সমস্ত পুরনো ঘুণে ধরা রক্ষণশীল ভ্রান্ত চিন্তা ভাবনা ও প্রথাকে সমূলে আঘাত করেছে তার মধ্যে বিবর্তনবাদ অন্যতম। তাই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধেরও মাত্রাটা যে একটু বাড়াবাড়ি রকমের বেশি হবে তা তো জানা কথাই। মানব সভ্যতার সমগ্র ইতিহাস জুড়েই আমরা এর পুনরাবৃত্তি

দেখে এসেছি। অন্যান্য জীবের বিবর্তন নিয়ে কথা বললে যাও বা ঠিক আছে, কিন্তু মানুষের বিবর্তনের প্রসংগ আসলেই আমাদের মাথায় যেনো আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। সেই ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইন এবং আ্যালফ্রেড ওয়ালেস যখন প্রথম বিবর্তনের তত্ত্বটি প্রস্তাব করলেন তখন চার্চের বিশপের স্ত্রীর মুখ থেকে যে আতঙ্কবানী বের হয়ে এসেছিলো তা যেনো আজকের দিনেও প্রাসংগিক বলে মনে হয়। তিনি আর্তনাদ করে বলেছিলেন ৫,

‘বনমানুষ থেকে আমাদের বিবর্তন ঘটেছে! আশা করি যেনো এটা সত্যি না হয়, আর যদি তা একান্তই সত্য হয়ে থাকে তবে চলো আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি সাধারন মানুষ যেনো এটা কখনই জানতে না পারে! ’

সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সত্যকে সরিয়ে রাখার প্রচেস্টা তো আর নতুন কিছুই নয়। এখনও বিশ্বব্যাপী সেই চেস্টার যেন কোন কমতি নেই!

ডারউইন প্রথমে তার ‘প্রজাতি উৎপত্তি’ বইটিতে মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে তেমন কিছুই বলেন নি (শুধু বলেছিলেন, 'light will be thrown on the origin of man and his history'), এবং সেই সময়ের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার এই নিশ্চুপতার কারণটা বোঝা তেমন কঠিনও নয়। ১৮৫৭ সালে জার্মানির ডুসেল নদীর উপত্যকায় নিয়েন্ডারথাল নামক জায়গায় বেশ কিছু আদিম মানুষের করোটি আবিষ্কৃত হয়। তখন জার্মানীর প্রখ্যাত অধ্যাপক স্কাফ হাউসেন ফসিলগুলো পর্যবেক্ষণ করে প্রস্তাব করেন যে, এগুলো আসলে মানুষের কোন বিলুপ্ত আদিম প্রজাতির হাড়গোড়। এদের নাম দেওয়া হয় নিয়েন্ডারথাল মানুষ ৬। তখনকার শিক্ষিত সমাজ কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করেননি। ওদিকে ডারউইনের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং বিজ্ঞানী টি এইচ হাক্সলি সে সময়ই মানুষের বিবর্তনের বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং এপ বা বন মানুষের সাথে মানুষের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যগুলো তুলে ধরে ১৮৬৩ সালে 'Evidence as to Man's Place in Nature' নামক বইটি প্রকাশ করেন। এর পর ডারউইন যখন "The Descent of Man and selection with respect to Sex' বইটি বের করেন ততদিনে মানুষের বিবর্তনের বিষয়টি বুদ্ধিজীবী মহলে মোটামুটিভাবে সুপরিচিত হয়ে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জার্মান বিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেল তার বিখ্যাত ‘সৃষ্টির ইতিহাস’ বইয়ে লিখেছিলেন যে, বনমানুষ থেকে মানুষের বিবর্তন যদি সত্যিই ঘটে থাকে তবে মানুষও নয় আবার ঠিক বনমানুষও নয় এমন ধরণের মধ্যস্থিত ফসিল পাওয়া যাবে। তিনিই প্রথম বিবর্তনের মধ্যবর্তী অবস্থার এরকম ফসিলগুলোকে হারানো যোগসূত্র বা ‘missing link’ বলে আখ্যায়িত করেন ৬। তার কথাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে - গত একশো বছরে এমন অসংখ্য ফসিলের সন্ধান পাওয়া গেছে যা থেকে মানুষ এবং বনমানুষের মধ্যবর্তী অবস্থার বিবর্তনের ধাপগুলো স্পস্ট হয়ে উঠেছে। শুধু ত তাইই নয়, এথেকে আমরা স্পস্ট দেখতে পাচ্ছি যে, পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন সময়ে আমাদের প্রজাতির (*Homo sapiens*) মানুষ ছাড়াও আরও অন্যান্য প্রজাতির মানুষও বিচরণ করেছে, এমনকি অনেক সময় একাধিক প্রজাতির মানুষ একই সময়ে তাদের সম্মিলিত পদচারণায় মুখরিত করে তুলেছে আমাদের এই ধরণী। অর্থাৎ, আমরা নিজেদেরকে যতই বিশেষ এক ‘সৃস্টি’ বলে দাবী করি না কেনো আমরাও আসলে অন্য কোন পূর্ববর্তী প্রজাতি থেকেই বিবর্তিত হয়েছি, অন্যান্য জীবের মতই আমাদের পুর্বপুরুষদেরও বিবর্তন ঘটেছে বিভিন্ন ধারায়, প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় তাদের মধ্যেও উদ্ভব ঘটেছে বিভিন্ন ধরণের প্রজাতির। এই মুহূর্তে আমরা ছাড়া আর কোন মানব প্রজাতির অস্তিত্ব না থাকলেও অতীতে যে তা ছিলো তা নিয়ে কিন্তু দ্বিমত প্রকাশের কোন অবকাশই আর নেই।

গত একশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা মানুষ এবং এপের মধ্যবর্তী স্তরের যে সমস্ত ফসিল খুঁজে পেয়েছেন তা থেকে মানব বিবর্তনের একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া কিন্তু আর কোন কঠিণ ব্যাপার নয়। এখন সমস্যাটা আর 'যথেষ্ট পরিমাণে ফসিল পাওয়া যাচ্ছে না' তা নয় বরং ঠিক তার উলটো। এত রকমের মানুষের পুর্বপুরুষের প্রজাতির এবং তাদের মধ্যবর্তী স্তরের ফসিল পাওয়া যাচ্ছে যে তাদেরকে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঠিক ঠাক মত শ্রেনীবিন্যাস করাটাই বিজ্ঞানীদের জন্য এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানী আর্নেষ্ট হেকেলের মনোবাঞ্ছা যে এভাবে পূরণ হবে তা হয়তো তিনি নিজেও আশা করেননি। তার উপরে আবার গত কয়েক দশকে ডেটিং পদ্ধতির যে অভুতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে তার ফলে সঠিকভাবে ফসিলের বয়স এবং প্রকৃতি নির্ধারণ করার ক্ষমতাও বেড়ে গেছে বহুগুণ। আরও উন্নত পদ্ধতির রেডিওকার্বন ডেটিং পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যেখানে ঠিকমত আগ্নেয়শীলা পাওয়া যাচ্ছে না বা যেগুলো রেডিওকার্বন ডেটিং এর সময়সীমার আওতায় পড়ছে না সেখানে এখন ইলেকট্রন স্পিন রেসোনেন্স এবং ইউরেনিয়াম সিরিজ ডেটিং এর মত অত্যাধুনিক পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে। সিটি স্ক্যান নামের ত্রিমাত্রিক এক্স-রে পদ্ধতিটি মূলত চিকিৎসাবিদ্যার জন্য আবিষ্কৃত হলেও এখন তার মাধ্যমে ফসিলের বাইরের এবং ভিতরের আভ্যন্তরীণ গঠণের ছবি তোলা সম্ভব হচ্ছে, মাইক্রোস্কপিক পদ্ধতির মাধ্যমে হাড়ের বা দাঁতের গঠন বের করে ফেলা যাচ্ছে, আবার আইসোটোপিক পর্যালোচনার মাধ্যমে বিলুপ্ত প্রজাতিগুলোর খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কেও বেশ ভালো ধারণা পাওয়া যাচ্ছে [৮, ৯]।

এছাড়া মানুষ এবং এপের দৈহিক গঠনের তুলনামুলক বিচার থেকেও বহু তথ্য বেড়িয়ে এসেছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের সাথে এপের পার্থক্যগুলো যত বেশী না পরিমাণগত তার চেয়ে অনেক বেশী গুণগত। মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রকমের ভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছেঃ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের আকার-বিশেষতঃ মস্তিষ্কের আকার মানুষের অনেক বড়, বনমানুষের সাথে তাদের হাত এবং পায়ের আকারের অনুপাতেও পার্থক্য রয়েছে, গায়ের লোম পড়ে গেছে অনেকাংশেই, চামড়ার রঞ্জকবস্তু এবং বুড়ো আঙ্গুল নাড়াবার ক্ষমতাও মানুষের অনেক বেশী। আগে মানুষের সাথে বনমানুষের পার্থক্যকে যত বড় বলে মনে করা হত আধুনিক গবেষণার ফলে তা ক্রমশঃ যেন কমে আসছে। অনেকেই এখনও বৃটিশ বিজ্ঞানী রিচার্ড ওয়েন (Richard Owen, 1804-1892) এর বলা কিছু ভুল তথ্যকে সত্য বলে মনে করে বসে আছেন - ওয়েন মনে করেছিলেন যে, তিনি মানুষ এবং বনমানুষের মধ্যে বিশাল এক পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে মানুষ এবং বনমানুষ একই পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে আসেনি। তিনি বলেন মানুষের মস্তিষ্কে হিপোক্যাম্পাস নামের একটি বাড়তি উপাংগ রয়েছে যা কিনা বনমানুষের মধ্যে নেই। কিন্তু ডারউনের বন্ধু টি এইচ হাক্সলি তখনই তা ভুল প্রমাণ করেন, প্রকৃতপক্ষে মানুষ এবং এপ দুই গ্রুপেরই মধ্যে এই উপাংগটির অস্তিত্ব রয়েছে।

এ তো গেলো একটা দিক, অন্যদিকে জেনেটিক্স এবং জিনোমিক্সের আধুনিক গবেষণা এবং পর্যালোচনাকে বাদ দিলে তো বিবর্তনের গল্প বলাই এখন আর সম্ভব নয়। গত দুই তিন দশকে বিজ্ঞানের এই শাখাটি বিবর্তনবাদ এবং মানুষের বিবর্তনের পক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী সব তথ্য এবং সাক্ষ্য হাজির করেছে যার সাথে অংগস্থানবিদ্যা এবং ফসিলবিদ্যা থেকে আলাদা আলাদাভাবে পাওয়া তথ্যগুলো প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। আর দু'এক জায়গায় যেখানে অমিল বা সংশয় ধরা পড়ছে সেখানে বিজ্ঞানীরা সুযোগ পাচ্ছেন আরও নতুন নতুন গবেষণার মাধ্যমে ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার। বিজ্ঞানের তিনটি শাখা থেকে স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া এই সম্মিলিত তথ্যগুলো বিবর্তনবিদ্যাকে অত্যন্ত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। মানুষ এবং তার কাছাকাছি প্রজাতিগুলোর জিনোমের অনুক্রম বা সিকোয়েন্সিং এর মাধ্যমে আমরা মানুষের বিবর্তন

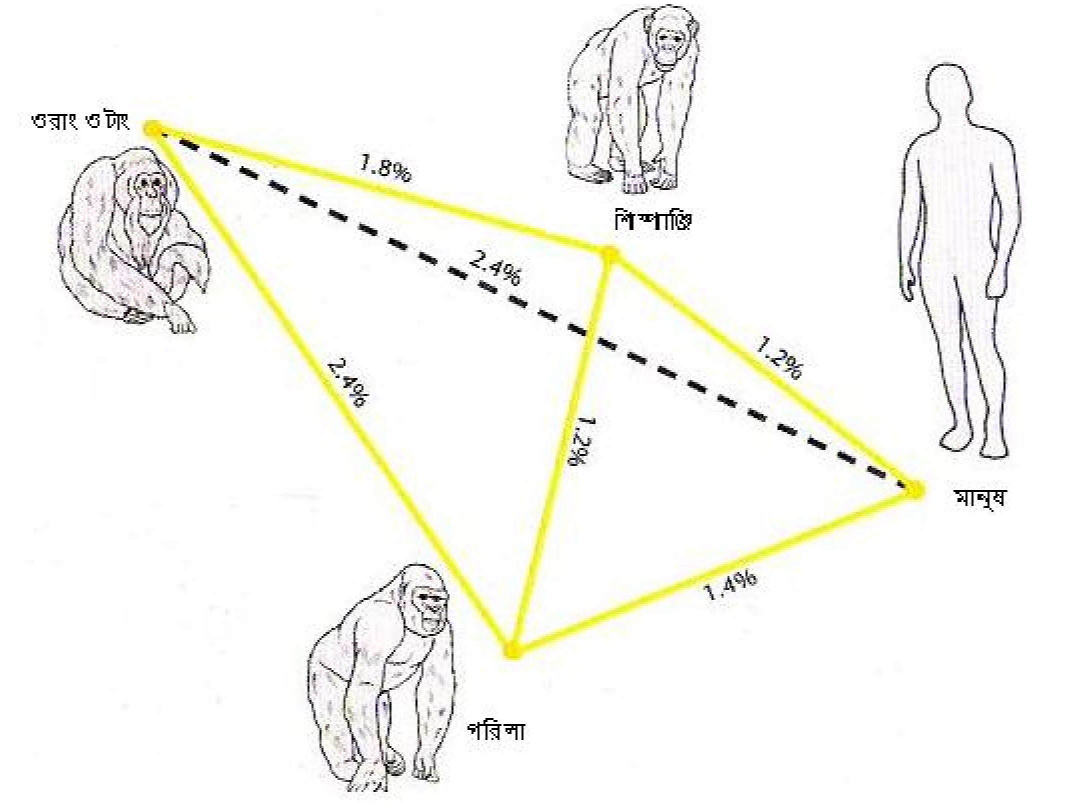

চিত্র ৯.১ : শিম্পাঞ্জি, ওরাং ওটাং, গরিলা এবং মানুষের মধ্যে বংশগতীয় পার্থক্যের তুলনা

নিয়ে যে বিস্তারিত সব তথ্য পেতে শুরু করেছি। এখন আবার প্যালেও-অ্যনথ্রোপলজী নামে বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা তৈরি করা হয়েছে, এরা মানুষের বিবর্তন নিয়ে গবেষণা করে। নৃতত্ত্ববিদ্যার অংশ হলেও এখানে জীববিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা এমনকি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের সমস্ত গবেষণাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আসলে যতই দিন যাচ্ছে ততই আরও বেশী করে পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে মানুষের বিবর্তনকে শুধুমাত্র জীববিজ্ঞানের সীমার মধ্যে রেখে বিচার করলেই হবে না। বুদ্ধিমত্তা এবং ভাষার অচিন্তনীয় বিকাশের ফলে মানুষ এমন এক জটিল সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে যে, বিবর্তনের প্রক্রিয়াও তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। আবার অন্যদিকে, মানুষ ছাড়া আমাদের খুব নিকটাত্মীয়রাও, যেমন ওরাং ওটাং, গরিলা, বা শিম্পাঞ্জিও, যেহেতু বেশ জটিল সামাজিক বন্ধন তৈরি করে, তাই মানুষের বিবর্তন বুঝতে হলে এই প্রজাতিগুলোরও জেনেটিক গঠন এবং বৈশিষ্ট্য তো বুঝতে হবেই এবং তার পাশাপাশি এদের ব্যবহার এবং প্রবণতাগুলোকেও বোঝাও অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

‘মানুষের বিভিন্ন প্রজাতি’ বলতে কি বুঝায় তা আরেকবার একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। জীববিদ্যার সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রজাতি বলতে আমরা বুঝি এমন এক জনপুঞ্জ যারা নিজেদের মধ্যে প্রজননে সক্ষম, কিন্তু অন্য জনপুঞ্জ থেকে প্রজননের দিক থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। যেমন ধরুন, বিভিন্ন ধরণের বিড়াল প্রজাতি বললে আমরা বুঝি তার মধ্যে রয়েছে, ঘরের সাধারণ বিড়াল থেকে শুরু করে, বাঘ, চিতা বাঘ, সিংহ, জাগুয়ার, বন্য বিড়াল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রজাতি।

হ্যা, মানুষ এবং তার পূর্বপুরুষদের বিভিন্ন প্রজাতি বলতেও আমরা সেরকম ওই বিভিন্ন ধরনের মানুষের কথাই বুঝি। এখন সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের একটাই প্রজাতি টিকে রয়েছে বলে ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝে ওঠা আমাদের জন্য যেনো একটু কষ্টকরে হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের প্রজাতির মানুষের সাথে কিছুটা মিল রয়েছে, আবার অমিলগুলোও চোখে পড়ার মতই, কিন্তু আবার বংশগতীয় দিক থেকে এতটাই ভিন্ন যে, তারা আমাদের সাথে প্রজননে অক্ষম –এমন বিভিন্ন ধরনের মানুষ নামক জীব পৃথিবীতে ঘুরে বেড়িয়েছে? হ্যা, বেশ অবিশ্বাস্য হলেও ব্যাপারটা আসলে সেরকমই।

এই বইটা তো শুরুই করেছি সেরকম এক ধরণের মানব প্রজাতির (*Homo floresiensis* বা যাদেরকে সাধারণ ভাষায় হবিট বা বেটে মানুষও বলা হয়) বর্ণনা দিয়ে। একটু পরেই আমরা আরও দেখবো যে, শুধু *Homo floresiensis* বা নিয়ান্ডারথাল প্রজাতিই নয়, বিবর্তনের ধারায় মানুষ এবং এপের মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিভিন্ন রকমের প্রজাতি এবং ক্রমশঃ সময়ের সাথে সাথে আজকের আধুনিক মানুষের কাছাকাছি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিভিন্ন ধরণের মানব প্রজাতি এই পৃথিবীতে বিকশিত হয়েছিল।

গত কয়েক দশকে আণবিক জীববিদ্যা, জেনেটিক্স, জিনোমিক্সের বিভিন্ন আবিষ্কারগুলো প্রাণের বিবর্তন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে এক নতুন পর্যায়ে উত্তোরিত করেছে। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা না করলে একুশ শতকে বসে লেখা কোন বিবর্তনের গল্প সম্পুর্ন হতে পারেনা। তাই ভাবছি এই নতুন জ্ঞানের আলোয় আমাদের পূর্বপুরুষদের গল্পটা কি রূপ নিয়েছে তা নিয়েই না হয় আগে আলোচনা করা যাক, তারপর আমরা দেখবো ফসিল রেকর্ডগুলো তার সাথে একমত হচ্ছে কিনা। এখানে ডিএনএ র গঠন বা কিভাবে জেনেটিক তথ্য ডিএনএ র ভিতর সঞ্চিত থাকে বা আণবিক জীববিদ্যার সাম্প্রতিক সবগুলো আবিষ্কার উল্লেখ করার সুযোগ বা সময় কোনটাই নেই বলে শুধু মানুষের বিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিস্কারের কথাই উল্লেখ করবো। আসলে সত্যি কথা বলতে কি মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে গত কয়েক শতাব্দী ধরে এত কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে যে শুধু তা নিয়েই একটি বড়সড় বই লেখা যায়। এখানে একটি অধ্যায়ের ছোট্টো পরিসরে তার সবকিছু ব্যাখ্যা করার প্রয়াসকে এক ধরণের ধৃষ্টতা ছাড়া আর কি যে বলা যায় তা ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু কি আর করা, সময় এবং সুযোগের সীমাবদ্ধতাটাকে মেনে নিয়ে আপাতত এখানেই এর কয়েকটি অংশ তুলে ধরা যাক।

জিনের আলোয় ফিরে দেখা

বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স তার 'Unweaving the Rainbow' বইতে বলেছিলেন যে, ডিএনএ হচ্ছে 'মৃতের জেনেটিক বই'- আমাদের পুর্বপুরুষের ইতিহাসের রোজনামচা যেন তারা। বিবর্তনবিদ্যা বলে যে, জীবের শরীরের সবকিছুই তার পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। আর এদিকে ডি এন এ র মধ্যে বিস্তারিতভাবে লেখা রয়েছে সেই কাহিনীর পূর্ণ ধারাবাহিক বিবরণী - কখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে, কোন পরিবেশে টিকে থাকার জন্য যুদ্ধ করেছে, প্রজননের ইতিহাস থেকে শুরু করে কোথায় কখন কোন মিউটেশন তাদের বিবর্তনের গতিকে নিয়ে গেছে নতুন দিগন্তে - সবকিছু লেখা আছে

আমাদের ডি এন এ র ভিতরে। প্রজননের মাধ্যমে পরের প্রজন্ম তৈরির ধারাবাহিকতা যদি ছিন্ন না হয় তাহলে ডিএনএ-এর ভিতরে লেখা তথ্যগুলো এক অণু থেকে আরেক অণুতে, এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। প্রতিটি জীব তার দেহকোষের ভিতরে হাজার লক্ষ এমনকি কোটি বছর ধরে এই ঐতিহাসিক তথ্য বয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা মোটে গত কয়েক দশক ধরে আণবিক জীববিদ্যার প্রভূত অগ্রগতির ফলে সঠিকভাবে ডিএনএ -এর ভিতরে লেখা এই তথ্যগুলো পড়তে এবং বুঝতে শুরু করেছি। ডঃ রিচার্ড ডকিন্স মনে করেন যে পৃথিবীতে যদি একটাও ফসিলের অস্তিত্ব না থাকতো বা কেউ যদি তাদেরকে কোন ম্যাজিক করে উড়িয়ে দিত তাহলেও পৃথিবী জোড়া জীবের বিস্তৃতির প্যাটার্ণ এবং তাদের জেনেটিক তথ্য থেকেই সম্পূর্ণ বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করা সম্ভব হতো [১১]। কথাটা শুনতে অতিরঞ্জণ বা ঔদ্ধত্য বলে মনে হলেও, আজকে একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় দাঁড়িয়ে, আণবিক জীববিদ্যার সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলোকে একটু মনযোগ দিয়ে বুঝতে চেস্টা করলেই বোঝা যায় যে, কথাটা আদৌ মিথ্যা নয়।

মানুষের জিনোমের সিকোয়েন্সিং বা অনুক্রমের ঐতিহাসিক প্রথম খসড়াটি প্রকাশিত হয় ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা এই প্রজেক্টে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৩ সালে এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয় [১২]। এর কিছুদিন পরেই, ২০০৫ সালে, আমাদের বিবর্তনের ইতিহাসে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় শিম্পাঞ্জির জিনোমও পড়ে শেষ করা হয়। (ওদিকে আবার গত কয়েক বছরে ইঁদুর, মৌমাছি, ইস্টসহ বেশ কয়েকটি জীবের জিনোমের অনুক্রমও বের করা হয়েছে, www.ncbi.nih.gov/Genbank বা www.genome.ucsc.edu ওয়েব সাইটগুলোতে এখন মানুষ এবং শিম্পাঞ্জি সহ বিভিন্ন জীবের জিনোমের অনুক্রমের বিস্তারিত তথ্য রাখা আছে) [১৩]। পৃথিবী জোড়া ৬৭ জন বিজ্ঞানী এই শিমাঞ্জি সিকোয়েন্সিং এ্যন্ড এ্যনালিসিস কনসোরটিয়ামে অংশগ্রহণ করেন, নেচার জার্নালের ২০০৫ সালের সেপটেম্বর ইস্যুতে মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির জিনোমের তুলনামুলক বিশ্লেষণের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হয় [১৩]। ন্যাশনাল হিউম্যান জিনোম রিসার্চ ইনস্টিটিউটের(NHGRI) এর ডিরেকটর ফ্রান্সিস কলিন্স এর মতে, এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস, শারিরীক গঠন, বিভিন্ন ধরণের অসুখ বিসুখের উৎপত্তি বুঝতে হলে বিবর্তনের ধারায় উদ্ভুত এবং অত্যন্ত কাছাকাছি সম্পর্কিত বিভিন্ন জীবের জিনোমের সাথে আমাদের জিনোমের তুলনামুলক ব্যাখ্যা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের জিনোমের পরীক্ষার সাথে ফসিল রেকর্ড এবং শারীরবিদ্যার তুলনামুলক ব্যাখ্যা থেকে বিজ্ঞানীরা আগে শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে যা ভেবেছিলেন তা প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। এদের বর্তমান জিনোমের মধ্যে সাদৃশ্য প্রায় ৯৯% এবং তাদের প্রোটিনের গঠনও খুবই কাছাকাছি। ডি এন এ র সন্নিবেশন (Insertion) এবং বিলুপ্তি (Deletion) হিসাব করলে এই সাদৃশ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৬% এ। প্রোটিন লেভেলে বিচার করলে দেখা যায় যে তাদের ২৯% জিন একই প্রোটিনের কোডিং এ নিয়োজিত। অর্থাৎ, দু'টো মানুষের ডি এন এ তুলনা করলে যে পার্থক্য দেখা যাবে, একটা মানুষ এবং শিম্পঞ্জির মধ্যে সে পার্থক্যটা মাত্র ১০ গুণ বেশী, কিংবা ধরুন ইঁদুরের সাথে মানুষের যে পার্থক্য তার তুলনায় শিম্পাঞ্জির সাথে পার্থক্য ৬০ গুণ কম [১৩]! বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, মানুষ এবং শিম্পাঞ্জিতে কিছু কিছু জিন অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর তুলনায় ক্রমাগতভাবে দ্রুতগতিতে বদলে যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে শব্দ শোনা এবং বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় জিন, স্নায়ুতন্ত্রের সংকেত আদান প্রদানের জিন, শুক্রানু তৈরির জিনসহ আরও কয়েকটি জিন। এদিকে আবার দেখা যাচ্ছে যে বিবর্তনের ধারায় মানুষ এবং শিম্পঞ্জির ডি এন এ তে ইঁদুর বা খরগোশের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে ক্ষতিকর

মিউটেশন ঘটেছে। তার ফলে একদিকে যেমন তাদের অসুখের পরিমাণ বেড়েছে কিন্তু অন্যদিকে আবার তা তাদেরকে পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হতে বাড়তি সুবিধা করে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা মানুষের জিনোমের এই ধরণের মিউটেশনগুলো আরও খতিয়ে দেখছেন।

> শিম্পাঞ্জি, অন্যান্য প্রাইমেট বা অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর সাথে আমাদের মিলগুলো বোঝা যেমন দরকার ঠিক তেমনিভাবেই গুরুত্বপূর্ণ এদের সাথে আমাদের পার্থক্যগুলো সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারা। তাহলেই হয়তো আমরা বলতে পারবো কোন কোন পরিবর্তনগুলোর ফলে আমরা মানুষে বিবর্তিত হয়েছি, কিংবা ঠিক কোন কোন বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে আমরা তাদের থেকে বুদ্ধিমত্তায় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে এত আলাদা হয়ে গেছি। ইতোমধ্যেই আমরা এই ধরনের বিশ্লেষণ থেকে এমন কিছু কিছু তথ্য জানতে পেরেছি যা আমাদের স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারে।

যেমন ধরুন, দেখা যাচ্ছে যে, শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের সাধারণ পূর্বসুরী থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর মানুষ Caspase- 12 নামক জিনের কার্যকরিতা হারিয়ে ফেলেছে যার ফলেই সে এখন আলজাইমারস বা স্মৃতিভংশ (Alzheimer's) রোগে আক্রান্ত হয়। এখন আমরা যদি শিম্পাঞ্জির মধ্যে এই জিনের কাজগুলোকে ঠিকমত বুঝতে পেরে আমাদের শরীরে মধ্যে তার প্রয়োগ ঘটাতে পারি তাহলে হয়তো এই মারাত্মক রোগটির একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিভিন্ন রোগের সাথে আমাদের জেনেটিক গঠনের বিবর্তনের ইতিহাস যে কি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তা এখন ধীরে ধীরে আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

বিজ্ঞানীরা জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে পাওয়া তথ্যগুলোর ক্রস পরীক্ষণ করে যত সঠিকভাবে প্রজাতির উৎপত্তি এবং বিকাশের সময়সীমা নির্ধারণ করতে পারেন ব্যাপারটা কিন্তু কয়েক দশক আগেও ঠিক এত সহজ ছিল না। ফসিল রেকর্ড পড়ার জন্য এত অত্যাধুনিক উপায়গুলো যেমন তাদের হাতে ছিল না, ঠিক তেমনিভাবে ডিএনএ বা আণবিক গঠণের তুলনামুলক বিশ্লেষণের পদ্ধতিগুলোও তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। আজকের দিনে ব্যাপারটা কিন্তু আর সেরকম নেই। আমরা এখন যে কোন ফসিলের আবিষ্কারকে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার বিভিন্ন ধরণের স্বতন্ত্র পরীক্ষা দিয়ে এক বার দু'বার নয়, বহুবারই যাচাই করে নিতে পারি। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের সময়সীমা নির্ধারণের ব্যাপারটা এর এক উজ্জ্বল নমুনা। যেমন ধরুন, গত শতাব্দীর প্রথম দিকে কিন্তু মানুষের তেমন কোন মধ্যবর্তী ফসিলের সন্ধান পাওয়া যায়নি, অনেকেই তখন মনে করতেন যে, মানুষ হয়তো অন্যান্য বনমানুষদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো প্রায় ৫ কোটি বছর আগে। তারপর ধীরে ধীরে যখন আরও অনেক ফসিল পাওয়া যেতে শুরু করলো, ওদিকে আবার বিজ্ঞানীরা মানুষের সাথে ওরাং ওটাং, গরিলা, শিম্পাঞ্জির মিলগুলো আরও ভালো করে বুঝতে শুরু করলেন তখন মনে করা হত যে, হয়তো দেড় কোটি বছর আগে মানুষের বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যেভাগে ডিএনএর আবিষ্কারের পর আমাদের সামনে আণবিক জীববিদ্যার গবেষণার দুয়ার খুলে যায়। এখন শুধু অতীতের ফসিল থেকেই নয়, আমাদের নিজেদের শরীরের জলজ্যান্ত

ডিএনএর ভিতরেই আমরা পড়ে ফেলতে পারছি আমাদের বিবর্তনের ইতিহাস। সত্তরের দশকে মানুষ এবং অন্যান্য এপদের প্রোটিনের এমাইনো এসিডের তুলনামুলক বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, বিবর্তনের যাত্রায় মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির আলাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা ৫০ লক্ষ বছরের বেশী পুরনো হতে পারেনা। এদিকে আবার গত তিরিশ, চল্লিশ বছরে ফসিলবিদেরা আফ্রিকা থেকে মানুষের ‘আধা’ এবং ‘সম্পুর্ণ’ আদিপুরুষদের যে সব ফসিল খুঁজে পেয়েছেন তা থেকেও কিন্তু আমরা এখন একই ধরণের তথ্য পেতে শুরু করেছি। পরবর্তীকালে করা বিভিন্ন আণবিক গবেষণা এবং ডিএনএ সংকরায়ণের ফলাফলগুলোও এই একই সময়ের কথাই বলেছে। আর এদিকে আজকের জিনোমিক্সের অত্যাধুনিক গবেষণা থেকেও আমরা এ বিষয়ে অত্যন্ত জোড়ালো সাক্ষ্য পেতে শুরু করেছি। ২০০৬ সালের মে মাসে এমআইটি এবং হার্ভার্ড ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানীরা নেচার জার্নালে যে গবেষণাটি প্রকাশ করেন তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ এবং শিম্পাঞ্জি তাদের সাধারণ পুর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল ৫৪ লক্ষ থেকে ৬৩ লক্ষ বছর

মানুষের জিনোম : কিছু মজার তথ্য

- মানুষের জিনোমে ৪৬ টি করে ক্রোমোজোম এবং ৩ বিলিয়ন ডি এন এ বেস রয়েছে। ডি এন এর ভিতরে ৪ ধরণের বেস A, T, C এবং G রয়েছে। খুব সংক্ষপে বলতে গেলে বলতে হয়, জিন হচ্ছে এই বেসগুলোর বিভিন্ন রকমের সমন্বয়ে তৈরি ডি এন এ র অংশ যারা আমাদের শরীরের বিভিন্ন ধরণের প্রোটিনের কোড নির্ধারণ করে। ব্যাপারটা অনেকটা লিখিত ভাষার মত। কতগুলো অক্ষর দিয়ে যেমন আমরা হাজার হাজার শব্দের জন্ম দেই তেমনিভাবে এই ৪ টি বেসের সমন্বয়েই হাজার হাজার জিনের উদ্ভব ঘটে।

চিত্র ৯.২: ক্রোমোজোমের গঠন

- ডি এন এর মধ্যে উল্লেখিত তথ্যগুলোকে যদি কাগজে কলমে লেখা হয় তাহলে তা দিয়ে ২০০টা ৫০০ পৃষ্ঠার ডিকশেনারী ভরিয়ে ফেলা যাবে। এর মধ্যেই লেখা রয়েছে আমাদের কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের সব তথ্যাবলী।

- মানুষের শরীরে ১০০ ট্রিলিয়ন কোষ আছে, এবং তাদের ভিতরে যে পরিমাণ ডি এন এ রয়েছে তাদের সবগুলোকে কে পাশাপাশি করে সাজালে এখান থেকে সূর্য পর্যন্ত ৬০০ বার আসা যাওয়া করা যাবে!

- মানুষের জিনোমে ২০,০০০ - ২৫,০০০ জিন রয়েছে। দু'টো মানুষের মধ্যে ডি এন এর পার্থক্য মাত্র ০.২%, অর্থাৎ, ৫০০ টি বেসের মধ্যে মাত্র একটি তে পার্থক্য দেখা যায়। আর শিম্পাঞ্জির সাথে আমাদের জিনোমের পার্থক্য হচ্ছে ২% এর কম [১৫]।

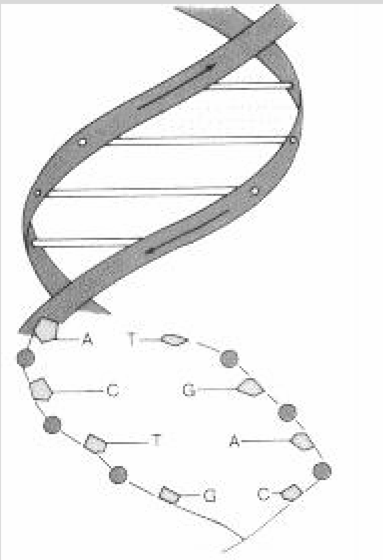

চিত্র ৯.৩: ডি এন এ র গঠন

আগে এবং তাদের আলাদা হয়ে যাওয়ার ইতিহাসটি বেশ জটিল [১৪]। কিছুদিন আগেও বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে এই দুই প্রজাতির মধ্যে প্রজননে বিচ্ছিন্নতা ঘটেছিল ৬০-৮০ লক্ষ বছর আগে, কিন্তু এখন জেনেটিক তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তা আসলে ঘটেছে আরও পরে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে, সম্পূর্ণভাবে আলাদা হয়ে যাওয়ার আগে এই দুই প্রজাতি বা উপপ্রজাতির মধ্যে বেশ লম্বা সময় ধরে প্রজনন ঘটেছিল যা আমাদের ক্রোমোজোম X এর মধ্যে গভীর ছাপ ফেলে গেছে। কে জানে, এ জন্যই হয়তো আমরা এত লম্বা সময় ধরে আফ্রিকা জূড়ে 'না-এপ না-মানুষ' জাতীয় মধ্যবর্তী ফসিলের সন্ধান পাচ্ছি! পরবর্তীতে ফসিল রেকর্ড নিয়ে আলোচনার সময় আমরা এ বিষয়টি দেখতে পাবো। উপরে বলা গবেষণাটিতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, গরিলা এবং অন্যান্য প্রাইমেটদের জিনোমের গবেষণা থেকে এ বিষয়ে আরও নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যাবে এবং বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যেই তার কাজ শুরু করে দিয়েছেন[১৪]।

এবার আসা যাক আণবিক জীববিদ্যার কল্যাণে বিবর্তন তত্ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য সংশয়ের নিষ্পত্তি কিভাবে ঘটলো সেই গল্পে। শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাং ওটাং সবার মধ্যে ক্রোমোসোমের সংখ্যা ৪৮, হঠাৎ করেই দেখা যাচ্ছে যে, একই হোমিনয়ডিয়া দলের সদস্য হওয়া স্বত্ত্বেও, মানুষের ক্রোমোসোমের সংখ্যা হয়ে গেছে ৪৬। বিবর্তনের তত্ত্বানুযায়ী এরা যদি একই পুর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে থাকে এবং অন্যদের সবার মধ্যে ৪৮টি ক্রোমোসোমের অস্তিত্ত্ব থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে এখন প্রশ্ন করতে হবে, মানুষের জিনোম থেকে দু'টো ক্রোমোজোম কোথায় হারিয়ে গেল? বিবর্তন তত্ত্ব যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে তো একদিন হঠাৎ করে ক্রোমোজোম দু'টো হাওয়া হয়ে যেতে পারে না, তাদের কোন না কোন রকমের চিহ্ন থাকতেই হবে মানুষের জিনোমের মধ্যে। আর যদি এ ধরণের কোন নমুনা একেবারেই না পাওয়া যায় তাহলে তো বিবর্তনবাদের মুল বিরষয়টি নিয়েই সন্দেহের অবকাশ থেকে যাচ্ছে। জীববিদরা প্রকল্প দিলেন যে, যেহেতু সব বনমানুষদের মধ্যে এখনও ৪৮টা ক্রোমোজোম আছে কিন্তু এদের দলের মধ্যে শুধুমাত্র মানুষেরই দু'টো ক্রোমোজোম কম আছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, শেষ সাধারণ পুর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর বিবর্তনের পথে চলতে চলতে কোন এক সময়ে মানুষের প্রজাতির মধ্যে আদি দু'টো ক্রোমোজোম সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল, যা অন্যান্য বনমানুষদের ক্ষেত্রে ঘটেনি। শেষ পর্যন্ত, এই তো কিছুদিন আগে, ২০০২ সালে বিজ্ঞানীরা দেখালেন যে, আসলে শিম্পাঞ্জিদের যে ১২ এবং ১৩ নম্বর ক্রোমোজোম (এখন তাদেরকে ২A এবং ২B বলে নামকরণ করা হয়েছে, নীচের ছবিতে মানুষের ক্রোমোজোম ২ এর সাথে শিম্পাঞ্জি, গরিলা এবং ওরাং ওটাং এর এই দুইটি ক্রোমোসোমের তুলনা দেখানো হয়েছে) রয়েছে সে দু'টো মানুষের মধ্যে মুখোমুখীভাবে সংযুক্ত হয়ে ক্রোমোজোম ২ তৈরি করেছে[১৬]। এই দু'টো ক্রোমোজোমের সংযুক্তির বিন্দুটির গঠন নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা থেকেও মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের আরও অনেক তথ্য বের হয়ে এসেছে, কিন্তু তা নিয়ে এখানে আর আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। আসলে এ ধরণের ক্ষেত্রগুলোতেই আমরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে বিবর্তনবাদের শক্তি এবং সঠিকতা বুঝতে পারি। কোন সঠিক তত্ত্ব থেকে বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প বা পূর্বাভাস দেওয়া

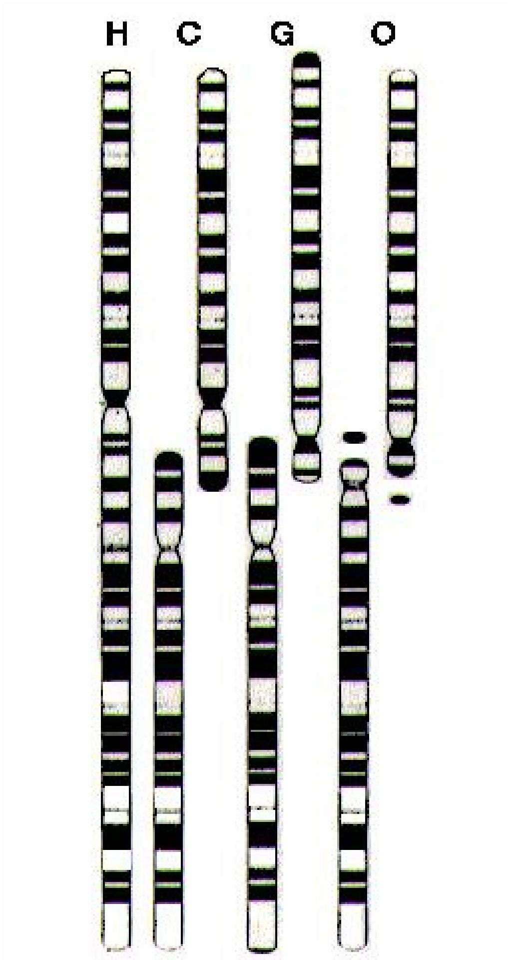

চিত্রঃ ৯.৪: শিম্পাঞ্জি (C), গরিলা (G), ওরাং ওটাং (O) এবং মানুষের (H) ক্রোমোজোম ২এর তুলনামুলক গঠন

(Yunis, J. J., Prakash, O., The origin of man, a chormosomal pictorial legacy. Science, Vol 215, 19 March 1982. 1525 - 1530)

সম্ভব হয় যা অবৈজ্ঞানিক কোন কিছুর উপর ভিত্তি করে দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন ধরুন, মানুষের শরীরে কোনভাবেই এই হারিয়ে যাওয়া ক্রোমোজোম টির অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়া যেত তাহলে বিবর্তন তত্ত্বের সঠিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হতেন বিজ্ঞানীমহল।

এছাড়াও মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির জিনোম বিশ্লেষণ থেকে বিজ্ঞানীরা মানুষের মস্তিষ্কের অত্যন্ত দ্রুত বিকাশের জন্য দায়ী জিনগুলো, তাদের বিকাশের সময়সীমা, বিভিন্ন ধরণের প্রোটিনের গঠন, বনমানুষদের মধ্যে ঘ্রাণশক্তির লোপ এবং সেই সাথে সাথে শক্তিশালী দৃষ্টিশক্তির বিকাশের মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য পেতে শুরু করেছেন। এমআইটি এবং হার্ভার্ড ইউনিভারসিটির ব্রড ইনস্টিটিউটের সদস্য বিজ্ঞানী টি মিকেলসনের মতে, আগামী কয়েক বছরে আরও অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং প্রাইমেটের জিনোমের অনুক্রম বের করে ফেলা যাবে, সেখান থেকে খুব সহজেই মানুষের বিবর্তনের জন্য দায়ী বিশেষ ডিএনএর অনুক্রমগুলো বেড়িয়ে পড়বে। মানুষের বিবর্তনের প্রধান

বৈশিষ্ট্যগুলো, যেমন ধরুন, দুই পায়ের উপড় ভর করে দাঁড়াতে পারা, মস্তিষ্কের বিবর্ধন বা জটিল ভাষাগত দক্ষতার মত বিবর্তনের বিশেষ ধাপগুলোতে কি ধরণের জেনেটিক পরিবর্তন কাজ করেছিল সেগুলো আবিষ্কার করতে পারলে হয়তো আমরা মানুষের বিবর্তনের একটা সম্পুর্ণ রূপরেখা তৈরি করতে পারবো ১৩। আবার অন্য দিকে এই জেনেটিক পরিবর্তনগুলো তাদেরকে টিকে থাকার জন্য কি বিশেষ ধরণের সুবিধা করে দিয়েছিল - এগুলো কি তাদের পরিবর্তনশীল পরিবেশে সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বাড়তি সুবিধা করে দিয়েছিল নাকি দ্রুত চলাচলে বা পারস্পরিক সংযোগ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল, নাকি সামাজিকভাবে দলবদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকার ক্ষমতা যুগিয়েছিল - এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে রয়েছে আমাদের উৎপত্তি এবং বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাসের রহস্য। আর এই প্রশ্নগুলোর উত্তর লুকিয়ে রয়েছে আমাদেরই দেহকোষের ভিতরের্ ডিএনএ মধ্যে। এই 'জিনের আলোয় ফিরে দেখা' পর্বটা শুরু করেছিলাম রিচার্ড ডকিন্সের উক্তি দিয়ে, চলুন তার আরেকটা উক্তি দিয়েই এর পরিসমাপ্তি ঘটানো যাক। তিনি ঠিকই বলেছেন, 'আমরা এই পৃথিবীতে ক্ষণিকের অতিথি, আমাদের জীবনের কাজ যখন শেষ হয়ে যায় তখন আমাদের দেহটাও পৃথিবীর বুকে বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু জিনগুলো হচ্ছে আবহমানকালের নাগরিক, তারা চিরঞ্জীব। তাদের মধ্যেই লেখা আছে আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশের সব কাহিনী'।'

ফসিল রেকর্ডের আলোয় এবার আমাদের ইতিহাসটা ঝালিয়ে নেওয়া যাক

চলুন এবার চোখ ফেরানো যাক বিবর্তনের সুদুর ইতিহাসের পাতায় - প্রায় ৬০ লক্ষ বছর আগের ইতিহাসে, যখন অন্যান্য বনমানুষ থেকে মানুষের বিবর্তনের পথ আলাদা হয়ে যেতে শুরু করেছিলো। আগের অধ্যায়গুলোতেই দেখেছিলাম ফসিল রেকর্ডগুলো কিভাবে জীবের বিবর্তনের ইতিহাসের পদচিহ্ন বহ্ন করে চলেছে। ডঃ রিচার্ড ডকিন্স যেমন একদিকে বলেছেন যে, কোন ফসিল রেকর্ডগুলো না থাকলেও আমরা শুধু জেনেটিক তথ্য থেকেই বিবর্তনের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখতে পারতাম, ঠিক তেমনিভাবে এও বলেছেন যে, আমাদের হাতের সামনে আর কোন সাক্ষ্য না থেকে শুধুই যদি ফসিল রেকর্ডগুলো থাকত তাহলেও আমরা একইভাবে চোখ বন্ধ করে বিবর্তনবাদের সঠিকতা প্রমাণ করতে পারতাম। এটা আসলে আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা 'একে অপরের পরিপুরক' হিসেবে বিবেচিত দু'টো পথ এক সাথে খুঁজে পেয়েছি ১১।

আসলে মানুষের বিবর্তনের গল্পটা পুরোপুরি বলতে গেলে আমাদের শুরু করতে হবে মানুষ নামক কোন প্রাণীর উদ্ভবেরও অনেক আগে - তাদের সেই আদি পুর্বপুরুষ বানর এবং পরবর্তী পূর্বপুরুষ বনমানুষদের বিবর্তনের ইতিহাস থেকে। এই দীর্ঘ ইতিহাসের বইটির অনেক হারিয়ে যাওয়া পৃষ্ঠার সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু গত একশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা মানুষ এবং এপের মধ্যবর্তী স্তরের এমন অনেক ফসিল খুঁজে পেয়েছেন যা থেকে মানব বিবর্তনের একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া কিন্তু আর কোন কঠিণ ব্যাপার নয়। ফসিল রেকর্ডের প্রসঙ্গে ঢোকার আগে পাঠকদেরকে একটা বিষয়ে আগে থেকেই সাবধান করে দিতে চাই। এই বইটি লেখার সময় সবচেয়ে বড় ভাবনা ছিল কিভাবে কঠিন কঠিন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকথা না কপচিয়ে সহজ ভাষায় বিবর্তন সম্পর্কে লিখতে পারা যায়। কতটুকু সফল হয়েছি জানি না, সেই বিচারের ভার না হয় পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি, তবে এখানে এসে যে বিপদে পড়ে গেছি তা বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারছি। ফসিল রেকর্ডের ধারাবাহিক বিবরণ দিতে গেলে সেই প্রতিজ্ঞাটি আর রাখা সম্ভব কিনা তা ঠিক বুঝতে পারছিনা। এখানে বারবারই ইতিহাসের সময়সীমা, প্রজাতিদেরর

<u>*এই বইয়ে মানুষ , এপসহ প্রাইমেটদের জন্য যে শ্রেণীবিন্যাস ব্যবহার করা হয়েছেঃ*</u>

মানব প্রজাতিসহ সব বনমানুষই স্তন্যপায়ী প্রাণীর অন্তর্গত প্রাইমেট বর্গের মধ্যে পড়েছে। এই **প্রাইমেটদের** মধ্যে এখন পর্যন্ত জানা মতে দুই শ'রও বেশী প্রজাতি রয়েছে, এখনকার আধুনিক শ্রেনীবিন্যাস অনুযায়ী এদেরকে তিনটি উপবর্গে ভাগ করা হয়ঃ **প্রোসিমিই** (যার মধ্যে রয়েছে লেমুর, লরিস, বুশবেবি জাতীয় আদি প্রাইমেট); **টারসিফরম** (টারশিয়ারদের আগে প্রোসিমিইর মধ্যে ফেলা হলেও এখন তাদেরকে আলাদা উপবর্গে ফেলা হয়); এবং **অ্যানথ্রোপইডি** (সব ধরণের বানর, বনমানুষ এবং মানুষ)। অ্যানথ্রোপইডি জাতীয় প্রাইমেটদেরকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ **নতুন দুনিয়ার বানর** (New World Monkeys বা Platyrrhini) এবং **পুরানো দুনিয়ার বানর** (Old World Monkeys বা Catarrhini)| হাউলার বা স্পাইডার বানর জাতীয় নতুন দুনিয়ার বানররা লেজ দিয়ে গাছে ঝুলে থাকতে পারে; আর ওদিকে ম্যাকাকু, বেবুন এবং হোমিনয়ডিয়া জাতীয় পুরানো দুনিয়ার বানররা লেজ দিয়ে গাছে ঝুলে থাকতে পারে না। আগে বিজ্ঞানীরা হোমিনিড গ্রুপের মধ্যে শুধু আধুনিক মানুষ এবং তাদের দ্বিপদী পুর্বপুরুষদের ফেলতেন, আর গরিলা, শিম্পাঞ্জি এবং অন্যান্য বনমানুষদের এক সাথে করে অন্য গ্রুপে ফেলা হত। কিন্তু আধুনিক জেনেটিক পরীক্ষা থেকে সুস্পস্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে, শিমাঞ্জিরা জেনেটিকভাবে গরিলা বা অন্যান্য বনমানুষের চেয়ে মানুষের অনেক কাছের প্রজাতি। তাদেরকে গরিলা বা ওরাং ওটাংদের সাথে এক করে শ্রেণীবিন্যাস করার কোন মানে হয় না। এখানে আমি আজকালকার বেশীরভাগ আধুনিক প্যালেও-অ্যনথ্রোপলজীর বইয়ে ব্যবহৃত শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতিই ব্যবহার করবো। এখানে মানুষসহ সব বনমানুষদের প্রথমে **হোমিনয়ডিয়া (বা এপ)** সুপার ফ্যামিলি বা অধি-গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তারপর গিবনদেরকে আলাদা করে দিয়ে বাকিদেরকে ফেলা হয়েছে **হোমিনিডি** গোত্রে। এই গোত্রে রয়েছে তিনটি উপ-গোত্রঃ ক) **ওরাং ওটাং,** খ) **গরিলা** এবং গ) **শিম্পাঞ্জি ও মানুষ**। মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির উপগোত্রকে বলা হয় **হোমিনিনি**। আমি এই বইয়ে সাধারণভাবে মানুষসহ হোমিনিডিয়া ফ্যামিলির সব বনমানুষ বা এপকে 'বনমানুষ' বলে অভিহিত করেছি [৮]ঃ

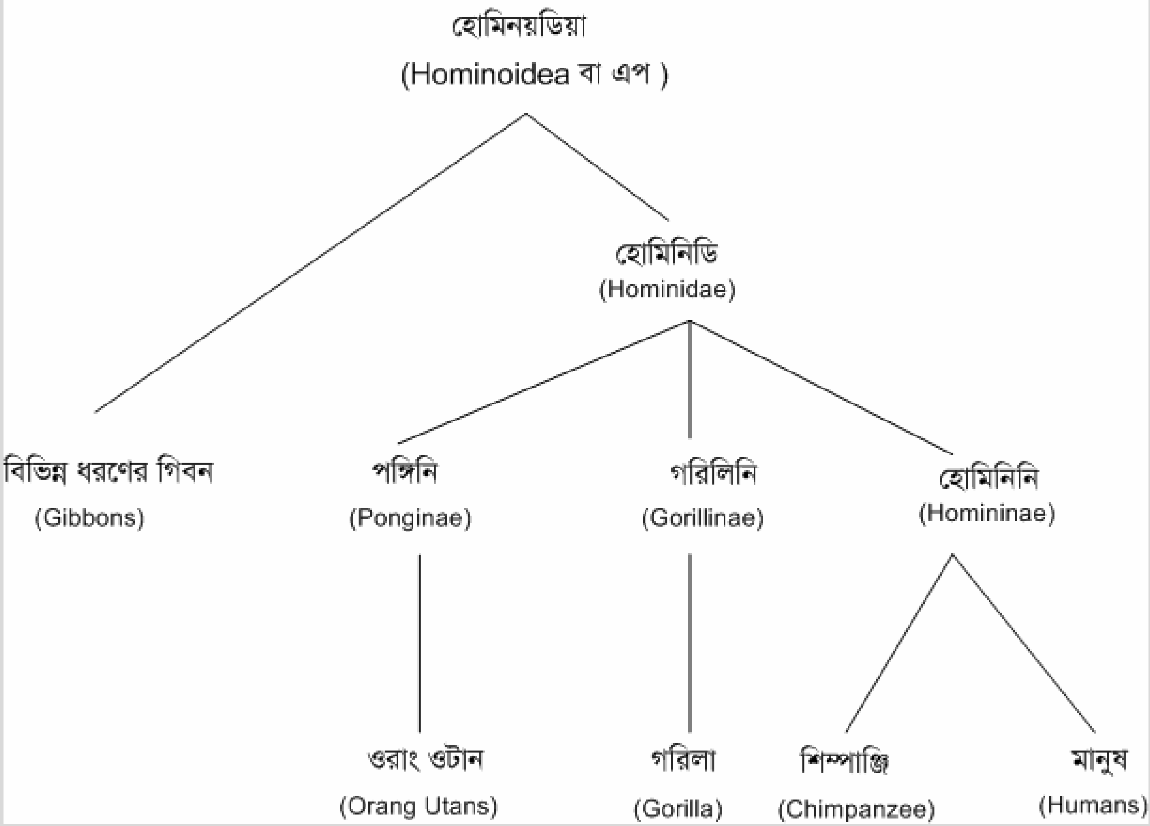

চিত্রঃ ৯.৫: হোমিনয়ডিয়া সুপার ফ্যামিলির সদস্যের শ্রেণীবিন্যাস

বৈজ্ঞানিক সব দুর্বোধ্য নাম, শ্রেনীবিন্যাস, গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের মত অত্যন্ত শুষ্ক এবং একঘেয়ে বিষয়গুলো চলে আসবে। এগুলোকে বাদ দিয়ে, কিন্তু আবার ওদিকে বৈজ্ঞানিক সততাও বজায় রেখে সঠিকভাবে বিষয়টা উপস্থাপন করা আসলে বেশ শক্ত একটা কাজ। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো সহজ সরল ভাষায় লিখতে, আশা করি উৎসাহী পাঠকেরা একটু কষ্ট করে হলেও ধৈর্য বজায় রাখতে সক্ষম হবেন।

আদি পুর্বপুরুষ প্রাইমেটদের বিবর্তনঃ আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছিলাম যে, প্রায় ২০ কোটি বছর আগে সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী জীবের বিবর্তন ঘটেছিল বটে, তবে সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে পর্যন্ত তাদের তেমন কোন বিশেষ বিকাশ বা বিস্তৃতি দেখা যায়নি। তার পরের প্রায় ১০ কোটি বছর ধরে বিভিন্ন ধরণের 'সরীসৃপ জাতীয় স্তন্যপায়ী' বা 'স্তন্যপায়ী জাতীয় সরীসৃপ' প্রাণীর অর্থাৎ বিভিন্ন ধরণের মধ্যবর্তী ফসিলের সন্ধান পাওয়া যায়। সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ডায়নোসররা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ারও বেশ পরে ইওসিন যুগে আদি প্রাইমেটদের বিবর্তন ঘটে। সেই সময়েই পৃথিবীর জলবায়ু আবারও গরম হয়ে উঠতে শুরু করে, গ্রীষ্মমন্ডলীয় আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। অনেকেই মনে করেন এই গরম আবহাওয়া অরন্যচারী প্রাইমেটদের বিকাশে সহায়তা করেছিল। আদি প্রাইমেটদের বেশ কয়েকটি প্রজাতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে (অস্ট্রেলিয়া এবং অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ দু'টো বাদ দিয়ে) দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই যুগেই অ্যাডাপিডি (family: Adapidae) এবং টারসিফরম (Tarsiiformes) জাতীয় প্রাণীর অনেক ফসিল পাওয়া গেছে যাদের মধ্যে প্রাইমেটদের মোটামুটি সব বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান ছিল [৮]।

প্রাইমেটদের কারা?

প্রাইমেটদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের চেয়ে বেশ অগ্রসর ধরণের [৬]। তাদের মধ্যে গাছে বসবাস করার জন্য প্রয়জনীয় অভিযোজন ক্ষমতাটি এখানে উল্লেখযোগ্যঃ তাদের হাত পা গাছে গাছে চলেফিরে বেড়াবার জন্য অত্যন্ত উপযোগী, আঙ্গুলগুলো কমবেশী নাড়াতেও পারে, বুড়ো আঙ্গুলকে অন্যান্য আঙ্গুলের বিপরীতে নিতে পারে, নখরের পরিবর্তে বিকাশ ঘটেছে নখের এবং সেই সাথে রয়েছে সংবেদনশীল হাতের তালু। তারা পা ,হাত এবং আঙ্গুল দিয়ে যেমন গাছের ডাল আঁকড়ে ধরতে পারে, তেমনি আবার হাত দিয়ে যে কোন জিনিষ বা খাদ্য মুখেও তুলতে পারে, বাহু ঘুরাতে পারে। চলাফেরার সময় পিছনের পা প্রধান ভুমিকা পালন করে যার ফলে দেখা যায় তাদের অনেকেই অর্ধ-খাড়া বা প্রায় খাড়া হয়ে দাঁড়াবার (এদের মধ্যে শুধু মানুষই পুরোপুরিভাবে দ্বিপদী) ক্ষমতা অর্জন করেছে। তাদের চোখ দু'টো আপেক্ষাকৃতভাবে কাছাকাছি, দেখার সময় দর্শন ক্ষেত্রের অধিক্রমণ (Overlap) করতে পারে বলে তাদের দৃষ্টিশক্তি ত্রিমাত্রিক, যা দিয়ে তারা খাদ্য এবং গাছের ডালপালার মধ্যে ব্যবধাণ খুব ভালোভাবে নির্ণয় করতে পারে। প্রাইমেটদের মধ্যে সবধরণের খাবারের উপযোগী দাঁত এবং পরিপাকযন্ত্র বিকাশ লাভ করে। তাদের দেহের আকারের তুলনায় মস্তিষ্কের আকার অনেক বড় এবং জটিল, এবং তারা বেশ জটিল সামাজিক জীবন যাপন করতে সক্ষম [৬]।

এপ বা বনমানুষদের বিবর্তনঃ প্রায় ৪ কোটি বছর আগে, ইওসিন যুগের শেষ দিকে, আবার বেশ ঠান্ডা পড়তে শুরু করে, ক্রমশঃ জঙ্গলের বিস্তৃতি কমে যেতে থাকে। সেই সাথে সাথে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের, বিশেষ করে প্রাইমেটদের, বিবর্তনের ধারায়ও পরিবর্তন দেখা দেয়। ফসিল রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, এ সময় তাদের বেশীর ভাগ প্রজাতিই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে ওদিকে প্রায় সাড়ে তিন কোটি বছর আগে মিশরসহ উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বেশ কয়েক ধরণের আদি অ্যানথ্রোপয়েড জাতীয় প্রাইমেটের বিস্তৃতি ঘটতে দেখা যায়। ফসিল রেকর্ডে বিভিন্ন প্রজাতির বানর এবং বনমানুষ উভয়ের অস্তিত্ব দেখে মনে হয় যে, ইতোমধ্যেই বনমানুষের বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। আসলে এই সময়ে এত ধরণের

<u>বনমানুষ বা এপ কারা?</u>

বনমানুষেরা প্রাইমেট বর্গের অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। হোমিনয়ডিয়া বা মানুষসহ সব ধরণের বনমানুষের মধ্যে দু'টো বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ এই অধিগোত্রের অন্তর্ভুক্ত কোন প্রাণীর মধ্যেই আর লেজ দেখতে পাওয়া যায় না এবং তাদের হাতের কনুই এর জয়েন্টে বিশেষ এক ধরণের গঠন বিকাশ লাভ করেছে। এই অংশটির বিশেষ গঠনের কারণেই আমরা এত সহজে হাত বাঁকাতে বা নোয়াতে পারি, হাতের উপর ভর করে ঝুলে থাকতে পারি। এই ধরণের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর নির্ভর করেই বিজ্ঞানীরা অন্যান্য প্রাইমেটদের ফসিল থেকে বনমানুষের পূর্বপুরুষের ফসিলের পার্থক্য নির্ধারণ করেন।

বানর, বনমানুষ এবং 'না বানর এবং না বনমানুষের' মধ্যবর্তী ফসিল পাওয়া গেছে যে বিজ্ঞানীরা কাকে বানর বলবেন আর কাকে বনমানুষের জাতে ফেলবেন তা নিয়ে রীতিমত সংশয়ে পড়ে যান। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর মত আদি প্রাইমেটদেরও লেজ ছিল, বনমানুষের পূর্বপুরুষদের মধ্যেই প্রথম লেজের বিলুপ্তি ঘটে। এ সময়েই বোধ হয় তাদের খাদ্যাভ্যাসেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, তাদের বেশীরভাগই গাছের পাতা খাওয়া ছেড়ে ফলমুল খাওয়ার অভ্যাসে অভিযোজিত হয়ে যায় [৮]। আফ্রিকায় বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েক প্রজাতির 'না বানর না বনমানুষ'

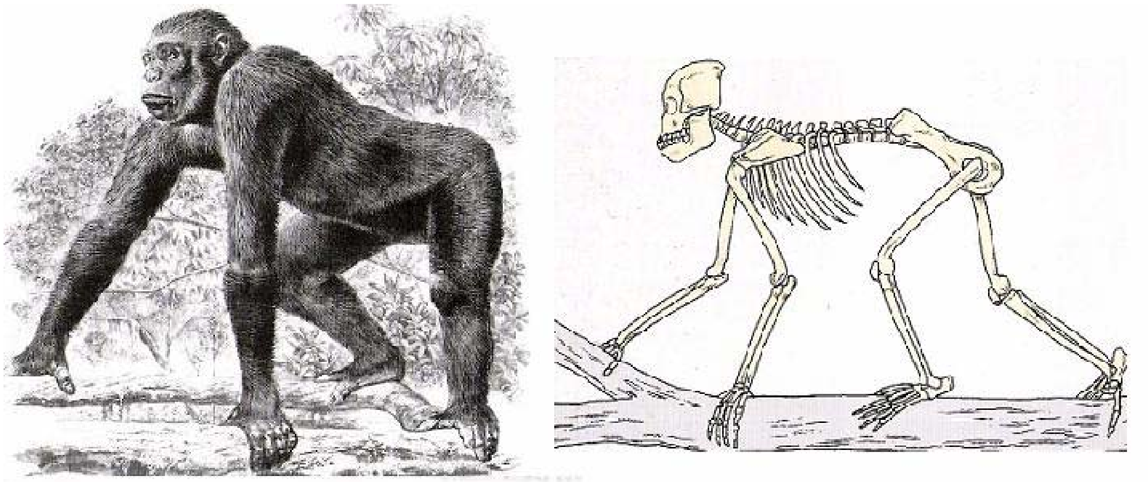

চিত্রঃ ৯.৬: বিজ্ঞানীরা এখন মোটামুটিভাবে প্রোকনসুলের বেশীরভাগ হাড়ের ফসিলেরই সন্ধান পেয়েছেন। সেখান থেকেই উপরে প্রোকনসুলের কঙ্কাল এবং শারীরিক গঠণের ছবি আঁকা হয়েছে [৮]।

জাতীয় প্রোকনসুলের*(Proconsul)* প্রজাতির ফসিল পাওয়া গেছে। এরা গাছে গাছে থাকতো, বানরের মত এদের নমনীয় মেরুদন্ড এবং সংকীর্ন বুকের গড়ণ থাকলেও নাড়াচাড়ার দিক থেকে তাদের বুড়ো আঙ্গুল এবং কোমড় বনমানুষদের মতই ছিল [১০]। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এরাই হোমিনয়ডিয়া বা সব বনমানুষদের পূর্বপুরুষ।

এ সময়ের দিকেই বেশ কিছু মজার ব্যাপার ঘটতে শুরু করে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা মহাদেশীয় সঞ্চরণের কথা শুনেছি, এও দেখেছি যে এর সাথে প্রাণের বিবর্তনের প্যাটার্নের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আগে আফ্রিকা ইউরেশিয়া থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন ছিল কিন্তু ১.৭ কোটি বছর আগে প্রথম আফ্রিকা মহাদেশের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের একটা সংকীর্ণ সংযোগ স্থাপিত হয়। তারপর ধীরে ধীরে ভুমি সংযাগটা বেশ প্রশস্থ হলে

প্রথমবারের মত পূর্ব এবং মধ্য ইউরোপে আফ্রিকা থেকে ইঁদুর, এ্যান্টিলোপ এবং প্রাইমেটসহ বিভিন্ন প্রাণীর আগমন ঘটতে শুরু করে। জার্মানী, টারকী, চেক প্রজাতন্ত্রের মত বিভিন্ন দেশে এ সময়েই প্রথম বনমানুষের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় [৮]।

বিভিন্ন ফসিল রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, সেই ১.৯ কোটি বছর আগে প্রোকনসুল জাতীয় বনমানুষের সাধারণ পুর্বপুরুষ থেকে গিবনদের উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু ওরাং ওটাংদের বিবর্তন ঘটে বেশ পরের দিকে, ১.৬ কোটি বছর আগে *Sivapithekas* জাতীয় বনমানুষের প্রজাতি থেকে। এদের ফসিলের গঠন থেকে বোঝা যায় যে এরা বেশ কিছুটা সময় মাটিতে কাটাতো, হাত পায়ের হাড়ের গড়নে মাটিতে অভিযোজনেরও সাক্ষ্য পাওয়া যায়। *Sivapithecus* এর আগের বনমানুষদের মধ্যে বানরের অনেক

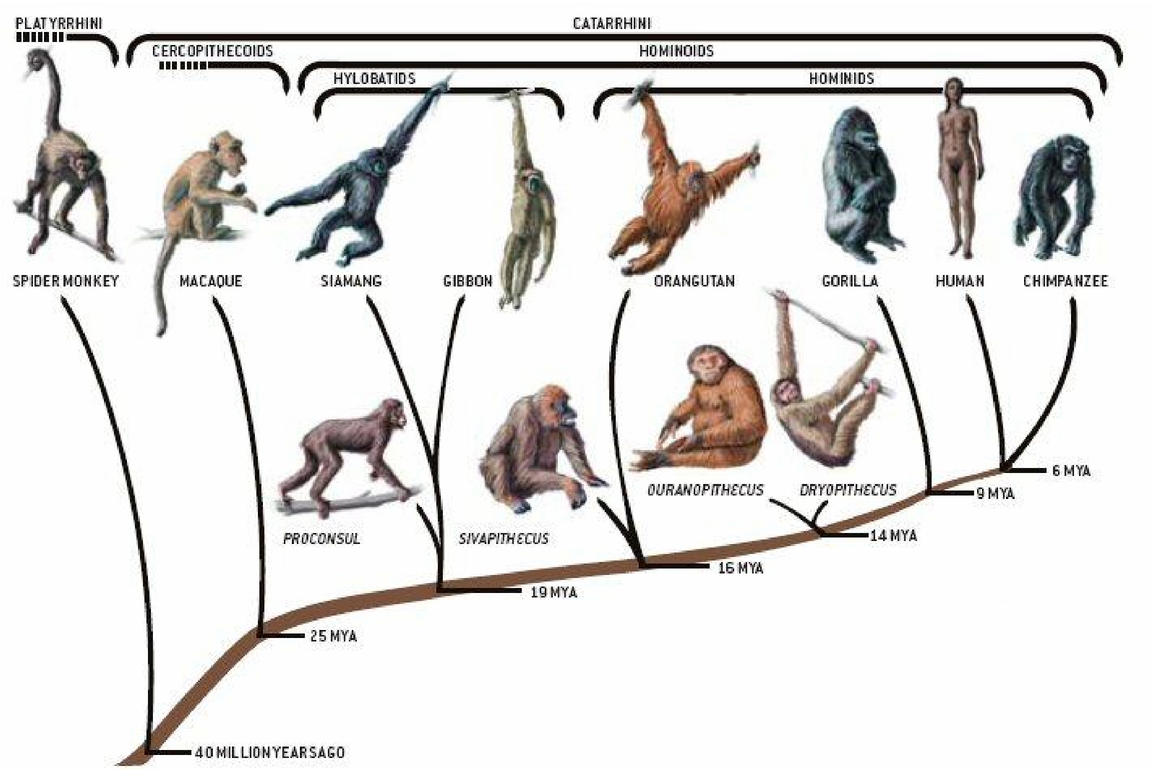

চিত্রঃ ৯.৭: মিওসিন যুগের বেশীরভাগ এপই বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে বিজ্ঞানীরা এই যুগের আদি আদি প্রাইমেট প্রোকনসুল (Proconsul) প্রজাতিকে এখন হমিনয়েডদের সাধারণ পূর্বপুরুষ বলে মনে করেন। ফসিল রেকর্ডে এদের মোটামুটি সব হাড়েরই সন্ধান পাওয়া গেছে। সিভাপিথেকাস্কে ওরাং ওটাংদের পুর্বপুরুষ এবং ড্রাইওপিথেকাস বা ওরানোপিথেকাসকে হোমিনিডি অর্থাৎ মানুষ এবং বনমানুষের পুর্বপুরুষ বলে মনে করা হয়।

বৈশিষ্ট্যের মিশাল পাওয়া যায়, কিন্তু এর উত্তরসুরীদের মধ্যে তা ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে এবং এরাই যে হমিনয়ড লাইনেরই পূর্বসুরী তাতে কোন সন্দেহ নেই [৮]। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ১.৪-১.২ কোটি বছর আগের *Ouranopithecus* কিংবা *Dryopithecus* জাতীয় কোন বনমানুষরাই হমিনয়ডিয়া সুপার ফ্যমিলির পূর্বপুরুষ। এদের কোন এক প্রজাতি থেকেই প্রায় ৯০ লক্ষ বছর আগে গরিলাদের বিবর্তন ঘটে। আর তারও বেশ পরে প্রায় ৬০ লক্ষ বছর আগে শিম্পাঞ্জি এবং মানুষ তাদের সাধারণ পুর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে নিজ নিজ পথে বিবর্তিত হতে শুরু করে। আর এখান থেকেই শুরু হয় আমাদের পূর্বপুরুষদের নিজস্ব যাত্রা, দীর্ঘ আকাবাঁকা বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে আজকের মানুষে বিবর্তিত হওয়ার সেই

মহাযাত্রা।

এ তো গেল আমাদের সেই আদিতম পুর্বপুরুষের কাহিনী, এখন আমরা প্রায় মানুষের আদি পুর্বপুরুষদের বিবর্তনের ইতিহাসের পাতায় এসে পড়েছি, সেই গল্পে ঢোকার আগে আমাদের নিকটতম আত্মীয় শিম্পাঞ্জিদের নিয়ে একটা সাধারণ ভুল ধারণা সম্পর্কে দু'একটা কথা বলে নিলে বোধ হয় খারাপ হয় না। আমরা প্রায়ই অনেককে বলতে শুনি যে, শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষের বিবর্তন ঘটেছে, ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক সেরকম নয়।

> প্রায় ৬০-৭০ লক্ষ বছর আগে শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের পুর্বপুরুষেরা এক ছিল, তারপর তাদের সেই সাধারন পুর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে দু'টো ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে – এরই এক ধারা থেকে ঘটে মানুষের বিবর্তন আর অন্য ধারা থেকে উদ্ভব ঘটেছে শিম্পাঞ্জীদের। শিম্পাঞ্জির সাথে আমাদের সম্পর্কটা আসলে অনেকটা খালাতো ভাইবোনের মত, নানা নানি এক হলেও আমরা সরাসরি কেউ কারও পুর্বপুরুষ নই।

বিবর্তনীয় সম্পর্কের হিসেবে অংক কষলে দেখা যাবে যে, আমাদের সাথে শিম্পাঞ্জির সম্পর্কটা সবচেয়ে কাছের, তারপরে আমাদের নিকট আত্মীয় হচ্ছে গরিলা। আর ওরাং ওটাংরা যেহেতু গরিলাদেরও আগে আমাদের সবার সাধারণ পুর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তাদের সাথে আমাদের সম্পর্কটাও আরেকটু দুরের। আগেই দেখেছিলাম যে জেনেটিক দিক থেকে আমাদের সাথে শিম্পাজির মিল প্রায় ৯৯%, উপরে চিত্র ৯.১ এ শিম্পাঞ্জিসহ আমাদের অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের মধ্যে জেনেটিক পার্থক্যের তুলনাগুলো দেখানো হয়েছে।

এরাই কি আমাদের আদি পুর্বপুরুষ?

আমরা আগেই দেখেছি আণবিক জীববিদ্যা, জেনেটিক্স, জিনোমিক্সের পরীক্ষাগুলো বলছে যে ৫০-৬০ লক্ষ বছরের কাছাকাছি কোন সময়ে শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের পূর্বপুরুষেরা আলাদা হয়ে যায়, এই তথ্যের সাথে এখন পর্যন্ত পাওয়া ফসিল রেকর্ডগুলোও কিন্তু প্রায় মিলে যাচ্ছে। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ৬০-৮০ লক্ষ বছরের পুরনো কয়েকটি ফসিলের অংশ বিশেষ (তাদের মধ্যে রয়েছে কেনিয়া থেকে পাওয়া *Orrarin tugenensis*, ইথিওপিয়া থেকে পাওয়া *Ardipithecus ramidus*, চাদ থেকে পাওয়া *Sahelanthropus tchadensis*, ইত্যাদি) পাওয়া গেলেও বিজ্ঞানীরা এখনও এদেরকে মানুষের সবচেয়ে পুরোনো পূর্বপুরুষের ফসিল বলে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। কারণ তাদের মতে, কোন সিদ্ধান্তে পৌছানোর মত পর্যাপ্ত পরিমাণ সাক্ষ্য প্রমাণ নাকি এখনও পাওয়া যায়নি।

বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য ফসিল রেকর্ডগুলো থেকে আমরা কি এখন পর্যন্ত কি জানতে পেরেছি? আসলে গত কয়েক দশকে এত রকমের মানুষের পূর্বপুরুষের প্রজাতির ফসিল পাওয়া গেছে যে, আমাদের চোখের সামনে মানব বিবর্তনের ছবিটা দিন দিন বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে। প্রায় ৪১ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকায় মানুষ এবং এপের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রজাতি *Australopethicus anamensis*

(*Australopethicus* এর অর্থ হচ্ছে দক্ষিণের এপ) এর অস্তিত্ব ছিল। আসলে এই কথাটা বলার সাথে সাথেই উৎসাহী পাঠকের মনে এক ঝাক প্রশ্নের উদয় হওয়াটাই কিন্তু স্বাভাবিক। এরা কি আমাদের সরাসরি পুর্বপুরুষ ছিল? মানুষের পূর্বপুরুষ হতে হলে কোন প্রজাতির কি কি ধরণের বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে? এদেরকে সরাসরি মানুষের পূর্বপুরুষ না বলে মধ্যবর্তী ফসিলই বা বলা হচ্ছে কেন? চলুন দেখা যাক এই প্রশ্নগুলোর উত্তরে বিজ্ঞানীরা কি বলছেন।

দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়ানোর ক্ষমতাকে মোটামুটিভাবে সব বিজ্ঞানী এখন মানুষের আদি পূর্বপুরুষদের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য বলে মেনে নিয়েছেন। অনেকে বড় মস্তিস্কের কথাও বলেন। কিন্তু আসলে বিবর্তনের ধারায় দেখা যায় যে, দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়ানোরও বেশ অনেক পরে, মাত্র ২০ লক্ষ বছর আগে, আমাদের পূর্বপুরুষদের মস্তিষ্ক বড় হতে শুরু করেছিল। তাই এখন মস্তিস্কের আকারকে মানুষের আদিতম পুর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য হিসেবে না ধরে বরং অপেক্ষাকৃত আধুনিক মানুষের (যাদেরকে *Homo* গণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়) পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য হিসেবেই ধরা হয়। এখন পর্যন্ত পাওয়া ফসিল রেকর্ড থেকে আমরা যে সব আদি পুর্বপুরুষ প্রজাতিদের কথা সবচেয়ে ভালোভাবে জানতে পেরেছি তাদের মধ্যে *Australopethicus afarensis* (যার অর্থ দাঁড়ায়, আফার অঞ্চল থেকে পাওয়া দক্ষিণের এপ) এর কথাই প্রথমে বলতে হয়। সত্তরের দশকের প্রথম দিকে ইথিওপিয়া ও তানজেনিয়ার বিভিন্ন

চিত্র ৯.৮: পাশের ফসিল থেকে ধারণা করা লুসির কল্পিত ছবি

চিত্র ৯.৯: ইথিপিয়ার হাদার অঞ্চলে পাওয়া লুসির কঙ্কালের ফসিল।

জায়গায় *A. afarensis* প্রজাতির আংশিক ফসিল পাওয়া যায়, এর মধ্যে ছিল হাটুর জোড়া এবং পায়ের হাড়ের উপরের অংশ। এখান থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করতে শুরু করেন যে এরা দুই পায়ের উপর ভর করে হাটতে পারতো। এর পরবর্তী পাঁচ বছরে আরও অনেক ফসিল খুঁজে পাওয়া গেলেও আসল চমকটির সন্ধান কিন্তু তখনও বিজ্ঞানীরা খুঁজে পাননি। আর সেটি হল প্রায় ৩২ লক্ষ বছর বয়সের বিখ্যাত সেই কঙ্কাল - যাকে পৃথিবী জোড়া সবাই 'লুসি' নামে চেনেন। মানুষের এত আগের পূর্বপুরুষের, এত সম্পুর্ণ ফসিল এর আগে কখনও পাওয়া যায়নি, তাই বিজ্ঞানীমহলে রীতিমত হইচই পড়ে যায় 'লুসি'কে নিয়ে। এদের হাটুর জয়েন্টের বিশেষ গঠন থেকে বিজ্ঞানীরা দেখান যে, লুসি আসলে দ্বিপদী ছিল। অর্থাৎ, *Australopethicus* এর বিভিন্ন প্রজাতিগুলোই হয়তো পৃথিবীর বুকে প্রথম প্রজাতি যারা দুই পায়ের উপর ভর করে হাটতে শিখেছিল। এর আগে আর কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীই দুই পায়ের উপর দাঁড়াতে শেখেনি। প্রাণের বিবর্তনের ইতিহাসে এটাই বোধ হয় আমাদের প্রথম দ্বিপদী যাত্রা। এই অঞ্চলেই আরও ১৩ টি *A. afarensis* এর 'গণ কবর' পাওয়া গেছে, অনেকেই মনে করেন

যে এরা হয়তো কোন আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে একসাথে মৃত্যুবরণ করেছিলো। এই ফসিলগুলোর বেশীর ভাগই ২৮-৩৩ লক্ষ বছরের পুরনো, তবে কয়েকটি ফসিলের বয়স ৪০ লক্ষ বছরের কাছাকাছিও রয়েছে[৮]।।

তাঞ্জেনিয়ার একটি অঞ্চলে আরও অনেকগুলো *A. afarensis* প্রজাতির ফসিল পাওয়া গেছে যাদের বয়স ৩৫-৪০ লক্ষ বছরের মধ্যে। আরও একটি অদ্ভুত জিনিষ পাওয়া গেছে এ অঞ্চলে - এই প্রজাতির দু'টি প্রাণীর পাশাপাশি হেটে এগিয়ে যাওয়ার সময় তাদের পায়ের ছাপগুলো ফসিলে পরিনত হয়ে গিয়েছিল - হ্যা, আক্ষরিক অর্থেই এই ফসিলগুলো আমাদের পূর্বপুরুষের পদচিহ্নই বটে। এই পায়ের ছাপগুলো যে ভাবে সংরক্ষিত হয়েছে তা দেখে বোঝা যায় যে, ধারে কাছে কোন আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নুৎপাতের সময় লুসির মত দু'জন হেটে গিয়েছিল এই পথ ধরে। আর তাদেরই পদচিহ্ন আঁকা হয়ে গিয়েছে মাটির বুকে। এ অগ্নুৎপাতের সময় চারদিকে আগ্নেয় ভস্ম উড়তে থাকে, ঠিক সে সময়েই যদি বৃষ্টি পড়তে শুরু করে তবে এই লবণ সমৃদ্ধ ভস্মগুলো খুব তাড়াতাড়ি শক্ত হয়ে জমে যায়। এ রকমই কোন এক মুহূর্তেই আমাদের আদি পূর্বপুরুষের দু'জনের এবং আরও অন্যান্য কিছু প্রাণীর পায়ের ছাপ সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল সেখানে। আর এই পদচিহ্নগুলোই আজকে বহন করে চলেছে আমাদের আদি পূর্বপুরুষের দু'পায়ে হাটতে পারার ক্ষমতার নমুনা। তবে আসলেই *A. afarensis* সম্পূর্ণভাবে দ্বিপদী ছিল কিনা তা নিয়ে বহু দিন ধরেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে গবেষণার অন্ত ছিল না।

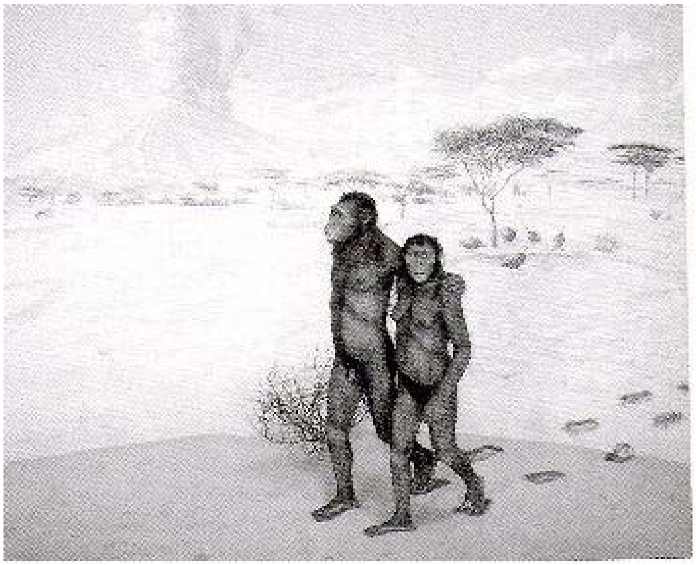

চিত্র ৯.১০: লুসির প্রজাতির দু'জনের হেটে যাওয়ার কল্পিত ছবি

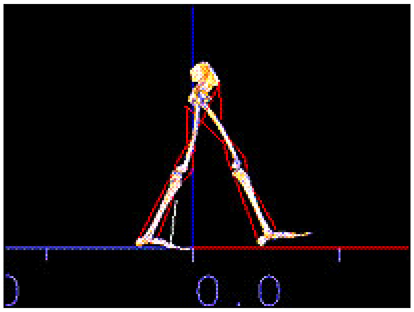

চিত্র ৯.১১: রোবোটিক্স-টেকনলজি ব্যবহার করে তৈরি *A. afarensis* প্রজাতির মডেল থেকে দেখানো হয় যে লুসিরা আসলে দ্বিপদী প্রাণী ছিল

কিছুদিন আগে, কয়েকজন বিজ্ঞানী মিলে এক মজার পরীক্ষা করেছেন, তারা কম্পিউটার রোবোটিক্স-

টেকনলজি ব্যবহার করে লুসির প্রজাতির পায়ের হাড়ের গঠন এবং পদচিহ্নগুলো থেকে মডেল তৈরি করে দেখিয়েছেন যে, তারা আসলেই দ্বিপদী ছিল [১৭]। ২০০৫ সালে রয়েল সোসাইটি ইন্টারফেস জারনালে তাদের এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়।

A. afarensis এর বহু ফসিল পাওয়া গেছে দক্ষিণ, পূর্ব এবং মধ্য আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গা থেকে। এ থেকে দেখা যায় যে, মোটামুটিভাবে প্রায় ২০ লক্ষ বছর ধরে আফ্রিকা জুড়ে এরা বেশ ভালোভাবেই রাজত্ব করেছিল। পরবর্তী কয়েক লক্ষ বছরে আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েক ধরণের আদি মানুষের বা মানুষ এবং এপের মধ্যবর্তী প্রজাতির বিকাশ ঘটেছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, *A. afaricanus, A. aethiopicus, A. garhi* ইত্যাদি [৫]। এদের ফসিলগুলো ৩০ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ বছরের পুরনো। এর আগে পর্যন্ত আমরা যাদের কথা শুনেছিলাম তাদের সবার গড়নই ছিল বেশ হালকা পাতলা ধরণের কিন্তু এই *A. aethiopicus* এর গড়ণ অন্যান্যদের তুলনায় বেশ ভারী ধরণের। আফ্রিকায় ২০ থেকে ১৩ লক্ষ বছরের পুরনো আরও দু'টি এধরণের ভারী গড়নের প্রজাতির ফসিল পাওয়া গেছে, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে *Paranthropus robustus* এবং *P. boisei*। এরা কিন্তু আধুনিক মানুষের আরও সাম্প্রতিক পূর্বপুরুষ *Homo habilis* বা *H. erectus* (নীচে যাদের নিয়ে আলোচনা করা হবে) এর সাথে একই সময়ে পাশাপাশি টিকে ছিল [৮]। *Paranthropus* এর প্রজাতিগুলোর বিশাল চোয়াল, শক্ত পেশী এবং চিবানোর দাঁত দেখে বোঝা যায় যে, তারা খুব শক্ত ধরণের উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্যে অভ্যস্ত ছিল, এরা বহু লক্ষ বছর ধরে বেশ সার্থকভাবে টিকে থেকেও শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের বইয়ের পাদটিকায় পরিণত হয়ে গেল। অনেকেই মনে করেন যে, সে সময়ে জলবায়ু এবং পরিবেশের যে তীব্র ওঠানামা ঘটছিল তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে না পেরেই শেষ পর্যন্ত এরা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

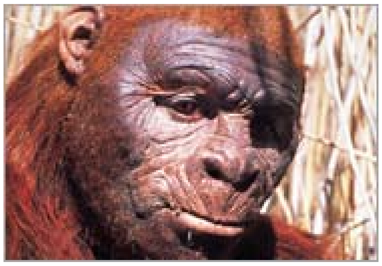

চিত্র ৯.১২: *Paranthropus boisei* প্রজাতি

অনিচ্ছা স্বত্তেও উপরে বিভিন্ন প্রজাতির অনেক কঠিন কঠিন বৈজ্ঞানিক সব নামগুলো উল্লেখ করতে হল, এরচেয়ে সহজভাবে কি করে এটা লেখা যেত তা বের করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত এভাবেই লিখতে বাধ্য হলাম। আর কিছু না হোক, আশা করি পাঠকের কাছে অন্তত এতটুকু পরিষ্কার হয়েছে যে, এই পুরো সময়টা ধরে একটি নয়, দু'টি নয় বরং বহু দ্বিপদী প্রজাতির পদচারণায় মুখরিত ছিল আমাদের এই পৃথিবী। অর্থাৎ, অন্যান্য সব প্রাণীর মতই আমাদেরও পূর্বপুরুষদের মধ্যে বহু রকমের প্রজাতির উৎপত্তি ঘটেছে, প্রাকৃতিক নিয়মেই একদিকে যেমন বিভিন্ন ধরণের প্রজাতির বিকাশ ঘটছে, অন্যদিকে কালের পরিক্রমায় তাদের অনেকেই বিলুপ্তও হয়ে গেছে। আগেও যেমনটা দেখেছি - বিবর্তনের পথটা একটা মইয়ের মত সোজা উপরে উঠে যায় না, বরং আঁকাবাঁকা পথে বহু শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট্য ঝোপঝাড় তৈরি করতে করতে এগোয়। ব্যাপারটা ঠিক এরকম নয় যে, সবসময়ই এক প্রজাতি থেকে পরবর্তী আরও

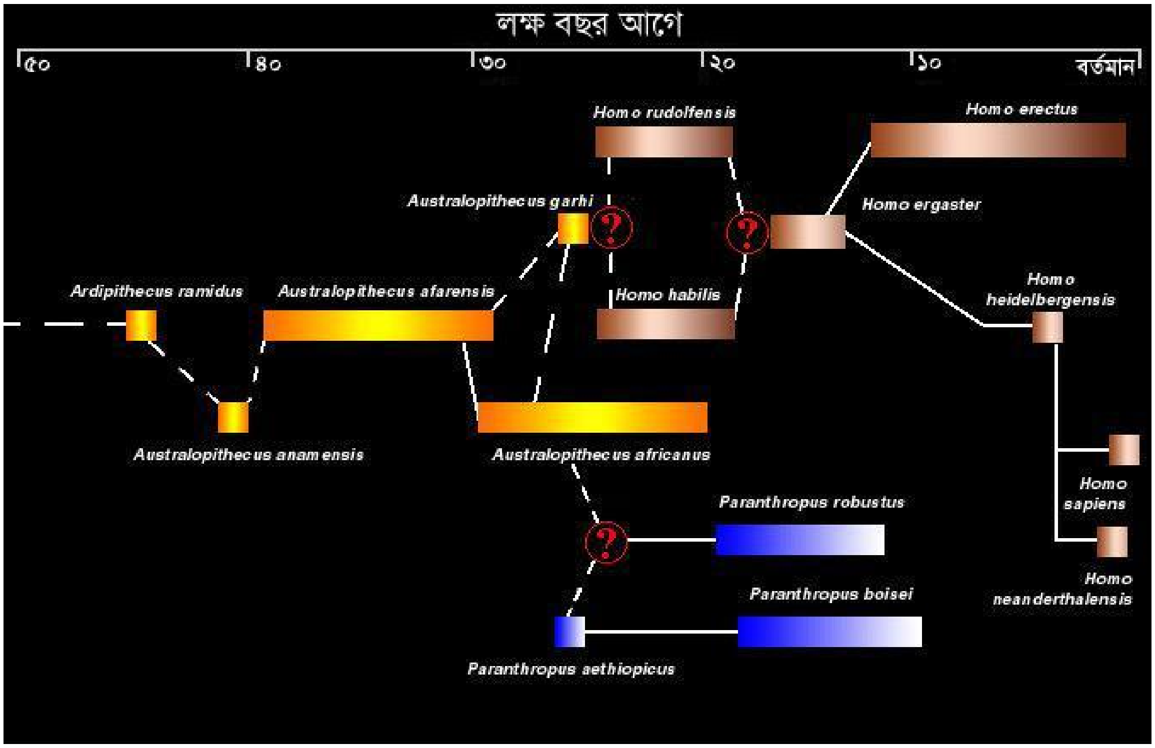

চিত্র ৯.১৩: গত ৫০ লক্ষ বছরে মানুষ এবং এপের মধ্যবর্তী প্রজাতি এবং মানুষের আদি প্রজাতি এবং আধুনিক মানুষের বিবর্তনের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের বিকাশের ধারাবাহিক চিত্র [১৮]ঃ

অগ্রসর প্রজাতিটির উদ্ভব ঘটে, তারপর তার থেকেও অগ্রসরটির...এভাবে। বিবর্তন তো পূর্বনির্ধারিত কোন সরলরৈখিক পথ নয়, বরং তার উলটোটাই ঘটতে দেখা যায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই। জীবের মধ্যে ক্রমাগতভাবে বিবর্তন ঘটতে থাকে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের, এক প্রজাতি থেকে উদ্ভুত হয় বহু প্রজাতি, এমনকি সেখান থেকে ছোট ছোট বহু উপপ্রজাতিও তৈরি হতে পারে। আবার কোন প্রজাতি প্রায় একই অবস্থায়ও থেকে যেতে পারে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। একদিকে যেমন বহু ধরণের প্রজাতি, উপপ্রজাতি বিকশিত হয়, তেমনিভাবে আবার তাদের মধ্যে কেউ দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকে, কেউ বা বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তীকালের মানুষের প্রজাতিগুলোর বিবর্তনের ইতিহাসেও আমরা এই একইরকমের আঁকাবাকা, বন্ধুর এক পথের চিত্র দেখতে পাবো । উপরে দেখা প্রজাতিগুলো আমাদের আধুনিক মানুষের সরাসরি পূর্বপুরুষ নাকি আমাদের এই পূর্বপুরুষদের কোন নিকট আত্মীয় তা এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে তারা যে বিবর্তনের ইতিহাসে প্রথমবারের মত দু'পায়ের উপর ভর করে দাড়ানোর ক্ষমতা অর্জন করেছিল তা বেশ স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। তারা যদি আমাদের সরাসরি পূর্বপুরুষ নাও হয়ে থাকে, তাদেরই আশেপাশের কোন প্রজাতি বা উপপ্রজাতি থেকেই যে আধুনিক মানুষের উদ্ভব ঘটেছে তা নিয়ে কিন্তু সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

বিজ্ঞানীরা এই প্রজাতিগুলোকে মানুষ ও অন্যান্য বনমানুষের মধ্যবর্তী ফসিল বা মিসিং লিঙ্ক হিসেবে চিহ্নিত করেন। অনেকে এও বলেন যে, লুসি গলা

এবং ঘাড়ের নীচের অংশে মানুষ কিন্তু উপরের অংশে বনমানুষ বৈ আর কিছুই নয়। লুসির প্রজাতির প্রাণীদের কোমড়ের হাড় মানুষের মত বেশ চওড়া হয়ে গেছে এবং হাটুর জয়েন্টের গঠনও মানুষের কাছাকাছি। এছাড়া বাকী বৈশিষ্ট্যগুলো বিচার করলে কিন্তু তাদেরকে বনমানুষের দলেই ফেলতে হয়।

মস্তিষ্কের আকার শরীরের চেয়ে অনেক ছোট, মাত্র ৪০০ মিলি লিটার (robust প্রজাতিদের মস্তিষ্কের আকার ছিল একটু বড়, ৫০০ মিলি লিটারের মত), চোয়ালের আকার বনমানুষের মতই, হাতগুলো শিম্পাঞ্জি এবং গরিলার মত বেশ লম্বা, ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে আকারে পার্থক্যটাও বেশ চোখে পড়ার মত। তাদের আঙ্গুলগুলোও বেশ বড় এবং বাঁকানো যা থেকে

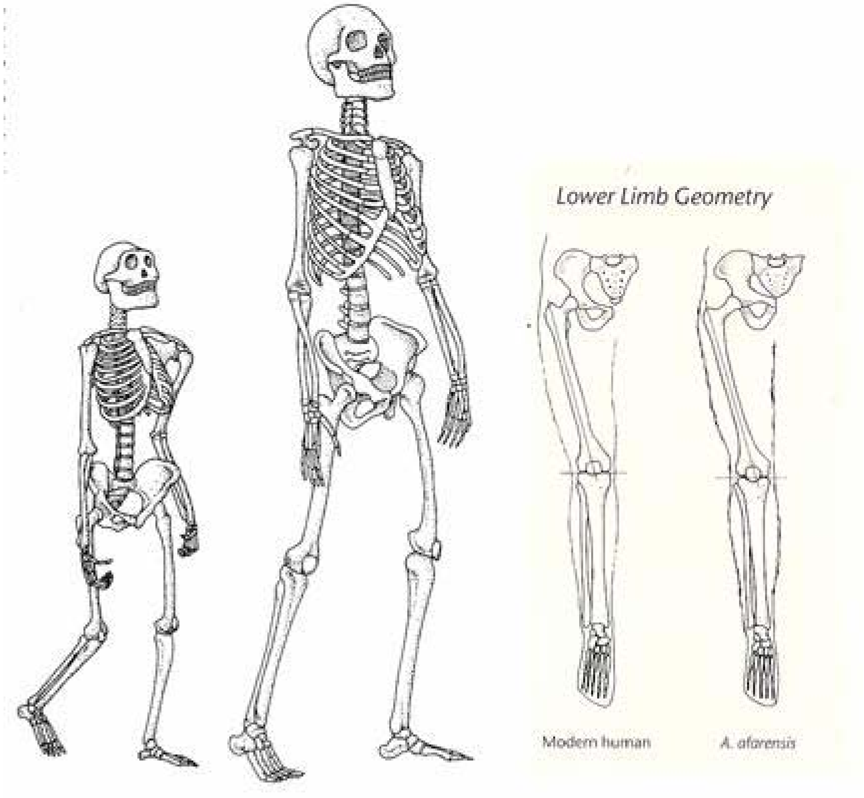

চিত্র ৯.১৪: লুসি বা *A. afarensis* এর সাথে মানুষের কঙ্কালের তুলনাঃ মানুষের তুলনায় লুসি অনেক ছোট, পুরোপুরি দ্বিপদী হলেও পেলভিসের গড়ন এবং পায়ের দৈর্ঘ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যায়।

বোঝা যায় যে, তারা তখনও গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে রাখতে বেশ পটু ছিল। তবে ২০ লক্ষ বছরের দিকে আমরা এদের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের যে প্রজাতিগুলো দেখতে পাই তাদের অনেকের মধ্যেই আধুনিক মানুষের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বিকশিত হতে শুরু করেছিল। পরবর্তিকালের এই আধুনিক মানুষের কাছাকাছি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রজাতিদের *Homo* দলের (গণ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়, আর আমরা নিজেরা এই দলেরই একজন বলে আমাদেরকে নাম দেওয়া হয়েছে *Homo sapiens*। চলুন এবার তাহলে আরও সাম্প্রতিক

কালের পূর্বপুরুষদের বিবর্তনের ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখা যাক।

আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষঃ *Homo* দের বিবর্তনের গল্প;

'মানুষ' বলতে আমরা তাহলে কাদেরকে বোঝাবো? বিবর্তনের ইতিহাসে কোন প্রজাতিগুলোকে মধ্যবর্তী ফসিল বলবো আর কাদেরকে আমাদের সরাসরি পূর্বপুরুষ বলবো? পৃথিবীর এই অফুরন্ত প্রাণের মেলায় আমরাই তো একমাত্র প্রাণী যারা নিজেদের ভূতভবিষ্যত নিয়ে মাথা ঘামাতে পারি, উৎপত্তি বা বিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে পারি, বই লিখতে পারি, বক্তৃতা দিতে পারি! তাই ইতিহাসের চুলচেড়া বিশ্লেষণ করে বিবর্তনের ভাষায় 'মানুষ' বলতে কি বোঝায় তা বের করার দায়িত্বটাও আমাদের কাঁধেই এসে বর্তায়। আমাদেরকেই এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করতে হবে - ঠিক কোন বৈশিষ্ট্যগুলোর বিবর্তনের কারণে আমরা আজকের আধুনিক মানুষে পরিণত হয়েছি? কোন সময় থেকে আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিলো? কাদেরকে আমরা বলবো আমাদের সরাসরি পূর্বপুরুষ আর কাদেরকেই বা আখ্যায়িত করবো মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মিসিং লিঙ্ক বলে?

দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে পারাটা অবশ্যই মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের একটা বড় মাইলফলক। তবে আগে অনেকেই মনে করতেন যে, দ্বিপদী হয়ে ওঠাটাই মানুষের পূর্বপুরুষের মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধির পেছনের সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে কাজ করেছে। খাড়া হয়ে দাঁড়াতে শেখার ফলে তাদের দুই হাত মুক্ত হয়ে গিয়েছিল, তারা শ্রম করতে পেরেছে, হাত দিয়ে হাতিয়ার বানাতে শিখেছে এবং তার ফলেই ধীরে ধীরে তাদের মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে। ধারণাটা আসলে বিভিন্ন কারণেই ভুল - আমরা আগেই দেখেছি যে কোন প্রয়োজন থেকে জীবের বিবর্তন ঘটে না, বিবর্তন কারও ইচ্ছা নির্ভর নয়, এভাবে চিন্তা করাটা সেই ভুল ল্যামার্কীয় দৃষ্টিভঙ্গীরই (তৃতীয় অধ্যায়ে ল্যামার্কীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল) প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে তো শ্রম করার 'জন্য' মস্তিষ্কের বিবর্তন ঘটতে পারেনা, শারিরীকভাবে জীবের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটির উদ্ভব না ঘটলে কোন 'উদ্দেশ্যকে' সামনে রেখে তার উদ্ভব ঘটা সম্ভব নয়। ওদিকে আবার প্রায় ২০ লক্ষ বছর ধরে আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় দ্বিপদী 'লুসি'দের যে ফসিল রেকর্ড খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে তাতে কিন্তু মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধির কোন নমুনা পাওয়া যাচ্ছে না, তাদের মস্তিষ্ক কিন্তু শিম্পাঞ্জিদের মস্তিষ্কের সমানই রয়ে গেছে। আসলেই যদি দুই হাত মুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে বা শ্রম করার ফলেই তাদের মধ্যে মস্তিষ্কের বিবর্তন ঘটতে শুরু করতো তাহলে তো এই দীর্ঘ ২০ লক্ষ বছরে তার চিহ্ন দেখা যেত [১৯]! আসলে দ্বিপদী হওয়া ছাড়া এই লম্বা সময়ের মধ্যে তাদের মধ্যে আর তেমন কোন পরিবর্তনই দেখা যায় না, হাটতে শিখলেও তারা তখনও বোধ হয় বেশ বড় একটা সময় গাছেই কাটাতো, আধুনিক মানুষের সাথে নয় বরং শিম্পাঞ্জির সাথে তাদের মিলটাই যেন একটু বেশী ছিল। তাই বিজ্ঞানীরা এখন আর দ্বিপদী হওয়ার বৈশিষ্ট্যটিকে আধুনিক মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন না। দুই পায়ের উপর দাঁড়াতে শেখাটাই প্রথম বনমানুষ থেকে মানুষের বিবর্তনের পর্বের সুচনা করেছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশই নেই; তবে তারও বেশ খানিকটা সময় পরে যখন মানব প্রজাতিগুলোর মধ্যে আধুনিক মানুষের বৈশিষ্ট্য দেখা দিতে শুরু করেছিল সেই সময়টাকেই মানুষের বিবর্তনের সন্ধিক্ষণ বলে ধরা হয়।

একসময় বিজ্ঞানীরা হাতিয়ারের ব্যবহারের শুরুকেও মানুষের বিবর্তনের এক গুরুত্বপুর্ণ পর্যায় বলে মনে করতেন। মানুষকে 'Man the Toolmaker' হিসেবে ভাবার পিছনে আসলে অনেকগুলো কারণও ছিল - ভাবা হত যে, এর জন্য যে বুদ্ধি এবং হাতের কলাকৌশলের প্রয়োজন তা একমাত্র যেন *Homo*

প্রজাতিগুলোরই আছে। কিন্তু পরে বোঝা গেল যে ব্যাপারটা বোধ হয় ঠিক সেরকম নাও হতে পারে। যে সময়ে এই হাতিয়ারগুলো পাওয়া গেছে সে সময়ে তো *Homo* সহ *Australopethicus* দেরও বেশ কয়েক প্রজাতির অস্তিত্ব ছিল, তারাও তো এই হাতিয়ারগুলো বানিয়ে থাকতে পারে! আসলেই কারা এই হাতিয়ারগুলো বানিয়েছিল তা এক্কেবারে দিব্যি দিয়ে কিন্তু বলা যাচ্ছে না। বিজ্ঞানীরা পরবর্তীতে দেখেছেন যে, শিম্পাঞ্জীদের বিভিন্ন দলের মধ্যেও ছোট খাটো ধরণের সরল হাতিয়ারের ব্যবহার দেখা যায়, এই হাতিয়ারগুলো বানাতে এবং ব্যবহার করতে তো তাহলে বড় মস্তিষ্কের প্রয়োজন নেই! তাই অনেকেই আর হাতিয়ার তৈরির শুরুকে মানব বিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় বলে মনে করেন না [৮]।

তাহলে কোন বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে আমরা আধুনিক মানুষের সরাসরি পূর্বপুরুষদের আলাদা করবো? বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের আকার এবং ভাষার উৎপত্তিকে আমাদের বিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্ত্বপুর্ণ অধ্যায় বলে মনে করেন, এর সাথে সাথে পরিবেশের পরিবর্তন এবং সেই পরিবেশে টিকে থাকার জন্য হাতিয়ারের ব্যবহার ও খাদ্যাভাসের পরিবর্তনও হয়তো বেশ জোড়ালো ভুমিকা রেখেছিল [১০]। এছাড়াও অনেকে মুখ বা নাকের বিশেষ গড়ন, মানব শিশুর অত্যন্ত অপরিণত অবস্থায় জন্ম লাভ করার মত বৈশিষ্ট্যেগুলোকেও

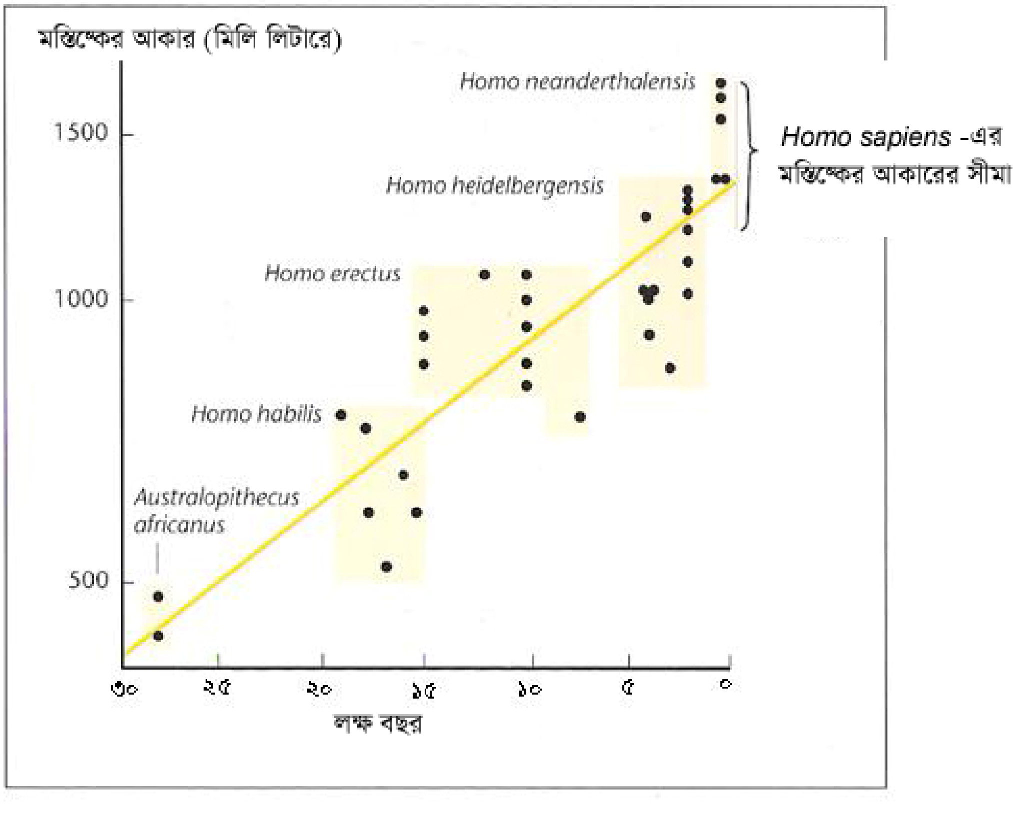

চিত্র ৯.১৫ঃ মানুষের পুর্বপুরুষদের মধ্যে ক্রমশঃ মস্তিষ্কের আকার বড় হওয়ার রেখচিত্র

গুরুত্ব দেন। আমরা যখন মস্তিষ্কের আকারের কথা বলি তখন কিন্তু সরাসরি মস্তিষ্কের আকারটা কত বড় তা কিন্তু বোঝাইনা বরং শরীরের সাথে মস্তিষ্কের আনুপাতিক হারকেই বোঝাই। অনেক বড় কোন প্রাণীর মস্তিষ্ক আরও বড় হতে পারে, সেটা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়, বরং একটা প্রাণীর শরীরের তুলনায় তার মস্তিষ্ক কত বড় তা দিয়েই তার বুদ্ধিমত্তা বিচার করা হয়। উপরে সময়ের সাথে সাথে মানুষের পুর্বপুরুষের

মধ্যে ক্রমশঃ মস্তিষ্কের আকার বড় হওয়ার একটা সারণী দেখানো হয়েছে।

এখানে আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, এই খুবই 'মানবসুলভ' বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু একদিনে উদ্ভুত হয়নি, এরা কোন মোড়কের ভিতরে একসাথে বিবর্তিত হয়ে হঠাৎ করে দেখা দেয়নি, বরং সময়ের সাথে সাথে অত্যন্ত ধীর গতিতে একেক সময়ে হয়তো একেক বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটেছে। তাই ঠিক কোন সময়টাতে আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে আধুনিক মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা দিতে শুরু করেছিল তা বলা একটু মুশকিলই বলতে হবে। প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ লক্ষ বছর আগে প্রজাতিগুলোতে একদিকে যেমন প্রথমবারের মত মস্তিষ্কের আকারে বেশ বড়সড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি আবার তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে আধুনিক মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলোও দেখা দিতে শুরু করে।

আগেই দেখেছিলাম যে, এ সময়টাতে মানুষের পূর্বপুরুষের বেশ কয়েকটি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যায়। আগেই দেখেছিলাম যে *Paranthropus* এবং *Australopethicus* এর বেশ কয়েকটি প্রজাতি এসময়ে টিকে ছিল, আর সেই সাথে প্রথম *Homo H. habilis, H. rudolfensis* দলের অন্তর্ভুক্ত দেরও অস্তিত্ব দেখা যায়। পঁচিশ লক্ষ বছর আগে থেকে শুরু করে তার পরবর্তী প্রায় ১০ লক্ষ বছর ধরে এত রকমের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রজাতি দেখা যায় যে এদের শ্রেনীবিন্যাস নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখনও হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। এ সময়টাতে এত প্রজাতির বিকাশ এবং বিলুপ্তির পিছনে জলবায়ু এবং পরিবেশের দ্রুত ওঠানামা হয়তো বিশেষ এক ভুমিকা রেখেছিল। এ প্রসঙ্গে আরেকটি সাধারণ ভুল ধারণা সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করে নিলে বোধ হয় খারাপ হয় না। অনেকেই হুট করে বলে বসেন যে, পরিবেশের এই পরিবর্তনের জন্যই আ কারণেই মানুষের বিবর্তন ঘটেছিল। আবারও একই কথা বলতে হয়, কোন 'কারণের জন্য' কিন্তু বিবর্তন ঘটেনা। ব্যাপারটা এমন নয় যে, পরিবেশ বদলানোর সাথে সাথে নতুন নতুন প্রাজতি জন্ম লাভ করতে থাকলো; মিউটেশন, জেনেটিক রিকম্বিনেশন ইত্যাদির ফলে যদি কোন প্রজাতির মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো ইতোমধ্যেই বিরাজ না করে তাহলে নতুন করে তা গজিয়ে উঠতে পারে না। পরিবেশ পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঘটে একইভাবে - এই পরিবেশের পরিবর্তনগুলো ঘটার সময়ে যে প্রজাতিগুলো ছিল তাদের মধ্যে যারা বৈশিষ্ট্যগত কারণে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল তারাই শুধু টিকে গিয়েছিল, আরা যারা পারেনি তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে আফ্রিকার ঘন অরণ্যগুলো কমে আসতে শুরু করে, বিভিন্ন জায়গায় গাছবিহীন শুকনো অঞ্চল এবং তৃনভুমি জন্ম নেয়। এমনটা তো হতেই পারে যে, এদের মধ্যে যারা শুধু গাছের ডালে ডালে থাকার চেয়ে বেশ কিছুটা সময় মাটিতে চলাচল করতে শুরু করেছিল এবং দূর দূরান্ত থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে বয়ে নিয়ে আসার উপায় রপ্ত করতে পেরেছিলো তারাই টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছিল। এ কারণেই হয়তো এ সময়ে দ্বিপদী নয় এমন বেশীরভাগ বনমানুষ প্রজাতির দ্রুত বিলুপ্তি ঘটে যেতে দেখা যায়, আর অন্যদিকে দ্বিপদী বনমানুষদের অর্থাৎ আমাদের পুর্বপুরুষদের দ্রুত বিকাশ ঘটতে শুরু করে। অনেক বিজ্ঞানীই এখন মনে করেন যে, পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়েই বড় মস্তিষ্কের অধিকারী বুদ্ধিমান মানুষের হাতিয়ারের ব্যবহার শুরু করেছিল এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিকভাবে জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটাতে বাধ্য হয়েছিল, আর সেখান থেকেই ধীরে ধীরে আমরা এত উন্নত এবং জটিল সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি।

সে যাই হোক, আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষদের কাহিনী শোনা যাক এবার। ২০ লক্ষ বছর আগের তানজানিয়া, কেনিয়া, ইথিওপিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে *H. habilis* দের যে ফসিলগুলো পাওয়া গেছে তাদের সাথে বিভিন্ন ধরণের পাথুড়ে হাতিয়ারও পাওয়া গেছে [৮]। এগুলোই কিন্তু মানব ইতিহাসে প্রথম হাতিয়ার! তাই মনে করা হয় যে, এরাই বোধ হয় প্রথম পাথুরে যন্ত্র তৈরি করতে শিখেছিলো এবং নিজেরা শিকার না করলেও মাংস খেতে শিখেছিলো। মাংসে থাকে অনেক বেশি পুষ্টি ও ক্যালোরি আর তা

সহজেই হজম হয় বলে সেখান থেকেই আপেক্ষাকৃত ছোট ক্ষুদ্রান্ত্রেরও বিবর্তন ঘটেছিল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন তার ফলে শরীরের যে শক্তি বেঁচে গেলো তা হয়তো ব্যবহৃত হয়েছিল বড় মস্তিষ্কের বিবর্তনে ২০। তারা দেখতেও বেশ ছোটখাটো, দাঁতের আকারও বেশ ছোট, এদের পা দেখতে অনেকটা আধুনিক মানুষের মত হলেও হাত তখনও বনমানুষের মতই বড় রয়ে গেছে, ওদিকে আবার খুব সামান্য হলেও মস্তিষ্কের আকার কিন্তু বড় হতে শুরু করে দিয়েছে। এদের মস্তিষ্কের আকার ৫৯০ সিসি থেকে শুরু করে ৬৯০ সিসি, যা পূর্ববর্তী সব প্রজাতির চেয়ে কিছুটা হলেও বড়। তবে এতটুকু বৃদ্ধিকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং তার ভিত্তিতে এদেরকে *Homo* র দলে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত কিনা তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও কিছু বিতর্ক দেখা যায়।

চিত্রঃ ৯.১৬: *H. habilis* দের দাঁতের এবং চোয়ালের গঠণ এবং আশেপাশের ফসিইলগুলো দেখে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে তারা মোটামুটিভাবে যা পেত তাই খেত, সব ধরণের খাওয়াতেই তারা অভ্যস্ত ছিল।

ওদিকে আবার একই সময়ের দিকে বেশ বড় ধরণের মানুষের এক প্রজাতিরও ফসিল পাওয়া গেছে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে *H. rudolfensis*, এরা *H. habiis* দের তুলনায় বেশ বড়, এদের মস্তিষ্কের আকার ৭০০-৮০০ সিসির কাছাকাছি। হাত পায়ের অনুপাতের দিক থেকে এরা অনেকটা আধুনিক মানুষের মত হলেও, এদের বড় এবং শক্ত ধরণের চোয়াল বা দাঁতের গঠন কিন্তু ঠিক সেরকম নয়। এই সবগুলো প্রজাতিই বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আধুনিক মানুষের চেয়ে বরং লুসির প্রজাতির অনেক কাছাকাছি। আসলে এর পরে বিবর্তনের পদযাত্রায় আমরা যাদের দেখা পাই, সেই *H. erectus* প্রজাতিটিকেই বরং আমাদের সবচেয়ে কাছের পূর্বপুরুষ বলে মনে হয়।

সেই উনিশ শতকে যখন এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে *H. erectus* এর ফসিল পাওয়া যেতে শুরু করে তখন অনেকেই ধারণা করেছিলেন যে, আফ্রিকায় মানুষের উৎপত্তি নিয়ে ডারউইন যা ভেবেছিলেন তা আসলে ভুল ছিল। আফ্রিকায় নয়, বরং এশিয়ায়ই হয়তো প্রথম মানুষের পূর্বপুরুষের বিবর্তন ঘটেছিল। এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় এদের ফসিল পাওয়া যেতে শুরু করে, তাদের মধ্যে পিকিং ম্যান, জাভা ম্যান বেশ

বিখ্যাত। চায়নায় যে ফসিলগুলো পাওয়া যায় তাদের বয়স ১০ লক্ষ বছর থেকে শুরু করে আড়াই লক্ষ বছরের মধ্যে। এরা দেখতে অনেকটাই বোধ হয় আমাদের মত, চেহারা, কপাল এবং চোয়ালের গঠন ফ্ল্যাট হয়ে এসেছে, আগের দেখা মানব প্রজাতিদের তুলনায় মস্তিষ্কের আকারও বেশ অনেক বড়, প্রায় ১০০০ সিসির মত, পায়ের গঠনও আধুনিক মানুষের মতই লম্বা। কিন্তু তার পরপরই আফ্রিকা জুড়ে মানুষের বিভিন্ন প্রজাতির ফসিল পাওয়া যেতে শুরু করলো, আর তখন দেখা গেল যে আসলে ডারউইনের ধারণাই ঠিক ছিল। এশিয়ার বিভিন্ন জায়গা জুড়ে যে প্রজাতিগুলোর ফসিল পাওয়া গিয়েছিল তাদের পূর্বপুরুষ আফ্রিকাবাসী *H. erectus* রা ছাড়া আর কেউ নয়। প্রায় বিশ লক্ষ বছর আফ্রিকায় বিকাশ লাভ করে *H. erectus* প্রজাতি আর তাদেরই একটা অংশ পরবর্তীতে ছড়িয়ে পড়ে এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে। এদের আফ্রিকাবাসী পূর্বসুরীদের অনেকেই *H. ergaster* বলেও অভিহিত করেন। ফসিল রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, এই প্রজাতির মানুষেরা ইতোমধ্যেই তাদের পূর্বপুরুষ প্রজাতিদের ভোতা

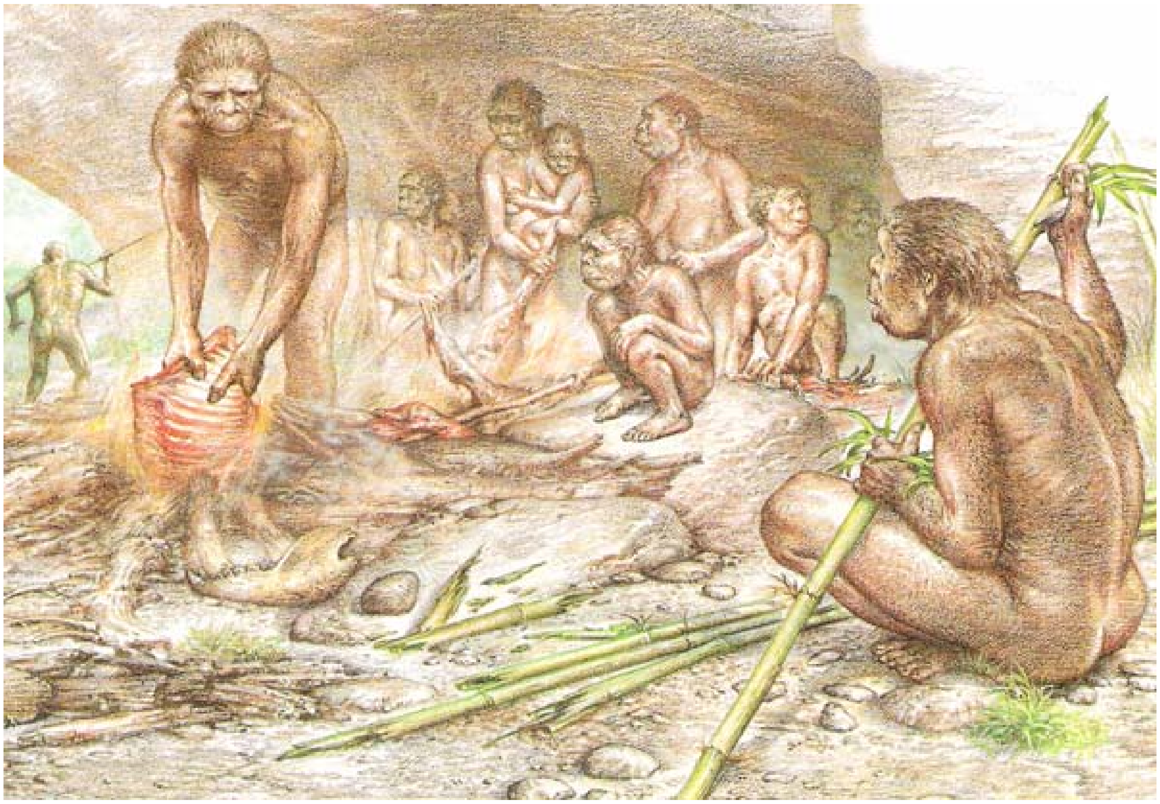

চিত্রঃ ৯.১৭: কোন এক *H. erectus* গোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের কল্পিত ছবি

অস্ত্রগুলোকে শান দিকে ধারালো করতে শিখছে, শিখে গেছে আগুনের ব্যবহার! তারাই সম্ভবত প্রথম মানব প্রজাতি যাদের একটি অংশ আফ্রিকা ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছিল, ছড়িয়ে পড়েছিল এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে[৮]। তবে ইউরোপ এবং মধ্যপ্রচ্যে পরবর্তীতে *H. heidelbergensis* নামে যে প্রজাতিটি দেখা যায় তারা সম্ভবত আফ্রিকা থেকে প্রথমবার বেড়িয়ে পড়া *H. erectus* দেরই উত্তরসুরী। তবে এরা আসলেই *H. erectus* দের থেকে বিবর্তিত হয়েছিল নাকি তারা আলাদা কোন প্রজাতি বলে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখন মতভেদ দেখা যায়। আর এদের থেকেই পরবর্তীতে নিয়ান্ডারথাল

প্রজাতির উদ্ভব ঘটে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, এদের কেউই কিন্তু আমাদের অর্থাৎ *H. sapiens* দের সরাসরি পূর্বপুরুষ নয়।

> আমাদের উৎপত্তি ঘটেছে আফ্রিকাবাসী সেই আদি *H. erectus* দের অংশ থেকেই প্রায় দুই লক্ষ বছর আগে, যারা কখনই আফ্রিকা ত্যাগ করেনি। আর প্রায় বিশ লক্ষ বছর আফ্রিকা থেকে বের হয়ে গিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে প্রজাতিগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল তারা কোন বংশধর না রেখেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে ইতিহাসের পাতা থেকে।

আমাদের নিজেদের প্রজাতি *H. sapiens* দের গল্প বলার সময় হয়ে এলো বলে। কিন্তু তার আগে নিয়ান্ডারথাল মানুষের কাহিনীটাকে আলাদা করে না বলে না নিলে বোধ হয় তাদের প্রতি অবিচারই করা

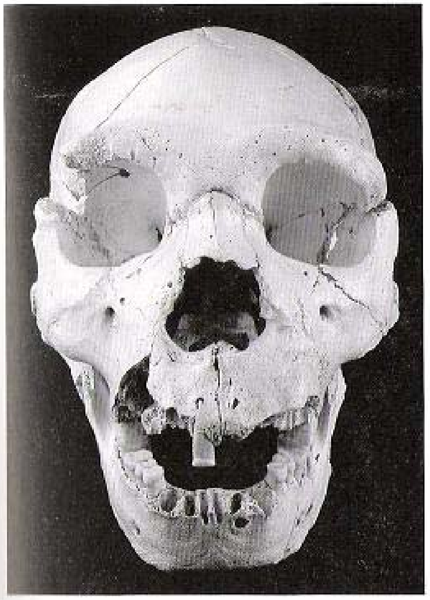

চিত্রঃ ৯.১৮: স্পেনে সিমা নামের একটি গুহার ভিতরই পাওয়া গেছে ৩ লাখ বছরেরও আগের ২,৫০০ ফসিল [৮]।

হবে। গত দেড়শ বছরে মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়া, ইরাক, ইসরাইল থেকে শুরু করে উত্তরে রাশিয়া, জার্মানি, পশ্চিমে স্পেন, ফ্রান্সসহ ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ান্ডারথালদের ফসিল পাওয়া গেছে (তবে পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় এদের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি)। ইরাকের শানিডার নামের এক জায়গায়, বিভিন্ন ধরনের ফুলের কারুকার্য করা, প্রায় ৬০ হাজার বছরের পুরনো নিয়ান্ডারথালদের কবর পাওয়া গেছে ৭। ফসিল রেকর্ড থেকে ৪-৫ লাখ বছর আগে *H. heidelbergensis* প্রজাতি থেকে *H. neanderthalensis* প্রজাতির বিবর্তনের ইতিহাস কিন্তু খুবই পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে ৮। তারপর

চিত্রঃ ৯.১৯: *H. heidelbergensis* প্রজাতি

বহুদিন ধরেই রাজত্ব করেছিল তারা। ৫০-৭০ হাজার বছর আগে, আধুনিক মানুষের যে প্রজাতিটি আফ্রিকা থেকে বের হয়ে এসে পরবর্তীতে মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপে পৌঁছেছিল তাদের সাথে পাশাপাশি কিছু সময় ধরে নিয়ান্ডারথাল প্রজাতিটাও টিকে ছিলো। ৩৫ হাজার বছর আগেও তাদের অস্তিত্ব দেখা যায় বিভিন্ন আঞ্চলে। আধুনিক মানুষের প্রজাতির সাথে এদের অনেক মিল থাকলেও অমিলও ছিলো প্রচুর। আমাদের মতই বড় মস্তিষ্ক থাকলেও তাদের করোটির আকৃতি ছিলো বেশ অন্যরকম, মুখের এবং সামনের দাঁতের গঠনেও ছিল বেশ পার্থক্য। তারা আসলে আমাদের আধুনিক মানুষের প্রজাতিরই আংশ ছিল কিনা এ নিয়ে বহু বছর ধরেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্কের কোন অন্ত ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি নিয়ান্ডারথাল প্রজাতির ফসিল থেকে নেওয়া ডিএনএ র বিশ্লেষন থেকে দেখা গেছে যে তাদের সাথে *H. sapiens* দের কখনও প্রজনন ঘটেনি, তারা আসলে সম্পুর্নভাবে ভিন্ন একটি প্রজাতি। তাদের সাথে কি আমাদের আধুনিক মানুষ প্রজাতির দেখা হয়েছিলো, কোন রকম আদান প্রদান কি ঘটেছিলো কিংবা তাদের বিলুপ্তির পিছনে আমাদের কি কোন অবদান ছিলো - এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এখনও ঠিকমত জানা যায়নি।

প্রায় ৩৫-৪০ হাজার বছর আগে ইউরোপে আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষদের দেখা যেতে শুরু করে, এরা ক্রো-ম্যগনন জাতি নামে পরিচিত। বিভিন্ন ফসিল রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, এদের শিকার পদ্ধতি, হাতিয়ারের মান নিয়ান্ডারথালদের চেয়ে অনেক উন্নত ধরণের ছিল, অনেকে মনে করেন যে, এদের সাথে

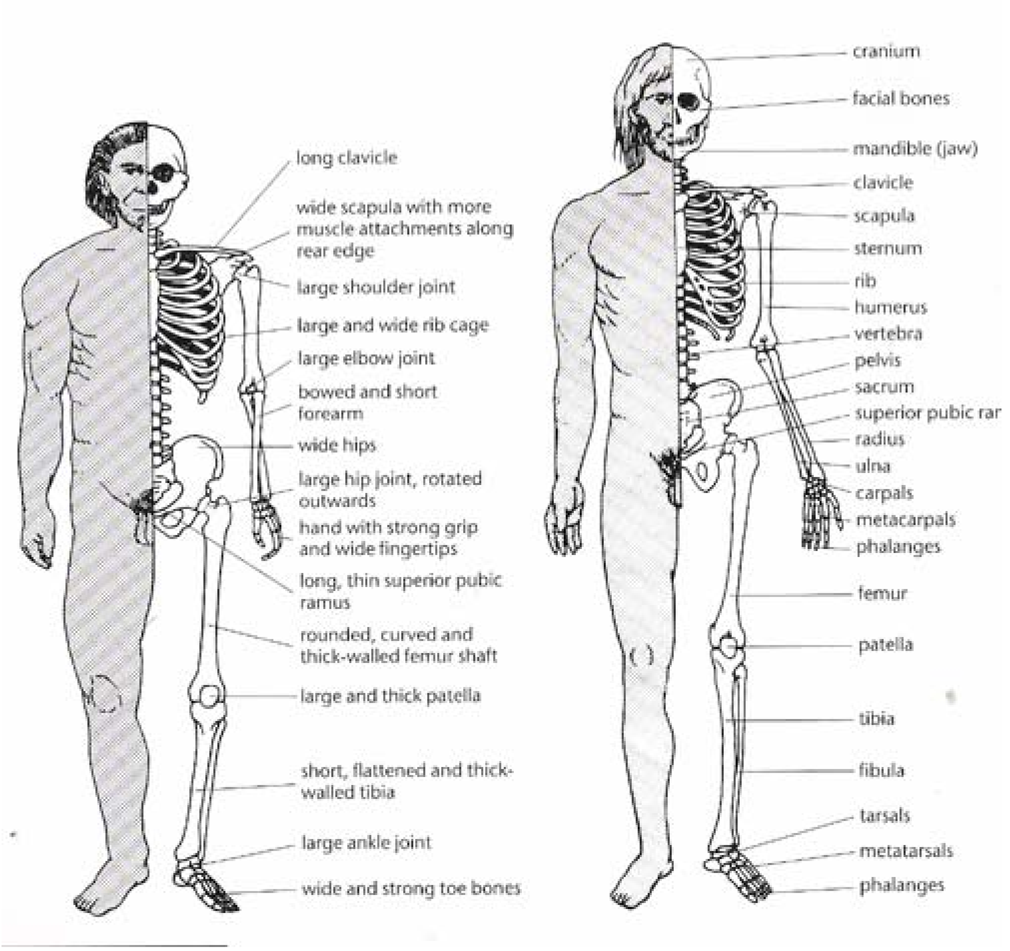

চিত্রঃ ৯.২০: ক্রো-ম্যাগননদের সাথে নিয়ান্ডারথালদের গঠনগত পার্থক্য

টিকে থাকার প্রতিযোগীতায় হেরে গিয়েই নিয়ান্ডারথালরা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ক্রো-ম্যাগনদের সাথে আধুনিক মানুষের বংশগতীয় মিল পাওয়া গেলেও নিয়ান্ডারথালদের সাথে কিন্তু তাদের কোন বংশগতীয় মিল পাওয়া যায় না। এই ক্রো ম্যাগননরাও পরবর্তীতে ইউরোপ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এছাড়াও, আমরা আগে সেই প্রথম অধ্যায়েই দেখেছিলাম যে, ইন্দোনেশিয়ায় *Homo floresiensis* প্রজাতির যে, ক্ষুদে মানুষগুলোর ফসিল পাওয়া গেছে তারা মাত্র ১২ হাজার বছর আগেও সেখানে দিব্যি টিকে ছিল। তারা খুব সম্ভবত এশিয়ায় বিস্তার করা সেই আগের দেখা *Homo erectus* প্রজাতি থেকে বিবর্তিত হয়েছিল। তাদের সাথেও আমাদের প্রজাতির কোন সরাসরি সম্পর্ক নেই বলেই মনে হয়।

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমাদের সামনে এটুকু স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমরা যতই নিজেদেরকে 'বিশেষ সৃষ্টি' বলে ভাবতে পছন্দ করি না কেন আসলে আমাদের বিবর্তনও ঘটেছে বিবর্তনের সেই একই অন্ধ 'প্রাকৃতিক নিয়ম' মেনেই। এই বিবর্তনের গতি বা হার কখনই সমান ছিলো না, এবড়ো থেবড়ো পথ পেরিয়ে, কখন দ্রুত, কখনও বা খুব ধীর গতির পরিবর্তনের মাধ্যমে, বহু প্রজাতির উদ্ভব এবং বিলুপ্তির

নিষ্ঠুর পথ পেরিয়ে এগিয়ে গেছে আমাদের বিবর্তন। ডঃ রিচার্ড ডকিন্সের মতই বলতে হয় আসলেই বিবর্তনের প্রক্রিয়াটা আচেতন এবং অন্ধ, প্রাকৃতিক নির্বাচনের কানাগলি দিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মেই ক্রমাগতভাবে এগিয়ে চলতে থাকে এই প্রাণের বিকাশ। ভাবতেও অবাক লাগে যে এত ধরণের এতরকমের বৈশিষ্ট্যের মানুষ এবং মানুষের পূর্বপুরুষের প্রজাতিগুলো একসময় পৃথিবীর বুকে হেটে বেড়িয়েছে! এখনও অনেক কিছুই আমাদের অজানা, কিন্তু বিবর্তনের ইতিহাস জুড়ে যে বহু রকমের মানব প্রজাতির অস্তিত্ব ছিল এবং তাদের প্রথম উৎপত্তি ঘটেছিল আফ্রিকায় তা নিয়ে কিন্তু আজকে সন্দেহের তেমন কোন অবকাশ নেই। কিন্তু প্রশ্ন করতে হয়, তাহলে আজকের পৃথিবীতে আমারাই কেন একমাত্র মানব প্রজাতি যারা টিকে থাকতে সক্ষম হলাম? আসলে আমাদের প্রজাতির বয়স কিন্তু খুব বেশী নয়, মাত্র ২ লক্ষ বছর আগে আমাদের প্রজাতির উৎপত্তি, বলতে গেলে আমরা বিবর্তনের পাড়ার খুব নতুন বাসিন্দা। একদিকে আমাদের বিবর্তনের ইতিহাসটা যেমন অন্যান্য জীবের মতই কিন্তু এটা মেনে নিতেই হবে যে, আমাদের টিকে থাকার ইতিহাসটা বিবিধ কারণেই একটু ভিন্ন গতিতে এগিয়েছে। আর তাই এ বিষয়ে গভীরভাবে জানতে হলে বোধ হয় শুধু ফসিলের গঠন এবং সময়সীমাগুলো জানলেই হবে না, আরও কিছু বাড়তি কথাও জানতে হবে। জানতে হবে আমাদের সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার ইতিহাস, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিবর্তন, ভাষার উৎপত্তি কিংবা আগুনের ব্যবহারের মত ঘটনাগুলোর গুরুত্ব।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা আফ্রিকা থেকে কখন বেরিয়ে পড়েছিল? -'আফ্রিকা থেকে বহির্গমন' তত্ত্বঃ

এবারের গল্পটা আমাদের পথ চলার গল্প, আমাদের পূর্বপুরুষদের আফ্রিকার সীমানা পেরিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার গল্প। এ যেনো অনেকটা বইয়ে পড়া গোয়েন্দা কাহিনীর মত - লক্ষ লক্ষ বছরের যাত্রাপথে কোথায় কোন স্মৃতিনিদর্শন ফেলে গেছে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন আজকের বিজ্ঞানীরা। কিন্তু সেই সুদীর্ঘ অতীতে বিভিন্ন প্রজাতির মানুষ বিভিন্ন সময়ে যে সব পথে অজানার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল তাদের পদচিহ্নগুলো খুঁজে বের করা তো আর মুখের কথা নয়, তাই এ ব্যাপারে যে আমরা নানা মুনীর নানা মত শুনতে পাবো সেটাই স্বাভাবিক। এতদিন পর্যন্ত ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরে পাওয়া যাওয়া ফসিল রেকর্ডগুলোই ছিল একমাত্র ভরসা। কিন্তু এখন তো আর আমাদের শুধু ফসিল রেকর্ডের মুখ চেয়ে বসে থাকার আর কোন প্রয়োজন নেই। অসম্ভব মনে হলেও সত্যি যে, আমাদের জিনের ভিতরই আজকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব আমাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহাসিক কাফেলার পদচিহ্ন। বিজ্ঞান আজকে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, ডিএনএ থেকেই এখন আমাদের সরাসরি পুর্বপুরুষদের ভ্রমনকাহিনী পড়ে ফেলা সম্ভব। তবে অনেক আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রজাতিগুলো সম্পর্কেও কি একইভাবে তা জানা সম্ভব? পরীক্ষা করে দেখার জন্য তাদের ডিএনএ ই বা কোথায় পাওয়া যাবে? তাই সেই আদি প্রজাতিগুলোর যাত্রাকাহিনী জানতে হলে বোধ হয় ফসিল রেকর্ডের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় খোলা নেই।

এখন পর্যন্ত পাওয়া ফসিল রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে, লুসির প্রজতিরা বোধ হয় কখনই তাদের আফ্রিকার বাস্তুভিটা ত্যাগ করে বাইরের পৃথিবীর মুখ দেখেনি। তার বেশ পরে, ২০ লক্ষ বছর আগে *H. erectus*-দের একটা অওংশই বোধ হয় প্রথম মানব প্রজাতি যারা আফ্রিকার মায়া ত্যাগ করে বেড়িয়ে পড়েছিল। তারা ভীষণ কোন দিগ্বিজয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে বের হয়েছিল সেটা ভাবলে বোধ হয় ভুলই হবে। সম্ভবতঃ খাদ্য এবং শিকারের সন্ধানে অল্প অল্প করে নিজেদের আবাসভুমি বিস্তৃত করতে করতে এক সময় তারা নিজের অজান্তেই আফ্রিকা থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল অন্যান্য মহাদেশগুলোতে। এ সময়ের

দিকেই যে আমাদের কোন এক পূর্বপুরুষ প্রজাতি আফ্রিকা থেকে বেড়িয়ে পড়েছিল তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আর কোন দ্বিমত নেই। তবে এরা আসলেই *H. erectus* প্রজাতি ছিল নাকি সে সময়ে আফ্রিকায় বসবাস করা অন্য কোন *Homo* প্রজাতি ছিল তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও কিছু বিতর্ক রয়েছে। মানব প্রজাতির এই প্রথম বেড়িয়ে পড়াকে 'প্রথম আফ্রিকা থেকে বহির্গমন' বলে চিহ্নিত করা হয়। ফসিল রেকর্ড থেকে মনে হয় যে তারা প্রথম দিকে বেশ কিছু কাল আফ্রিকার আশেপাশে গরম অঞ্চলগুলোতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তারপর এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব বিস্তার করতে তাদের আরও প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর লেগে গিয়েছিল[৮]। আড়াই লাখ বছর আগে এদের উত্তরসুরীদেরই আমরা দেখতে পেয়েছি চীন, জাভাসহ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে, আর ওদিকে ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যে মাত্র ৩৫ হাজার বছর এগেও দেখেছি নিয়ান্ডারথাল প্রজাতির বিচরণ। তাপমাত্রার ওঠানামার সাথে এই মানব প্রজাতিগুলোর বিস্তৃতি ও জীবনযাপন পদ্ধতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। গরম যুগগুলোতে তাদের জনসংখ্যা ফুলে ফেঁপে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী বরফ যুগগুলোতে আবার বহু জনগোষ্ঠী বিলুপ্তও হয়ে যেত। সাম্প্রতিককালের সর্বশেষ (২০ হাজার বছর আগে) বরফ যুগের সাথে লড়াই করতে না পেরেই বোধ হয় ইউরোপের ক্রোম্যাগনন জাতি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল [৮]।

আমাদের নিজেদের প্রজাতির আধুনিক মানুষেরা অর্থাৎ *H. sapien* রা যে, আফ্রিকা থেকে উদ্ভুত হয়ে খুব সাম্প্রতিককালে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে তা নিয়েও এখন আর কোন দ্বিমত নেই। তবে তারা ঠিক কোন কোন পথে আফ্রিকা থেকে বেড়িয়ে পড়েছিলো, এবং ঠিক কোন সময়টাতে এবং কতবার তা ঘটেছিল তা নিয়ে এখনও বিতর্কের অবকাশ রয়ে গেছে। আর আমাদের এই যাত্রাকেই মানব ইতিহাসে 'দ্বিতীয়বারের মত আফ্রিকা থেকে বহির্গমন' বলে অভিহিত করা হয়। প্রায় দুই লাখ বছর আগে আফ্রিকায় আমাদের এই আধুনিক মানুষের প্রজাতির উদ্ভব ঘটলেও প্রথম এক লক্ষ বছর তারা বোধ হয় আফ্রিকার সীমানা পেরিয়ে বাইরে বেরোয়নি। ইথিওপিয়া থেকে শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের এই পূর্বপুরুষদের ফসিল পাওয়া গেছে। আর আফ্রিকার বাইরে প্রথম যে ফসিল পাওয়া যায় তারা ৯০ হাজার বছরের চেয়ে বেশী পুরনো নয়। এই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের ইসরাইলে তাদের বসতি দেখা গেলেও সেখান থেকে পরবর্তীতে তারা আর কোথাও বিস্তার লাভ করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না [২১]। এর পরের কাহিনী নিয়ে ফসিলবিদদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে, কিন্ত এখন মনে হচ্ছে, আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে খুব অচিরেই খুব অচিরেই সেই বিতর্কেরও ইতি ঘটাতে পারবো। বইটি লেখার সময়ে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকায় এ নিয়ে একটি চমৎকার প্রতিবেদন (২০০৬) প্রকাশিত হয়, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক জেনেটিক্সের আলোয় আমরা ইতোমধ্যেই বেশ পরিষ্কারভাবেই আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই মহাযাত্রার কাহিনীটা একে ফেলতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের পূর্বপুরুষদের একটা অংশ মাত্র ৫০-৭০ হাজার বছর আগে আফ্রিকা ছেড়েছিল আর আজকে পৃথিবীব্যাপী আমি বা আপনিসহ যে ছয়শো কোটি মানুষের মুখ দেখতে পাই তারা সবাই এদের উত্তরসুরী ।

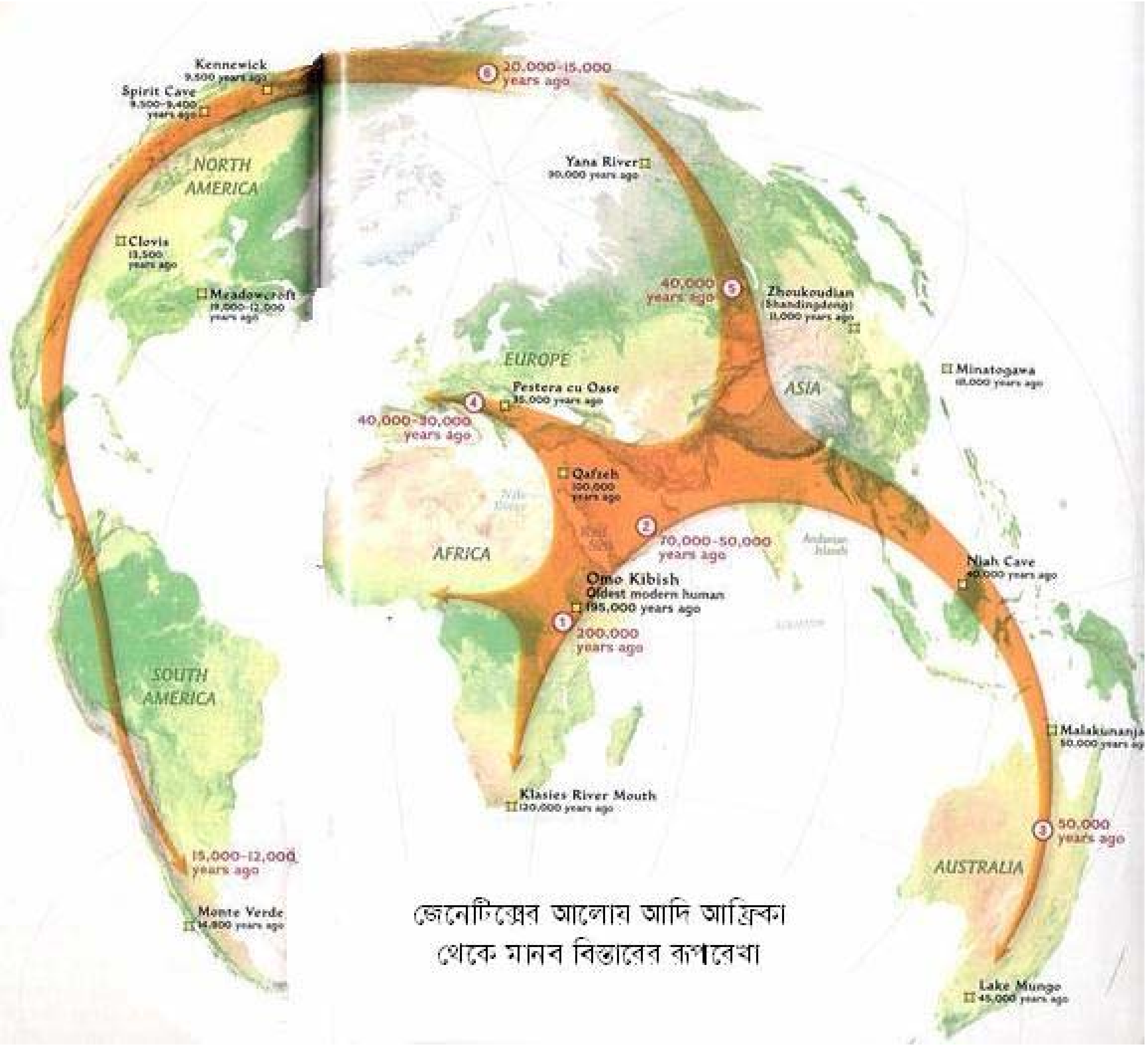

চিত্রঃ ৯.২১: জেনেটিক্সের গবেষণা থেকে *Homo sapines* দের আফ্রিকা থেকে বেড়িয়ে পড়ার সময়সীমা

কিন্তু কিভাবে সম্ভব আজকে আমার বা আপানার ডিএনএ থেকে হাজার বছরের্ এই ইতিহাস খুঁজে বের করা? কি দেখেই বা বিজ্ঞানীরা এত আস্থা নিয়ে বলতে পারছেন সে কাহিনীর ইতিবৃত্ত? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা ডঃ রিচার্ড ডকিন্সের কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই, বিজ্ঞানী স্পেনসার ওয়েলস এর মুখে - আমাদের প্রতিটি রক্তকণাই যেনো জিনের ভাষায় লেখা ইতিহাসের একেকটা বই [২১]। সব মানুষের দেহে যে জেনেটিক কোড রয়েছে তা প্রায় ৯৯.৯% এক। গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে, আফ্রিকাবাসীদের জেনেটিক কোডের মধ্যে যে পরিমাণ বৈচিত্র দেখা যায় তার তুলনায় বাকি পৃথিবীর মানুষের মধ্যে তেমন কোন বৈচিত্র নেই বললেই চলে। আফ্রিকার যে সব জেনেটিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তারই একটা সাব-সেট বা ক্ষুদ্র অংশ দেখা যায় বাকিদের মধ্যে। তার অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে? আফ্রিকাবাসীদের একটা ক্ষুদ্র অংশ আফ্রিকায় উদ্ভুত হয়ে, বিকশিত হয়ে পরবর্তীতে তাদের একটা অংশ পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়লেই শুধুমাত্র এটা হওয়া সম্ভব। সে না হয় গেলো এক কাহিনী, এবার চলুন চট করে একবার দেখে নেওয়া যাক বিজ্ঞানীরা কি করে আফ্রিকা থেকে বহির্গমনের ইতিহাস বের করলেন। আমরা জানি যে,আমাদের জিনে

কখনও কখনও বিক্ষিপ্তভাবে মিউটেশন ঘটে থাকে। জেনেটিক্সের নিয়ম মেনে তারপর তা পরবর্তী বংশধরদের ডিএনএ তেও দেখা যায়। এই মিউটেশনুলোকেই জেনেটিক মার্কার বা নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করেন বিজ্ঞানীরা। বহু প্রজন্ম পরে যদি আপনার এবং আমার দুজনেরই ডিএনএ তে একই মিউটেশন দেখা যায় তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, কোন না কোন সময়ে আমাদের একই পূর্বপুরুষ ছিল। বিভিন্ন জনপুঞ্জের মধ্যে এই সাধারণ নির্দেশকগুলোকে খুঁজে বের করে তুলনামুলক পর্যালোচনা করতে পারলেই বোঝা যাবে তারা সবাই একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভুত হয়েছে কি হয়নি।

আর এই মিউটেশন বা নির্দেশকগুলো প্রথম কখন ঘটেছিল এবং কোন জনপুঞ্জের মধ্যে কোন সাধারণ নির্দেশকগুলোর অস্তিত্ব রয়ে গেছে তা জানতে পারলেই বোঝা যাবে কখন কোন জনপুঞ্জ কখন তাদের সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। তবে এখানে আরেকটু কথা আছে, যে কোন কোষের ডিএনএ থেকে আবার এই পরীক্ষা করা যাবে না। বাবা মার জিনের জেনেটিক রিকম্বিনেশনের মাধ্যমে যেহেতু আমাদের জন্ম হয়, আমাদের বেশীরভাগ কোষেই এই মিউটেশনগুলো আর ঠিকমত নাও দেখা যেতে পারে। তাহলে কোথা থেকে আমরা এই আদি তথ্যগুলো অবিকৃত অবস্থায় পেতে পারি? তারও সামাধান খুঁজে পাওয়া গেছে, আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে যে আমাদের দেহকোষে এমন কয়েকটি অংশ রয়েছে যারা আবিকৃত অবস্থায় বাবা মা থেকে সন্তানের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

> মেয়েদের মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ মা থেকে সন্তানে প্রবাহিত হয় কোন পরিবর্তন ছাড়াই, আবার ওদিকে ছেলেদের যে 'Y' ক্রোমোজোম টি রয়েছে তাও বাবা থেকে ছেলের মধ্যে অপারিবর্তিত অবস্থায় সঞ্চালিত হয়। অর্থাৎ, এই মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ এবং 'Y' ক্রোমোসোমের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে আমাদের পুর্বপুরুষদের মধ্যে ঘটা মিউটেশনগুলোর ঐতিহাসিক তথ্য।

বিজ্ঞানীরা এদের ভিতরকার জেনেটিক মার্কারগুলোর সময়সীমা এবং সংখ্যার আপেক্ষিক পর্যালোচনা থেকেই মোটামুটিভাবে বলতে পারেন কখন কোন জনপুঞ্জ কার থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল।

নীচে একজন আদি আমেরিকাবাসী অর্থাৎ আমেরিকান ইন্ডিয়ানের 'Y' ক্রোমোসোমের ভিতরের মিউটেশনগুলো থেকে তার পূর্বপুরুষের ইতিহাস বের করার পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। এখানে তার ডিএনএর ভিতরের বিভিন্ন সময়ে ঘটা মিউটেশনগুলোকে চারটি স্তরে ভেঙ্গে ক্রমানুযায়ী দেখানো হয়েছে। আদি আফ্রিকাবাসীসহ পৃথিবীর সব পুরুষের ডিএনএ তেই একটি বেসিক মিউটেশনের প্যাটার্ণ লক্ষ্য করা যায়, যা আমাদের সামনে আজও আফ্রিকার আদি চিহ্ন বহন করে চলেছে। ১ নম্বর ডিএনএর ছবিতে এই মৌলিক প্যাটার্ণটা দেখানো হয়েছে। ২ নম্বর ডিএনএ তে ৫০ হাজার বছরের পুরনো M168 মিউটেশন বা নির্দেশকটি দেখা যাচ্ছে, যা শুধু আফ্রিকাবাসী পুরুষ ছাড়া পৃথিবীর বাকি সব পুরুষের মধ্যে দেখা যায়, এ থেকে বোঝা যায় যে আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে পড়ার পরপরই সেই জনগোষ্ঠির মধ্যে এই মিউটেশনটা

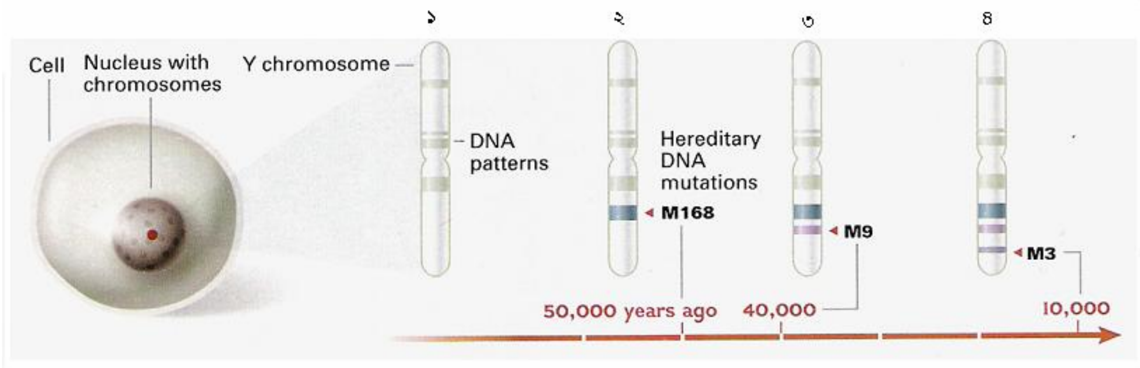

চিত্রঃ ৯.২২: একজন আদি আমেরিকাবাসীর 'Y' ক্রোমোসোমের ভিতরের বিভিন্ন সময়ে ঘটা মিউটেশনগুলো

ঘটেছিল। ৩ নম্বর ডিএনএ তে দেখা যাচ্ছে যে ৪০ হাজার বছরের পুরনো M9 নামে একটি নতুন মিউটেশন যুক্ত হয়েছে, আর এটি শুধু মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্যে এশিয়ার জনগোষ্ঠির মধ্যে দেখা যায়। এর পরে ৪ নম্বর ছবিতে যে M9 (১০ হাজার বছরের পুরনো) নামে যে মিউটেশনটি দেখান হয়েছে তা আজকের আদিবাসী আমেরিকানদের মধ্যে দেখা যায়, আর দেখা যায় এশিয়ার সায়বেরিয়া অঞ্চলের জনগোষ্ঠির মধ্যে যাদেরই একটি অংশ আলাস্কা হয়ে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিল[২১]।

জেনেটিক তথ্য থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে ৫০-৭০ হাজার বছর আগে যে আফ্রিকাবাসীদের যে ছোট একটি অংশ বের হয়ে এসেছিল তারা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব দিকে এশিয়ার উপকুল ধরে যাত্রা করে তারা কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যাত্রাপথের বিভিন্ন অঞ্চলে, যেমন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, মালয়েশিয়া, পাপুয়া নিউগিনি এবং অস্ট্রেলিয়ায় এখনও যে আদিবাসীরা রয়ে গেছেন তাদের মাইট্রোকন্ড্রিয়াল ডিএনএর মধ্যে এখনও সেই আদি আফ্রিকার নির্দেশকগুলোর চিহ্ন রয়ে গেছে। আর এদিকে ইউরোপে আধুনিক মানুষের খুটি গাড়ার কাহিনীতো আরও রোমাঞ্চকর। এতদিন পর্যন্ত ফসিলবিদেরা মনে করে এসেছেন যে, মানুষের পূর্বপুরুষেরা সম্ভবত আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ইউরোপে বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু জেনেটিক তথ্য তো বলছে আরেক কথা! জেনেটিক নির্দেশক থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশবাসীদের সাথেই বরং ইউরোপবাসীদের বংশগতীয় সাদৃশ্য সবচেয়ে বেশী। তাহলে কি ভারত থেকে পরবর্তীকালে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ইউরোপে পাড়ি জমিয়েছিল? ওদিকে ৪০ হাজার বছর আগেই তারা মধ্য এশিয়ার চীনসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পরেছিল। আমরা আগেই দেখেছি, উত্তর এশিয়ার সাইবেরিয়া থেকে ১৫-২০ হাজার বছর আগেই মানুষ উত্তর আমেরিকায় পা রেখেছিল।

আসলে আধুনিক জেনেটিক আবিষ্কারগুলো নিয়ে লিখতে বসলে কলম থামানো খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। মাত্রাতিরিক্ত তথ্যভারে পাঠকেরা বিরক্ত হয়ে থাকলে আশা করি নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন। যাই হোক, আফ্রিকা থেকে বহির্গমনের গল্পের এখানেই ইতি টানছি। এই দু'টো প্রধান বহির্গমন তত্ত্বকে মোটামুটিভাবে সব বিজ্ঞানীই সঠিক বলে মনে করেন। তবে অনেকে মনে করেন যে, এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রজাতির ছোট বা বড় অংশ হয়তো আফ্রিকা থেকে বেড়িয়ে পড়েছিল [১১]। একবার বা দু'বার নয় বারবার আফ্রিকা থেকে বেড়িয়ে পড়া এবং তারপর কখনও কখনও আবার পড়ে সেখানে ফিরে যাওয়াও হয়তো এমন কোন অসম্ভব ঘটনা নয়।

মানুষের গল্পটা কি শেষ পর্যন্ত শেষ হল?

না, হল না কিন্তু। গল্পটা ফুরোতে গিয়েও ফুরোয় না, কারণ এ গল্প তো এত তাড়াতাড়ি শেষ হবার নয়। এখনও আরও একটা খুব বড় অংশই বাকি রয়ে গেছে, মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের আরেক অধ্যায় - তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিবর্তন, বৌদ্ধিক বিকাশ, ভাষার উৎপত্তি, কৃষিব্যবস্থার উদ্ভব, সভ্যতার সৃষ্টির মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। এই বিষয়গুলো একটু গোলমেলে তো বটেই, এদের কোনটাকেই ফসিলে পুড়ে ইতিহাসের পাতায় বন্দী করা যায় না, শরীরের হাড়গোর, দাঁত না হয় ফসিলে পরিণত হয়, কিন্তু ভাষা, গান, আচার ব্যবহার বা বুদ্ধিচর্চার মত সুকোমল বৃত্তিগুলোর তো আর ফসিল হয় না! কিন্তু এদের সাথে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসটা আবার জড়িয়ে গেছে ওতপ্রোতভাবে। তাই বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ, দার্শনিকেরা বিভিন্ন ধরণের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এ সম্পর্কে বিভিন্ন অনুকল্প দিয়েছে, এখন সেটা নিয়ে লিখতে গেলে আবার আর এক মহাভারত হয়ে যাবে। এমনিতেই এই অধ্যায়টি অনেক বড় হয়ে গেছে, তাই ভাবছি পাঠকের বিরক্তির পরিমাণ আর না বাড়িয়ে আলাদাভাবে এর পরের অধ্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা করা যাক। বিবর্তনের মেলায় নিজেদের সাফল্য, বিকাশ এবং এগিয়ে চলার গল্প দিয়ে বইটার উপসংহার টানলে বোধ হয় মন্দ হবে না।

তথ্যসুত্র

১. DiChristine M, 2006, Becoming Human, Scientific American Science Magazne:Special Edition, p.1.

২. Calvin W. 2006, The Emergence of Intelligence, Scientific American:Special Edition, pp 85.

৩. Gould, S, J: Understanding Evolution, PBS Website.
http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/08/1/l_081_06.html

৪. ইসলাম, শ, ২০০৫, বিজ্ঞানের দর্শন, প্রথম খন্ড, শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ঢাকা, পৃঃ ৭৯।

৫. Skybreak, A. 2006, The Science of Evolution and The Myth Of Creationism, Insight Press, Illinois, USA.

৬. আখতারুজ্জামান, ম, ২০০৪, বিবর্তনবিদ্যা, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, পৃঃ ২৭৭-৩৭৫।

৭. Wilson, E, 2004, On Human Nature, Presidents and Fellows of Harvard College, p 169

৮. Stringer, C and Andrews, P, 2005, The complete Wrold of Human Evolution, Thames and Hudson Ltd, London.

and

৯.Blow to Neanderthal breeding theory,2003, BBC Science News

http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3023685.stm

and

Neanderthals 'not close family, 2004, BBC Science News
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3431609.stm

১০)The Human Origins Progam Resource Guide to Paleoanthropology, Smithsonian National Museum of Natural History

http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/faq/encarta/encarta.htm

১১) Dawkins R, 2004, The Ancestor's Tale, 2004. Houghton Mifflin Company, Boston, New York.

১২)The Human Genome Project,

http://genome.wellcome.ac.uk/node30075.html

১৩) New Genome Comparison Finds Chimps, Humans Very Similar At DNA Level,2005, Science Daily Magazine.

http://www.sciencedaily.com/releases/2005/09/050901074102.htm

১৪) Human and Chimp Genomes Reveal New Twist on Origin of Species, 2006, Science Daily Magazine.

http://www.sciencedaily.com/releases/2006/05/060518075823.htm

১৫) The Human Genome: Quick Facts
http://genome.wellcome.ac.uk/doc_WTD020745.html

১৬) Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium ,2005. "Initial sequence of the chimpanzee genome and comparison with the human genome". Nature *437: 69-87*.

http://www.genome.gov/Pages/Research/DIR/Chimp_Analysis.pdf

Kenneth R. Miller, professor of biology at Brown University, delivered the keynote address at the University’s 242nd Opening Convocation Tuesday, Sept. 6, 2005.
http://www.brown.edu/Administration/News_Bureau/2005-06/05-013m.html

National Human Genome Reserach Institue4, 2005, 'Scientists Analyze Chromosomes 2'

http://www.genome.gov/13514624

১৭) Robotics show Lucy walked upright , 2005, BBC News

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4697977.stm

১৮) Early Human Phylogeny Tree, Smithsonian National Museum of Natural History
http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/ha/a_tree.html

১৯) Mayr E, 2004, What Evolution Is,Basic Books, NY, USA. pp 231-268

[২০] Food For Thought - 3 Million Years Ago, BBC: Science and Nature:PreHistoric Life. http://www.bbc.co.uk/sn/prehistoric_life/human/human_evolution/food_for_thought1.shtml

২১) The greatest Journey, 2006, National Geographic Magazine.

দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

{বন্যা আহমেদের *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটি অবসর প্রকাশনী থেকে ২০০৭ এর একুশে বইমেলায় প্রকাশিতব্য। এই অংশটি বইটির নবম অধ্যায়।}

একাদশ অধ্যায়

যে গল্পের শেষ নেই

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পর

তখন আমি ক্লাশ সিক্স বা সেভেনে পড়ি। কত প্রশ্ন সব কিছু নিয়ে, সমাজ নিয়ে, পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে। বিশেষ করে নিজের উৎপত্তি নিয়ে তো এন্তার সব প্রশ্ন করে বিরক্ত করে চলেছি চারপাশের সবাইকে। ঠিক সে সময়েই আমার মামা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'যে গল্পের শেষ নেই' বইটি কিনে এনে দিলেন পড়ার জন্য। একটা ছোট বই একজনের জীবনে যে কি প্রভাব ফেলতে পারে তার প্রমাণ এই বইটা। বিবর্তনবাদ সম্পর্কে প্রথম জেনেছিলাম সেখানেই। কিন্তু আমার প্রায়ই মনে হয় এই বইটি থেকে আমি হয়তো আরও বড় কিছু শিখেছিলাম - চারদিকের পৃথিবীকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে শেখার হাতে খড়ি বোধ হয় হয়েছিল সেখানেই। তাই, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বইটাকে স্মরণ করেই আমার এই বিবর্তনের উপর বইটা শেষ করছি, এই শেষ অধ্যায়টির নাম রাখছি 'যে গল্পের শেষ নেই'। আসলেই তো অন্তহীন এই গল্প - সেই সাড়ে তিনশ কোটি বছর আগে প্রথম প্রাণের উৎপত্তির পর থেকে হাটি হাটি পা পা করে এগিয়ে গেছে এই প্রাণের সমারোহ, হাজারো প্রজাতির ভীরে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে এই ধরণী, তাদের অনেকেই আবার টিকে থাকার খেলায় হেরে গিয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, উৎপত্তি-বিলুপ্তির এক অনন্ত খেলায় মেতে আছে যেন এই প্রকৃতি।

বই এর এই শেষ অধ্যায়টা যখন লিখতে বসেছি তখনই দেখলাম ফসিলবিদ এবং জীববিদদের মধ্যে রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গেছে নতুন এক আবিষ্কার নিয়ে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, লুসির ফসিল যদি বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হয়ে থাকে, তবে ৩৩ লক্ষ বছর আগের এই তিন বছর বয়সী বাচ্চার প্রায় সম্পুর্ণ ফসিলটা একুশ শতকের সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার। ফসিলটা পাওয়া গেছে ইথিওপিয়ার প্রত্যন্ত দিকিকা অঞ্চলে, লুসির ফসিল যেখানে পাওয়া গিয়েছিল তার খুবই কাছাকাছি জায়গায়। এই শিশুটি লুসির প্রজাতিরই *(Australopithecus afarensis)* অন্তর্ভুক্ত, তাই অনেকেই তাকে আদর করে নাম দিয়েছেন 'লুসির সন্তান'৩। ফসিলটার যে শুধু একটা পুর্নাংগ চেহারাই রয়েছে তাই নয়, তার দুধের দাঁতগুলো, পায়ের হাড়, এমনকি আঙ্গুলগুলো পর্যন্ত ফসিলে পরিণত হয়েছে ২। কোন বাচ্চার তো দূরের কথা, পূর্ণাংগ মানুষের এত পুরনো এবং সম্পূর্ণ ফসিল আগে কখনও পাওয়া যায়নি। আমরা মানুষের বিবর্তন নিয়ে লেখা অধ্যায়ে দেখেছিলাম যে বিজ্ঞানীরা লুসিসহ এই প্রজাতির বহু ফসিলই খুঁজে পেয়েছেন। এই আবিষ্কারটির মাধ্যমে এখন বিজ্ঞানীরা মানুষের বিবর্তনের সেই ঊষালগ্নে এই প্রজাতির সন্তানপ্রসব, লালনপালন, শৈশব, বড় হওয়া সহ তাদের জীবনযাত্রার ছবিটা আরও সম্পূর্ণভাবে আঁকতে পারবেন। এ তো শুধু একটা *Australopithecus* শিশুর জীবনের কোন এক মুহুর্তের ছবি নয়, এই ফসিলটা যেনো বিলুপ্তির অতলে হারিয়ে যাওয়া আমাদের এই পূর্বপুরুষ প্রজাতির জীবন প্রবাহকে ছবির ফ্রেমে বেঁধে দিয়েছে।

ভালোই হল 'লুসির সন্তান' এর ফসিলের খবরটা পেয়ে, মানব বিবর্তনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা বাকি ছিল তা একটু হলেও সহজ হয়ে গেল। 'আমাদের গল্প' অধ্যায়ের শেষে বলেছিলাম, মানুষের সামাজিক গঠন, ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ নিয়ে শেষ অধ্যায়ে আরেকটু

বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো। মানুষের বিবর্তনে এগুলো যেরকম গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে তা হয়তো অন্য কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে সেভাবে প্রযোজ্য নয়। আর সেখানেই কি আমাদের প্রজাতির অনন্যতার রহস্যটি লুকিয়ে রয়েছে? এ প্রশ্নটির দেওয়ার আগে বোধ হয় তার আগের প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। বিপুল এই প্রাণীজগতে আমরা কি আসলেই অনন্য? এর উত্তর তো সোজাসাপ্টা 'হ্যা' ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। মানুষ এই প্রকৃতিরই অংশ, অন্যান্য প্রাণীর মতই লাখ লাখ বছর ধরে প্রাকৃর্তিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায়ই তার উৎপত্তি ঘটেছে। কিন্তু বিবর্তনের এই প্রক্রিয়াতেই মানুষের মধ্যে অনন্যসাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটেছে যা প্রকৃতিতে আগে কখনও ঘটতে দেখা যায়নি। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় যে কি ধরণের অভিনব এবং জটিল বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি ঘটতে পারে তা আমরা আগেই দেখেছি। মানুষের বুদ্ধিমত্তার এই অনন্য স্বকীয়তা যেন তারই আরেক বিশেষ সাক্ষ্য বহন করে চলেছে আমাদের সামনে। বর্তমানে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক স্টিভেন পিঙ্কার (তিনি এমআইটি র মস্তিষ্ক এবং বৌদ্ধিক বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক, ভাষা, ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ এবং তার সাথে বিবর্তনবাদের সম্পর্ক, মানুষের মন, সচেতন জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বিখ্যাত) এক সাক্ষাৎকারে মজা করে বলেছিলেন, 'হুট করে দেখলে মানুষের বিবর্তনকে তো অসাধারণ বলেই মনে হয়। যে পদ্ধতি থেকে শামুক, বট গাছ বা মাছের মত জীবের জন্ম হয় তা থেকেই কি করে আবার চাঁদে পৌঁছে যাওয়া, মহাসমুদ্র পাড়ি দেওয়া বা ইন্টারনেটের জন্মদাতা এমন এক বুদ্ধিমান প্রাণীর উৎপত্তি ঘটতে পারে? তাহলে কি কোন স্বর্গীয় স্পর্শ আমাদের মস্তিষ্ককে বিশেষভাবে তৈরি করেছিল? না, আমি তা মনে করি না, কারণ ডারউনের দেওয়া প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া দিয়েই মানুষের বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।' [১]

লুসির প্রজাতির অন্যান্য ফসিলের মতই এই দিকিকা শিশুরও কোমড় থেকে নীচে দ্বীপদী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কিন্তু উপরের সব বৈশিষ্ট্যগুলোই তখনও বনমানুষের মতই রয়ে গেছে। এখান থেকে এবং অন্যান্য আদি মানুষ প্রজাতির ফসিল থেকে বোঝা যায় যে, আমরা আজকে আধুনিক মানুষের যে সব বৈশিষ্ট্যগুলো দেখি তা একদিনে দেখা দেয়নি। পরিষ্কারভাবেই প্রাকৃতিক নির্বাচন এখানে প্রথমে দ্বিপদী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কোমড়ের নীচের অংশের এবং পায়ের গঠনের বিবর্তনকে নির্বাচন করেছে। তারপর ধাপে ধাপে অন্যান্য পরিবর্তনগুলো ঘটেছে লক্ষ লক্ষ বছরের পরিক্রমায়।[২] ব্যাপারটা এমন নয় যে, একটা কোন বিবর্তনের বোতাম টিপে দিলাম বা ম্যাজিকের মত একটা মিউটেশন ঘটে গেল আর আমরা রাতারাতি দুপায়ে ভর করে দাড়িয়ে গেলাম কিংবা কথা বলার শক্তি পেয়ে গেলাম। প্রাকৃতিক নিয়মে চলা বিবর্তন কখনই এভাবে ঘটে না। ঠিক একইভাবে বলা যায় যে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বা মস্তিষ্কের বিবর্তনও ঘটেছিল ধাপে ধাপে বহুকাল ধরে। আসলে শুধু তো মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধিই এখানে একমাত্র নিয়ামক হিসেবে কাজ করেনি। মানুষের বুদ্ধিমত্তা এবং বুদ্ধিদীপ্ত আচরণের পিছনে কাজ করে চলেছে মস্তিষ্কের ভিতরের লক্ষ কোটি স্নায়ু কোষ, তাদের বিশেষ গঠন ও জটিল সমন্বয়। কয়েকশ কোটি স্নায়বিক কোষের সাথে সাথে উন্মেষ ঘটেছে কয়েক হাজার কোটি স্নায়বিক জালিকা দিয়ে তৈরি স্নায়ুতন্ত্রের।[১] প্রায় ৫ লক্ষ বছর ধরে আমরা মানুষের বিভিন্ন প্রজাতির যে ফসিল রেকর্ডগুলো পাচ্ছি তাতে শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তা এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনেরও ধীর এবং ক্রমান্বয়িক বিকাশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। শারীরিকভাবে আধুনিক মানুষের কাছাকাছি প্রজাতির উদ্ভব প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে ঘটলেও বৌদ্ধিকভাবে আধুনিক মানুষের বিবর্তন কিন্তু খুব বেশীদিন আগের কথা নয়। মানব সভ্যতা বলতে আমরা যা বুঝি তার সূচনা হয়েছে এই তো সেদিন, তারপর হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে যেতে যেতে এসে পৌঁছেছে আজকের স্তরে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কিছুই হঠাৎ করে একদিনে টুপ করে আকাশ থেকে পড়েনি। আজকে আমরা যে অকল্পনীয় বুদ্ধিমত্তা দেখে অভিভুত হই তার উৎপত্তি এবং বিকাশ বহু লক্ষ বছর ধরে বিবর্তনের

ইতিহাসের আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে ধাপে ধাপেই ঘটেছে।

দিকিকা শিশুর ফসিলটিতে এক অভাবনীয় কান্ড ঘটেছে। তার মাথার খুলির ভিতরের মস্তিষ্কের নরম অংশগুলো পর্যন্ত পাথরের বুকে ফসিলীভুত হয়ে গেছে। তার মস্তিষ্কের সিটি স্ক্যান থেকে বিজ্ঞানীরা অভুতপূর্ব সব তথ্য খুঁজে পেয়েছেন। বিভিন্ন প্রজাতির মানুষের মস্তিষ্কের বিবর্তনের স্তরগুলো বিজ্ঞানীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখান থেকেই তারা বুঝতে পারবেন প্রথম কখন মানুষের মস্তিষ্ক বড় হতে শুরু করেছিল এবং তা কিভাবে তাদের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থায় প্রভাব ফেলেছিল। আসলে মস্তিষ্কের এই আকার বৃদ্ধির সাথে মানুষের সামগ্রিক বিকাশের এত কিছু জড়িয়ে আছে যে তা নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে সত্যিই অবাক হতে হয়। এর ফলে মানুষ যে শুধু বুদ্ধিমান প্রাণীতে পরিণত হয়েছে তাইই নয়, মায়ের সন্তান প্রসব, লালন পালন, পুরুষ ও নারীর জোড় বাঁধা থেকে শুরু করে সামগ্রিক সামাজিক অবকাঠামোতে বিশাল পরিবর্তন ঘটে গেছে। বিশ লাখ বছর আগে *H. erectus* দের মধ্যেই মস্তিষ্কের আকার বেশ বড় (প্রায় ১০০০ সিসি) হয়ে যেতে দেখা যায়। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এই প্রজাতির মায়েরা এত বড় মস্তিষ্কের শিশুর জন্মদান করতো কিভাবে? তাদের কোমর বা পেলভিক অঞ্চলের যে গঠন তা দিয়ে তো এত বড় মস্তিষ্কসম্পন্ন শিশুর তো জন্ম দেওয়া সম্ভব নয় (ঠিক যেমন আমাদের প্রজাতির পক্ষেও তা সম্ভব নয়)! অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় কোন এক সময় নিশ্চিয়ই সন্তান ধারণ, সন্তান প্রসব, এবং তাদের লালন পালনের প্রক্রিয়ায় এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটেছিল[২]।

মানুষের শিশু অপরিণত অবস্থায় জন্ম লাভ করে, জন্মের সময় তার মস্তিষ্কের আকার যা থাকে তা প্রাপ্তবয়ষ্ক হতে হতে প্রায় ৩ গুণ বড় হয়, জন্মের পর প্রথম বছরেই তা বেড়ে দ্বিগুন হয়ে যায়। একটা শিম্পাজি শিশু জন্মের সময় যেটুকু চলাফেরার ক্ষমতা এবং স্বনির্ভরতা নিয়ে জন্মায় তা মানব শিশুতে দেখা যায় জন্মেরও ১৭ মাস পরে [৪]। মানুষের শিশু যদি আরও পরিণত হয়ে জন্মাতো তাহলে গর্ভাবস্থায়তার মাথার আকারও আরও বড় হত। মায়ের পক্ষে দ্বিপদী গঠন নিয়ে সেই বড় মাথাওয়ালা শিশুর জন্ম দেওয়া সম্ভব হত না [৫]। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এ রকম, বিবর্তনের ধারায় কোন এক সময়ে যদি এই অপরিণত শিশুর জন্মের ব্যাপারটা নির্বাচিত না হত তাহলে মানুষের মস্তিষ্কও পরে এত বড় হওয়ার সুযোগ পেত না। আসলে এই পরিবর্তনটির ফলেই পরবর্তী কয়েক লক্ষ বছরের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষের মস্তিষ্কের আকার দ্বিগুণ হতে পেরেছে। এই তিন বছর বয়সী দিকিকা শিশুর মস্তিস্কের আকার থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই বয়স পর্যন্ত তার মস্তিষ্কের ক্রমবৃদ্ধি শিম্পাঞ্জির থেকে ধীর গতিতে ঘটেছে। তাহলে খুব অল্প হলেও সেই ৩০-৪০ লাখ বছর আগেই তাদের শৈশব প্রলম্বিত হতে শুরু হয়ে গিয়েছিল[২]। এদিকে আবার সম্পুর্নভাবে দ্বিপদী হওয়ার ফলে তাদের হাত স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল এবং মায়েরা এই অপরিণত শিশুকে দুই হাত দিয়ে কোলে তুলে নিয়ে যত্ন নিতে পেরেছে। তাই দেখা যায়, একসময় মানব শিশু বনমানুষের শিশুদের মত জন্মের পরেই মায়ের পিঠ আঁকড়ে ধরে রাখার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। ফসিলবিদেরা এখনও দিকিকা শিশুর পায়ের আঙ্গুলগুলোকে শিলাস্তর থেকে আলাদা করে উঠতে পারেন নি। তারা আশা করছেন এর পায়ের আঙ্গুলের গঠন থেকেই বোঝা যাবে যে, লুসির প্রজাতির সময় থেকেই শিশুরা মাকে আঁকড়ে ধরে রাখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল নাকি তা আরও পরের কোন প্রজাতিতে ঘটেছিল [২]।

এ তো না হয় গেলো শারীরিক বিবর্তনের অংশটি, চলুন এখন দেখা যাক এই আপরিণত শিশুর জন্ম দেওয়ার ফলে মানুষের বিভিন্ন প্রজাতির সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে কি বিশাল প্রভাব পড়েছিল! অপরিণত শিশুকে বড় করার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন, বাবা মার আরও বেশী সময় দিতে হয় তাকে বড় করে তুলতে। অনেকে মনে করেন যে, সন্তানের এই বিশেষ লালন পালন পদ্ধতির সাথে মানুষের জোড়া

বাঁধা এবং সামাজবদ্ধ হওয়ার একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। মেয়েরা বেশী সময় ঘরে থেকে সন্তান লালন পালন শুরু করে, পুরুষেরা খাওয়া সংগ্রহ করে ঘরে ফেরে। দ্বিপদী হওয়ার ফলে তাদের হাত দু'টো স্বাধীন, তারা বাড়তি খাওয়া হাতে করে নিয়ে আসতে পারে। একজন পুরুষ একজন মেয়ের সাথে দীর্ঘ মেয়াদি সময় ধরে জোড়া বাঁধার ফলে তাদের যৌন সম্পর্কের নিশ্চয়তাও যেমন থাকে আবার অপরিণত শিশুর দেখাশোনার মাধ্যমে তাকে বাঁচিয়ে রাখার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। এদিকে মাংস খেতে শুরু করার পর তাদের আর অরন্যের বা গাছগাছালির উপরও নির্ভর করতে হয় না। তারা যে কোন জায়গায় বসতি স্থাপন করে দুর দুরান্ত থেকে খাওয়া সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে পারে। হাতিয়ারের ব্যবহারও কিন্তু এক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে। বিজ্ঞানীরা ২০ লক্ষ বছরেরও বেশী পুরনো ফসিলের সাথে বিভিন্ন ধরনের সরল হাতিয়ায়ের সন্ধান পেয়েছেন। এইসব জায়গায় ফসিলীভুত বিভিন্ন জিনিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে মানুষের আদি পূর্বপুরুষেরা তখন শিকার করতে শুরু করেছিল। এই সরল হাতিয়ারগুলোর উন্নতি ঘটতে দেখা যায় ১৫-১৭ লক্ষ বছর আগে *H. erectus* প্রজাতির মধ্যে। তবে এই হাতিয়ারগুলোর গঠনে লক্ষ্যনীয় রকমের গুণগত পরিবর্তন দেখা যায় দুই লক্ষ বছর আগে। এদের বিশেষ রকমের ধারালো গঠন দেখে বোঝা যায় যে, এ সময়ে নিশ্চয়ই মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশে এক বিশেষ অগ্রগতি ঘটেছিল। তারা পরিকল্পণা, কার্যকরন এবং তার প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে বুঝতে শুরু করেছিল, কিভাবে হাতিয়ারগুলো বানালে তা দিয়ে নির্দষ্ট কর্ম সম্পাদন করা যাবে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিল।

অন্যান্য প্রাইমেটদের তুলনায় মানুষের খাদ্য ভাগাভাগি করে খাওয়ার অভ্যাসটা কিন্তু বেশ অন্যরকম। মানুষই বোধ হয় একমাত্র প্রাণী যে খাওয়া সংগ্রহ করে নিজে না খেয়ে তার পরিবার বা দলের কাছে পৌছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করে। সমাজবদ্ধতা এখানে তাকে টিকে থাকার জন্য হাজারো রকমের বাড়তি সুবিধা এনে দেয়। বিপদে আপদে তারা একসাথে হয়ে যুদ্ধ করে নিজেদের রক্ষা করতে পারে, হিংস্র বন্য জন্তু শিকার করতে পারে, বেশী করে খাদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়, সন্তান লালন পালনে সুবিধা হয়। এদিকে আগুনের ব্যবহার শেখাটা বোধ হয় মানব ইতিহাসের এক বিশেষ মাইলফলক। সে হিসেবে দেখলে আজকে নাসার মঙ্গল গ্রহে রকেট পাঠানোর চেয়ে একে কোন অংশেই ছোট আবিষ্কার বলা যায় না। আগুন দিয়ে একদিকে সে বিভিন্ন রকমের খাদ্য পুড়িয়ে বা রান্না করে খেতে শিখলো, রকমারী খাদ্যের বিস্তৃতিও বেড়ে গেল বহুগুণ। আবার আগুন দিয়ে দলবদ্ধ হয়ে তারা অন্যান্য প্রাণীর হাত থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে শিখলো। তাদেরকে আর নিরাপত্তার জন্য আর রাতের বেলা গাছে গাছে থাকতে হচ্ছে না। আগুন জালিয়ে উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারার ফলে শুধুমাত্র গরম আবহাওয়ায় বাস করার প্রয়োজনও কমে আসলো, পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন আবহাওয়ায় ছড়িয়ে পড়তে আর বাধা রইলো না। মানুষের ইতিহাসে আমরা দেখেছি যে তারা বিভিন্ন সময়ে আফ্রিকা থেকে বের হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর আনাচে কানাচে। বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য তাদেরকে অভিযোজিত হতে হয়েছে, বেঁচে থাকার জন্য আবিষ্কার করতে হয়েছে নতুন নতুন পদ্ধতির। খুব সম্ভবত *Homo* প্রজাতিগুলোর উদ্ভবের পরই মানুষের মধ্যে এই বিশেষ অভ্যাসগুলো গড়ে উঠতে শুরু করে। ৫ লক্ষ বছরের পুরনো বিভিন্ন ফসিল রেকর্ডে মানুষের ঘর বাঁধা, সমাজবদ্ধ হয়ে থাকা ইত্যাদির পরিষ্কার নিদর্শন পাওয়া যায়। আফ্রিকার কালাহারি মরুভুমিতে স্যান নামের যে প্রাচীন শিকারী উপজাতি রয়েছে তাদের মধ্যে এখনও এ ধরণের দল দেখতে পাওয়া যায় [৬]। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, এই ধরণের বিভিন্ন অভ্যাস, ব্যবহার, সামাজিক ব্যবস্থাগুলো একদিনে গড়ে ওঠেনি। শারীরিক এবং বৌদ্ধিক বিবর্তনের সাথে সাথে এদেরও বিকাশ ঘটেছে ধীর গতিতে, একেক সময়ে, একেক ভাবে।

ভাষার উৎপত্তি মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এর ফলে তার বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক

এবং সামাজিক জীবনে এক অভিনব অধ্যায়ের সুচনা হয়েছে যা আর কোন প্রাণীর মধ্যে ঘটতে দেখা যায় না। অনেকেই মনে করেন যে ভাষার উৎপত্তিই মানুষের স্বকীয়তার অন্যতম প্রধান কারণ। ঠিক কোন সময় ভাষার উৎপত্তি ঘটেছিল তা এখনও আমরা সঠিকভাবে জানি না। শব্দ, বাক্য কিংবা ভাষা তো আর ফসিলীভুত হয় না তাই তার বিবর্তনের ইতিহাস খুঁজে বের করা বেশ কঠিন। তবে বিজ্ঞানীরা কিছু জিনের সন্ধান পেয়েছেন যারা মানুষের কথা বলা, ভাষার সমন্বয় ইত্যাদিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। এই জিনগুলোর কাজ এবং উৎপত্তির সময়সীমা জানতে পারলে হয়তো আমরা সহজেই ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কেও আরও ভালো ধারণা পেতে সক্ষম হব। তবে ভাষার ব্যবহারের জন্য যে শুধু মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের বিশেষ বিকাশই দরকার তাইই নয়, গলার ভিতরও এক ধরণের বিশেষ গঠনের প্রয়োজন। শিম্পাঞ্জি বা বনমানুষের মধ্যে এই পরিবর্তনটি ঘটেনি, আর তাই তাদেরকে কিছু শব্দ শেখানো গেলেও তারা আমাদের মত ভাষার ব্যাপক ব্যবহার করতে সক্ষম নয়[৭]। আমাদের এই সদ্য পাওয়া দিকিকা শিশুর ফসিলটিতেও ভাষার জন্য প্রয়োজনীয় গঠনটি দেখা যায় না [২]। অর্থাৎ, ভাষার জন্য যে মিউটেশন বা মিউটেশনগুলোর প্রয়োজন ছিল সেগুলো নিশ্চয়ই বনমানুষদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার অনেক পরে ঘটেছে। তবে এটা বোধ হয় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আধুনিক প্রজাতির মানুষেরা ৫০-৭০ হাজার বছর আগে আফ্রিকা থেকে বেড়িয়ে পড়ার আগেই তাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটির বিবর্তন ঘটেছিল[১]। কারণ আপনি পৃথিবীর যে কোন জায়গা বা জাতি থেকে কয়েকটি শিশুকে একেবারে ছোটবেলায় নিয়ে এসে বড় করলে দেখবেন যে তারা একই ভাষায় একই রকম উচ্চারণে কথা বলতে শিখছে, ভাষা শেখার ক্ষমতা তাদের একেবারেই একরকম।

বর্ণভেদ (racism) কি ন্যায়সংগত?

না। সাড়া পৃথিবী জুড়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিকভাবে জাতভেদ, বর্ণভেদের ভিত্তিতে যে বৈষম্য তৈরি করে রাখা হয়েছে তা আসলে ভিত্তিহীন। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস বলছে আমরা সবাই একই প্রজাতি থেকে উদ্ভুত হয়ে মাত্র ৫০-৭০ হাজার বছর আগে আফ্রিকা থেকে সাড়া পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছি। আমরা গায়ের রং, চুলের রং বা নাক মুখের গড়ণে যে বাহ্যিক পার্থক্য দেখি তা ভৌগলিকভাবে বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার ফল। ভৌগলিকভাবে বিভিন্ন জাতির অস্তিত্ব রয়েছে সেটা ঠিক কিন্তু বংশগতীয়ভাবে জাতি, বর্ণ বা Race এর ভেদাভেদ বলতে যা বোঝায় তা আমাদের প্রজাতির মধ্যে নেই। আমাদের জিন পুলে পার্থক্য এতই নগন্য এবং একজনের সাথে আরেকজনের জিনে পার্থক্য এতই কম যে কোন দল বা গোষ্ঠিকে আলাদা কোন জাত বা বর্ণে ভাগ করা যায় না। এ ছাড়া আমাদের প্রজাতির কোন দল বা গোষ্ঠীই প্রজননতভাবে একে অন্যের থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় বিচ্ছিন্ন ছিল না যে তাদের থেকে নতুন উপ-প্রজাতি বা বর্ণের উৎপত্তি ঘটতে পারে[১]। আজকে যদি অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, নাজেরিয়া বা নরওয়ে, আমেরিকা বা পেরুর সদ্য জন্মানো শিশুকে একসাথে একইভাবে বড় করা হয় তাহলে তারা বাহ্যিকভাবে দেখতে কিছুটা অন্যরকম হলেও তাদের ভাষা, ব্যবহার (স্বাতন্ত্রতা বা প্রকারণের কারণে একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে যতটুকু পার্থক্য দেখা যেতে পারে তার চেয়ে বেশি পার্থক্য দেখা যাবে না) সব কিছুই একইরকম হবে। পৃথিবীর কোন জাতির মানুষের মধ্যেই যৌন প্রজননেও কোন সমস্যা দেখা যায় না। এর সব কিছু থেকেই প্রমাণিত হয় যে আমরা একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। ভেবে দেখুন তো, আমরা আমাদের সংকীর্ন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বর্ণভেদ সৃষ্টি করে মানুষে মানুষে সামাজিক বৈষম্য তৈরি করার চেস্টা করি, কিন্তু আজকে যদি নিয়ান্ডারথাল প্রজাতি বা লুসিদের মত মানুষ ও শিম্পাঞ্জির মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রজাতিরা পৃথিবীতে টিকে থাকতো তাদেরকে আমরা কোন চোখে দেখতাম?

তবে স্টিভেন পিঙ্কারের মত অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন যে ভাষার মত জটিল একটা ব্যাপার একদিনে বিবর্তিত হয়নি, এর বিবর্তন ঘটতেও দীর্ঘ সময় লেগেছিল। সম্ভবত মানুষের মস্তিষ্কের বিবর্তন, সামাজিক আদানপ্রদান, পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে বৌদ্ধিক জ্ঞান এবং ভাষার উন্মেষের মত বৈশিষ্ট্যগুলো এক জটিল

প্রক্রিয়ার। এরা একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, একটার হাত ধরে আরেকটা আরও উন্নত হয়েছে।

আমরা এখন সহজাতভাবেই কথা বলি, কিন্তু একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে, ভাষা মানুষের বুদ্ধিমত্তা এবং সাংস্কৃতিক বিকাশে কি বিশাল ভুমিকা রেখেছে। ভাষার উৎপত্তির কারণেই আমরা ভাব বিনিময় করতে পারি, একজন আরেকজনের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারি, অতীত প্রজন্মগুলো থেকে শেখা বিশাল জ্ঞানভান্ডারকে পরের প্রজন্মে সঞ্চালিত করতে পারি। শুধু তো তাই নয়, ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করতে পারি, নিজেদের ভালো মন্দ নিয়ে আলোচনা করতে পারি, নিজেদের দল বা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য গল্প, উপাখ্যান, ধর্মীয় বিধি নিষেধ তৈরি করতে পারি। লিখিত ভাষা আবিষ্কারের অনেক আগেই আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের অভিজ্ঞাতাকে ছড়িয়ে দিত প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে গল্প কথা কাহিনীর মাধ্যমে। মানুষের শৈশবকালও অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে অনেক দীর্ঘ, তার ফলে সে তার পারিপার্শ্বিকতা থেকে, সামাজিক আভিজ্ঞতাগুলো থেকে শিখতেও পারে অনেক বেশী। এদিকে আবার ভাষা এবং ভাব বিনিময়ের ব্যাপক বিকাশের ফলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের তথ্য বা স্মৃতি সংরক্ষণের ক্ষমতারও বিশেষ বিবর্তন ঘটেছে, আরও বড় এবং উন্নত হয়েছে মস্তিষ্ক। এর ফলশ্রুতিতেই মানুষের মধ্যে সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বৌদ্ধিক চর্চার ক্ষমতা গড়ে ওঠে [৫]। গত প্রায় এক লক্ষ বছরে মানুষের তেমন কোন শারিরীক বিবর্তন না ঘটলেও সাস্কৃতিকভাবে সে এই পৃথিবীর বিবর্তনের ইতিহাসে এক সরব বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে।

পশুপালন এবং কৃষি এই সাংস্কৃতিক বিকাশকে উত্তরিত করেছে আরেক স্তরে। মাত্র ১০ হাজার বছর আগে কৃষির উদ্ভবের ফলেই প্রথমবারের মত মানুষ বাড়তি খাদ্য উৎপাদন করতে শেখে। আর তার ফলশ্রুতিতেই মানুষের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে দ্রুত গতিতে, গড়ে উঠে স্থিতিশীল গ্রামভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। সমাজের এক অংশ কৃষিকাজের মাধ্যমে বাড়তি খাদ্যের যোগান দিতে পারায় অন্যরা রাজনীতি, ধর্ম, শিল্পকলা চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হয়, ধীরে ধীরে তৈরি হয় শহরকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার। বাড়তি খাদ্যের কারণেই সামাজিক শ্রমবিভাগ সম্ভব হয়, গড়ে উঠতে শুরু করে জাত, ধর্ম, প্রথা এবং শ্রেনীর ভেদাভেদ। মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মত গড়ে ওঠে সভ্যতা। জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সাংস্কৃতিক বিকাশের যেন জোয়ার বয়ে যেতে শুরু করে পৃথিবী জুড়ে [৬]। রিচার্ড ডকিন্স থেকে শুরু করে অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, মানব বিবর্তনের ইতিহাসে এই সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, একে বাদ দিয়ে মানুষের বিবর্তনের গল্প সম্পূর্ণ হতে পারে না। মস্তিষ্কসহ অন্যান্য শারীরিক বিবর্তন যেমন এই সাংস্কৃতিক বিকাশের সোপান হিসেবে কাজ করেছে তেমনি এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশও আমাদের সামগ্রিক বিবর্তনকে প্রভাবিত করেছে। গত তিরিশ বছরে মানুষের একটাই উল্লেখযোগ্য বিবর্তন ঘটেছে, তাদের হাড় এবং কঙ্কালের গঠন অনেক হাল্কা এবং সরু হয়ে গিয়েছে। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ফলে মানুষ যতই উন্নত ধরণের হাতিয়ার, প্রযুক্তি, এবং খাদ্য উৎপাদনের পদ্ধতি শিখেছে ততই কমে এসেছে শারীরিকভাবে ভারী এবং চ্যালেঞ্জিং কাজের পরিমাণ, আর তাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় বিবর্তন ঘটেছে অপেক্ষাকৃত হাল্কা গড়নের।

উপরে বলা বৈশিষ্ট্যগুলোই আমাদেরকে আলাদা করে দিয়েছে প্রকৃতির অন্যান্য প্রাণীদের থেকে। মানুষ 'কারণ এবং ফলাফল' সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, আমরা আমাদের অতীত থেকে শিখতে পারি, ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করতে পারি। আমরা প্রকৃতির উপর তো পুরোপুরি নির্ভরশীল নইই বরং সাধ্যমত প্রকৃতিকে বদলে নিতে পারি নিজেদের প্রয়োজনে। অন্যান্য প্রাণীরা প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নিজেদের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলোকে ইচ্ছে করলেই বদলাতে পারে না। তাদের নির্ভর করতে হয়

দীর্ঘ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে আরও যোগ্যতর বৈশিষ্ট্যগুলোর বিবর্তনের উপর। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তো ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়। আমরাই একমাত্র প্রাণী যারা আমাদের পারিপার্শ্বিকতাকে নিজের মত করে সাজিয়ে নিতে পারি, বদলে দিতে পারি, প্রয়োজনে ধ্বংসও করতে পারি। আমাদের শিশুদের জন্ম এবং টিকে থাকা অনেকটাই এখন আর প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল নয়।

সামাজিক ডারউইনবাদ আর প্রাকৃতিক বিবর্তনবাদ কি এক?

না মোটেই তা নয়। ভিক্টোরিয়ান যুগে সামাজিক ডারউইনবাদের (Social Darwinism) উদ্ভব ঘটান হার্বার্ট স্পেনসার নামের এক দার্শনিক, যা ডারউইন প্রদত্ত বিবর্তন তত্ত্ব থেকে একেবারেই আলাদা। স্পেন্সর ডারউইন কথিত জীবন সংগ্রাম (struggle for life)কে বিকৃত করে 'যোগ্যতমের বিজয়' (survival of fittest) শব্দগুচ্ছ সামাজিক জীবনে ব্যবহার করে বিবর্তনে একটি অপলাপমূলক ধারণার আমদানী করেন। স্পেনসারের দর্শনের মূল নির্যাসটি ছিল - 'might is right'। তিনি প্রচারণা চালান যে, গরীবদের উপর ধনীদের নিরন্তর শোষণ কিংবা শক্তিহীনদের উপর শক্তিমানদের দর্প এগুলো নিতান্তই প্রাকৃতিক ব্যাপার। প্রাকৃতিকভাবে বিবর্তনের ফলশ্রুতিতেই এগুলো ঘটছে, তাই এগুলোর সামাজিক প্রয়োগও যৌক্তিক। এ ধরনের বিভ্রান্তকারী দর্শনের ফলশ্রুতিতেই পরবর্তীতে বিভিন্ন শাষকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে ঔপনিবেশিকতাবাদ, জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্যকে বৈধতা দান করতে সচেস্ট হয়েছিলেন বিভিন্ন সময়। হিটলার তার নাৎসীবাদের সমর্থনে একে ব্যবহার করেন। ১৯৩০ সালে আমেরিকার ২৪ টি রাষ্ট্রে 'বন্ধ্যাকরণ আইন' পাশ করা হয়, উদ্দেশ্য ছিল জনপুঞ্জে 'অনাকাঙ্খিত' এবং 'অনুপযুক্ত' দুর্বল পিতামাতার জিনের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। অর্থাৎ 'সামাজিকভাবে ডারউইনবাদের প্রয়োগ'-এর মাধ্যমে 'যোগ্যতমের বিজয়' নানা ধরণের নৈরাজ্যজনক প্রতিক্রিয়শীলতার জন্ম দিয়েছিল, আর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল, যা থেকে অনেকে এখনও মুক্তি পায় নি। কিন্তু সত্যি বলতে কি- ডারউইন কখনওই এধরনের 'যোগ্যতমের বিজয়'-এর কথা বলেন নি, কিংবা তার প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বকে কখনই সামাজিকজীবনে প্রয়োগ করার কথা ভাবেননি। কাজেই এ ধরনের বর্ণবাদী তত্ত্বের সাথে ডারউইন বা তত্ত্বকে জড়ানো নিতান্তই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

প্রকৃতিতে কিছু ঘটে বলেই তা সামাজিক জীবনেও প্রয়োগ করা উচিৎ - এ ধরণের চিন্তাধারা এক ধরনের কুযুক্তি বা হেত্বাভাস (fallacy)। হেত্বাভাসটির পুঁথিগত নাম হল - 'প্রকৃতির দোহাই' (Naturalistic fallacy)। প্রাকৃতিক নির্বাচন আসলে প্রকৃতিতে প্রজাতির প্রতিযোগিতার মাধ্যমে টিকে থাকার কিংবা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথাই শুধু ব্যাখা করছে - সামাজিক জীবনে এর প্রয়োগের 'ঔচিত্য' নিয়ে কখনোই মাথা ঘামাচ্ছে না। প্রকৃতিতে কিছু ঘটার অর্থ এই নয় যে তা সামাজিকভাবেও প্রয়োগ করতে হবে। আর তা ছাড়া বিবর্তনবাদের মুল বিষয়বস্ত ভালো করে বুঝলে দেখা যায় যে এর সাথে স্পেনসারের দেওয়া মতবাদের কোন সম্পর্কই নেই। প্রকৃতিতে কেবল নিরন্তর প্রতিযোগিতাই চলছে না, বরং বিভিন্ন ধরণের পারষ্পিক সহযোগিতা, মিথোজীবীতা কিংবা সহ-বিবর্তনও বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। জীবের টিকে থাকার জন্য এগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অথচ, সামাজিক বিবর্তনবাদে এই ব্যাপারগুলো অস্বীকার করে কেবল 'যোগ্যতমের বিজয়'-এর কথাই কেবল সোচ্চারে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল, বিবর্তন ঘটার জন্য প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরণের প্রকারণ অবশ্য প্রয়োজনীয়। জনপুঞ্জে জেনেটিক প্রকারণ না থাকলে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া কাজই করতে পারবে না। কিন্তু সামাজিক ডারউইনবাদের প্রবক্তারা জোর করে 'অনাকাঙ্খিত' জিনকে হটিয়ে দিয়ে প্রকারণকে দূর করার জন্য তৎপর হয়েছিলেন। এ জন্য বহু আগেই 'সামাজিক ডারউইনবাদ' সচেতন বৈজ্ঞানিক মহাল থেকে পরিত্যক্ত হয়েছে। অনেকেই অজ্ঞতার কারণে এখনো ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাথে পরিত্যক্ত সামাজিক বিবর্তনবাদকে গুলিয়ে ফেলেন।

মানব পিতামাতারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে, কখন কয়টি শিশুর জন্ম হবে, কিভাবে অত্যাধুনিক চিকিৎসা, খাদ্যাভ্যাস, নিরাপত্তা ইত্যাদি নিশ্চিত করার মাধ্যমে তারা টিকে থাকতে পারবে (যদিও তা আপনি অর্থনৈতিকভাবে কোন শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত তার উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল)। আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় আজকে আমরা রোগ প্রতিরোধ করতে পারছি, বার্ধক্যের সাথে যুদ্ধ করে আমাদের আয়ু বাড়িয়ে চলেছি,

জন্ম নিয়ন্ত্রন করছি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের সুখ স্বাচ্ছ্যন্দের জন্য প্রয়োজন এমন সব প্রাণী এবং উদ্ভিদের বিকাশ ঘটাচ্ছি, এমনকি নতুন নতুন প্রজাতির পর্যন্ত উদ্ভব ঘটাচ্ছি, বাকীদের এগিয়ে দিচ্ছি বিলুপ্তির পথে। একে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাথে টেক্কা দেওয়া ছাড়া আর কি বলবেন? গত কয়েকশ বছরে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়ে আমরা নিজেদের স্বার্থে প্রকৃতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে শুরু করেছি। পৃথিবীব্যাপী রাজনৈতিক ক্ষমতাধারী অংশগুলো বিজ্ঞানের আধুনিকতম প্রযুক্তি ব্যবহার করে মারনাস্ত্র, জীবানু অস্ত্র, নিউক্লিয়ার বোমা বানানোর খেলায় মেতে উঠলেও প্রকৃতিকে রক্ষা করার বিজ্ঞানটি নিয়ে কিন্তু তাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। আমাদের বোঝা দরকার যে, মানুষের এই বুদ্ধিবৃত্তি এবং অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণেই আজ আমাদের উপর বর্তে গেছে আর এক গুরুদায়িত্ব। প্রকৃতিকে বদলে ফেলার ক্ষমতার পাশে পাশে নিজেদের টিকে থাকার স্বার্থেই তাকে রক্ষা করার দায়িত্বও এসে পড়েছে আমাদেরই উপর। নিজেদের টিকে থাকার জন্য ক্রমাগতভাবে প্রকৃতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিলে তো আমাদের ধ্বংসই অনিবার্য হয়ে উঠবে! ডঃ আর্নেষ্ট মায়ার তার 'Evolution' বইতে লিখছিলেন, মানুষের এই বৌদ্ধিক বিকাশ একদিকে যেমন তার গর্ব, আরেকদিকে সেটাই তার বোঝা। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় কথাটার তাৎপর্য কত গভীর।

আমরা আগেই দেখেছি, বিবর্তন তত্ত্বকে আলাদা করে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে রেখে বিচার করলে এর সামগ্রিকতাকে বোঝা সম্ভব নয়। বিবর্তনবাদ আজকে শুধু একটা যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই নয়, এ আমাদের চিরায়ত চিন্তাভাবনা, দর্শন, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার খুঁটি ধরে নাড়া দিয়েছে। মানুষের চৈতন্য এবং বৌদ্ধিক জগতে যেন বিপ্লবের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে এই মতবাদটি! মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই প্রথম সে মুক্তি পেতে যাচ্ছে তার নিজেরই তৈরি কাল্পনিক সৃষ্টিতত্ত্বের ধোঁয়াজাল থেকে! তাই এর বিপক্ষে বিরোধিতার পরিমাণটাও যে তীব্র হবে তা তো সহজেই বোধগম্য! সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে বিবর্তনবাদের বা ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বটা খুব সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু এর পিছনে রাজনৈতিক এবং সামাজিক যে শক্তিগুলো কাজ করে তা হয়তো অনেক সময় আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। প্রবল ক্ষমতাধারী মধ্যযুগীয় চার্চ যখন ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারে আর গ্যালিলিওকে বলে কোপার্নিকাসীয় সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বের কথা প্রচার করা যাবে না, তার সাথে আজকের ক্ষমতাধারী রক্ষণশীলদের (যেমন ধরুন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ যখন বলে আইডিকে বিজ্ঞান হিসেবে পড়ানো উচিত) বিবর্তনবাদের তীব্র বিরোধিতার মিলটা কোথায় তা একটু ভালোভাবে খেয়াল করলেই স্পষ্ট ওঠে। পরিবেশ, পরিস্থিতি, প্রেক্ষাপট হয়তো বদলেছে, ইচ্ছে করলেই হয়তো তারা আর বিজ্ঞানীদের পুড়িয়ে মারতে পারে না, কিন্তু শক্তিশালী অদৃশ্য হাতগুলো তখন যেভাবে কাজ করেছিল এখনও কিন্তু তারা একইভাবে কলকাঠি নেড়ে চলেছে। তাই হাজার হাজার বছর ধরে বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের দ্বন্দ্বকে বুঝতে হলে কিংবা আজকের আমেরিকায় বিবর্তনবাদ বিরোধী রক্ষণশীল আইডি প্রবক্তাদের ক্ষমতা ঠিকমতভাবে বুঝতে হলে এর পিছনের সামগ্রিকতাকেও উপলব্ধি করা দরকার। আমরা জানি প্রাচীন গ্রীক দর্শন এবং রোমান সাম্রাজ্যের রাজনীতি কিভাবে খ্রীষ্ট ধর্মের উত্থান এবং বিস্তারকে নিয়ন্ত্রণ করেছে - ইতিহাস ঘেটে দেখলে অন্যান্য ধর্মগুলোর ক্ষেত্রেও একই রকমের ঘটনা দেখা যায়। বুদ্ধিমান মানব প্রজাতি সভ্যতার যে জটিল কাঠামো তৈরি করেছে তাকে তার সামগ্রিকতায় ফেলে বিচার করতে হবে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো কিভাবে ধর্ম এবং সৃষ্টিতত্ত্বকে নিয়ন্ত্রিত করেছে তা গভীরভাবে বুঝতে হবে। তাহলেই আমরা বিবর্তনবাদ এবং সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের বিরোধিতাকারী এই অন্ধ, ধর্মীয় রক্ষণশীল শক্তিশালী অংশটির বিরুদ্ধে সঠিক অবস্থানে দাঁড়াতে পারবো।

অনেকেই মনে করেন মানুষকে কেন্দ্রে বসিয়ে প্রচলিত বিধি বিধান অনুযায়ী জীবন না চলালে নাকি মানব

সভ্যতার মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে যাবে। বিবর্তনবাদ নাকি মানুষকে অবক্ষয়ের পথে ঠেলে দিচ্ছে! ব্যাপারটা যেনো এরকম যে ডারউইন বিবর্তনের তত্ত্ব দেওয়ার আগে পৃথিবীতে অনৈতিক ব্যাপারগুলোর অস্তিত্ব ছিল না। মানুষের আর বেঁচে থাকার, ভালো কাজ করার কোন অনুপ্রেরণা থাকবে না। কিন্তু ব্যাপারটা কি আসলে ঠিক তার উলটো নয়? অনেকেই আমাদের নিজেদের কল্পনায় বানানো এই 'সৃষ্টি'র মহত্ত্বকে ত্যাগ করতে ভয় পান - কিন্তু ভেবে দেখুন তো আজকে আমরা যতই নিজেদের সম্পর্কে জানতে পারছি, যতই বুঝতে পারছি যে 'আমরা প্রকৃতিরই একটা অংশ মাত্র, কেউ আমাদেরকে বিশেষভাবে পরিকল্পনা করে বানায়নি, কেউ আমাদের সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে এই মহাবিশ্বকে সাজায়নি' ততই কি আমাদের চিন্তার পরিসর বিস্তৃত হচ্ছে না, দায়িত্বশীল হওয়ার দায় বেড়ে যাচ্ছে না? হয়তো সারাটা মহাবিশ্বই পড়ে রয়েছে আমাদের বুদ্ধিদীপ্ত পদচারণার অপেক্ষায় - হয়তো এরকম আরও মহাবিশ্বের পর মহাবিশ্ব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, হয়তো আমাদের মত জীবনের সমারোহে, প্রাণের স্পন্দনে মুখরিত হয়ে আছে আরও অনেক বিশ্ব! কিংবা কে জানে, হয়তো বা আমরা ছাড়া আর কোন বুদ্ধিমান প্রাণীরই উদ্ভব ঘটেনি অন্য কোথাও! অতিকায় ডায়নোসররা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কেউ তো একবারও ফিরে তাকায়নি; কয়েকশো কোটি বছরের যাত্রাপথে আরও কোটি কোটি প্রজাতি বিলুপ্তির পথ ধরেছে, প্রকৃতি তো এক ফোটাও চোখের জল ফেলেনি; আমাদের প্রজাতিও হয়তো এক সময় হারিয়ে যেতে পারে প্রাকৃতিক নিয়মেই। কেউ তো আমাদেরকে রক্ষা করার পবিত্র দায় নিয়ে বসে নেই। আমাদের নিজের দায়িত্ব আজকে নিজেকেই নিতে হবে, নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই এক সুস্হ মানব সমাজ গড়ে তুলতে হবে, নিজেদের বিলুপ্তি ঠেকাতেই প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবে। নিজেদের অকল্পনীয় বুদ্ধিমত্তার আলোয় বলিষ্ঠ হয়ে 'রহস্যময়' এই 'প্রায় অচেনা' মহাবিশ্বের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হতে হবে। যতদিন পর্যন্ত আর কোন বুদ্ধিমান প্রাণীর সন্ধান না পাওয়া যাচ্ছে, এই টিকে থাকার, বিকশিত হওয়ার, ছড়িয়ে পড়ার প্রাণের মেলায় আমরাই আমাদের সাথী, কান্ডারী এবং ত্রাণকর্তা। ঠিক যেমনটি বলেছিলেন স্টিফেন জে গুল্ড তার *Wonderful Life* (1989) বইটিতেঃ 'আমরা ইতিহাসের সন্তান এবং এই বৈচিত্রময় মহাবিশ্বের বিস্তীর্ণ পরিসরে আমাদের নিজের পথ নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে - এই মহাবিশ্ব আমাদের দুঃখ বেদনার ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন আর তাই আমরা আমাদের সমৃদ্ধির কিংবা পতনের ব্যাপারে সম্পুর্ণভাবে স্বাধীন। আমরা কোন পথ বেছে নেব তার উপরই নির্ভর করছে আমাদের সমৃদ্ধি বা পতনের সম্ভাবনা।'

বিবর্তনবাদ এক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী। গত পাঁচশ বছরে হাজার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হলেও মাত্র দু'টি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন বা paradigm shift এ ভুমিকা রেখেছে। এর প্রথমটি হচ্ছে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব এবং আরেকটি হচ্ছে ডারউনের দেওয়া এই বিবর্তনবাদ। আমাদের চারপাশের প্রকৃতি এবং প্রাণ সংক্রান্ত সব বিজ্ঞানের বুনিয়াদ বিবর্তন তত্ত্ব। আপনি আপনার চারপাশের সব কিছুকে অনড়, স্থির এবং অপরিবর্তনীয় হিসেবে দেখবেন নাকি তার সদা গতিময় বিবর্তনের সাথী হয়ে মানব সভ্যতাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন সেটাই এখন বিবেচ্য বিষয়। বিজ্ঞান কি সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলেছে, না দেয় নি। আমরা এখনও জানি না অনেক কিছুই, কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে বিরতিহীনভাবে সামনের দিকে। কিন্তু এই অজানাকে জানার জন্য, তাকে বোঝার জন্য স্থবির নয় বরং প্রয়োজন খোলা মনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর। সমাজের বহুদিনের চিন্তার অচলায়তন ভেঙ্গে বেড়িয়ে আসাটা আমার, আপনার, আমাদের ভবিষৎ প্রজন্মের জন্যই তা প্রয়োজন। যুগে যুগে এভাবেই এগিয়েছে আমাদের মানব সভ্যতা; ক্রমাগত পরিবর্তন, স্বার্থান্বেষী প্রতিক্রিয়াশীল অংশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং পুরোনকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণায় দীক্ষিত হয়ে নতুনকে গ্রহণ করার মাধ্যমে।

তথ্যসুত্রঃ

১. Pinker, S. Evolution Of Mind, 2003, pbs.org
http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/07/2/l_072_03.html

২) Wong, K. Dec 2006 edition, Lucy's Baby, Scientific American Magazine

৩) Sloan, C. Nov 2006 edition, Meet the Dikika Baby, National Geographic Magazine.

৪) Skybreak, A. 2006, The Science of Evolution and The Myth Of Creationism, Insight Press, Illinois, USA.

৫) Mayr E, 2004, What Evolution Is, Basic Books, NY, USA

৬) Early Human Phylogeny Tree, Smithsonian National Museum of Natural History
http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/ha/a_tree.html

৭) Stringer, C and Andrews, P, 2005, The complete Wrold of Human Evolution, Thames and Hudson Ltd, London.

পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

{বন্যা আহমেদের *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটি অবসর প্রকাশনী থেকে ২০০৭ এর একুশে বইমেলায় প্রকাশিতব্য। এই অংশটি বইটির একাদশ অধ্যায়।}

দশম অধ্যায়

ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন : সৃষ্টিতত্ত্বের বিবর্তন

অভিজিৎ রায় এবং বন্যা আহমেদ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পর

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আবারও কোর্ট কাচারি পর্যন্তই গড়ালো, যদিও আমেরিকার জন্য সেটা নতুন কোন ব্যাপারই নয়। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ডোভার শহরের সরকারী স্কুল বোর্ড বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে বিবর্তনবাদের পাশাপাশি সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প বা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন (আইডি) পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলে সেখানকার আভিভাবকেরা তার বিরুদ্ধে মামলা করতে বাধ্য হন। কোর্টের জজ *জন ই. জোন্স* বিস্তারিতভাবে আইডির প্রবক্তা এবং আইডির বিপক্ষে দাঁড়ানো প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানীদের বক্তব্য শোনার পর ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে রায় দিলেন - আদালতের সাক্ষী থেকে দেখা যাচ্ছে যে আইডি ধর্ম এবং সৃষ্টিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি মতবাদ, তাই সরকারী কোন স্কুলের পাঠ্যসুচীতে একে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তটি পরিষ্কারভাবে আমেরিকার সাংবিধানিক আইনকে (Establishment Clause, আমেরিকার সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর এই অংশটিতে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে, সরকার কোনভাবেই কোন ধর্মের পক্ষে বা তা প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন আইন তৈরি করবে না) লংঘন করে। জজ সাহেব আরও বললেন, এই মামলা থেকে এও পরিষ্কারভাবে বোঝা গেছে যে, বিবর্তনবাদ একটি যথার্থ বিজ্ঞান এবং তা বৈজ্ঞানিক মহলে বহুলভাবে সমর্থিত, এই তত্ত্বের সাথে কোন আলৌকিক স্রষ্টা আদৌ আছে কি নেই তার কোন দ্বন্দ্ব নেই [১]।

কিন্তু জজ সাহেব বললে কি হবে, আজকে আমেরিকার অত্যন্ত রক্ষণশীল কিন্তু ক্ষমতাবান খ্রীস্টান মৌলবাদী

ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন (আইডি)বলতে কি বুঝায়?

আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ১৯৮৭ সালে এক ঐতিহাসিক রায়ে ‘ক্রিয়েশন সায়েন্স’ বা ধর্মীয় সৃষ্টিতত্তকে ‘অবৈজ্ঞানিক’ এবং ‘রিলিজিয়াস ডগমা’ হিসেবে চিহ্নিত করে দেওয়ার পর পরই সৃষ্টিবাদীরাও বুঝে গিয়েছিলেন যে সেই পুরনো সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে বোধ হয় আর জনসাধারণকে বোকা বানিয়ে রাখা যাবে না। ফলে বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য মূলতঃ তখন থেকেই তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো আরেকটু ‘সফিসটিকেটেড’ তত্ত্বের। সম্প্রতি তাদের পক্ষ থেকে নতুন কিছু যুক্তির অবতারণা করে নতুন মোড়কে ‘সেই একই পুরোন সৃষ্টিতত্ত্ব’কে হাজির করা হয়েছে, যার নাম হচ্ছে সৃষ্টির ‘বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প’ (Intelligent Design argument), বা সংক্ষেপে আইডি। মাইকেল বিহে, উইলিয়াম ডেম্বস্কি, ফিলিপ জনসন, জোনাথন ওয়েলসসহ প্রবক্তাদের সকলেই মোটা অঙ্কের অর্থপুস্ট রক্ষণশীল খ্রীস্টান সংগঠন *ডিস্কভারি ইন্সটিটিউটের* (Discovery Institute) সাথে যুক্ত। এঁদের যুক্তি হল, আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ড এবং সর্বোপরি জৈব জীবন এতই জটিল এবং অনন্যসাধারণ যে প্রাকৃতিক উপায়ে সেগুলো উদ্ভুত হতে পারে না, এবং এর পেছনে এক বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনাকারীর পরিকল্পনার ছাপ আছে। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা মহাবিশ্ব এবং পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির পিছনে খ্রীষ্টিয় ঈশ্বর জড়িত থাকবার ব্যাপারটা মুখ ফুটে সরাসরি না বললেও তাদের বিভিন্ন লেখালখিতে তা সুস্পস্টভাবে ফুটে ওঠে। তারা বলেন, বৈজ্ঞানিক ডেটা বা উপাত্তগুলো শুধু প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় কিংবা উচিৎ ও নয়, এগুলোকে সঠিকভাবে বোঝা যাবে তখনই, যখন এক সৃজনশীল সজ্ঞাত সত্ত্বার (intelligent agent) সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের আলোকে এগুলোকে দেখার চেষ্টা এবং বিশ্লেষণ করা হবে। এই ‘আইডি’ ইদানিংকালে কারো কারো কাছে এতটাই গুরুত্ব পেয়েছে যে, তাঁরা অনেকেই এই তত্ত্বটিকে বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত করে (মুলতঃ ডারউইনীয় বিবর্তনের বিকল্প হিসেবে) স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে চান, এবং এ নিয়ে আমারিকায় আন্দোলনও শুরু করেছেন।

অংশ এবং সরকার তো তা বলছে না। এই তো সেদিনও তাদের প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ দিব্যি বলে দিলেন যে, স্কুলে আইডি এবং বিবর্তন দুটোই নাকি সমানভাবে পড়ানো উচিত। *সাইন্টিফিক আমেরিকান* জার্নালের অকটোবর, ২০০৬ সংখ্যার এক জরিপে দেখা যাচ্ছে যে, এদেশের রক্ষণশীল রিপাবলিকান দলের ৬০%ই হচ্ছে সৃষ্টিতত্ত্ববাদী এবং মাত্র ১১% বিবর্তনবাদে আস্থা রাখে, আর ওদিকে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে ২৯% সৃষ্টিতত্ত্ববাদী এবং ৪৪% বিবর্তনবাদকে সঠিক বলে স্বীকার করে। উদারনৈতিক (liberal) প্রগতিশীল আমেরিকানদের মধ্যে ৬৩%, কিন্তু রক্ষণশীল অংশের মাত্র ৩৭% বির্বতনবাদকে মেনে নিয়েছে। বিজ্ঞানের সঠিকতা কি তবে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চেই নির্ধারিত হবে? কিন্তু অন্য কোন বৈজ্ঞানিক আবিস্কার যেমন বিদ্যুৎ, চুম্বকত্ব, টেলিস্কোপ থেকে শুরু করে মাধ্যাকর্ষণ, আপেক্ষিক তত্ত্ব কিংবা বিগ ব্যাং- কোনটিকে প্রতিষ্ঠিত করতেই কিন্তু রাজনৈতিক দলের কিংবা ধর্মীয় গোষ্ঠীর করুণা বা সম্মতির দরকার পড়েনি! সাম্প্রতিক একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে আমেরিকার জনগণের ৮২ শতাংশ সত্যিকারের স্বর্গে বিশ্বাস করে, এমনকি শতকরা ৫১ ভাগ ভুতে পর্যন্ত বিশ্বাস করে, আর সে তুলনায় বিবর্তনের মত বৈজ্ঞানিক একটি তত্ত্বে বিশ্বাস করে মাত্র শতকরা ২৮ ভাগ লোক [২]। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনের নভেম্বর, ২০০4 সংখ্যায় প্রকাশিত 'Was Darwin Wrong?' প্রবন্ধ থেকে দেখা যায় যে, ৪৫% আমেরিকান এখনও মনে করে যে, সৃষ্টিকর্তা গত ১০ হাজার বছরে কোন এক সময়ে মানুষকে এভাবেই বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানী ডগলাস ফুটুইমা তার 'Evolution' বইয়ে লিখেছেন যে, শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশী আমেরিকান এখনও মানুষের বিবর্তনে বিশ্বাস করে না, অথচ ওদিকে ইউরোপের বেশিরভাগ মানুষ বিবর্তনবাদকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞানে এত অগ্রসর বলে কথিত আমেরিকানদের বিবর্তন সম্পর্কে আস্থার অবস্থা দেখে ইউরোপবাসীর অনেকেই নাকি বিস্মিত না হয়ে পারে না [৩]। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সামন্ততান্ত্রিক রক্ষণশীল চার্চ্চের সাথে বিজ্ঞানের দন্দ্ব, শিল্প বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, দু'টি বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বব্যাপী উপনিবেশের অবসান ইত্যাদি থেকে পাওয়া শিক্ষার কারণেই হয়তো ইউরোপবাসীরা আজকে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অগ্রসর ভুমিকা নিতে সক্ষম হয়েছে। নিউ সাইন্টিস্ট মাগ্যজিনে বক্তব্য দিতে গিয়ে মিশিগান ইউনিভারসিটির শিক্ষক জন মিলার বলেন যে, (উন্নত দেশগুলোর মধ্যে) আমেরিকাই মনে হয় একমাত্র দেশ যেখানে বিবর্তনবাদ নিয়ে এই রক্ষণশীল ক্ষমতাশালী অংশ রাজনৈতিক খেলায় মেতেছে, পৃথিবীর বেশীরভাগ দেশেই এটা আর কোন ইস্যুই নয় [৪]। বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জেনেটিক্সসহ আধুনিক জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নিত্য নতুন আবিষ্কারের ফলে যেখানে সারা পৃথিবীতে ক্রমশঃ মানুষের মধ্যে বিবর্তনের পক্ষে সমর্থন বাড়ছে সেখানে এই রাজনৈতিক খেলার শিকার হয়ে আমেরিকায় তা কমতির দিকে। খুবই আবাক লাগতে ভাবতে যে, আজকে যদি আমেরিকার সরকার এবং ক্ষমতাশালী অংশের এই অবস্থা হয় তাহলে প্রায় দু'শ বছর আগে এ দেশের প্রতিষ্ঠাতা রাজনীতিবিদেরা কি করে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করতে পেরেছিলো? এখন তো মনে হচ্ছে এদেশের পূর্বসুরীদের অগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গীর কারণেই হয়তো এখনও আমেরিকার স্কুল কলেজে বিজ্ঞান টিকে আছে! তাহলে কি আমরা বলব যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে আমেরিকা ক্রমাগতভাবে উদারনৈতিক অগ্রসরতা থেকে পিছিয়ে পড়ছে? হতেই পারে। তবে আরো একটা জিনিস এখান থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কোন দেশে বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কার ঘটলেই সেখানে বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গড়ে ওঠে না, বিজ্ঞানমনস্কতার জন্য চাই এমন এক সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সচেতন জনগোষ্ঠী যাদের মাধ্যমে রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে জনসাধারণের মাঝে জনপ্রিয় করে তোলার প্রচেস্টা নেওয়া হবে।

এতক্ষণ তো দেখলাম আমেরিকার মত উন্নত দেশে বিবর্তনবাদের কি অবস্থা। ইদানিং কালে শুধু তো আমরিকায়ই নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হারুন ইয়াহিয়াদের (তূর্কী দেশীয়) মত স্বঘোষিত 'বিজ্ঞানী'রাও

আবার আইডি সমর্থন করতে শুরু করেছেন। তারা আইডির সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে নিজেদের সৃষ্টিতত্ত্ব মিলিয়ে বিবর্তনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছেন। আর ওদিকে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কথা বোধ হয় আর না বলাই ভাল। দৈনিক সমকালে কালস্রোত বিভাগে এ বছর (২০০৬ সাল) মাসাধিক কাল ধরে প্রকাশিত হচ্ছে হুমায়ুন রশীদের লেখা 'বাংলাদেশে কি বিবর্তন পড়ানো হচ্ছে?' নামের একটি সিরিজ। ওই সিরিজে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার যে করুণ ছবি ফুটে উঠেছে তা সত্যই ভয়াবহ। স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তো বটেই, এমনকি জীববিজ্ঞানের স্বনামধন্য শিক্ষক শিক্ষিকারাও বিবর্তনকে ধর্মবিরোধী আজগুবি ধ্যান ধারণা বলে মনে করেন। তারা মনে করেন পরীক্ষা পাশের জন্য এসব 'হাবি জাবি' জিনিস পড়া যেতে পারে, কখনই ওগুলো সত্য বলে মেনে নেওয়া যাবে না! [৫]

বিবর্তনবাদ নিয়ে রক্ষণশীল মহলে এত হৈ চৈ কেনো?

বিবর্তনবিরোধীরা ডারউইনিজমকে শুধু প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হয়নি, সমস্ত 'শয়তানির চাবিকাঠি' হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছে। আমেরিকার রক্ষণশীল অংশের মদদপুষ্ট ডিস্কভারি ইন্সটিউটের পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং ইন্টেইলজেন্ট ডিজাইনের অন্যতম প্রবক্তা ফিলিপ জনসনের মতে, যেহেতু অবিশ্বাসীরা ডারউইনের মতানুসারে মনে করে মানুষ বানর থেকে উদ্ভূত হয়েছে, সেহেতু তারা যে কোন ধরনের 'নাফরমানি' করতে পারে - সমকামিতা, গর্ভপাত, পর্ণোগ্রাফি, তালাক, গণহত্যা সবকিছু [৬]! এমন একটা ভাব, ডারউইন আসার আগ পর্যন্ত সারা পৃথিবী যেন এগুলো থেকে একেবারেই মুক্ত ছিল! 'আনসারিং জেনেসিস' নামে একটা মৌলবাদী খ্রীষ্টান ওয়েবসাইট আছে, যারা এখনো মনে করে পৃথিবীর বয়স ছ'হাজার বছরের বেশী নয়। এ ওয়েবসাইটের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে কোন উপায়ে বিবর্তনকে ঠেকানো আর 'প্রমাণ করা' বিজ্ঞান যাই বলুক না কেন, বাইবেলে যা লেখা আছে তাই ঠিক[৭]। তারা খুব সুন্দর করে চার্ট বানিয়ে দেখিয়েছে বিবর্তন মানলে পাওয়া যাবে রেসিজম, ফ্যাসিজম, কমিউনিজম, নাজিজম আর জেনেসিস মানলে এ পৃথিবীতে থাকবে প্রেম ভালবাসা, স্নেহ, মায়া আর মমতা! ওদিকে হারুন ইয়াহিয়ার মত ব্যক্তিরা আবার দিব্যি বলে বেড়াচ্ছেন যে, বিবর্তনবাদ পশ্চিমা-আধিপত্যবাদী শক্তির দ্বারা সৃষ্ট একধরণের 'প্রতারণা' ছাড়া নাকি আর কিছুই নয়!

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে সব ছেড়ে ছুড়ে বিবর্তন তত্ত্বের উপর এই বিশেষ মহলটির এতো আক্রোশ কেন? বিজ্ঞানের তো আরো হাজারটা শাখা আছে, কই সেগুলো নিয়ে তো এমন 'উদ্দেশ্যমূলক' ভাবে বিতর্ক তৈরী করা হচ্ছে না? এমনকি জীববিজ্ঞানের ভিতরেও তো আছে কোষবিদ্যা, বংশগতিবিদ্যা, সাইটোজেনেটিক্স কিংবা আণবিক জীববিদ্যা ইত্যাদি। ওগুলো নিয়েও বিশেষ মহলটির কোন মাথাব্যথা নেই, বিতর্কও নেই। তাহলে নিশ্চয়ই ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের মধ্যে তারা এমন কিছু খুঁজে পেয়েছে যা তাদের গায়ে ভিষণ জ্বালা ধরানোর জন্য যথেষ্ট। কি সেটি? আসলে সত্যি বলতে কি, বিবর্তনতত্ত্ব সমস্ত পুরোন সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্যান ধারণা আর কুসংস্কারের বুকে তীব্র আঘাত হেনেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মের মূল ভিত্তি সৃষ্টিতত্ত্বকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছে বিবর্তনবাদ।

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই নিজের জন্ম রহস্য নিয়ে মানুষ বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করে এসেছে। যুগে যুগে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে তাই জন্ম হয়েছে নানা ধরণের ধর্মের এবং সৃষ্টিতত্ত্বের। তবে পশ্চিমা বিশ্বে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উইলিয়াম প্যালের কল্যাণে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে সৃষ্টির পরিকল্প যুক্তি (Design argument) প্রবলভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। ডারউইনের বিবর্তনবাদী তত্ত্বই ১৮৫৯ সালে প্রথমবারের মতো একে শক্তিশালীভাবে চ্যালেঞ্জ করে ভুল প্রমাণিত করলো। বিবর্তনবাদ খুব পরিস্কার

ভাবেই দেখিয়ে দিল যে, মানুষসহ বিভিন্ন প্রজাতির বিবর্তন এবং উদ্ভবের পেছনে কোন স্বর্গীয় কারণ খোঁজার দরকার নেই। অন্যান্য পশুপাখি, গাছপালা যে পদ্ধতিতে পৃথিবীতে এসেছে, মানুষ নামের 'দ্বিপদী প্রাণী'টিও ঠিক একই বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এ পৃথিবীতে এসেছে। অর্থাৎ জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষ আসলে প্রাণীজগতের অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়, তা সে নিজেকে যতই 'অনন্য সাধারণ' মনে করুক না কেন! দার্শনিক ডেনিয়েল ডেনেট এজন্যই বিবর্তনতত্ত্বকে 'ইউনিভার্সাল এসিড' (universal acid) বা রাজাম্ল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন[৮]। ইউনিভার্সাল এসিড যেমন তার বিধ্বংসী ক্ষমতায় সকল পদার্থকে পুড়িয়ে-গলিয়ে ছারখার করে দিতে পারে, তেমনি ডারউইনের বিবর্তনবাদী তত্ত্ব সমস্ত প্রথাগত সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্যান ধারণা আর কুসংস্কারকে একেবারে দুর করে দিতে পারে। অধ্যাপক ডেনেট তার বিখ্যাত বইটিতে[৮] বিবর্তন তত্ত্বকে 'ডারউইনের বিপজ্জনক প্রস্তাব' (Darwin's dangerous idea) বলে উল্লেখ করেছেন। এটি 'বিপজ্জনক' কারণ এটি বলে যে, মানুষ এবং অন্যান্য জীব কোন সৃষ্টিকর্তার নির্দেশনা ছাড়াই শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সরল প্রাণ থেকে ক্রমান্বয়ে উদ্ভূত হতে পারে। নিঃসন্দেহে এটি সৃষ্টিবাদীদের জন্য বিপদের কথা। অক্সফোর্ডের বিশপ স্যামুয়েল উইলবারফোর্স (Samuel Wilberforce), যিনি ডারউইনের বন্ধু বিজ্ঞানী হাক্সলির সাথে ঝগড়া-ঝাটির কারণে বিখ্যাত হয়ে আছেন (২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য), সঙ্গত কারণেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা বিবর্তনকে অস্বীকার করেন এই বলে[৯]: 'প্রাকৃতিক নির্বাচন নামের তত্ত্বটি ঈশ্বরের বাণীর সাথে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এটি বরং ঈশ্বরের সৃষ্টির সাথে ঈশ্বরের প্রেরিত বাণীর বিরোধ ঘটায়।'

সে যাই হোক, চলুন এবার দেখা যাক আজকের রক্ষণশীল আমেরিকাবাসীদের কাছে 'হট্ কেক' ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্বটি আসলে কি বলতে চাইছে, এই তত্ত্বটিকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রচেষ্টার পিছনে আসলে কি উদ্দেশ্য কাজ করছে। এর মুলে যেতে হলে আমাদেরকে আইডি তত্ত্বের আস্তানা ডিস্কভারি ইনস্টিটিউটে একবার ঢুঁ মেরে আসতে হবে। ওখানে কারা কালকাঠি নাড়ছেন, কি বলছেন এবং কেন বলছেন তা একটু খতিয়ে দেখলেও বোধ হয় ডোভার শহরের জজ সাহেবের দেওয়া সাম্প্রতিক রায়ের অর্থ পরিস্কার হয়ে যাবে। কিন্তু আইডি প্রবক্তাদের জন্ম রহস্যটা ঠিকমত বুঝতে হলে আমাদেরকে আরেকটু দুরে যেতে হবে, চোখ রাখতে হবে সেই আঠারো শতকে, উইলিয়াম প্যালের কালে। সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিহাসের বইটার সে সময়কার পাতাগুলো একটু ভালোমত উলটে পালটে দেখতে হবে কারণ তাদেরই উত্তরসুরি হিসেবে জন্ম হয়েছে এই নব্য আইডি প্রবক্তাদের!

উইলিয়াম প্যালে এবং তার পরিকল্পিত সৃষ্টির যুক্তি

উইলিয়াম প্যালে (১৭৪৩-১৮০৫)'র বিখ্যাত বই 'Natural Theology, or Evidence of Existence and Attributes of the Deity, collected from the Appearences of Nature' প্রকাশিত হয় ১৮০২ সালে। ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়েও প্যালে ভেবেছিলেন বিস্তর, কিন্তু নিজেই শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন 'বুদ্ধিদীপ্ত স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান উপযুক্ত মাধ্যম নয়' [১০] ; এ ক্ষেত্রে প্যালের 'উপযুক্ত মাধ্যম' মনে হয়েছিল বরং জীববিজ্ঞানকে। আর পূর্ববর্তী অন্যান্য *ন্যাচারাল থিওলিজিয়ান*দের মতই প্যালেও জীবজগতকে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে জীবের অভিযোজনের ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্যালে লক্ষ্য করেছিলেন যে, প্রতিটি জীবদেহে নির্দিষ্ট কাজ করবার জন্য নির্দিষ্ট অংগ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, যা জীবটিকে একটি নির্দিষ্ট কোন পরিবেশে টিকে থাকতে সহায়তা করে। তিনি জটিল জীবদেহকে ঘড়ির কাঠামোর সাথে তুলনীয় মনে করেছিলেন, আর তার মধ্যেই দেখেছিলেন স্রষ্টার সুমহান পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য আর

নিপুণ তুলির আঁচর। প্যালের ভাষাতেই [১১] :

> ‘ধরা যাক ঝোপঝারের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ আমার পা একটা পাথরে লেগে গেল। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, এই পাথরটা কোত্থেকে এলো? আমার মনে উত্তর আসবে- প্রকৃতির অন্য অনেক কিছুর মত পাথরটাও হয়ত সবসময়ই এখানে ছিল। ... ...কিন্তু ধরা যাক আমি পথ চলতে গিয়ে একটা ঘড়ি কুড়িয়ে পেলাম। এবার কিন্তু আমার কখনই মনে হবে না যে ঘড়িটিও সব সময়ই এখানে পড়ে ছিল।’

নিঃসন্দেহে ঘড়ির গঠন পাথরের মত সরল নয়। একটি ঘড়ি দেখলে বোঝা যায়- ঘড়ির ভিতরের বিভিন্ন ছোট ছোট অংশগুলো কোন এক কারিগর এমনভাবে তৈরী করেছেন যেন সেগুলো সঠিকভাবে সমন্বিত হয়ে কাঁটাগুলোকে ডায়ালের চারপাশে মাপমত ঘুরিয়ে ঠিক ঠাক মত সময়ের হিসেব রাখতে পারে। কাজেই পথে ঘড়ি কুড়িয়ে পেলে যে কেউ ভাবতে বাধ্য যে ওখানে আপনা আপনি ঘড়ির জন্ম হয়নি বরং এর পেছনে একজন কারিগর রয়েছেন যিনি অতি যত্ন করে একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঘড়িটি তৈরী করেছেন*। একই যুক্তিমালার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে প্যালে বেছে নিয়েছিলেন আমাদের জীবদেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংগ চোখকে। চোখ নামের এই অংগটিকে প্যালে ঘড়ির মতই এক ধরনের জটিল যন্ত্র হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন, কারণ তার মতে, ‘ ঘড়ির মতই এটি (চোখ) বহু ছোট-খাট গতিশীল কলকব্জা সমন্বিত এক ধরণের জটিল যন্ত্র হিসেবে আমাদের কাছে আবির্ভূত হয়, যেগুলোর প্রত্যেকটি একসাথে কাজ করে অংগটিকে কর্মক্ষম করে তুলে।’ [১২]।

চোখকে প্যালে অনেকটা জৈব-টেলিস্কোপ হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, ঘড়ি কিংবা টেলিস্কোপ তৈরী করার জন্য যেহেতু একজন কারিগর দরকার, চোখ ‘সৃষ্টি করার জন্য’ও প্রয়োজন একজন অনুরূপ কোন কারিগরের। সেই কারিগর যে একজন ‘ব্যক্তি ঈশ্বর’ (Personal God)ই হতে হবে তা প্যালে খুব পরিস্কার করেই বলেন [১১] :

> ‘কোন পরিকল্পনাকারী (Designer) ছাড়া কোন পরিকল্পনা (Design) হতে পারে না, যেমনি আবিস্কর্তা ছাড়া কোন আবিস্কার হতে পারে না।... ...পরিকল্পনার ছাপ এতোই প্রবল যে একে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এই পরিকল্পনাকারীকে অবশ্যই একজন ব্যক্তি হতে হবে। সেই ব্যক্তিই হচ্ছেন ঈশ্বর।’

---

* প্যালের এই ‘ঘড়ির কারিগরের যুক্তি’ দর্শনশাস্ত্রে পরিচিত হয়ে আছে ‘পরিকল্প যুক্তি’ বা ‘Argument from Design’ হিসেবে। শুধু জীব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তথা মহাবিশ্বের উৎপত্তির পেছনে ঈশ্বর নামক ‘কারিগরের’ অস্তিত্বের পক্ষে অত্যন্ত জোড়ালো যুক্তি হিসেবে অনেককাল ধরে প্যালের এই যুক্তিমালা ব্যবহৃত হয়েছে। একটি ঘড়ি যেমন নিজে থেকে সৃষ্ট হয়ে পথে পড়ে থাকতে পারে না, ঠিক তেমনি মহাবিশ্বও নিজ থেকে সৃষ্ট হয়ে এমনি অবস্থায় চলে আসতে পারে না। ঘড়ি তৈরীর পেছনে যেমন ঘড়ির কারিগরের ভূমিকা আছে, তেমনি মহাবিশ্ব তৈরীর পেছনেও ঈশ্বর জাতীয় কোন কারিগরের হাত থাকতেই হবে, এই ধারণাটি এক সময় সৃষ্টিবাদীদের মধ্যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্যালের যুক্তমালা নিয়ে আলোচনা এবং খন্ডন এই অধ্যায়ের পরিসরের বাইরে। উৎসাহী পাঠকেরা এর জন্য অঙ্কুর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত অভিজিৎ রায়ের ‘আলোহাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ (২০০৫, ২০০৬) বইটি দেখতে পারেন।

পরিকল্পনাবিহীনভাবে প্রাকৃতিক উপায়ে চোখের উৎপত্তির সম্ভাবনাকে এক্কেবারে উড়িয়ে দিয়ে প্যালে বলেছেন[১১] : 'মানবদেহে স্রেফ দৈবাৎ প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ কোন ধরনের পরিকল্পনা (Design) বিহীন ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে হয়তো আঁচিল, আঁব, জরুল, তিল, ব্রণের মত জিনিসপত্র তৈরী হতে পারে কিন্তু কোনভাবেই চোখ নয়।' ... কোথাও কোন উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

ডারউইন নিঃসন্দেহে প্যালের উক্তিগুলো পড়েছিলেন এবং এর একটি যোগ্য জবাবও মনে মনে ঠিক করেছিলেন যা তিনি দিয়েছিলেন পরে তার 'প্রজাতির উদ্ভব' বইয়ের মাধ্যমে। ডারউইন প্রস্তাব করলেন জীবদেহকে কেবল ঘড়ির মত যন্ত্রের মত কিছু ভেবে বসে থাকলে চলবে না। জীবজগৎ যন্ত্র নয়; কাজেই যন্ত্র হিসেবে চিন্তা করা বাদ দিতে পারলে এর পেছনে আর কোন কোন ডিজাইন বা পরিকল্পনাার মত 'উদ্দেশ্য' খোঁজার দরকার নেই। জীবজগতে চোখের উদ্ভব ও বিবর্তনের পেছনে ডারউইন প্রস্তাব করলেন এক 'অন্ধ কারিগরের', নাম প্রাকৃতিক নির্বাচন- যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লাখ লাখ বছর ধরে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা পরিবর্তনের ফলে চোখের মত অত্যন্ত জটিল অংগ-প্রত্যংগ গড়ে ওঠা সম্ভব। এ প্রক্রিয়াটির নাম ক্রমবর্ধমান নির্বাচন (cumulative selection)। একাধিক ধাপের এই ক্রমবর্ধমান নির্বাচনের মাধ্যমে যে ধাপে ধাপে যে জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ভুত হতে পারে তা ইতোমধ্যেই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমানিত হয়েছে [১৩]। শুধু তাই নয়, এ পদ্ধতিতে আংশিকভাবে চোখের উৎপত্তি ও বিকাশ যে সম্ভব এবং তা বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে যে একটি জীবের টিকে থাকার সম্ভাবনাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলতে পারে তারও অজস্র উদাহরণ রয়েছে আমাদের চারপাশে। ডারউইন তার 'প্রজাতির উৎপত্তি' (১৮৫৯) বইয়ে বলেন [১৪] :

> 'চোখের আছে কিছু অনুকরণীয় উপকরণ, যা দিয়ে এটি বিভিন্ন দূরত্বের সাথে ফোকাস করতে পারে, বিভিন্ন মাত্রার আলো এর ভিতরে ঢুকতে দিতে পারে, এবং গোলাকার ও বর্ণীয় অপেরণকে সংশোধন করতে পারে, সেটি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভুত হয়েছে মনে করা হয়ত অসম্ভব ব্যাপার বলেই মনে হতে পারে। তবুও যুক্তি আমাকে বলে যে, যদি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ও সরল চোখ থেকে নিঁখুত ও জটিল চোখ পর্যন্ত অনেক কয়েকটি স্তর থেকে থাকে এবং প্রতিটি স্তর তার ধারকের জন্য উপকারী হয় বলে দেখানো যায়; আর যদি চোখগুলো সামান্য পরিমানেও পরিবর্তনশীল হয়, এবং বিভিন্নতাগুলো বংশানুসৃত হয় (যা অবশ্যই সম্ভব), আর যদি অঙ্গের বিভিন্নতাগুলো বা পরিবর্তনগুলো জীবনের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে প্রাণীর জন্য উপকারী বলে বিবেচিত হয়, তাহলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে নিখুঁত ও জটিল চোখের উদ্ভব যতই অবাস্তব শোনাক না কেন, না ঘটার কোন কারণ নেই।'

বিবর্তন বা প্রাকৃতিক নির্বাচন লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ধাপে ধাপে ঘটে। আজকে আমরা চোখের যে পূর্ণাংগ গঠন দেখে মুগ্ধ হই তা একদিনে তৈরি হয়নি, তা বহুকাল ধরে ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকা ছোট ছোট পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। ডারউইনের পরে গত দেড়শো বছরে আমরা চোখসহ বিভিন্ন অঙ্গের বিবর্তন সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে পেরেছি। বিবর্তনের ইতিহাসে, খুব সম্ভবত, বেশ কয়েকবারই আলাদা আলাদাভাবে চোখের বিকাশ ঘটেছে- কখনও মাকড়সা, কাঁকড়া, বিভিন্ন পোকার মত সন্ধিবদ্ধ (arthropod) প্রানীদের মধ্যে, আবার কখনও অক্টোপাস, শামুক, ঝিনুক জাতীয় মলাস্ক (Mollusk) প্রাণীদের মধ্যে এবং কখনও বা আমাদের মত মেরুদন্ডী (Vertebrates) প্রাণীদের মধ্যে।

এই তিনটি গ্রুপের মধ্যেই আলাদা আলাদাভাবে চোখের সৃষ্টি এবং বিকাশ ঘটেছে - এই বিভিন্ন ধরনের চোখগুলো একেটা একেক রকম পদ্ধতিতে কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত এরা সবাই চোখের ভুমিকাই পালন করে। খুব সম্ভবত আলোর প্রতি সংবেদনশীল একধরনের স্নায়বিক কোষ থেকে প্রথম চোখের বিকাশ শুরু হয়। তারপর হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হতে হতে আজকে তারা এই রূপ গ্রহন করেছে। কতগুলো সংবেদনশীল কোষকে কাপের মত অবতলে যদি ঠিকমতভাবে সাজানো যায় তাহলে যে নতুন একটি আদি-চোখের উদ্ভব হয় তার পক্ষে আলোর দিক নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে উঠে।

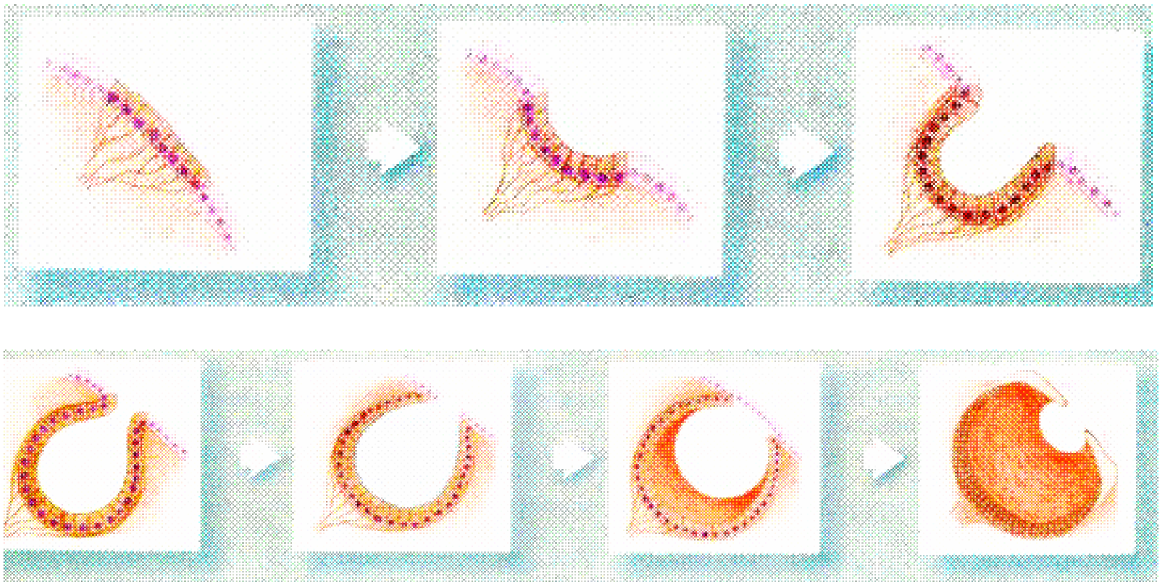

চিত্র ১০.১ : চোখের বিবর্তন : চোখের মত একটি জটিল প্রত্যঙ্গ সহজেই আলোর প্রতি সংবেদনশীল খুব সরল স্নায়বিক কোষ বিশিষ্ট 'আই-স্পট' থেকে বিভিন্ন ধাপে ধাপে পরিমিত ভিন্নতার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হতে পারে। যখনই এ ধরনের কোন পরিবর্তন - যা কিছুটা হলেও বাড়তি সুবিধা প্রদান করে, তা ধীরে ধীরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জনপুঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে।
(সৌজন্য : http://www.millerandlevine.com/km/evol/lgd/index.html)

এখন যদি এই কাপটির ধারগুলোকে কোনভাবে বন্ধ করা যায় তাহলে আধুনিক pin-hole camera-এর মত চোখের উৎপত্তি ঘটবে। তারপর একসময় গতি নির্ধারণ করতে পারে এমন একটি অক্ষিপট (Retina) বা রং বুঝতে পারে কোনের (cone) মত এমন একটি অংশ বিকাশ লাভ করে তাহলে আরও উন্নত একটি চোখের সৃষ্টি হবে। এরপর যদি বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইরিস ডায়াফ্রামের (Iris diaphragm) উৎপত্তি ঘটে তাহলে চোখের ভিতরে কতখানি আলো ঢুকবে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এরপর আস্তে আস্তে যদি লেন্সের (lens) উদ্ভব ঘটে তা তাকে আলোর সমন্বয় এবং ফোকাস করতে সহযোগিতা করবে আর এর ফলে চোখের উপযোগীতা আরও বাড়বে। এইভাবেই সময়ের সাথে সাথে মিউটেশনের মাধ্যমে চোখের ক্রমান্বয়িক পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা এখনও আমাদের চারপাশে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত বিভিন্ন ধাপের চোখের অস্তিত্ব দেখতে পাই, অনেক আদিম প্রাণীর মধ্যে এখনও বিভিন্ন রকমের এবং স্তরের আদি-চোখের অস্তিত্ব দেখা যায়। কিছু এককোষী জীবে একটা আলোক-সংবেদনশীল জায়গা আছে যা দিয়ে সে আলোর দিক সম্পর্কে খুব সামান্যই ধারণা করতে পারে, আবার কিছু কৃমির মধ্যে এই

আলোক-সংবেদনশীল কোষগুলি একটি ছোট অবতল কাপের মধ্যে বসানো থাকে যা দিয়ে সে আরেকটু ভালোভাবে দিক নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। সমতলের উপর বসানো নামমাত্র আলোক সংবেদনশীলতা থেকে শুরু করে পিনহোল ক্যামেরার মত মেরুদন্ডী প্রাণীদের অত্যন্ত উন্নত চোখ পর্যন্ত সব ধাপের চোখই দেখা যায় আমাদের চারপাশে, এবং তা দিয়েই বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

ক)

খ)

গ)

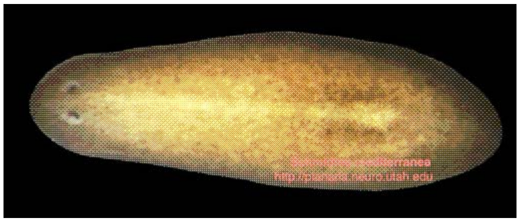

ঘ)

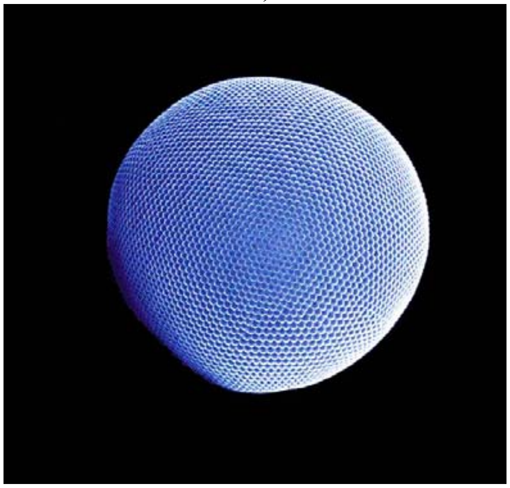

ঙ)

চ)

চিত্র ১০.২ : প্রকৃতিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের চোখ : ক) অন্ধ গুহা মাছ মেক্সিকান টেট্রা (Astyanax mexicanus); (খ) অন্ধ cave salamander: খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে চামড়ার নীচে 'আদিম প্রকৃতির' চোখের অবস্থান বোঝা যাবে; (গ) আদিম নটিলাসের পিন-হোল ক্যামেরা সদৃশ চোখ; (ঘ) প্লানারিয়াম : কাপ 'আইস্পট' (ঙ) অ্যান্টার্কটিক ক্রিল (চ) মানুষের চোখ।

বিবর্তনবাদ : এক ইউনিভার্সাল এসিড

পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক ধ্যন ধারণার কোন কমতি নেই, কিন্তু খুব কম বৈজ্ঞানিক ধারণাই জনসাধারণের মানসপটে স্থায়ীভাবে বিপ্লব ঘটাতে পেরেছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক থমাস কুন (Thomas Kuhn) এ ধরনের যুগান্তকারী বিপ্লবাত্মক ধারণাকে ‘প্যারাডিম শিফট’ (Paradigm Shift) নামে অভিহিত করতেন [১৫]। *প্যারাডিম শিফট* কিন্তু হর-হামেশা ঘটে না। মানব সভ্যতার ইতিহাস তামা-তামা করে খুঁজলেও দু’একটির বেশি *প্যারাডিম শিফটের* উদাহরণ পাওয়া যাবে না। পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব ছিল একটি *প্যারাডিম শিফট*, যা আমাদের চিরচেনা বিশ্বব্রহ্মান্ডের ছবিটাই দিয়েছিল আমূল বদলে। ঠিক একই ভাবে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে *প্যারাডিম শিফটের* উদাহরণ হল বিবর্তনতত্ত্ব [১৬]। এই বিবর্তন তত্ত্বই আমাদের শিখিয়েছে যে, কোন প্রজাতিই চিরন্তন বা স্থির নয়, বরং আদিম এক কোষী প্রাণী থেকে শুরু করে এক প্রজাতি থেকে পরিবর্তিত হতে হতে আরেক প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে, আর মানুষ সহ পৃথিবীর সব প্রাণীই আসলে কোটি কোটি বছর ধরে তাদের পুর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হতে হতে এখানে এসে পৌঁছেছে। ডারউইন শুধু এ ধরনের একটি বিপ্লবাত্মক ধারণা প্রস্তাব করেই ক্ষান্ত হননি, বিবর্তনের এই প্রক্রিয়াটি (প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে) কিভাবে কাজ করে তার পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন সবিস্তারে [১৭], প্রথমবারের মত ১৮৫৯ সালে ‘প্রজাতির উদ্ভব’ বা ‘অরিজিন অব স্পিশিজ’ বইয়ে। খুব অবাক হতে হয় এই ভেবে, যে সময়টাতে সৃষ্টি রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে প্রায় সকল বিজ্ঞানী আর দার্শনিকই সবে ধন নীল-মনি ওই বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায়ে মুখ থুবরে পড়ে ছিলেন আর বাইবেলীয় গণনায় ভেবে নিয়েছিলেন পৃথিবীর বয়স সর্বসাকুল্যে মাত্র ছ’হাজার বছর আর মানুষ হচ্ছে বিধাতার এক ‘বিশেষ সৃষ্টি’, সে সময়টাতে জন্ম নিয়েও ডারউইনের মাথা থেকে এমনি একটি যুগান্তকারী ধারণা বেরিয়ে এসেছিলো যা শুধু বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকেই তরান্বিত করেনি, সেই সাথে চাবুক হেনেছিলো আমাদের ঘারে সিন্দাবাদের ভুতের মত সওয়ার হওয়া সমস্ত ধর্মীয় সংস্কারের বুকে। দার্শনিক ডেনিয়েল ডেনেট এজন্যই বোধ হয় বলেছিলেন, ‘আমাকে যদি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধারণাটির জন্য কাউকে পুরষ্কৃত করতে বলা হয়, আমি নিউটন, আইনস্টাইনদের কথা মনে রেখেও নির্দ্বিধায় ডারউইনকেই বেছে নেব।’ [১৮] ‘ডারউইনের বুলডগ’ বলে কথিত বিজ্ঞানী টি এইচ হাক্সলি ডারউইনের ‘প্রজাতির উদ্ভব’ বইটিকে নিউটনের ‘প্রিন্সিপিয়ার’ পর জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী ‘মহাস্ত্র’ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন; আবার সেই সাথে আবার দুঃখও করেছিলেন এই ভেবে - ‘এতোই নির্বোধ আমি যে এত সহজ ব্যাপারটা আগে আমার মাথায় আসেনি।’ [১৯] বিজ্ঞানী আর্নেস্ট মায়ার বলেছেন, ‘ডারউইনিয়ীয় বিপ্লব যে মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ধারণা - এটি যে কারো পক্ষে খন্ডন করা কঠিনই হবে।’ [২০] স্টিফেন জে গুল্ড মনে করতেন তাবৎ পশ্চিমা বিশ্বের আধা ডজন বাছা বাছা তত্ত্বের মধ্যে ডারউইনের তত্ত্ব থাকবে শীর্ষস্থানে। [২১] আর অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স তো মনেই করেন যে, শুধু পৃথিবী নয় সমগ্র মহাবিশ্বে কোথাও প্রাণের বিকাশ ঘটলে তা হয়ত ডারউইনীয় পদ্ধতিতেই ঘটবে, কারণ ডারউইনীয় বিবর্তন সম্ভবতঃ একটি ‘সার্বজনীন সত্য’ (universal truth)।[২২] সমগ্র মহাবিশ্বের প্রেক্ষাপটে ‘সার্বজনীন সত্য’ কিনা তা এখনো প্রমাণিত না হলেও স্বীকার করে নিতেই হবে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব আর এর নান্দনিক বিকাশকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের চেয়ে ভাল কোন তত্ত্ব এ মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই। আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছি পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব যেমন একটি সফল তত্ত্ব, জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডারউইনের তত্ত্ব তেমনি একটি অত্যন্ত সার্থক তত্ত্ব।

দার্শনিক ডেনিয়েল ডেনেট বিবর্তনতত্ত্বকে ‘ইউনিভার্সাল এসিড’ (universal acid) বা রাজাম্ল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন [৮]। ইউনিভার্সাল এসিড যেমন তার বিধ্বংসী ক্ষমতায় সকল পদার্থকে পুড়িয়ে-গলিয়ে ছারখার করে দিতে পারে, তেমনি ডারউইনের বিবর্তনবাদী তত্ত্ব সমস্ত প্রথাগত ধর্মীয় ধ্যান ধারণা আর কুসংস্কারকে একেবারে দুর করে দিতে পারে। অধ্যাপক ডেনেট তার বিখ্যাত বইটিতে [৮] বিবর্তন তত্ত্বকে ‘ডারউইনের বিপজ্জনক প্রস্তাব’ (Darwin's dangerous idea) বলে উল্লেখ করেছেন। এটি ‘বিপজ্জনক’ কারণ এটি বলে যে, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী কোন উপরওয়ালার নির্দেশনা ছাড়াই শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সরল জীব থেকে ক্রমানুয়ে উদ্ভুত হতে পারে।

সৃষ্টিতত্ত্বের বিবর্তন

ভিক্টোরিয়ান যুগের শেষ নাগাদ ব্রিটেনসহ সারা ইউরোপের শিক্ষিত মহলেই ডারউইনীয় বিবর্তনবাদ গ্রহনযোগ্য হয়ে ওঠে, বিজ্ঞানীদের মধ্যে তো বটেই, এমনকি চার্চের পাদ্রীদের মধ্যেও [১৬]। কিন্তু ইউরোপের অবস্থা যতখানি না ভাল হতে থাকল, আমেরিকার অবস্থা হতে লাগলো পাল্লা দিয়ে ততটাই খারাপ। তার কারণ, সেখানে বিবর্তনের ব্যাপারটি শিক্ষাঙ্গনে সীমাবদ্ধ থাকলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে তা কোনরকম সচেতনতা জাগাতে ব্যর্থ হয়। আর মানুষকে অসচেতন রাখতে পুরোমাত্রায় ইন্ধন যুগিয়ে চলে সেখানকার খ্রীষ্টিয় চার্চ এবং আমেরিকার রক্ষণশীল সরকারগুলো। ফলে দেখা গেল, জামানা পাল্টে গেলেও বেশিরভাগ আমেরিকানই বাইবেল বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বকেই 'শিরোধার্য' করে বসে আছেন[**]। সারা দুনিয়া জুড়ে শিক্ষাঙ্গনে যে নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে তার ছোঁয়া যেন আমেরিকানরা লাগাতেই চাইলেন না গায়ে। ধীরে ধীরে আমেরিকার প্রেস এবং মিডিয়ারও চোখেও বিবর্তন বনাম সৃষ্টিতত্ত্বের অলিখিত দ্বন্দ্বের ব্যাপারটা নজরে পড়ল এবং তাদের দৌলতেই ১৮৯০ সালের পর থেকে এই বিতর্ককে 'জনগণের মধ্যে' ছড়িয়ে দেওয়া শুরু হল। এখনও আমেরিকায় জনগণের মধ্যে বিবর্তন এবং সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে বিতর্কের কোন শেষ নেই। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, আমেরিকা পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রধান ধর্মপ্রাণ দেশ (ভারতের পরই)। অথচ ইউরোপে কিন্তু পরিস্থিতি একদমই অন্যরকম, সেখানে ইউরোপের বেশীরভাগ মানুষই আজকে বিবর্তনবাদকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

একটি জিনিস এখানে পরিস্কার করা দরকার। আমেরিকার সাধারণ মানুষ বা রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ বা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যাই বিশ্বাস করুক না কেন আজকের দিনে জীববিজ্ঞানীদের সকলেই কিন্তু বিবর্তনবাদী। বিবর্তনবাদের স্বীকৃতি ছাড়া আজকে জীববিজ্ঞানের সব শাখাই অচল। কোন বৈজ্ঞানিক জার্নালেই বিবর্তনের মুল বিষয়টির সমালোচনা বা বিরোধিতা করা হয় না; সেখানে হয়তো বিবর্তনটা কিভাবে ঘটছে তার পদ্ধতি নিয়ে (যেমন ধীর গতিতে ঘটছে নাকি উল্লম্ফন ঘটছে) মতানৈক্য হতে পারে, বিতর্ক হতে পারে বিবর্তনের পদ্ধতি কি ফাইলেটিক (phyletic), স্যালটেশন (saltation) নাকি কোয়ান্টাম (quantum) এ নিয়ে; কিন্তু বিবর্তন যে ঘটছেই সে ব্যাপারে জীববিজ্ঞানী এবং প্রাণরসায়নবিদদের মধ্যে এখন কোনো সংশয়ই নেই।

প্রায় অর্ধ শতকেরও বেশী হতে চললো শিক্ষায়তনে (academia) বিবর্তন নিয়ে কোন বিতর্ক নেই, যা বিতর্ক সবই ওই রাজনৈতিক মহলে, আইন-আদালতে, মিডিয়া, স্কুল বোর্ডে কিংবা ইন্টারনেটের বিভিন্ন ফোরাম এবং ওয়েব সাইটে। বোঝা কষ্টকর নয় 'সীতার অগ্নিপরীক্ষার' মত ডারউইনীয় বিবর্তন তত্ত্বকে কেন বার বার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কেন টেনে হিঁচড়ে এমনকি আদালতের কাঠগড়াতেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বারবার; কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই ডারউইনবাদ অত্যন্ত সাফল্যের সাথেই বিপদকে সামাল দিতে পেরেছে। ইতিহাসের যে আইনী লড়াইগুলো বিগত শতাব্দীর আশির দশক পর্যন্ত আমেরিকার জনগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছে সেগুলো হল : টেনিসির

———————————————————

** 'দ্য ক্রিয়েশনিস্টস' (১৯৯২) বইয়ের লেখক রোনাল্ড নাম্বারসের মতে প্রথম দিকে সৃষ্টিবাদ (creationism) শব্দটি 'বিবর্তন-বিরোধী' সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত না; কারণ, বিবর্তন বিরোধীদের সে সময় কোন সৃষ্টির কোন বিশেষ মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ঐকমত ছিল না। কিন্তু ১৯২০ সালের পর থেকে আমেরিকায় বাইবেলীয় সৃষ্টিতত্ত্ব বিবর্তন-বিরোধী মহলে বিবর্তনতত্ত্বের বিকল্প মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

স্কোপস 'মাঙ্কি' ট্রায়াল (Scopes Trial, 1925), আরকানসাসের ভারসাম্যমূলক বিচারের ধারা (Arkansas Balanced Treatment Act, 1981), লুইজিয়ানার সৃষ্টিবাদী ধারা (The Louisiana Creationism Act, 1987)[২৩]। এর মধ্যে স্কোপস ট্রায়ালের রায় বিবর্তনবাদীদের বিপক্ষে গেলেও এতে তাদের 'নৈতিক বিজয়' অর্জিত হয়, আর বাকিগুলোর ক্ষেত্রে সৃষ্টিতাত্ত্বিকদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। লুজিয়ানার আইনী লড়াই তো একেবারে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। শেষপর্যন্ত আরকানসাস এবং লুজিয়ানা -দু জায়গার আদালতই তথাকথিত 'সৃষ্টিবিজ্ঞান' (Creation science)কে 'বিজ্ঞানের ছদ্মবেশধারী এক ধর্মীয় মতবাদ' (Religious dogma) হিসেবে আখ্যায়িত করে 'অসাংবিধানিক' হিসেবে বাতিল করে দেয়।

স্কোপস ট্রায়ালের কথা আলাদা করে বলতেই হয়। ১৯২৫ সালে জীববিজ্ঞানের শিক্ষক জন স্কোপসকে টেনেসীর ডেটন থেকে গ্রেফতার করা হয় স্কুলের ছাত্রদের 'বিবর্তন পড়ানোর অজুহাতে'। আজকের দিনের পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ব্যাপারটা শুনতে খুব অদ্ভুত শোনাবে, কিন্তু সেসময় সেটাই ছিল রূঢ় বাস্তবতা। মুলতঃ ১৮৯৫ সালে নাইজেরিয়ায় বাইবেল বিশ্বাসীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়, যাকে 'নাইজেরিয়া বাইবেল কনফারেন্স' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকেই আমেরিকার 'মৌলবাদীরা' (fundamentalists) বিভিন্ন প্রদেশে 'বিবর্তন-বিরোধী আইন' বলবৎ করার জন্য সরকারের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে। সৃষ্টিবাদীদের দৌরাত্ম সেসময় এতোই বেশি ছিল যে টেনিসি, মিসিসিপি এবং আরকানসাসের মত প্রদেশগুলোতে স্কুল কলেজে বিবর্তন পড়ানোই ছিল অপরাধ। ওকলাহামার পাঠ্যপুস্তক থেকে বিবর্তন উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর ফ্লোরিডায় ডারউইনবাদকে 'ধ্বংসাত্মক' হিসেবে চিহ্নিত করে হেয় করা হয়েছিল[২৪]। এমন এক পরিস্থিতিতে ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টি করবার লক্ষ্যে জন টি স্কোপস নামের টেনিসির এক হাইস্কুল শিক্ষক ছাত্রদের বিবর্তন পড়িয়ে সেখানকার বিবর্তন-বিরোধী আইনের বলি হবার সিদ্ধান্ত নিলেন। যথারীতি স্কোপসকে গ্রেফতার করা হল এবং আদালতের হাতে সোপর্দ করা হল। স্কোপসের পক্ষে লড়েছিলেন বিখ্যাত আইনবিদ ক্লেরেন্স ড্যারো (Clarence Darrow)। আর উল্টো পক্ষে ছিলেন তিন তিনবার (ব্যর্থ) প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী এবং তার্কিক উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান (Willium Jennings Bryan)। দুর্ভাগ্যক্রমে আদালত বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের সাক্ষ্য গ্রহণে অপারগতা দেখায়, যা চার্লস ড্যারোকে হতাশ করে দেয়। তারপরও চার্লস ড্যারোর জেরায় জর্জরিত হয়ে ব্রায়ান জেনিংস একটা সময় স্বীকার করতে বাধ্য হন যে পৃথিবীর বয়স বাইবেল বর্ণিত ৬০০০ বছরের ঢের বেশি [২৩]। পুরো কোর্ট পরিণত হয় যেন এক জলজ্যান্ত সার্কাসে।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত স্কোপসকে বিবর্তন পড়িয়ে টেনেসির আইন ভাঙার অপরাধে (যা তিনি সত্যই করেছিলেন) একশ ডলার জরিমানা করা হয়। পরবর্তীতে অবশ্য স্কোপস আপিল করায় সে দন্ডও মওকুফ হয়ে যায়। কিন্তু এখানে পুরো ব্যাপারটিতে আসলে বিবর্তনবাদীদের নৈতিক বিজয় ঘটে। টেনিসির আদালত সারা আমেরিকাতেই এক ঠাট্টা তামাসার পাত্র হয়ে ওঠে। বিশেষ করে এইচ এল মেনকেন (H.L. Mencken) নামের এক পত্রিকার রিপোর্টার তার ক্ষুরধার লেখনীতে মৌলবাদী সৃষ্টিতাত্ত্বিকদের একেবারে তুলোধুনো করে ছাড়েন। দীর্ঘদিন ধরে মামলা মোকদ্দমার চাপ আর দেশ জুড়ে ঠাট্টা তামাসা সহ্য করতে না পেরে রায় প্রদানের দিন কয়েকের মধ্যেই ব্রায়ান জেনিংসের অকাল মৃত্যু ঘটে। ১৯৬০ সালে স্কোপস ট্রায়ালকে ভিত্তি করে স্ট্যানলি ক্রামারের (Stanley Kramer) নির্দেশনায় একটি বিখ্যাত চলচিত্র নির্মিত হয় -'Inherit the wind'। সেটিতে ড্যারোর ভূমিকায় আভিনয় করেন বিখ্যাত অভিনেতা

স্পেনসার ট্রেসি (Spencer Tracy), ব্রায়ান জেনিংসের ভূমিকায় ছিলেন ফ্রেডরিক মার্চ (Fredric March), আর মেনকেনের ভুমিকায় ছিলেন জীন কেলি (Gene Kelley)। ছবিটি সে সময় দর্শকদের মধ্যে দারুন জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এবং এখন পর্যন্ত তা ইতিহাসের অন্যতম 'ক্লাসিক' ছবি হিসেবে বিবেচিত।

সৃষ্টিবাদীরা স্কোপস ট্রায়ালের পর থেকে নতুন উদ্যমে এবং নতুন ধারায় নিজেদের মতবাদ প্রচারে তৎপর হয়ে ওঠে। বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের কোন কিছুই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাথে মিলছে না দেখে, ১৯৬১ সালে জন হুইটকম্ব (John Whitcomb) এবং হেনরী মরিস (Henry Moris) 'The Genesis Flood' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। লেখকেরা দাবী করেন যে সাদা চোখে যতই বেমানান লাগুক না কেন, বাইবেলের সৃষ্টি তত্ত্ব আসলে বিজ্ঞানের সাথে সংগতিপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক মহলে বইটি কোন গ্রহনযোগ্যতা না পেলেও ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা এই বইটির মধ্যে ডারউইনীয় বিবর্তনবাদকে ঠেকানোর অভিনব কিছু পন্থা খুঁজে পায়। ১৯৬৩ সালে হেনরী মরিস Creation Research Society (CRS) এবং সত্তর দশকের দিকে 'Institute of Creation Research' (ICR) প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের লক্ষ্য ছিল স্কুল কলেজগুলোতে এ নতুন সৃষ্টিতত্ত্বকে 'বৈজ্ঞানিকভাবে' পড়ানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করা। মরিস এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা পরিস্কার করেই বলেন [২৪] :

> 'আমরা যে চেষ্টাকে মহিমান্বিত করি তা হল প্রথমে এটি বোঝা যে ঈশ্বরের বাণী হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী; এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় ঈশ্বর পরিস্কার করেই বলতে সক্ষম, এবং যা বলেন তা সঠিকভাবেই নির্দেশ করেন। বাইবেলে ঠিক তাই রয়েছে, যা আমাদের মূলমন্ত্র। এটা আমরা মেনে নেই, আর তারপর বৈজ্ঞানিক উপাত্তগুলোকে সেই (বাইবেলীয়) কাঠামোর ভিতরে ফেলে ব্যাখ্যা করি।'

ICR এর ওয়েব সাইটেও লেখা আছে [২৫] :

> 'The Bible is the written word of God … To the student of nature this means that the account of origins in Genesis is a factual presentation of simple historical truth.'

এ ধরনের 'রিসার্চ' কতটা 'বৈজ্ঞানিক' তা নিয়ে সব সময়ই সংশয় তো থেকেছেই, তা হাসির ও খোরাক হয়েছে পুরোমাত্রায়। গবেষণা করার সময় বিজ্ঞানীরা খোলা মনে 'রিসার্চ করবেন' এটাই ধরে নেওয়া হয়। বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নেন নিরপেক্ষভাবে করা পরীক্ষণের ফলাফলের ভিত্তিতে। কিন্তু বাইবেল বিশ্বাসী 'বিজ্ঞানীরা' তা করেন না। তারা বাইবেল যে 'অভ্রান্ত' সে সিদ্ধান্তেই সব সময় অটল থাকেন। আর আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্যের আলোকে বাইবেলকে 'পুনর্ব্যাখ্যা' করেন। যখন 'পুনর্ব্যাখ্যা' করতে পারেন না, কিংবা ধর্মগ্রন্থের সাথে তাদের সৃষ্টির গল্পগুলোর এতটাই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তখন তারা খোদ বিজ্ঞানের সাক্ষ্য-প্রমাণগুলোকেই প্রশ্নবিদ্ধ করতে থাকেন। নীচের কার্টুনটি দেখলেই বোঝা যাবে সৃষ্টিবাদীদের বিজ্ঞান 'Creation Sceince' কিভাবে কাজ করে। বলা বাহুল্য, কোন বৈজ্ঞানিক জার্নালে কখনই এই 'সৃষ্টি-বিজ্ঞানী'দের কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়নি। ডঃ ইউজিন স্কট (Eugenie Scott) এবং ডঃ হেনরী কোল (Henry Cole) একবার একটি সমীক্ষায় দেখিয়েছিলেন যে, এই সৃষ্টিবিজ্ঞানীরা আটষট্টিটি জার্নালে তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল পাঠাতে পারতেন, কিন্তু নিজেরাই বুঝেছিলেন যে

সেগুলো এতই নিম্নমানের যে পাঠানোর উপযুক্ত নয়, কিংবা যদিও বা কিছু পাঠিয়েছিলেন, সঙ্গত কারণেই সেগুলো প্রত্যাখ্যাতও হয়েছিলো [২৬]।

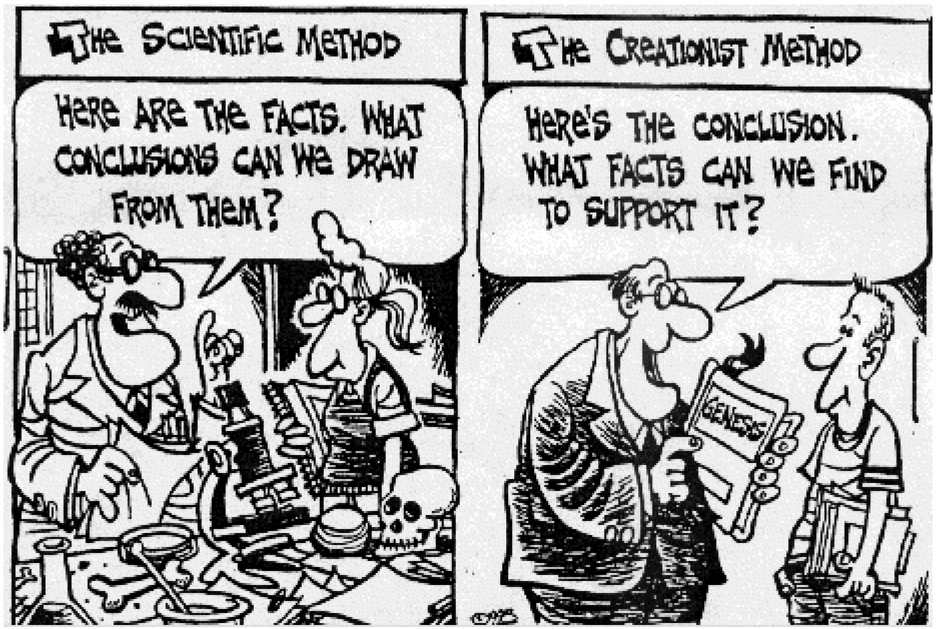

চিত্র ১০.৩ : কার্টুন : প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বনাম সৃষ্টি বিজ্ঞানের পদ্ধতি

মরিসের পাশাপাশি সৃষ্টিতত্ত্বের আরেক মহারথি ছিলেন দুয়েন গিশ (Duane Gish)। বায়োকেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট করা এ ভদ্রলোক, অত্যন্ত দক্ষ তার্কিক। বিগত শতাব্দীর আশির দশকে এ ভদ্রলোক সারা আমেরিকার উপকূল জুড়ে ভ্রমণ করতেন আর বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানীদের সাথে মুখোমুখি বিতর্কে লিপ্ত হতেন। জীববিজ্ঞানীদের অধিকাংশই যেহেতু ল্যাব-রিসার্চ নিয়েই পড়ে থাকতেন, তাদের অনেকেই বাকপটু ছিলেন না, অনেকে প্রকাশ্য বিতর্কে অভ্যস্তও ছিলেন না। গিশ বেছে বেছে এ ধরনের জীববিজ্ঞানীদের নিজের সহজ শিকারে পরিণত করতেন। আর সাধারণ মানুষদের যেহেতু বিবর্তনের জটিল টেকনিকাল বিষয়গুলো নিয়ে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, সুযোগটি পুরোমাত্রায় ব্যবহার করতেন গিশ। প্রকাশ্য সভায় বিভিন্ন চটকদার বক্তব্য আউড়ে তিনি প্রতিপক্ষ জীববিজ্ঞানীদের ধরাশায়ী করার ভঙ্গী করে দর্শকদের 'বাহবা' কুড়াতেন। আর দর্শক সারির একটা বড় অংশই ছিল আবার চার্চগামী খ্রীষ্টান। তারা গিশের প্রতিটি বিতর্ক সভায় দলবল নিয়ে যোগদান করতেন আর গিশের প্রতিটি কথার পরই হাত তালির বন্যা বইয়ে দিতেন। ফলে প্রথম থেকেই তারা এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতেন যে, বিতর্ক শুরুর আগেই মনে হত গিশ বুঝি জয়ী হয়ে গিয়েছেন।

নিঃসন্দেহে এ সমস্ত চমকবাজীর প্রভাব আমেরিকায় পড়েছিল। অচিরেই রক্ষণশীলদের চাপে আর্কানসাস এবং লুজিয়ানায় বিবর্তনের পাশাপাশি সৃষ্টিতত্ত্বকেও পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য 'ভারসাম্যমুলক' আইন প্রবর্তন করা হল। এই আইনকে 'অসাংবিধানিক' হিসেবে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করলেন আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন (ACLU)। ফলে বিবর্তন-সৃষ্টিতত্ত্বের 'দ্বন্দ্ব' আবারও আদালতের কাঠগড়ায় উঠে এল। এবার আর্কানসাসের আদালত পরিণত হল 'সৃষ্টি বিজ্ঞানী'দের তামাসায়। সেখানে

একেক ‘সৃষ্টি বিজ্ঞানী’ একেক ভাবে নিজেদের বিশ্বাস উপস্থাপন করতে থাকেন, যুক্তি এবং বুদ্ধির লেশ ছাড়াই। যেমন, ডালাসের ধর্মতাত্ত্বিক নর্মান গেইসলার (Norman Geisler) ঘোষনা করলেন - ‘ঈশ্বরে অবিশ্বাস করেও ঈশ্বর যে আছে তাতে নিজের বিশ্বাস আনা সম্ভব।’ তিনি আরো বললেন, আকাশে দেখা ইউএফও বা উড়ন্ত চাকীগুলো নাকি শয়তানের চর! আরেক মৌলবাদী সৃষ্টিতাত্ত্বিক ও কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হেনরী ভস (Henry Voss) কে তো ফিরিয়েই নেওয়া হল কারণ তিনি বিচার শুরুর ঠিক আগে শয়তানের আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন।

সৃষ্টি-বিজ্ঞানীদের অনেকেই আদালতে স্বীকার করলেন যে তারা গবেষণার নামে যা করছেন তা আসলে বিজ্ঞান নয়। লোমা লিন্ডা বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যারল্ড কফিন (Harold Coffin) বললেন, ‘না, সৃষ্টি-বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষণযোগ্য নয়।’ লোমা লিন্ডার আরেক ‘বিজ্ঞানী’ এরিয়েল রথ(Ariel Roth)কে যখন জিজ্ঞাসা করা হল সৃষ্টিবিজ্ঞান আসলেই বিজ্ঞান কিনা তিনি বললেন - ‘যদি আপনি বিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করেন পরীক্ষণযোগ্যতা আর পূর্বাভাসযোগ্যতার নিরিখে, তবে আমার উত্তর, না!’। হ্যারল্ড কফিন (Harold Coffin) ক্যাম্বরিয়ান বিস্ফোরন, মধ্যবর্তী ফসিলের অভাব ইত্যাদি নানা অভিযোগে বিবর্তনকে অভিযুক্ত করলেন। কিন্তু কোঁসুলীর জেরার সামনে আসল গোমড় ফাঁস হয়ে গেল।

জেরার নমুনা :

> প্রঃ ১৯৫৫ সালে আপনার পি এইচ ডি-র পর তো কেবলমাত্র দুটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আছে স্ট্যান্ডার্ড সায়েন্টিফিক জার্নালে, না?
>
> উঃ হ্যাঁ, ঠিক।
>
> প্রঃ বলা হয় যে ক্যানাডার বার্জেস শেল (Burgess shale) তো ৫০০ মিলিয়ন বছরের বেশী পুরোন, কিন্তু আপনার তো ধারণা এটির বয়স মাত্র ৫০০০ বছর, তাই না?
>
> উঃ হ্যাঁ।
>
> প্রঃ বাইবেল না থাকলে তো পৃথিবী যে মিলিয়ন বছরের পুরোন তা মানতে আপনার কোন অসুবিধা ছিল না, তাই না?
>
> উঃ হ্যাঁ, যদি বাইবেল না থাকত।

দেখা গেল যে পাঁচজন বিজ্ঞানীকে সৃষ্টি-বিজ্ঞান সমর্থন করার জন্য আদালতে আনা হয়েছে তারা সবাই Creation Research Society (CRS)-এর সদস্য। তারা সকলেই একটি শপথনামায় সাক্ষর করেছিলেন এই মর্মে যে তারা বাইবেলের বাণীকে আক্ষরিক (literal interpretation) অর্থেই গ্রহণ করেন। CRS এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্গারেট হেলডার (Margatet Helder) আদালতে স্বীকার করলেন যে বিশেষ সৃষ্টিবাদের (special creation) পক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ নেই।

ফেডারেল জজ উইলিয়াম ওভার্টনের সামনে আরকানসাসের ভারসাম্যমূলক বিচারের ধারাকে

‘অসাংবিধানিক’ হিসেবে ঘোষণা করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকলো না। তিনি ১৯৮২ সালের ৫ই জানুয়ারী বিচারের রায়ে ঘোষণা করলেন এই তথাকথিত ‘সৃষ্টি বিজ্ঞান’ আসলে ‘সৃষ্টির বাইবেলীয় ভাষ্যকে সরকারী স্কুলের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার সুচতুর প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়।’ এ ধরনের প্রচেষ্টা আমেরিকার সংবিধানের প্রথম সংশোধনীকে লংঘন করে।

একইভাবে ১৯৮৫ সালে লুইজিয়ানাতেও ফেডারেল জজ অ্যাড্রিয়ান ডুপ্লান্টিয়ার (Adrian Duplantier) ‘অসাংবিধানিক’ আখ্যা দিয়ে তথাকথিত সৃষ্টিবিজ্ঞানকে বাতিল করে দেন। পরবর্তীতে আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ১৯৮৭ সালের রায়ে সৃষ্টিতত্ত্বকে বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে ‘ধর্মীয় প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর’ অভিযোগে অভিযুক্ত করে স্কুল কলেজে এর অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয় [২৪]।

ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন : ‘আধুনিক সৃষ্টিবাদ’ এর জন্ম

আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ১৯৮৭ সালে এক ঐতিহাসিক রায়ে ক্রিয়েশন সায়েন্সকে ‘বৈজ্ঞানিক নয়’ বরং ‘রিলিজিয়াস ডগমা’ হিসেবে চিহ্নিত করে দেওয়ার পর পরই সৃষ্টিবাদীরাও বুঝে গিয়েছিলেন যে এভাবে আর সচেতন জনসাধারণকে বোকা বানিয়ে রাখা যাবে না। তারা যখন দেখলো যে বিজ্ঞানীমহল কিছুতেই তাদের অবৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলোকে সমর্থন করছে না তখন তারা সত্যিকার অর্থেই মরিয়া হয়ে উঠল। গোপনে গোপনে জন্ম হল ‘আধুনিক সৃষ্টিবাদের’। এই ‘আধুনিক সৃষ্টিবাদী’রা তাদের পুর্বসূরীদের ভুল থেকে মূলতঃ তিনটি শিক্ষা নিলেনঃ

> প্রথমতঃ তারা বুঝেছিলেন কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশ্বাসকে (sectarian belief) বিজ্ঞান হিসেবে চালানো যাবে না, বরং সার্বজনীন সৃষ্টিকর্তার পক্ষেই ‘সাক্ষ্য-প্রমাণ’ হাজির করতে হবে।
>
> দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টিতত্ত্বের যে সমস্ত পূর্বতন দাবীগুলো হাস্যকর শোনায় এবং বৈজ্ঞানিক মহলে এবং সচেতন জনগণের মধ্যে ইতোমধ্যেই পরিত্যক্ত হয়েছে (যেমন বাইবেল কথিত পৃথিবীর বয়স- ছ’হাজার বছর) সেগুলো বাদ দিয়ে আধুনিক এবং বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি হাজির করা।
>
> তৃতীয়তঃ বিজ্ঞান যে কেবল ‘প্রাকৃতিক নিয়ম দিকে জগৎকে ব্যাখ্যা করে’ -এই মনোভাবকে ‘গোঁড়ামীপূর্ণ’ হিসেবে চিহ্নিত করে অপার্থিব অলৌকিক সত্ত্বাকে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের আওতায় নিয়ে আসা।

মোদ্দা কথা হল বিবর্তনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য তাদের মূলতঃ দু’টো নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হলো: একদিকে তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়লো আরেকটু ‘সফিসটিকেটেড’ তত্ত্বের আর অন্যদিকে অর্থ প্রতিপত্তি এবং রাজনৈতিক চালের জোড়ে সরকারী মাধ্যমগুলোতে আইডির পক্ষে সমর্থন জোগাড় করা। অর্থাৎ, সোজা পথে যদি স্কুল কলেজে তাদের সৃষ্টিতত্ত্ব ঢোকানো না যায় তাহলে বাঁকা পথে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি, বিশেষতঃ যখন ক্ষমতা এবং অর্থ কোনটারই তাদের অভাব নেই। আর তারই

ফলাফল হচ্ছে আজকের এই সৃষ্টির 'বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প' (Intelligent Design argument), বা সংক্ষেপে আইডি।

তত্ত্ব হিসেবে 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন' বা 'বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প'কে সাধারণ মানুষের সামনে হাজির করা হয় বিগত নব্বই এর দশকে। মাইকেল বিহে, উইলিয়াম ডেম্বস্কি, ফিলিপ জনসন, জোনাথন ওয়েলস প্রমুখ এ তত্ত্বটির প্রবক্তা এবং প্রচারক। প্রবক্তাদের সকলেই মোটা অঙ্কের অর্থপুষ্ট রক্ষণশীল খ্রীষ্টান সংগঠন *ডিস্কোভারি ইন্সটিটিউটের* (Discovery Institute) সাথে যুক্ত। এঁদের যুক্তি হল, আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ড এবং সর্বোপরি জৈব জীবন এতই জটিল এবং অনন্যসাধারণ যে প্রাকৃতিক উপায়ে সেগুলো উদ্ভুত হতে পারে না, এবং এর পেছনে এক বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনাকারীর পরিকল্পনার ছাপ আছে। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা মহাবিশ্ব এবং পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির পিছনে ঈশ্বর জড়িত থাকবার ব্যাপারটা মুখ ফুটে সরাসরি না বললেও সেদিকেই প্রায়শঃ ইঙ্গিত করে বলেন, বৈজ্ঞানিক ডেটাগুলো শুধু প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় কিংবা উচিৎ ও নয়, এগুলোকে সঠিকভাবে বোঝা যাবে তখনই, যখন এক সৃজনশীল সজ্ঞাত সত্ত্বার (intelligent agent) সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের আলোকে এগুলোকে দেখার চেষ্টা এবং বিশ্লেষণ করা হবে। প্রথম দিকে বৈজ্ঞানিক মহলে সুবিধা করতে না পারলেও বিজ্ঞান বিষয়ে অসচেতন রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিমন্ডলে এই 'আধুনিক সৃষ্টিবাদী'রা আক্ষরিক অর্থেই তর্ক-বিতর্কের টাইফুন ছুটিয়ে দিতে সমর্থ হয়। আর বরাবরের মত তো আমেরিকান সরকার আর মৌলবাদী খ্রীষ্টান চার্চ পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ার জন্য তো মুখিয়ে ছিলই। যেমন, ভিয়েনার রোমান ক্যাথলিক আর্চ বিশপ Christoph Schonborn 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' এর ৭ ই জুলাই, ২০০৫ সংখ্যায় পরিস্কার ঘোষণা করেন যে ক্যাথলিক চার্চ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা বিবর্তনকে অস্বীকার করে। এর একমাস পরেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ একটি প্রেস কনফারেন্সে ঘোষণা করেন যে, তিনি স্কুল কলেজে বিবর্তন এবং 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' দুটোই পড়ানোর পক্ষে [২৭]।

তারা তাদের কৌশলের অংশ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষ জনগণের কাছে গিয়ে দাবী করে যে এই 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' তত্ত্বের সাথে আসলে ধর্মের কোনই সম্পর্ক নেই। এটি সম্পূর্ণ ভাবেই একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। যেমন, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের অন্যতম প্রবক্তা এবং *ডিস্কোভারি ইন্সটিটিউটের* অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব উইলিয়াম ডেম্বস্কি তার 'The Design Revolution' (২০০৪) বইয়ে বলেন [২৮] :

> 'সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পটি কোন প্রোটেস্ট্যান্ট- খ্রীষ্টান সংক্রান্ত বিষয় না, এমনকি সাধারণ খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের ব্যাপারও নয় .... এটি এক অগ্রসর বৈজ্ঞানিক গবেষনামূলক কর্মসূচী। এ অনুকল্পের প্রবক্তারা এটার উৎকর্ষতা এবং ন্যায্যতা কোন ধরনের ধর্মীয় আবেদন হাজির না করেই বৈজ্ঞানিক মহলে উত্থাপন করতে সচেস্ট।'

সেই ডেম্বস্কিই আবার খ্রীষ্টানদের সভাসমিতিতে গিয়ে তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষনা করে বলেন, তার লক্ষ্যই হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টকে বিজ্ঞানের জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। তিনি তার 'Intelligent Design: The Bridge Between Science and Theology' (১৯৯৯) বইয়ে সুস্পস্ট ভাবেই লিখেছিলেন [২৮] :

> 'বিজ্ঞানের যে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি যীশু খ্রীষ্টকে দৃশ্যপট থেকে বিতারিত করে দিয়েছে সেগুলোকে মৌলিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে দেখতে হবে। যীশুকে বাদ দিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর গভীর ধারণা লাভ করা যায় না।'

অর্থাৎ, আইডির প্রবক্তারা ঠিক করেছেন তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে গিয়ে 'রথও দেখবেন' আবার 'কলাও বেঁচবেন'। জনগণের সেক্যুলার অংশকে হাত করার লক্ষ্যে তারা ক্রমাগত প্রচার চালান যে তাদের তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক, এর সাথে ধর্মের কোনই সম্পর্ক নেই, কিন্তু তাদের আসল গোমড় ফাঁস হয়ে যায় যখন তারা রক্ষণশীল মৌলবাদী সংগঠনের লোকজনের সাথে মিশতে গিয়ে বিশ্বাসের ঝাঁপি উপুর করে দেন!

ডিস্কোভারি ইন্সটিটিউটের আরেক কর্ণধর জোনাথন ওয়েলস 'Unification Church' এর আজীবন সদস্য। তিনি 'Moonie in-house journal' এ 'Darwinism : Why I went for a second PhD' শিরোনামের একটি প্রবন্ধে পরিস্কার করেই বলেন তার জীবনের একমাত্র ব্রতই হচ্ছে ডারউইনিজম ঠেকানো। তিনি লিখেছেন [২৯] :

> 'পিতার (চার্চের ফাদার Reverend Moon) উপদেশ, আমার শিক্ষা আর প্রার্থনা আমাকে এই মর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে যে আমি আমার পুরো জীবন ডারউইনিজম ধ্বংস করার কাজে নিয়োজিত করব, ঠিক যেমনিভাবে Unification Church এর অনেক সদস্য মার্ক্সিজম ধ্বংস করার কাজে উৎসর্গ করেছেন। যখন পিতা ১৯৭৮ সালে পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য আমাকে (আরো একডজন সেমিনারী গ্র্যাজুয়েট ছাত্রের সাথে) নির্বাচন করলেন, আমি সাথে সাথে এই সম্মুখ সমরে যোগদান করার সুযোগ লুফে নিলাম।'

বিজ্ঞান পড়লেই যে মানুষ 'বিজ্ঞানমনস্ক' হয় না জোনাথন ওয়েলসের উপরোক্ত উক্তিতেও তা আবারো প্রমাণিত হয়। অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স এ প্রসঙ্গে বলেন, 'This quotation alone casts doubt on any claims Wells might have had to be taken seriously as a disinterested seeker after truth-which would seem a fairly minimal qualification for PhD in science'। [৩০]
এই আধুনিক সৃষ্টিতাত্ত্বিকদের দুরভিসন্ধি জনসমক্ষে আরো একবার প্রকাশিত হয়ে যায় যখন হঠাৎ করেই ডিস্কোভারি ইন্সটিটিউটের এক 'গোপন দলিল' ১৯৯৯ সালে ইন্টারনেটে ফাঁস হয়ে যায়। দলিলটি 'ওয়েজ ডকুমেন্ট' (wedge document) নামে কুখ্যাত। দলিলটি http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/2437/wedge.html সাইটে এখনও রাখা আছে। দলিলটির ফাঁস হয়ে যাবার ব্যাপারটি এবং এর নির্ভরযোগ্যতা ডিস্কোভারি ইন্সটিটিউট নিজেই স্বীকার করেছিল [২৮]। দলিলটিতে লেখা আছে, 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন'- এর পুরোধাদের প্রধানতম লক্ষ্যই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদকে শিক্ষা, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অঙ্গন থেকে হটিয়ে দিয়ে সব জায়গায় ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিষ্ঠিত করা আর যে প্রাকৃতিক এবং বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে বিজ্ঞানের সৌধ গড়ে উঠেছে তার মূলে কুঠারাঘাত করা। মজার ব্যাপারটা হচ্ছে, দলিলটিতে আরও বলা হয়েছে, তাদের মূল আক্রোশটা হচ্ছে বস্তুবাদের পুরোধা ডারউইন, মার্ক্স এবং ফ্রয়েডের উপর। তারা বিজ্ঞানের বিরোধীতা করতে যেয়ে এতই অন্ধ হয় গেছেন যে, ডারউইন, মার্ক্স এবং ফ্রয়েড সবার দর্শনকে একাকার করে ফেলেছেন, তাদের পার্থক্যগুলো বোঝারও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। সে যাই হোক, আজকে অনেক আগ্রসর ধার্মিক এবং সৃষ্টিবাদী ব্যক্তিই বিবর্তনকে মেনে নিয়েছেন এই বলে যে তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সাথে এর কোন দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু ফিলিপ জনসনসহ আইডি প্রবক্তারা এতটাই অন্ধ মৌলবাদী যে তাদের ধার্মিক বিবর্তনবাদীদের (যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, এবং বিবর্তনবাদকেও একটি বাস্তবতা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন) প্রতিও বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই [২৪]।

ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন প্রবক্তরা পূর্বতন সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে তাদের পার্থক্য করতে চাইলেও প্রতিবারই তাদের প্রচেষ্টা মাঠে মারা গেছে। এমনকি ডোভার কোর্টের মামলায় এটিও প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে, Of Pandas and People নামের যে বইটি তারা ডোভার স্কুলের পাঠ্য পুস্তক হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন সেটির মূল লেখক Dean Kenyon এর কিছুদিন আগেই What is Creation Science? নামে একটি বইয়ের ভুমিকা লিখেছিলেন। বইয়ের দ্বিতীয় লেখক Percival Davis আবার বাইবেলীয় ছয় হাজার বছরের 'ইয়ং আর্থ' সমর্থন করে একটি বই লিখেছিলেন যার নাম - A Case for Creationism। তবে সবচেয়ে লজ্জাকর যে ব্যাপারটি প্রকাশিত হয়ে যায় তা হল, Of Pandas and People বইটি নিজেই একটি সৃষ্টিতাত্ত্বিক বই, যেটি ১৯৮৩ সালে 'Creation Biology' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে একই বই বেরোয় 'Biology and Creation' নামে। Of Pandas and People বইটি আসলে 'Biology and Creation' এরই হুবহু কপি শুধু 'creation' শব্দটি সরিয়ে দিয়ে 'Intelligent design' শব্দটি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর 'Creator' এর জায়গায় 'Designer' বসানো হয়েছে।

নিঃসন্দেহে সচেতন মহলের কাছে আইডি প্রবক্তাদের এহেন 'লুকোচুরি খেলা' একদমই গ্রহনযোগ্যতা পায় নি। ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্বের প্রবক্তারা তত্ত্বটিকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে চালাতে চাইলেও বৈজ্ঞানিক মহলে এটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে; শুধু তাই নয়, এটিকে 'উত্তম মোড়কে সৃষ্টিবাদ' (better-packaged creationism), 'সস্তা জ্যাকেটে সৃষ্টিবাদ' (creationism in a cheap tuxedo), লুকানো সৃষ্টিবাদ (stealth creationism) ইত্যাদি বিভিন্ন অভিধায় অভিষিক্ত করা হয় [৩১]।

আজকে আমেরিকাসহ সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে জীববিজ্ঞানীরা, বিজ্ঞানের এবং নিজেদের টিকে থাকার স্বার্থেই ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছেন। বেশীর ভাগ জায়গায়ই আইডি সমর্থকদের পরাজয় ঘটলেও ছোট খাটো কিছু জায়গায় তারা দিব্যি ঢুকে পড়তে পেরেছে, ওহাইও এবং কানসাসের দু'টি ছোট স্কুল বোর্ড (যেখানে রক্ষনশীল রিপাবলিকান দলের সদস্য সংখ্যা বেশী) ইতোমধ্যেই তাদের জীববিজ্ঞানের পাঠ্যসুচীতে বিবর্তনবাদে সংশয় প্রকাশ করা উচিত বলে লাইন যোগ করে দিয়েছে। জর্জিয়ায় কব কাউন্টি স্কুল বোর্ড বিবর্তন একটি তত্ত্ব হলেও তা সত্য নয় বলে বইতে স্টিকার লাগিয়ে দেয়, পরে অবশ্য তারা তা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলো। জীববিজ্ঞানী ডঃ টিম বেড়া তার (Evolution and the Myth of Creationsim: a basic guide to the facts in the Evolution Debate) বইয়ের ভুমিকাতে লিখেছেন যে এতদিন বিজ্ঞানীরা সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের এইসব কর্মকান্ডকে অবহেলা করে এসেছে, শুধু গবেষণার কাজ করাকেই কর্তব্য মনে করেছে। কিন্তু আজকে আমেরিকায় এরা এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, এরা মানব সভ্যতার জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেছে, বিজ্ঞানীদের জন্য আর চুপ করে বসে থাকা ঠিক হবে না। তাই আজকে আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের বড় বড় জীববিজ্ঞানীরা যেখানেই আইডি নিয়ে মামলা হচ্ছে সেখানেই ছুটে যাচ্ছেন সাক্ষ্য দিতে, মিডিয়ার বক্তব্য রাখছেন, বিজ্ঞান বিশেষতঃ বিবর্তনবাদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বই লিখছেন, ইন্টারনেটে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটগুলোতে বিস্তারিত লিখছেন এবং বিভিন্নভাবে এ বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।

ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইনের দেওয়া 'যুক্তি'গুলো

'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন' বা বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পের দুটি ভাষ্য পাওয়া যায়। একটি ভাষ্য পাওয়া যায়

জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, যেটি বলে আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মান্ড এমন কিছু চলক বা ভ্যারিয়েবলের সূক্ষ্ম সমন্বয়ের (Fine Tuning) সাহায্যে তৈরী হয়েছে যে এর একচুল হের ফের হলে আর আমাদের এ পৃথিবীতে কখনই প্রাণ সৃষ্টি হত না। অর্থাৎ, পরবর্তীতে প্রাণ সৃষ্টি করবেন এই ইচ্ছাটি মাথায় রেখে ঈশ্বর (কিংবা হয়ত অন্য কোন বুদ্ধিমান সত্ত্বা) বিশ্বব্রহ্মান্ড তৈরী করেছিলেন, আর সে জন্যই আমাদের মহাবিশ্বঠিক এরকম; এত নিখুঁত, এত সুসংবদ্ধ।

আর ওদিকে 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন'এর জীববিজ্ঞানের ভাষ্যটি বলছে ঠিক তার উলটো কথা। জীববিজ্ঞানের আইডি প্রবক্তা 'ফাইন টিউনার'রা যে ভাবে যুক্তি সাজিয়ে থাকেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা দেন ঠিক উলটো যুক্তি। জীববিজ্ঞানের আইডির প্রবক্তারা বলেন আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে এতটাই **অনুপযুক্ত** যে প্রাকৃতিক নিয়মে এখানে এমনি এমনি প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে না। আবার জ্যোর্তিবিজ্ঞানের আইডি ওয়ালারা উলটো ভাবে বলেন, এই বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে এতটাই **উপযুক্ত** যে এই বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাকৃতিক নিয়মে কোনভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। একসাথে দুই বিপরীতধর্মী কথা তো সত্য হতে পারে না। বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পের এই দুটি ভাষ্য নিয়েই তাহলে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করা যাক।

আমরা জীববিজ্ঞানের 'বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প'গুলোই বিবেচনায় আনব আগে। কারণ, দুনিয়া জুড়ে এদের প্রাবল্য আর জোয়ারই বেশী। তারাই ডারউইনীয় বিবর্তনবাদকে পাঠ্যপুস্তক থেকে হটিয়ে 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন'কে তার স্থলাভিষিক্ত করতে চান। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক ডেনিয়েল ডেনেট বলেন [২৭] :

> 'সৌভাগ্যক্রমে অযথা কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করার জন্য আজকের দিনে পদার্থবিদদের খুব বেশী প্রণোদনা নেই। কারণ পদার্থবিদদের আর সাধারণ মানুষদের কাছে গিয়ে গিয়ে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আর আপেক্ষিক তত্ত্ব বুঝানোর চেষ্টা করে সময় নষ্ট করতে হয় না কারণ ওগুলো ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিক মহলে এবং তার বাইরে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে।
>
> কিন্তু বিবর্তনের ব্যাপারটা আলাদা। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের মৌলিক ধারণাটি শুধু মাত্র চিন্তার উদ্রেগকারকই নয়, এটি অত্যন্ত শক্তিশালী 'ডিজাইন আর্গুমেন্ট'কে বাতিল করে দেয়, যেটি দীর্ঘদিন ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রধানতম যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হত। সে জন্যই যত প্রণোদনা আজও দেখা যায় তার প্রায় সবই জীববিজ্ঞানীদের ঠেকানোর ক্ষেত্রে।'

আইডির জীববিজ্ঞানীরা সেই পুরোন চোখকে আবারো তাদের তত্ত্বের এক প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। আসলে 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন'-এর ব্যানারে, প্যালের সেই সৃষ্টতত্ত্বের যুক্তিই যে বিগত কয়েক দশকে আবার নতুন মোড়কে ফিরে এসেছে তা চোখ নিয়ে আইডি প্রবক্তাদের নতুন করে গজিয়ে ওঠা 'বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তি' গুলো আলোচনা করলেই বোঝা যাবে। আবারও চোখের গঠন নিয়ে তারা অনেক হৈ চৈ শুরু করছেন, তাদের মতে আমাদের চোখের গঠন এত জটিল, সুক্ষ্ম এবং নিখুঁত যে বুদ্ধিমান কোন স্রষ্টার ডিজাইন ছাড়া তা সৃষ্টিই হতে পারে না। ৫%, ১০%, সিকিভাগ বা অর্ধেক চোখ নাকি জীবের কোন কাজে আসতে পারে না। ডঃ রিচার্ড ডকিন্স, ডঃ ইউজিন স্কট, ডঃ জেরি কয়েন, ডঃ কেনেথ মিলার

সহ অনেক বিজ্ঞানী ইতিমধ্যেই তাদের এই দাবিগুলোকে ভুল বলে প্রমাণিত করেছেন।

অনেকেই মনে করেন যে চোখের (কিংবা কান, পাখা, ফুসফুস ইত্যাদি) মত একটি গুরুত্বপুর্ণ অংশ ধীরে ধীরে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি হতে পারে না, কারণ মধ্যবর্তী পর্যায়গুলো স্বতন্ত্রভাবে ঠিকমত কাজ করতে পারবে না, এবং তার ফলে তাদের কোন উপযোগিতাই থাকতে পারে না। তারা আসলে এখানে বিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ দিকটিই বুঝতে পারেন না বা এড়িয়ে যেতে চান। আমরা আগেই দেখছি যে, জীবের কোন অংশকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের দৃষ্টিকোন থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে আসার জন্য পুর্ণাংগভাবে বিকাশিত হতে হয় না। অন্ধ হওয়ার থেকে আংশিক দৃষ্টিশক্তি থাকা অনেক ভালো। আমাদের মধ্যে অনেকেরই দৃষ্টিক্ষীণতার (myopia) বা দুরের বা কাছের দৃষ্টিহীনতার সমস্যা আছে, তার ফলে আমরা দুরে বা কাছে অস্পষ্ট দেখি। কিন্তু আমরা যদি আদিম কালের মত বন্য জীবন যাপন করতাম এই সীমাবদ্ধতাসহ চোখই আমাদেরকে অনেকখানি সুবিধা এনে দিতে পারতো। আমরা খাওয়া, আশ্রয়, সঙ্গী বা শিকারী পশুদের দেখতে পেতাম, তাদের নড়াচড়া বুঝতে পারতাম। যে জনসমষ্টির মধ্যে কোন দৃষ্টিশক্তিই নেই বা খুবই সীমিত দৃষ্টিশক্তি আছে তাদের জন্য চোখের উদ্ভব বা চোখের মত যে কোন অঙ্গের বিন্দুমাত্র উন্নতিই অনেক বাড়তি সুবিধা এনে দেবে। একেবারেই দর্শনশক্তি না থাকা মানে হচ্ছে সে পুরোপুরিই অন্ধ, এখন প্রাণীটির মধ্যে যদি অর্ধেক বা সিকিভাগ দৃষ্টিক্ষমতাও বিকাশ লাভ করে তাহলেই সে কিছু হলেও তার শিকারীর গতিবিধি দেখতে পাবে বা বুঝতে পারবে। চোখের এইটুকু আংশিক বিকাশই প্রাণীটির বেঁচে থাকা বা না থাকার মধ্যে বিশাল একটি ভুমিকা রাখতে পারে। একই যুক্তি খাটে পাখার ক্ষেত্রেও, আমরা চারপাশে আংশিক পাখাসহ প্রচুর প্রাণী দেখতে পাই। টিকটিকি, ব্যাঙ, শামুক জাতীয় গ্লাইড করে চলে এমন অনেক প্রাণীর মধ্যেও আংশিক পাখার মত অংশ দেখতে পাওয়া যায়। গাছে থাকে এমন অনেক প্রাণীর দুই জয়েন্টের মাঝখানে পাখার মত একধরনের চামড়ার অস্তিত্ব দেখা যায় যেটা আংশিকভাবে বিকশিত পাখা বৈ আর কিছু নয়। পাখাটি কত ছোট বা বড় তা এখানে ব্যাপার নয়, প্রাণীটি যদি কখনও গাছ থেকে পড়ে যায় তাহলে ওইটুকু পাখা ব্যবহার করেই সে তার জীবন বাঁচাতে পারবে যা কিনা তাকে টিকে থাকতে বাড়তি সুবিধা জোগাবে।

আইডি প্রবক্তাদের আরেকটি অতিপ্রিয় যুক্তি হচ্ছে চোখের নিখুঁত গঠন যা তাদের মতে কোন বুদ্ধিদীপ্ত সৃষ্টিকর্তার হস্তক্ষেপ ছাড়া সৃষ্টিই হতে পারে না। আর অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা বলেন, বিবর্তন বা প্রাকৃতিক নির্বাচন যেহেতু শুধুমাত্র বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ সময় ধরে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হতে হতে আরও উন্নততর রূপে পরিণত হয়, তাই খুব যুক্তিসঙ্গত কারণেই প্রাণীর মধ্যে অনেক ত্রুটিপূর্ণ অংগপ্রত্যংগ দেখা যায়। এ প্রেক্ষিতে এখন দেখা যাক আইডি-ওয়ালারা যেমনটি দাবী করছেন, মানুষের চোখ আসলেই সেরকম ত্রুটিহীন বা নিখুঁত কিনা। চোখের অক্ষিপটের (Retina) ভিতরে একধরনের আলো-গ্রহনকারী (Photoreceptor or photo cells) কোষ আছে যারা বাইরের আলো গ্রহন করে এবং তারপর একগুচ্ছ দর্শন স্নায়ুর (Optic nerve or ganglion cells) মাধ্যমে তাকে মস্তিস্কে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে, যার ফলে আমরা দেখতে পাই। কোন বুদ্ধিমান স্রষ্টা নিশ্চয়ই জালের মত করে ছড়িয়ে থাকা এই স্নায়ুগুলোকে আলো গ্রহনকারী কোষগুলোর সামনের দিকে বসিয়ে দেবেন না! কারণ তাহলে তো বেশ কিছু আলো বাধা পাবে, আমরা এই বাধাটুকু না থাকলে যতখানি দেখতে পেতাম তার থেকে কম দেখতে পাবো এবং এর ফলে আমাদের দৃষ্টির মান অনেক কমে যাবে! কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, বাস্তবেই আমাদের চোখ ওরকম। আমাদের অক্ষিপটের ঠিক সামনে এই স্নায়ুগুলো জালের মত ছড়ানো থাকে, শুধু তাই না, এই স্নায়ুগুলোকে যে রক্তনালীগুলো রক্ত সরবরাহ করে তারাও আমাদের অক্ষিপটের সামনেই বিস্তৃত থাকে, এর ফলে আলো বাধা পায় এবং আমাদের দৃষ্টশক্তি কিছুটা হলেও কমে

যায়।

স্নায়ুগুলোর এই অসুবিধাজনক অবস্থানের কারনে আমাদের চোখে আরেকটি বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে । এই স্নায়বিক জালটি মস্তিষ্কে পৌছানোর জন্য অক্ষিপটকে ফুটো করে তার ভিতর দিয়ে পথ করে নেয়। এর ফলে একটি অন্ধবিন্দু (blind spot)-এর সৃষ্টি হয়। আমাদের প্রত্যেকের চোখেই এক মিলিমিটারের মত জায়গা জুড়ে এই অন্ধবিন্দুটি রয়েছে, আমরা আপাতভাবে বুঝতে না পারলেও ওই জায়গাটিতে আসলে আমাদের দৃষ্টি সাদা হয়ে যায়।

তাহলে কি চোখ সৃষ্টির সময় এই সীমাবদ্ধতাগুলো মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় খোলা ছিলো না? তাও তো ঠিক নয়! আমাদের সামনেই এরকম প্রাণীরও উদাহরণ তো রয়েছে যাদের স্নায়ুগুলো খুব নিখুঁতভাবে আলো-গ্রহনকারী কোষগুলোর পিছনে বসানো আছে! স্কুইড এবং অকটোপাসেরও আমাদের মতই একধরনের লেন্স-এবং-অক্ষিপটসহ চোখ আছে, যার প্রয়োজনীয় স্নায়ুগুলো অক্ষিপটের পিছনে অবস্থান করে এবং তার ফলে তাদের চোখে কোন অন্ধবিন্দু-এর সৃষ্টি হয়নি। আসলে বিবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে আমাদের চোখের এই সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটিকে কে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। বিবর্তন কাজ করে শুধুমাত্র ইতিমধ্যে তৈরী বা বিদ্যমান গঠনকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে, সে নতুন করে কিছু সৃষ্টি বা বদল করতে পারে না। মেরদন্ডী প্রাণীর চোখ সৃষ্টি হয়েছে মস্তিস্কের বাইরের দিকের অংশকে পরিবর্তন করে যা অনেক আগেই সৃষ্টি হয়েছিলো, বহুকাল ধরে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মস্তিস্কের এই অংশটি পরিবর্তিত হতে হতে আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা লাভ করেছে। মস্তিষ্কের এই সংবেদনশীল কোষগুলো অক্ষিপটের আকার ধারণ করলেও মস্তিষ্কের পুরোনো মূল গঠনটি তো আর বদলে যেতে পারেনি, তার ফলে এই জালের মত ছড়িয়ে থাকা স্নায়ুগুলোও তাদের আগের অবস্থানেই রয়ে গেছে। কিন্তু অন্যদিকে মলাস্ক (স্কুইড বা অকটোপাস) জাতীয় প্রাণীর চোখ বিবর্তিত হয়েছে তাদের চামড়ার অংশ থেকে, মস্তিষ্কের অংশ থেকে নয়। এক্ষেত্রে ত্বকের স্নায়ুগুলো মস্তিষ্কের মত ঠিক বাইরের স্তরে না থেকে ভিতরের স্তরে সাজানো থাকে, আর এ কারণেই স্নায়ুগুলো মলাস্কের চোখের অক্ষিপটের সামনে নয় বরং পিছনেই রয়ে গেছে। আমাদের চোখ যদি এভাবে লাখ লাখ বছর ধরে প্রাকৃতিকভাবে বিবর্তিত না হয়ে কোন পূর্বপরিকল্পিত ডিজাইন থেকে তৈরী হত তাহলে হয়তো চোখের এত সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিজ্ঞানীদেরও আর মাথা ঘামাতে হত না।

আণবিক জীববিজ্ঞানের কথা না উল্লেখ করলে চোখ নিয়ে আলোচনা তো সম্পূর্ণই হবে না। বিগত কয়েক দশকে জীববিজ্ঞানের এই শাখাটি রীতিমত বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে। জীববিজ্ঞানের মূল গবেষণা এখন চোখের মত 'বড় কাঠামো' থেকে সরে এসে তার কোষে এসে ঠেকেছে। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফলগুলো রীতিমত বিস্ময়কর। দেখা গেছে, কীট-পতঙ্গের চোখের সাথে মানুষের চোখের কাঠামোগত যত বৈসাদৃশ্যই থাকুক না কেন, এরা একই ধরনের বংশানুসৃত দ্রব্য দিয়ে তৈরী। আলোর প্রতি সংবেদনশীল প্রোটিন Opsins এবং Pax6 নামে একটি প্রধান নিয়ামক জিন (master controll gene) খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা যা দিয়ে তারা ইঁদুর থেকে শুরু করে ফ্রুট ফ্লাই এবং ফ্রুট ফ্লাই থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সকল প্রজাতির চোখের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করতে পারেন[৩৫]। শুধু তাই নয় অন্ধ ড্রসোফিলার মধ্যে এ জিনটি প্রবেশ করিয়ে কৃত্রিমভাবে চোখের উদ্ভবও ঘটানো হয়েছে [৩৫, ৩৬]। এই জিনের আবিস্কার চোখের বিবর্তনের ধারাটিকে আরো স্পষ্ট ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। এ কারণেই নেইল শ্যাঙ্কস তার 'গড দ্য ডেভিল এন্ড ডারউইন' বইয়ে উল্লেখ করেছেন - 'চোখের ব্যাপারটা বিবর্তনবাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠার বদলে বরং আজ বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ হিসেবেই বরং আবির্ভূত

হয়েছে।' [১২]

লিহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়নবিদ ডঃ মাইকেল বিহে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের একজন অন্যতম প্রবক্তা। তাঁর 'Darwins Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution' (১৯৯৬) বইটয়া নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিক কালে ইনটেলিজেন্ট ডিজাইনের সমর্থনে সবচেয়ে শক্তিশালী বই। এ বইয়ে ডঃ বিহে হ্রাস-অযোগ্য জটিলতা (Irreducible complexity) নামে একটি নতুন শাব্দিক পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন, সরল অবস্থা হতে জটিল জীবজগতের সৃষ্টি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টি হতে পারেনা। কিন্তু 'হ্রাস-অযোগ্য জটিলতা'- জিনিসটা কি? ডঃ বিহে তার বইয়ে ব্যাখ্যা করেছেন [৩২] :

> 'যে সমস্ত জৈব তন্ত্র (Biological system) নানা ধরনের, পর্যায়ক্রমিক, কিংবা সামান্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কোনভাবেই গঠিত হতে পারে না, তাদের আমি 'হ্রাস-অযোগ্য জটিল' (Irreducible complex) নামে অভিহিত করি। 'হ্রাস-অযোগ্য জটিলতা' আমার দেওয়া এক বর্ণাঢ্য শব্দমালা যার মাধ্যমে আমি পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় (interaction) অংশ নেওয়া একাধিক যন্ত্রাংশের একটি সিস্টেমকে বোঝাই - যার মধ্য থেকে একটি অংশ খুলে নিলেই সিস্টেমটি আর কাজ করবে না।'

বিহে পুরো ব্যাপারটি বোঝাতে মানুষের ডিজাইন করা ইঁদুর ধরার কলের (mouse trap) উদাহরণ হাজির করেছেন। এ সাধারণ যন্ত্রটির মধ্যে থাকে ১) কাঠের পাটতন, (২) ধাতব হাতড়ি যার সাহায্যে ইদুর মারা হয়, (৩) স্প্রিং যার শেষ মাথাটি হাতুড়ির সাথে আটকানো থাকে, (৪) একটি ফাঁদ যা স্প্রিংটিকে বিমুক্ত করে (৫) এবং একটি ধাতব দন্ড যা ফাঁদের সাথে যুক্ত থাকে এবং হাতুরীটিকে ধরে রাখে। বিহের যুক্তি হল শুধু প্ল্যাটফর্ম বা স্প্রিং এর সাহায্যে ইঁদুর ধরা যায় না। ইঁদুর তখনই কলে ধরা যাবে যখন পুরো সিস্টেমের সকল যন্ত্রাংশগুলো এক সাথে কাজ করবে। যে কোন একটি যন্ত্রাংশকে খুলে ফেললেই ইঁদুর ধরার কলের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই বিহের মতে, এটি একটি 'হ্রাস-অযোগ্য জটিল' সিস্টেমের ভাল উদাহরণ। ঠিক একইভাবে বিহে মনে করেন প্রকৃতিতে ব্যাকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলামগুলো 'হ্রাস-অযোগ্য জটিল'। এ ফ্ল্যাজেলামগুলোর প্রান্তদেশে এক ধরনের জৈব-মোটর আছে যেগুলোকে ব্যাকটেরিয়ার কোষগুলো স্ব-প্রচালনের (self-propulsion) কাজে ব্যবহার করে। তার সাথে চাবুকের মত দেখতে এক রকমের প্রপেলারও আছে, যেগুলো ওই আনবিক মোটরের সাহায্যে ঘুরতে পারে। প্রোপেলারগুলো একটি 'ইউনিভার্সাল জয়েন্টের' মাধ্যমে মোটরের সাহায্যে লাগানো থাকে। মোটরটি আবার এক ধরনের প্রোটিনের মাধ্যমে জায়গামত রাখা থাকে, যেগুলো বিহের মতে স্ট্যাটরের ভূমিকা পালন করে। আরেক ধরনের প্রোটিন বুশিং পদার্থের ভূমিকা পালন করে যার ফলে চালক-স্তম্ভদন্ড (drive shaft)টি ব্যাকটেরিয়ার মেমব্রেনকে বিদ্ধ করতে পারে। বিহে বলেন, ব্যাকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলামকে ঠিকমত কর্মক্ষম রাখতে ডজনখানেক ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিন সম্মিলিত ভাবে কাজ করে। যে কোন একটি প্রোটিনের অভাবে ফ্ল্যাজেলাম কাজ করবে না, এমন কি কোষ গুলোও ভেঙ্গে পড়বে।

জীববিজ্ঞানীরা বিহের সবগুলো যুক্তিকেই খন্ডন করেছেন। বিহের উদাহরণে বর্ণিত ওই ইদুঁর ধরার কলটির কথাই ধরুন। কলটি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুলে এর ফাঁদ এবং ধাতব দন্ডটি সরিয়ে নিন। এবার আপনার হাতে যেটি থাকবে সেটি আর ইঁদুরের কল নয়; বরং অবশিষ্ট তিনটি যন্ত্রাংশ দিয়ে গঠিত মেশিনটিকে আপনি সহজেই টাই ক্লিপ কিংবা পেপার ক্লিপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এবারে

স্প্রিংটিকে সরিয়ে নিন। এবারে আপনার হাতে থাকবে দুই-যন্ত্রাংশের এক চাবির চেইন। আবার প্রথমে সরিয়ে নেওয়া ফাঁদটিকে মাছ ধরার ছিপ হিসেবেও আপনি ব্যবহার করতে পারেন, ঠিক যেমনি ভাবে কাঠের পাটাতনটিকে ব্যবহার করতে পারেন 'পেপার-ওয়েট' হিসেবে। অর্থাৎ যে সিস্টেমটিকে এতক্ষণ 'হ্রাস-অযোগ্য জটিল' বলে ভাবা হচ্ছিল, তাকে আরো ছোট ছোট ভাগে ভেঙ্গে ফেলে অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো যায়।

ব্যকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলাম গুলোর ক্ষেত্রে আসা যাক। বিহে যেমন ভেবেছিলেন কোন প্রোটিন সরিয়ে ফেললে ফ্ল্যাজেলাম আর কাজ করবে না, অর্থাৎ পুরো সিস্টেমটিই অকেজো হয়ে পড়বে, তা মোটেও সত্যি নয়। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক কেনেথ মিলার পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন সরিয়ে ফেলার পরও ফ্ল্যাজেলামগুলো কাজ করেছে; বহু ব্যাকটেরিয়া এটিকে অন্য কোষের ভিতরে বিষ ঢেলে দেওয়ার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, ফ্ল্যাজেলামের বিভিন্ন অংশগুলোর আলাদা ভাবে ভিন্ন ভিন্ন কাজ থাকলেও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে তারা সুবিধা পেতে পারে। জীববিজ্ঞানে এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় যে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো এক সময় এক উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীতে অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে সরীসৃপের চোয়ালের হাড় থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর কানের উৎপত্তি। আজকে আমাদের কানের দিকে তাকালে ওটাকে 'হ্রাস-অযোগ্য জটিল' বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আদিতে তা ছিল না। এমন নয় যে, হঠাৎ করেই একদিন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কজাবিহীন চোয়ালের হাড়্গুলো ঠিক করল তারা কানের হাড়ে পরিণত হয়ে যাবে; বরং এর জন্য বিবর্তনের পথ ধরে ধীর পরিবর্তনের মাধ্যমে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়েই তারা আজকের রূপ ধারণ করেছে। কাজেই উৎপত্তির সামগ্রিক ইতিহাস না জেনে শুধুমাত্র চোখ, কান কিংবা ফ্ল্যাজেলামের দিকে তাকালে ওগুলোকে 'হ্রাস-অযোগ্য জটিল' বলে মনে হতে পারে বৈকি।

এ যুগের প্রথিতযশাঃ সংশয়বাদী, টেনিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মাসিমো পিগ্লিউসি তাঁর 'Design yes, intelligent no: a critique of intelligent design theory and neo-creationism' প্রবন্ধে বলেন, জীবজগতে হয়ত বেশ কিছু উদাহরণ থাকতে পারে যেগুলোকে জীববিজ্ঞানীরা বিবর্তন তত্ত্বের আলোকে এ মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে পারছেন না; কারণ জীববিজ্ঞানীদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য নেই। কাজেই এটি মূলতঃ অজ্ঞতা সূচক যুক্তি (Argument from ignorance), কখনই বিহের তথাকথিত Irreducible complexityর প্রমাণ নয়। আমরা এ প্রবন্ধে আগেই উলেখ করেছি যে, উইলিয়াম প্যালে যখন প্রথম আঠারো শতকে 'আর্গুমেনট অব ডিজাইন' বা সৃষ্টির অনুকল্পের অবতারণা করেছিলেন, তখন তিনি চোখের গঠন দেখে যার পর নাই বিস্মিত হয়েছিলেন। প্যালে ভেবেছিলেন চোখের মত একটি জটিল প্রত্যংগ কোন ভাবেই প্রাকৃতিক উপায়ে বিবর্তিত হতে পারে না। কিন্তু আজকের দিনের জীববিজ্ঞানীরা পর্যাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক নিয়মে চোখের বিবর্তনের ধাপগুলো সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছেন। ম্যাট ইয়ং তার 'Grand Designs and Facile Analogies: Exposing Behe's Mousetrap and Dembski's Arrow' প্রবন্ধে বলেন: 'আধা-চোখের যুক্তি গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না দেখে ডঃ বিহে এখন আধা ফ্ল্যাজেলামের যুক্তি হাজির করেছেন; আর একটা গালভরা নামও খুঁজে বের করেছেন -'ইরিডিউসিবল কম্পলেক্সিটি'। কিন্তু এটি ওই পুরোনো আধা চোখের যুক্তিই। আর গালভরা পরিভাষা বাদ দিলে এটি শেষ পর্যন্ত ওই অজ্ঞতাসূচক যুক্তি বা God in gaps।' [৩৩]

এবারে জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প' এর ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যাক[৩৪]। ধরা যাক মাধ্যাকর্ষণের কথা। নিউটন তার মাধ্যাকর্ষণ সূত্রে একটি ধ্রুবক ব্যবহার করেছিলেন যাকে আমরা

বলি নিউটনীয় ধ্রুবক, বা গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট। নিউটন তার সেই বিখ্যাত সূত্রে দেখিয়েছিলেন, দুটো বস্তুর মধ্যে আকর্ষণবলের পরিমান ঠিক কতটা হবে সেটা নির্ণয়ে এই গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট নামের রাশিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি ওই ধ্রুবকটির মান এখন যা আছে তা না হয়ে অন্যরকম হত আকর্ষণ বলের পরিমাণও যেত বদলে। সাদা চোখে মনে হবে যে ব্যাপারটা সামান্যই, আকর্ষণ বল বদলালেও বোধ হয় তেমন কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, ওই ধ্রুবকের মান আসলে আমাদের এই পরিচিত বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রকৃতি নির্ধারণ করছে। ওটার মান এখন যা আছে তা না হয়ে যদি অন্য ধরণের কিছু হত তা হলে এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডটাই হত অন্যরকম। ওই ধ্রুবকের মান ভিন্ন হলে তারাদের মধ্যে হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হয়ে হিলিয়াম উৎপাদনের মাত্রাকে দিত বদলে। হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের পর্যাপ্ততা শুধু এই গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট এর উপরই নয়, মহাকর্ষ এবং দুর্বল পারমাণবিক বলের মধ্যকার শক্তির ভারসাম্যের উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেমন, তাঁরা দেখিয়েছেন, দুর্বল পারমাণবিক বলের শক্তি যদি একটু বেশী হত, এই মহাবিশ্বে পুরোটাই মানে শতকরা একশ ভাগ হাইড্রোজেনে পূর্ণ থাকত, কারণ ডিউটেরিয়াম (এটি হাইড্রোজেনের একটি মাসতুত ভাই, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'আইসোটোপ') আর হিলিয়ামে পরিণত হবার আগেই সমস্ত নিউট্রন নিঃশেষ হয়ে যেত। আবার দুর্বল পারমানবিক বলের শক্তিমত্তা আরেকটু কম হলে সারা মহাবিশ্বে শতকরা একশ ভাগই হত হিলিয়াম। কারণ সে ক্ষেত্রে নিউট্রন নিঃশেষিত না হয়ে তা উৎপন্ন প্রটোনের সাথে যোগ দিয়ে হাইড্রোজেন তৈরীতে বাধা দিত। কাজেই এ দু' চরম অবস্থার যে কোন একটি সঠিক হলে মহাবিশ্বে কোন নক্ষত্ররাজি তৈরী হওয়ার মত অবস্থাই কখনও তৈরী হত না, ঘটত না আমাদের এই মলয়শীতলা ধরণীতে কার্বন-ভিত্তিক প্রাণের নান্দনিক বিকাশ। আবার,বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রনের ভর মাপতে গিয়ে দেখেছেন এই ভর নিউট্রন-প্রোটনের ভরের পার্থক্যের চেয়ে কিছুটা কম যার ফলে তারা মনে করেন, একটি মুক্ত-নিউট্রন সহজেই প্রোটন, ইলেকট্রন ও অ্যান্টি-নিউট্রিনোতে পরিনত হতে পেরেছে।

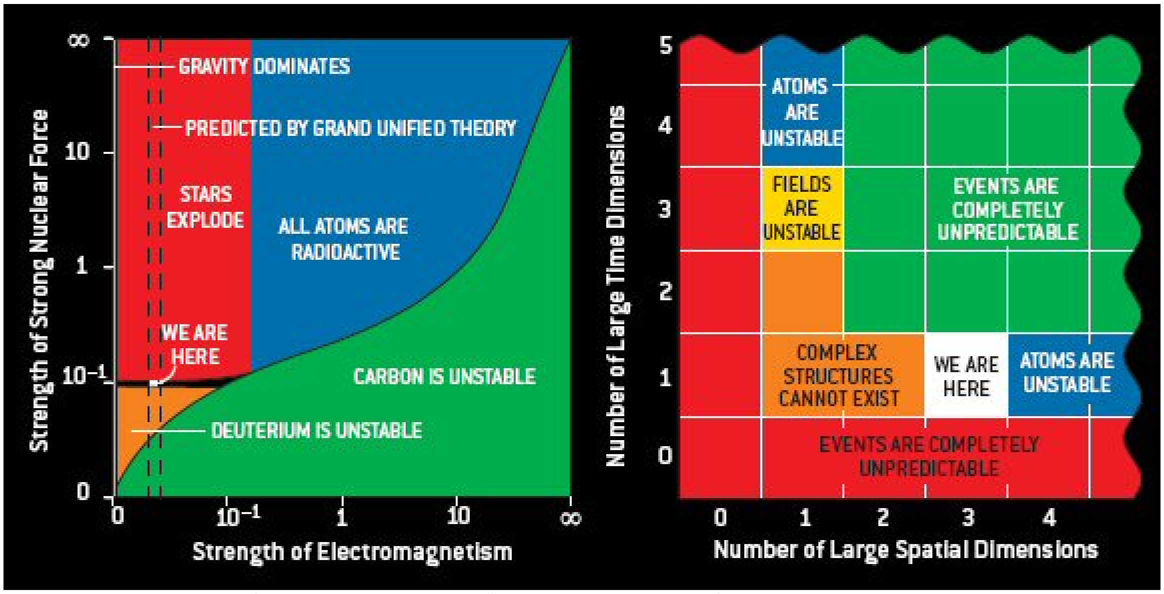

চিত্র ১০.৪ : অনেক বিজ্ঞানী বলেন মহাবিশ্বের খুব সীমিত পরিসরের মধ্যে জীবনের বিকাশ ঘটেছে; এমন কেন হয়েছে তার উত্তর পেতে হলে ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে পৃথিবীতে প্রাণ এবং মানুষের উপস্থিতির দিকে তাকিয়ে।

যদি ইলেকট্রনের ভর সামান্য বেশী হত, নিউট্রন তাহলে সুস্থিত হয়ে যেত, আর উৎপন্ন সমস্ত ইলেকট্রন আর প্রোটন সব একসাথে মিলে-মিশে নিউট্রনে পরিণত হয়ে যেত। এর ফলে যেটা ঘটত সেটা আমাদের

জন্য খুব একটা সুখপ্রদ কিছু নয়। সে ক্ষেত্রে খুব কম পরিমানে হাইড্রোজেনই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকত আর তা হলে নক্ষত্রের জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানীই হয়ত খুঁজে পাওয়া যেত না।

জন ডি. ব্যরো এবং ফ্রাঙ্ক জে. টিপলার এ ধরনের নানা ধরনের রহস্যময় ‘যোগাযোগ’ তুলে ধরে একটি বই লিখেছেন ১৯৮৬ সালে, নাম- ‘The Anthropic Cosmological Principle’। তাঁদের বক্তব্য হল, আমাদের মহাবিশ্বে গ্র্যাভিটেশনাল অথবা কসমলজিকাল ধ্রুবকগুলোর মান এমন কেন, কিংবা মহাবিশ্বের চেহারাটাই বা এমন কেন হয়েছে তার উত্তর পেতে হলে ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে পৃথিবীতে প্রাণ এবং মানুষের উপস্থিতির দিকে তাকিয়ে। পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির জন্য সর্বোপরি মানুষের আবির্ভাবের জন্য এই মৌলিক ধ্রুবক আর চলকগুলোর মান ঠিক এমনই হওয়া দরকার ছিল - সে জন্যই ওগুলো ওরকম। দৈবক্রমে ওগুলো ঘটে নি, ররং এর পেছনে এক বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বার (বিধাতার) একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। মানুষকে কেন্দ্রে রেখে বিশ্বব্রক্ষ্মান্ডের নিয়ম-নীতিগুলোকে ব্যাখ্যা করবার এই যুক্তিকে বলা হয় ‘অ্যানথ্রোপিক আর্গুমেন্ট’ বা ‘নরত্ববাচক যুক্তি’। গণিতবিদ এবং দার্শনিক ডঃ উইলিয়াম ডেম্বস্কি ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘Intelligent Design: The Bridge Between Science & Theology’ বইয়ে তথ্য বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, আমাদের এই মহাবিশ্বের ভিতর যে ধরনের বিমূর্ত তথ্য লুকানো আছে তা কোন ভাবেই প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্ট হতে পারে না।

এধরনের যুক্তিগুলো প্রথম দৃষ্টিতে খুব আকর্ষণীয় দেখালেও, অনুসন্ধিৎসু সংশয়বাদী চোখ দিয়ে দেখলে কিন্তু নানা দুর্বলতা প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ ব্যারো এবং টিপালার যে যুক্তি দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে এটি ধরেই নেওয়া হয়েছে আমাদের পৃথিবীতে যে ভাবে কার্বন ভিত্তিক প্রাণের বিকাশ ঘটেছে সেভাবে ছাড়া আর অন্য কোনভাবে প্রাণ সৃষ্ট হতে পারবে না। এই সজ্ঞাত ধারণাটি কখনই সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। যেমন, বিজ্ঞানীরা কিন্তু কার্বনের পাশাপাশি সিলিকন ভিত্তিক প্রাণের বিকাশকেও ইদানিং কালে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন। প্রকৃতিতে পাওয়া ডায়াটমগুলো (জীববিজ্ঞানের ভাষায় এগুলো এক ধরনের eukaryotic algae) এমনি একটি উদাহরণ। আবার আমরা প্রায়শঃই শুনি যে, আমাদের পৃথিবীতে তাপ, চাপ সবকিছু যদি সঠিক অনুপাতে না থাকত, তবে নাকি প্রাণের বিকাশ ঘটত না। এই যে পৃথিবীটা ২৩.৫ ডিগ্রীতে হেলে আছে, তার এক চুল এদিক ওদিক হলে তাপ আর চাপের এমন বৈষম্য তৈরী হত যে, প্রাণ সৃষ্টিই অসম্ভব একটি ব্যাপারে পরিণত হত। কিন্তু অনেকেই প্রাণের এই ধরনের ‘সঙ্কীর্ণ’ সংজ্ঞার সাথে একমত পোষণ করেন না। তারা বলেন, আমরা ওই ধরণের ‘সর্বোত্তম’ পরিবেশে বিকশিত হয়েছি বলে আমরা মনে করি প্রাণের উৎপত্তির জন্য ঠিক ওধরণের পরিবেশই লাগবে। যেমন, বাতাসে সঠিক অনুপাতে অক্সিজেন, চাপ, তাপ ইত্যাদি। এগুলো ঠিক ঠিক অনুপাতে না থাকলে নাকি জীবনের বিকাশ ঘটবে না। এটি একটি সজ্ঞাত ধারণা, প্রামাণিত সত্য নয়। অক্সিজেনকে জীবন বিকাশের অন্যতম উপাদান বলে মনে করা হয়, কিন্তু মাটির নীচে এমন অনেক ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের জন্য অক্সিজেন শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, রীতিমত ক্ষতিকর। ষাটের দশকে আমেরিকান জীববিজ্ঞানী টমাস ব্রক (Thomas Brock) এবং তার সহকর্মীরা ওয়াইওমিং এর ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের ১৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার উষ্ণ প্রস্রবনে এক ধরনের সরলাকৃতির অণুজীব (Microbes) আবিষ্কার করেন [৩৭]। কোন বহুকোষী জীবই সাধারণতঃ এই তাপমাত্রায় টিকে থাকতে পারে না। সমুদ্রের গভীর তলদেশে এমনকি কেরসিন তেলের ভিতরের বৈরী পরিবেশেও প্রাণের বিকাশ ঘটেছে এমন প্রমাণ বিজ্ঞানীদের কাছে আছে - যে পরিবেশের সাথে আসলে আমাদের সংজ্ঞায়িত ‘সর্বোত্তম পরিবেশের’ কোনই মিল নেই। যে সমস্ত ‘প্রাণ’ এই ধরনের ভয়ংকর বৈরী পরিবেশে টিকে থাকতে পারে তাদেরকে বলা হয় চরমজীবী (Extremophile)। পৃথিবীতে বেশ কয়েক ডজন চরমজীবীর অস্তিত্ব রয়েছে।

কাজেই হলফ করে বলা যায় না যে, মহাজাগতিক ধ্রুবক আর চলকগুলোর মান অন্যরকম হলে এই মহাবিশ্বে প্রাণের বিকাশ ঘটত না। বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ অধ্যাপক ভিকটর স্টেংগর তার 'The Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology' বইয়ে দেখিয়েছেন চলক আর ধ্রুবকগুলোর মান পরিবর্তন করে আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ডের মতই অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মান্ড তৈরী করা যায়, যেখানে প্রাণের উদ্ভবের মত পরিবেশ উদ্ভব ঘটতে পারে। এর জন্য কোন সূক্ষ্ম সমন্বয় বা 'ফাইন টিউনিং' এর কোন প্রয়োজন নেই। ডঃ স্টেংগর যখন বলেন, 'সূক্ষ্ম-সমন্বয়বাদীদের দাবীর এমন কোন ভিত্তি নেই যাতে তারা অনুমান করতে পারেন যে, একমাত্র একটি সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়া জীবন সৃষ্টি অসম্ভব'- তখন সেটিকে গুরুত্ব না দিয়ে আমাদের উপায় থাকে না। এছাড়াও 'Physical Review' জার্নালে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে অ্যান্থনি অ্যাগুরি (Anthony Aguirre) স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়েছেন, মহাবিশ্বের ছয়টি প্যারামিটার বা পরিবর্ত্য রাশিগুলো বিভিন্নভাবে অদলবদল করে গ্রহ, তারা এবং পরিশেষে কোন একটি গ্রহে বুদ্ধিদীপ্ত জীবন গঠনের উপযোগী পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব - কোন ধরনের 'Anthropic Argument'-এর আমদানী ছাড়াই [৩৮]।

ইনফ্লেশন বা স্ফীতি তত্ত্বের[৩৯] সাম্প্রতিক ফলাফলগুলোও তথাকথিত 'ফাইন-টিউনিং'-এর ধারণাগুলোকে প্রত্যাখান করছে। ইনফ্লেশন বা স্ফীতি তত্ত্ব নিয়ে প্রখ্যাত পদার্থবিদ আঁদ্রে লিন্ডে আর তার দলবলের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল যদি সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে আমাদের মহাবিশ্বের মতই বাস্তবে আরো মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে। একাধিক মহাবিশ্বের ধারণাটি কোন ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথা নয়, নয় কোন স্টারট্রেক মুভি বা আসিমভের সায়েন্সফিকশন। অতি সংক্ষেপে অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণাটিকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যক্ত করা যায় এভাবে [৪০] :

> আমাদের মহাবিশ্ব যদি কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে স্থান-কালের শূন্যতার ভিতর দিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকে, তবে এই পুরো প্রক্রিয়াটি কিন্তু একাধিকবার ঘটতে পারে, এবং হয়ত বাস্তবে ঘটেছেও। এই একাধিক মহাবিশ্বের অস্তিত্বের ব্যাপারটি প্রাথমিকভাবে ট্রিয়ন, অ্যালেন গুথ, আর পরবর্তীতে মূলতঃ আদ্রে লিন্ডের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে। বলা হয়ে থাকে সৃষ্টির উষালগ্নে ইনফ্লেশনের মাধ্যমে প্রসারণশীল বুদ্বুদ (Expanding Bubbles) থেকে আমাদের মহাবিশ্বের মতই অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে, যেগুলো একটা অপরটা থেকে সংস্পর্শবিহীন অবস্থায় দূরে সরে গেছে। এ ধরনের অসংখ্য মহাবিশ্বের একটিতেই হয়ত আমরা অবস্থান করছি অন্য গুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারেই জ্ঞাত না হয়ে।

মাল্টিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা কিন্ত শেলের মতই আঘাত করেছে 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন'-এর প্রবক্তাদের বুকে। কারণ, সাদা মাঠা কথায় এ তত্ত্ব বলছে যে, হাজারো-লক্ষ-কোটি মহাবিশ্বের ভীরে আমাদের মহাবিশ্বও একটি। স্রেফ সম্ভাবনার নিরিখেই এমন একটি মহাবিশ্বে চলকগুলোর মান এমনিতেই এত সূক্ষভাবে সমন্বিত হতে পারে, অন্যগুলোতে হয়ত হয়নি। আমাদের মহাবিশ্বের চলকগুলো আকস্মিকভাবে এই রূপে সমন্বিত হতে পেরেছে বলেই এতে প্রাণের উন্মেষ ঘটেছে; এতে এত আশ্চর্য হবার কিছু নেই! কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েল সোসাইটি রিসার্চ প্রফেসর মার্টিন রীস সেটিই খুব চমৎকারভাবে একটি উপমার মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন [১২] :

‘অসংখ্য মহাবিশ্বের ভীরে আমাদের মহাবিশ্বও একটি। অন্য মহাবিশ্বে বিজ্ঞানের সূত্র আর চলকগুলো হয়ত একেবারেই অন্যরকম হবে।... কাজেই ঘড়ির কারিগরের সাদৃশ্য এখানে একেবারেই অচল। তার বদলে বরং আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ডকে অনেকটা পরিত্যক্ত সেকেন্ড হ্যান্ড কাপড়ের দোকানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। **দোকানের মজুদ যদি বিশাল হয় তবে দোকানের কোন একটি জামা আপনার গায়ে ঠিকমত লেগে গেলে আপনি নিশ্চয় তাতে বিস্মিত হবেন না!** ঠিক একইভাবে আমাদের মহাবিশ্ব যদি ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য মহাবিশ্বের একটি হয়ে থাকে, দোকানের একটি জামার মতই সূক্ষ-সমন্বয় দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।’

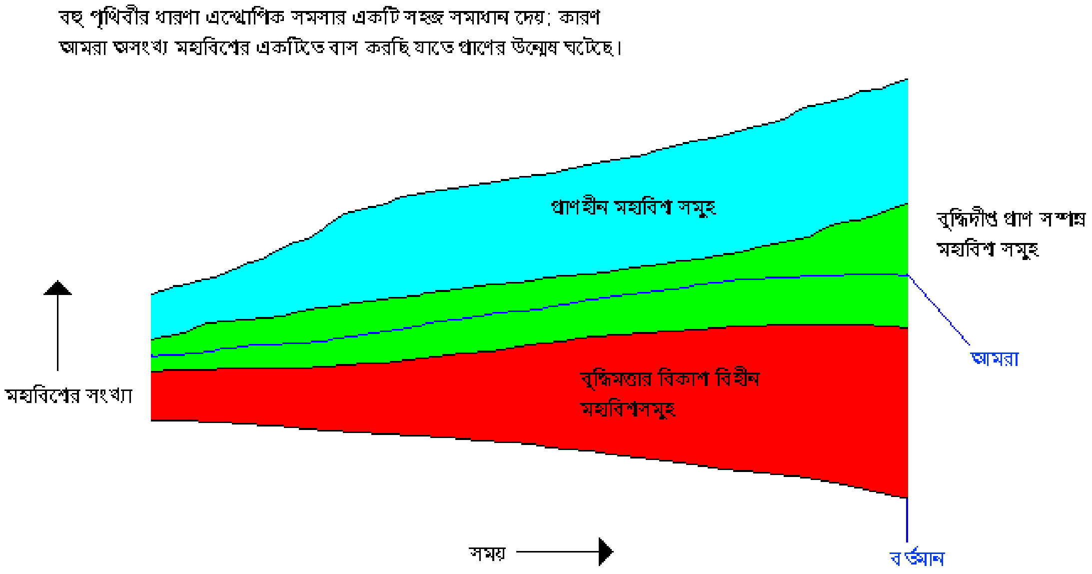

চিত্র ১০.৫ : মালটিভার্স হাইপোথিসিস অ্যান্থ্রোপিক এবং ফাইন-টিউনিং আর্গুমেন্টের একটি সহজ সমাধান দেয়।

‘ফাইন টিউনিং’ আর্গুমেন্টের এর সমালোচনা করেছেন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়েইনবার্গও। তিনি ‘A Designer Universe?’ প্রবন্ধে এ ধরনের যুক্তির সমালোচনা করে বলেন :

‘কোন কোন পদার্থবিদ আছেন যারা বলেন প্রকৃতির কিছু ধ্রুবকের মানগুলোর এমন কিছু মানের সাথে খুব রহস্যময়ভাবে সূক্ষ-সমন্বয় (fine-tune) ঘটেছে যেগুলো জীবন গঠনের সম্ভাব্যতা প্রদান করে। এ ভাবে একজন মানব দরদী সৃষ্টিকর্তাকে কল্পণা করে বিজ্ঞানের সব রহস্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। আমি এই ধরনের সুক্ষ-সমন্বয়ের ধারণায় মোটেও সন্তুষ্ট নই।’

মাইকেল আইকেদা, বিল জেফ্রিস, ভিকটর স্টেংগর, রিচার্ড ডকিন্স সহ অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন এই ‘ফাইন টিউনিং’ বা ‘এনথ্রোপিক’ আর্গুমেন্টগুলো সেই পুরোন ‘গড ইন গ্যাপস’ আর্গুমেন্টেরই নয়া সংস্করণ। যেখানে রহস্য পাওয়া যাচ্ছে, কিংবা আধুনিক বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু ব্যাখ্যা করা

যাচ্ছে না, সেখানেই অতিপ্রাকৃতিক কোন কিছু আমদানী করে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হচ্ছে। এভাবে মুক্ত-বুদ্ধি এবং বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত না করে বরং অন্ধ বিশ্বাসের কাছে প্রকারন্তরে নতি স্বীকারে আমাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে।

আসলে অনেক বিজ্ঞানীই আজ এই মতের সাথে পুরোপুরি আস্থাশীল যে, মহাবিশ্ব মোটেও আমাদের জন্য 'ফাইন টিউনড' নয়, বরং আমরাই এই বিশ্বব্রহ্মান্ডে টিকে থাকার সংগ্রামে ধীরে ধীরে নিজেদেরকে 'ফাইন টিউন্ড' করে গড়ে নিয়েছি। ব্যাপারটা হয়ত মিথ্যে নয়। আবারও আমাদের চোখের কথাই ধরা যাক। মানুষের চোখ বিবর্তিত হয়েছে এমনভাবে যে, এটি লাল থেকে বেগুনি পর্যন্ত -এই সীমার তড়িচ্চুম্বক বর্ণালিতেই কেবল সংবেদনশীল। এর কারণ হল, আমাদের বায়ুমন্ডল ভেদ করে এই সীমার আলোই বছরের পর বছর ধরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছুচ্ছে। কাজেই সেই অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে আমাদের চোখও সেভাবেই বিবর্তিত হয়েছে। এখন এই পুরো ব্যাপারটিকে কেউ উলটোভাবেও ব্যাখ্যা করতে চাইতে পারেন। বলতে পারেন যে, কোন এক বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বা আমাদের চোখকে কে লাল থেকে বেগুনী আলোর সীমায় সংবেদনশীল করে গড়বেন বলেই বায়ুমন্ডলের মাধ্যমে তিনি সেই সীমার মধ্যবর্তী পরিসরের আলো আমাদের চোখে প্রবেশ করতে দেন। তাই আমাদের চোখ এরকম। কিন্তু এভাবে ব্যাখ্যা করাটা কতটা যৌক্তিক? অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেওয়ার মতনই শোনায়। তারপরও 'ফাইন টিউনার'রা ঠিক এভাবেই যুক্তি দিতে পছন্দ করেন। মহাজাগতিক ধ্রুবকগুলোর মান এরকম কেন, বৈজ্ঞানিকভাবে এটি না খুঁজে এর ব্যাখ্যা হিসেবে 'না হলে পরে পৃথিবীতে প্রাণের আর মানুষের আবির্ভাব ঘটত না' এই ধরণের যুক্তি হাজির করেন। প্রাণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মূখ্য হয়, তবে মহাবিস্ফোরণের পর সৃষ্টিকর্তা কেন ৭০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন এই পৃথিবী তৈরী করতে, আর তারপর আরো ৬০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন 'মানবতার উন্মেষ' ঘটাতে তার কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। পৃথিবী উৎপত্তির ইতিহাসের পরিক্রমায় আমরা আজ জানি, মানুষ তো পুরো সময়ের একশ ভাগের এক ভাগেরও কম সময় ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। তারপরও মানুষকে এত বড় করে তুলে ধরে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার কি প্রয়োজন?

আসলে শতাব্দী-প্রাচীন 'মানবকেন্দ্রিক' সংস্কারের ভুত মনে হয় কারো কারো মাথা থেকে যাচ্ছেই না। সেই টলেমীর সময় থেকেই আমরা তা দেখে এসেছি। আমাদের এই পৃথিবীটা যে মহাকাশের কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া একটা নিতান্ত সাধারণ গ্রহ মাত্র, -এটি যে কোন কিছুরই কেন্দ্রে নয় - না সৌরজগতের, না এই বিশাল মহাবিশ্বের - এ সত্যটি গ্রহণ করতে মানুষের অনেকটা সময় লেগেছে। পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দিলে এর বিশিষ্টতা ক্ষুন্ন হয় এই ভয়েই বোধ হয় টলেমীর 'ভূ-কেন্দ্রিক' মডেল জনমানসে রাজত্ব করেছে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে, আর ধর্ম বিরোধী সত্য উচ্চারণের জন্য কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিওদের সইতে হয়েছে নির্যাতন। একই দৃষ্টিভঙ্গি আমরা দেখেছি উনবিংশ শতাব্দীতে (১৮৫৯ সাল) যখন চার্লস ডারউইন এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীবজগতের বিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। বিবর্তনের ধারণা সাধারণ মানুষ এখনও 'মন থেকে নিতে পারে নি' কারণ এই তত্ত্ব গ্রহণ করলে 'সৃষ্টির সেরা জীব' মানুষের বিশিষ্টতা ক্ষুন্ন হয়ে যায়! এই সংস্কারের ভুত এক-দু দিনে দূর হবার নয়। তাই রহস্য দেখলেই, জটিলতা দেখলেই মানুষ আজও নিজেকে সৃষ্টির কেন্দ্রে রেখে, পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে বসিয়ে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। 'ফাইন-টিউনিং' আর 'অ্যানথ্রোপিক' আর্গুমেন্টগুলো এজন্যই মানুষের কাছে এখনও এত আকর্ষণীয় বলে মনে হয়।

অধিকাংশ বিজ্ঞানীই আজ মনে করেন মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পেছনে 'সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত' অনুকল্পটি (জীববিজ্ঞান এবং জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই) কিছু গোঁড়া খ্রীষ্টানদের ধর্মবিশ্বাস থেকে উদ্ভুত একটি বিশ্বাস-নির্ভর ধারণার চতুর অভিব্যক্তি মাত্র এবং এটি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িতও নয় যে এটির সত্যতা কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা কখনও নির্ণীত হওয়া সম্ভব। সেজন্যই এটি কখনও বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবী করতে পারে না। বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের সাফল্যজনক প্রয়োগেই মহাবিশ্বের রহস্য উদঘাটন করতে প্রয়াসী হয়েছেন, বহু ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হচ্ছেন। এভাবেই ধাপে ধাপে আমরা এগুচ্ছি। তার পরেও এটি অবশ্যই স্বীকার্য যে, আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক জায়গাতেই এখনও 'ফাঁক' রয়ে গেছে; রয়ে গেছে অনেক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে জটিল কিছু দেখলেই বিজ্ঞান তার পেছনে কোন সৃজনশীল সজ্ঞাত সত্ত্বাকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে এত সহজেই বৈধতা দিয়ে দেবে। সরল সিস্টেম থেকে জটিল সিস্টেমের বিকাশের উদাহরণ প্রকৃতিতে খুঁজলেই অনেক পাওয়া যাবে। ঠান্ডায় জলীয়-বাষ্প জমে তুষার কণিকায় পরিণত হওয়া, কিংবা বাতাস আর পানির ঝাপটায় পাথুরে জায়গায় তৈরী হওয়া জটিল নকসার ক্যাথেড্রালের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতেই আছে। যখন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসে বিচিত্র নক্সার হিমবাহ, কিংবা এক পশলা বৃষ্টির পর পশ্চিমাকাশে উদয় হয় বর্ণিল রংধনুর, মুগ্ধ হয় আমাদের অনেকের মন, কিন্তু আমরা কেউ এগুলো তৈরী হওয়ার পেছনে আমরা কেউ সজ্ঞাত সত্ত্বার দাবী করি না। কারণ আমরা সবাই জানি ওগুলো সবই তৈরী হয় কোন সজ্ঞাত সত্ত্বার হস্তক্ষেপ ছাড়াই, পদার্থবিজ্ঞানের কতকগুলো প্রাণহীন নিয়মকে অনুসরণ করে। ক্যালস্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এমিরিটাস অধ্যাপক মার্ক পেরাখ সম্প্রতি 'Unintelligent Design' নামে একটি বই লিখেছেন। বইটিতে তিনি উইলিয়াম ডেম্বস্কি, মাইকেল বিহে আর ফিলিপ জনসন সহ অন্যান্য আই.ডি প্রবক্তাদের সমস্ত যুক্তি খন্ডন করে উপসংহার টেনেছেন এই বলে যে, আই.ডি কখনই বিজ্ঞান নয়, বরং ছদ্মবেশী বিজ্ঞান, যাকে ইংরেজীতে আমরা বলি pseudoscience. ডঃ পেরাখ তার বইয়ে নিত্যদিনের বেশ কিছু সাধারণ উদাহরণ হাজির করে দেখিয়েছেন, জটিলতা মানেই বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ নয়, অনর্থক জটিলতা বরং প্রকারান্তরে বুদ্ধিহীনতাই প্রকাশ করে। তাঁর ভাষায়, 'কোন যন্ত্র তা সে মেকানিকালই হোক আর বায়োমেকানিকালই হোক, যদি অতিরিক্ত জটিল হয়, তা বরং বুদ্ধিহীন উৎসের দিকেই নির্দেশ করে' (আনইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন, মার্ক পেরাখ, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১২৬)। কাজেই মহাবিশ্বের কিংবা জীবজগতের জটিলতাকে বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পের প্রমাণ ভাবার কোন যৌক্তিকতা নেই।

আর তাছাড়া আই.ডির বিরুদ্ধে সবচাইতে বড় যুক্তি তো হাতের সামনেই রয়ে গেছে। আমাদের এই 'জটিল' মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে ব্যখার জন্য যদি কোন বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বার সত্যই প্রয়োজন হয়, তবে ধরেই নেওয়া যেতে পারে সেই বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বাকে এই মহাবিশ্বের চেয়েও জটিল কিছু হতে হবে। তা হলে সেই জটিল বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বার অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করবার জন্য ওই একি যুক্তিতে আবার ততোধিক জটিল কোন সত্ত্বার আমদানী করতে হবে, এমনি ভাবে জটিলতর সত্ত্বার আমদানীর খেলা হয়ত চলতেই থাকবে একের পর এক। এ ধরনের যুক্তি তাই আমাদেরকে অনর্থক অসীমত্বের দিকে ঠেলে দেয়, যা বার্ট্রান্ড রাসেল এবং ডেভিড হিউমের মত দার্শনিকেরা অনেক আগেই অগ্রহণযোগ্য বলে বাতিল করে দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত না আই.ডি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যুক্তি আর সংশয়বাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত আই.ডি প্রবক্তাদের ভাগ্যের শিকে ছিঁড়ছে না বলেই মনে হচ্ছে।

সৃষ্টিবাদীদের বিবর্তন: এর শেষ কোথায়?

আইডি-ওয়ালাদের চেয়ে বরং প্রগতিশীল অবস্থানে আছেন 'বিশ্বাসী বিবর্তনবাদী' (theistic evolutionist) দের দল। তাঁরা মনে করেন ঈশ্বর এক সময় পৃথিবীতে প্রাণের উন্মেষ ঘটালেও পরবর্তীতে আর এতে হস্তক্ষেপ করেননি, বিবর্তনের মাধ্যমে প্রাণকে বিকশিত হতে দিয়েছেন। প্রয়াত পোপ জন পল ২ এ ধরনের বিশ্বাসী বিবর্তনবাদী ছিলেন যিনি বিবর্তনকে বাস্তবতা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। প্রতিটি যুগেই সৃষ্টিবাদীরা বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রাকে ঠেকানোর নানাভাবে চেষ্টা করে এসেছে। বিশেষতঃ যখনই ধর্মগ্রন্থের সাথে বিরোধ দেখেছে বিজ্ঞানের, বিজ্ঞানকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছে আস্তাকুঁড়ে। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। বাইবেল-বিরোধী সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বকে সমর্থন করার জন্য গ্যালিলিও, ব্রুনোর মত বিজ্ঞানীকে করেছে নির্যাতন। তারপরও ঈশ্বর ও তার পুত্ররা সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরা থামাতে পারেননি। কোপার্নিকাসের তত্ত্ব এখন সৃষ্টিবাদীরা মেনে নিলেও বাইবেলের বাণীকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করে বিবর্তন ঠেকানোর প্রচেষ্টা এখনও কোন কোন মহলে লক্ষ্যনীয়। যেমন, 'ইয়ং আর্থ ক্রিয়েশনিস্ট'দের দল বাইবেলীয় ধারণায় বিশ্বাস করেন পৃথিবীর বয়স মাত্র ছ'হাজার বছর। বিগত কয়েক দশকে তাদের আস্ফালনও কিন্তু কমে এসেছে, কারণ আধুনিক রেডিও অ্যাকটিভ ডেটিং এর মাধ্যমে খুব নির্ভরযোগ্যভাবে পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করা গিয়েছে, যা বাইবেল বর্ণিত বয়সের চেয়ে অনেক অনেক বেশী। শুধু তাই নয়, মিলিয়ন বছর আগেকার ফসিলও আবিস্কৃত হয়েছে। বিজ্ঞানী ডগলাস ফুটুইমা 'সৃষ্টিবাদীদের বিবর্তনের' একটি ধারাবাহিক ছবি তার 'ইভলুশন' বইতে উল্লেখ করেছেন এভাবে:

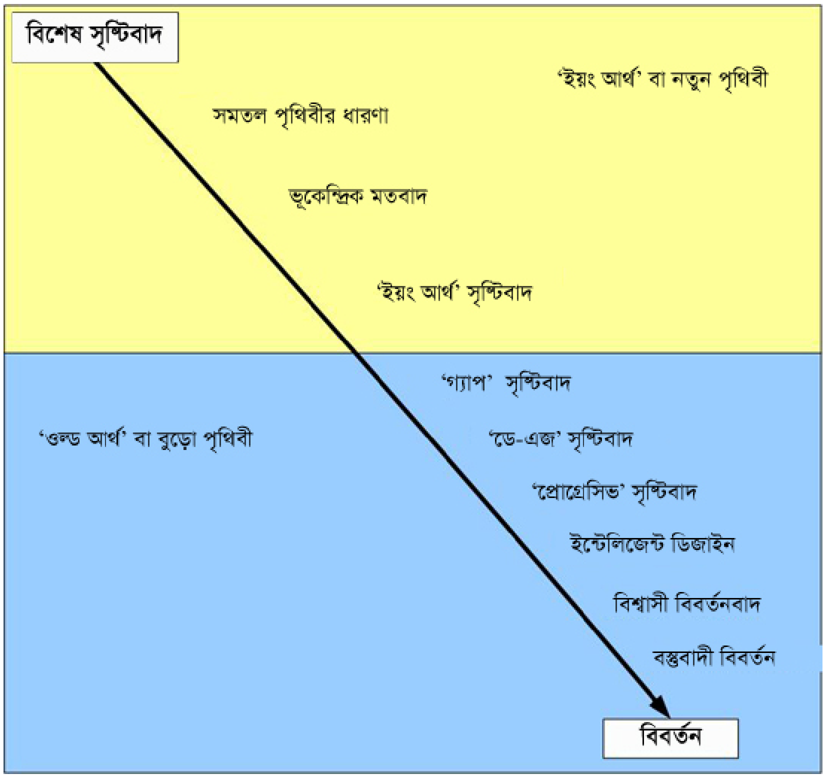

চিত্র : সৃষ্টিবাদীদের বিবর্তনের রূপরেখা (Ref. Evolutionary science, creationism and society, Doglas J. Futuyama, Evolution, Sinauer Associates Inc. p525)

বিজ্ঞানী ভিক্টর স্টেংগর এ প্রসঙ্গে খুব তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন :

> ‘The species of religious thought called creationism continues to evolve by a process of natural selection. While, as National Center for Science Education executive director Eugenie Scott has pointed out, there has always been a continuum of creationist views from extreme to moderate, we can still identify a few dominant strains.’

আমরা মনে করি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই ধীরে ধীরে একটা সময় জৈব বিবর্তনকে একটি বাস্তবতা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন, এবং শেষমেষ বুঝবেন জড়জগৎ এবং জীবজগতের সবকিছুই প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপন্ন আর বিকশিত হয়েছে এবং এ সবই ঘটেছে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায়, ঠিক যেভাবে কয়েক শো বছর লাগলেও শেষ পর্যন্ত সূর্যকেন্দ্রিক পৃথিবীর ধারণাটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো জনসাধারণের মধ্যে। জীববিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞান, জেনেটিক্স, আণবিক জীববিদ্যার কোন শাখাই বিবর্তনের কোন সাক্ষ্যের বিরোধিতা তো করছেই না, বরং যত দিন যাচ্ছে বিবর্তনের ধারাটি সবার কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। ফসিল ছাড়াও, জেনেটিক্স এবং আণবিক জীববিদ্যার মত নতুন শাখাগুলো যেভাবে বিবর্তনের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ একেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে শুরু করেছে, এটি এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার মাত্র।

তথ্যসূত্র:

(১) Shermer M, 2006, Why Darwin Matters, Time Books, New York. 380

(২) Angier N, 2004, My God Problem, Free Inquiry magazine, vol 24, no. 5.

(৩) Futuyma DJ, 2005, Evolution, Sinauer Associates, INC, MA, USA, p.523.

(৪) Why doesn't America believe in evolution?, 2006, New Scientist magazine, August 2006issue, p 11.
http://www.newscientist.com/channel/being-human/mg19125653.700-why-doesnt-america-believe-in-evolution.html

(৫) রশীদ হু, জুলাই ১৫, ২০০৬, পরীক্ষায় পাশের জন্য পড়ি, কালস্রোত বিভাগ, দৈনিক সমকাল।

(৬) Stenger V, Do Our Values Come from God?, The Evidence Says No, http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Godless/Values.htm

(৭) "We focus particularly on providing answers to questions surrounding the book of Genesis, as it is the most-attacked book of the Bible. We also desire to train others to develop a biblical worldview, and seek to expose the bankruptcy of evolutionary ideas, and its bedfellow, a “millions of years old” earth (and even older universe)." from ‘Our message’, Answer in Genesis,

http://www.answersingenesis.org/

(৮) Dennett DC, 1995, Darwin's Dangerous Idea: Evolution and Meanings of Life, Penguin (UK), Simon and Schuster (USA).

(৯) White AD, 1993, A History of Warfare of Sceince with the theology in Christendom, Prometheus Books.

(১০) Rees M, 2001, Our Cosmic Habitat, Princeton University Press, p 163

(১১) Paley W, (1801) 1850, Natural Theology or Evidence of the Existence and Attributes of the Deity, Collected from the Appearances of Nature, American Tract Society.

(১২) Shanks N, 2004, God, the Devil and Darwin: A critique of Intelligent Design theory, Oxford University Press.

(১৩) বিস্তারিত তথ্যের জন্য Dawkins R, (1986) 1996, The Blind Watchmaker : Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without a Design, Norton Paperback এর 'Accumulating Small change' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।'

(১৪) Darwin C, (1859), 1999 The Origin of Species, Bantam Books, p 155.
(১৫) Kuhn T, 1970, The Structure of Scientific Revolutions, University Of Chicago Press, USA

(১৬) স্টেংগর ভি, ডারউইনিজমের আতংক, (অনুবাদ : বন্যা আহমেদ), জুন ২, ২০০৫, একুশ শতক বিভাগ, দৈনিক ভোরের কাগজ

(১৭) আজকের দিনের বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা অবশ্য প্রজাতির উৎপত্তির পেছনে **প্রাকৃতিক নির্বাচনের পাশাপাশি** বিবর্তনের জন্য অন্য অনকে ফ্যাক্টর (যেমন জিন মিউটেশন, ক্রোমজম মিউটেশন, জেনেটিক রিকম্বিনেশন, জেনেটিক ড্রিফট এবং অন্তরণ বা আইসোলেশন) খুঁজে পেয়েছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(১৮) Dawkins R, Darwin and Darwinism, Mukto-Mona Darwin Day celebration, http://www.mukto-mona.com/Articles/dawkins/darwin_and_darwinism120206.htm

(১৯) Huxley TH, 1880, The Origin of Species (review), *Westminster Review*, vol 17, pp 541-570

(২০) Mayr E, 1988, Toward a New Philosophy of Biology, Cambridge, Mass, Harvard University press.

(২১) Gould SJ, 2002, The Structure of Evolutionary Theory, Belknap Press

(২২) Dawkins R, 2004, A Devil's Chaplain: Reflections on Hope, Lies, Science, and Love, Mariner Books; Reprint edition

(২৩) Berra TM, 1988, Evolution and Myth of Creationism, Stanford University Press, USA

(২৪) Stenger V, 2003, Has Science Found God? The Latest Results in the Search for the Purpose in the Universe, Prometheus Books, USA

(২৫) Creation Research Society [online], www.creationresearch.org

(২৬) Scott EC and Cole HP, 1985, The Elusive Basis of Creation 'Science', Quarterly Review of Biology, vol. 60, no. 1.

(২৭) Dennett DC, 2006, The Hoax of Intelligent Design and How It was Prepared, from Intelligent Thought: Science versus the Intelligent Design Movement, Brockman J (Editor), Vintage.

(২৮) Coyne JA, 2006, The Faith That Dare NOT Speak Its Name, from Intelligent Thought: Science versus the Intelligent Design Movement, Brockman J (Editor), Vintage

(২৯) Wells J, Darwinism: Why I Went for a Second Ph.D, The Words of the Wells Family, Kansas Citizens for Science. Source: http://www.tparents.org/library/unification/talks/wells/DARWIN.htm

(৩০) Dawkins R, 2006, Intelligent Aliens, from Intelligent Thought: Science versus the Intelligent Design Movement, Brockman J (Editor), Vintage, pp 92.

(৩১) Perakh M, 2005, Intelligent Design Theory - A Quasi-Scientific Endeavor with a Religious Agenda, Mukto-Mona [online], www.mukto-mona.com

(৩২) Behe MJ, 1996, Darwin's Black Box : The Biochemical Challenge to Evolution, Free Press, USA.

(৩৩) Young M and Edis T [editors],(2004) 2006, Why Intelligent Design Fails: A Scientific Critique of the New Creationism, Rutgers University Press, London.

(৩৪) রায় অ, ২০০৫,আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রি, অঙ্কুর প্রকাশনী।

(৩৫) Halder G, Callaerts P, Gehring WJ, 1995, Induction of Ectopic Eyes by Targeted Expression of the eyeless Gene in Drosophila. Science, vol. 267, pp 1788-1792.

(৩৬) Gerhart J and Kirschner M, 1997, Embryos, and Evolution: Toward a Cellular and Developmental Understanding of Phenotypic Variation and Evolutionary Adaptability, Cells,

(৩৭) Brock TD, Life at High Temperature, History and Education, Inc, Yellowstone National Park, Wyoming.

(৩৮) Anthony A, 2001, The Cold Big-Bang Cosmology as a Counter-example to Several Anthropic Arguments, Journal of Physical Rev, D64:083508.

(৩৯) বিস্তারিত তথ্যের জন্য Alan H. Guth,1998, The Inflationary Universe: The Quest for a New Theory of Cosmic Origins, Perseus Books Group দেখুন|

(৪০) Linde A, 1998, Self Reproducing Inflationary Universe, Scientific American.

একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

{বন্যা আহমেদের *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটি অবসর প্রকাশনী থেকে ২০০৭ এর একুশে বইমেলায় প্রকাশিতব্য। এই অংশটি বইটির দশম অধ্যায়।}

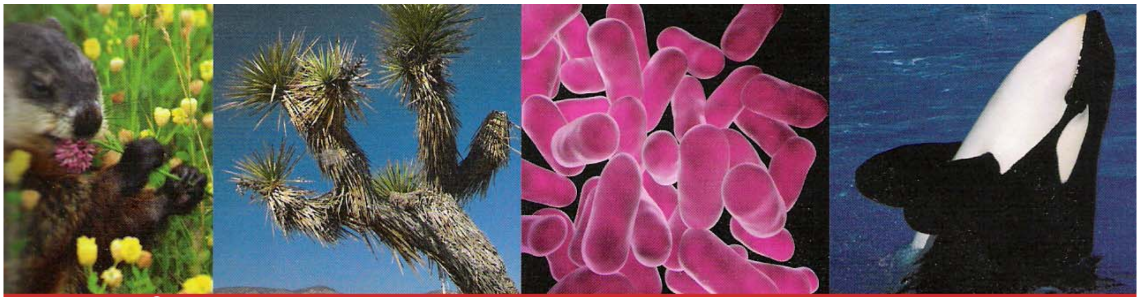

আমাদের পৃথিবীর বয়স প্রায় সাড়ে চারশ কোটি বছর। প্রাণের উৎপত্তির ইতিহাসটাও কিন্তু খুব ছোট নয়। প্রায় সাড়ে তিনশ কোটি বছর আগে প্রাণ উৎপত্তির ঊষালগ্ন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত হাজারো, লক্ষ কোটি জীবের উৎপত্তি ঘটেছে, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই আবার বিলুপ্ত হয়ে গেছে কালের পরিক্রমায়। ফসিল রেকর্ড বলে, অনবরত অগুনতি প্রজাতির উৎপত্তি ঘটেছে, সেই কবে থেকে প্রাণের সমারোহে মুখরিত হয়ে আছে আমাদের এই গ্রহ। কেন এত ধরণের প্রাণের সমারোহ এবং বৈচিত্র আমাদের চারপাশে? আমরা এলাম কোথা থেকে? আমরাও কি এই প্রকৃতিরই অংশ? এই ধরণের প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে হলে, পৃথিবীতে প্রাণের রহস্য বুঝতে হলে আমাদের বিবর্তনবাদ বুঝতে হবে। আজকে চিকিৎসাবিদ্যা থেকে শুরু করে জেনেটিক্স, জিনোমিক্স, বা আণবিক জীববিদ্যার মত জীববিজ্ঞানের সমস্ত শাখার খুঁটি হিসেবে ধরা হয় এই বির্বতনবিদ্যাকে।

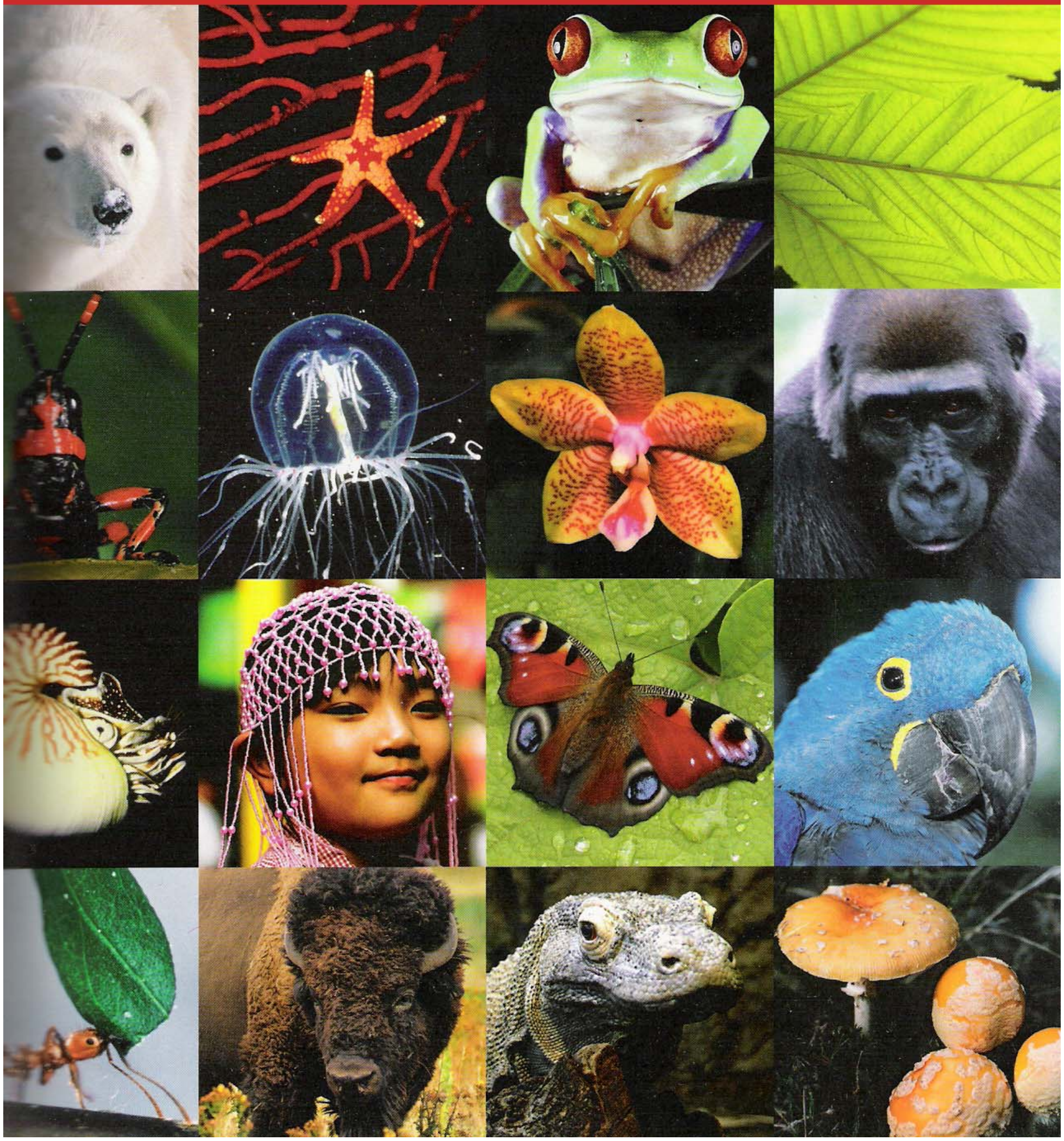

বিবর্তন তত্ত্ব আজকে আমাদের শুধু প্রাণের বিকাশ, বিলুপ্তি এবং টিকে থাকার ব্যাপারটাই বুঝতে সাহায্য করছে না, আজকের এই জীবজগৎ কি করে ক্রমাগতভাবে বদলে যাচ্ছে এবং তা আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রাকে কিভাবে প্রভাবিত করছে তার একটা পূর্ণাংগ ব্যাখ্যাও দিচ্ছে। বিবর্তনবাদ না বুঝলে আজকে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা, ওষুধ বা কীটনাশক তৈরি, পরিবেশ দূষণরোধ থেকে শুরু করে জীববিদ্যার সকল শাখাই অকেজো হয়ে পড়বে।

অ্যান্টিবায়োটিকের অতিপ্রয়োগ এবং অপপ্রয়োগের ফলে আজকে পৃথিবী জুড়ে নতুন নতুন প্রতিরোধক ব্যাকটেরিয়ার উদ্ভব হচ্ছে, যাদের উপর প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকগুলো আর কাজ করতে পারছে না। কিভাবে এই ব্যাকটেরিয়াগুলোর বিবর্তন ঘটে তা বুঝার উপরই নির্ভর করছে এ সমস্যার সমাধান। যে কোন অ্যান্টিবায়োটিক তৈরীর পেছনে বিবর্তন তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

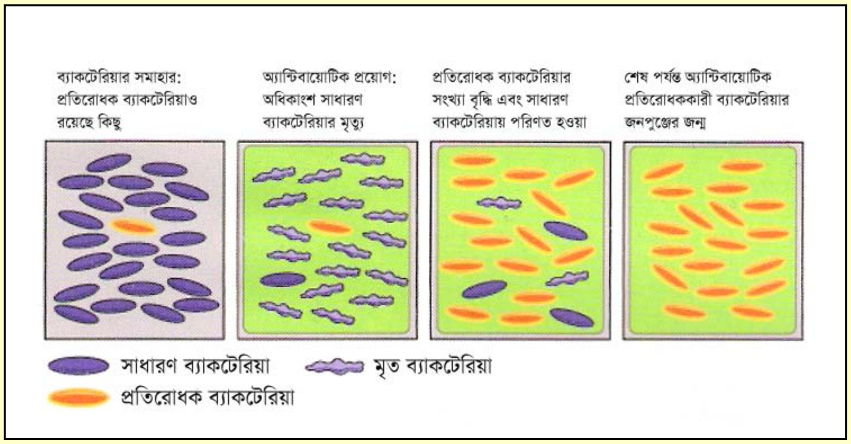

আমাদের চারদিকে এ বৈচিত্রময় পরিবেশ একদিনে তৈরি হয়নি, কোটি কোটি বছরের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় এর উদ্ভব ঘটেছে। এই প্রবাল দ্বীপ বা গভীর অরণ্য থেকে শুরু করে আমাদের চারপাশের প্রকৃতি মানুষের অজ্ঞতা, অপব্যবহার এবং অবহেলায় বিপর্যস্ত হওয়ার পথে। আমাদের নিজেদের টিকে থাকার স্বার্থেই এদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

দিনের পর দিন শক্তিশালী কীটনাশক প্রয়োগ করে আমরা আমাদের স্বাস্থ্যের এবং পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি করে চলেছি। তাই বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা কীটনাশক প্রয়োগের বদলে জৈব উপায়ে শস্যের জন্য ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ দমনের চেষ্টা চালাচ্ছেন। পাশের ছবিতে সয়াবিনের জন্য ক্ষতিকর এক ধরণের কীট দেখানো হয়েছে।

ফসিলগুলো পৃথিবীর দীর্ঘ প্রায় চারশ কোটি বছরের প্রাণের ইতিহাসের সরাসরি সাক্ষী, তারা ধারণ করে রেখেছে এই গ্রহে প্রাণের অফুরন্ত কোলাহলের নীরব পদচিহ্ন। পৃথিবীর উৎপত্তির পর প্রায় একশ কোটি বছর যাবত কোন জীব ছিল না। আমরা ৩৮০ কোটি বছর আগেকার প্রথম জীবাশ্মের সাক্ষাৎ পাই। এসব জীব আসলে ব্যকটেরিয়া আর নীলাভ শৈবাল জাতীয় অনুজীব।

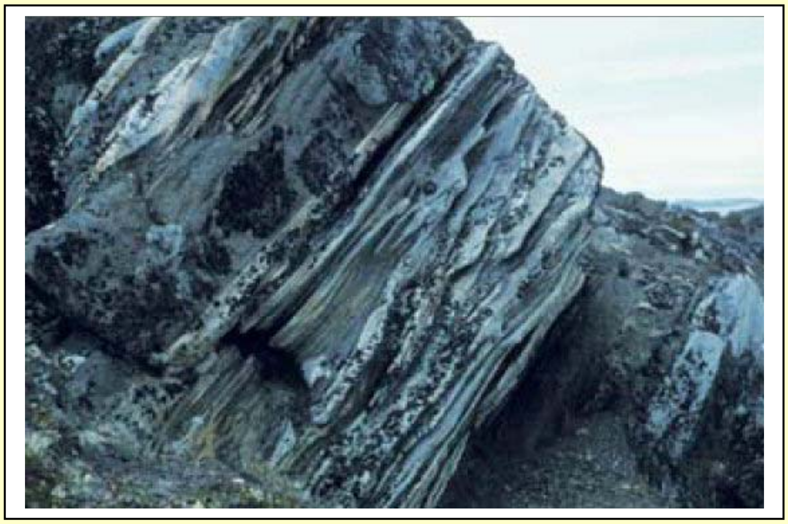

গ্রীনল্যান্ডের ছোট্ট পাহাড় আকিলার দক্ষিণে সাদা দাগ গুলোর মধ্যে জীবনের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে। এগুলো ৩৮০ কোটি বছরের বেশী পুরোন।

অস্ট্রেলিয়ার শার্ক অববাহিকায় গড়ে ওঠা স্ট্রোমাটোলাইটের ছবি। ৩৫০ কোটি বছরের পুরোন এই জীবাশ্মের সাথে আধুনিক সায়নোব্যকটেরিয়ার মিল পাওয়া যায়।

গত শতাব্দীতেই বিবর্তনবাদকে জীববিজ্ঞানের মূল শাখা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ডারউইন এই বিবর্তন তত্ত্ব প্রস্তাব করছিলেন প্রায় দেড়শো বছর আগে। তার আগে এবং পরে, ভুত্বকের বিভিন্ন স্তরে হাজার হাজার প্রজাতির ফসিলের সন্ধান পাওয়া গেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত এমন একটাও ফসিল পাওয়া যায়নি যা প্রাণের বিবর্তনের ধারাবাহিকতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়।

সাড়ে ছয় লাখ বছর আগের অ্যামোনাইটের ফসিল (উপরে)।

২০০৪ সালে চীনে এক প্রত্নতত্ত্ববিদকে মাটি খুঁড়ে ডায়নোসরের ফসিল বের করতে দেখা যাচ্ছে (ডানে)

লুসির সন্তানঃ আশির দশকের প্রথম দিকে যখন ৩২ লক্ষ বছরের পুরনো *Australopethicus afarensis*-এর প্রায় সম্পুর্ন ফসিলটি পাওয়া যায় তখন বিজ্ঞানীমহলে রীতিমত হইচই পড়ে গিয়েছিল। একেই সেই বিখ্যাত 'লুসি' নামে অভিহিত করা হয়, যার মধ্যে মানুষ এবং বনমানুষ উভয়ের বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান ছিল। ২০০৬ সালে বিজ্ঞানীরা একই প্রজাতির ৩৩ লক্ষ বছরের পুরনো তিন বছরের শিশুর ফসিল খুঁজে পেয়েছেন। এই প্রথম এত ছোট শিশুর এত পুরনো এবং সম্পুর্ণ ফসিল পাওয়া গেছে বলে বিজ্ঞানীমহলে এ নিয়ে উত্তেজনার সীমা পরিসীমা নেই। ফসিলটির পায়ের হাড়, হাটুর জয়েন্ট, ছোট আঙ্গুলগুলো, দাঁত বা মস্তিষ্কের আকার ও গঠনের অনুপাত থেকে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সন্তানধারণ, লালন পালন এবং শারীরিক বৃদ্ধি এবং বিকাশ সম্পর্কে গভীর ধারণা লাভ করতে পারবো।

মধ্যবর্তী ফসিল বা মিসিং লিঙ্কগুলোতে কোন জীবের পূর্ববর্তী থেকে পরবর্তী প্রজাতিতে বিবর্তনের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায়। সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা প্রায়ই দাবী করেন যে, এ ধরণের কোন ফসিল নাকি কখনও পাওয়া যায়নি। যারা বিবর্তনবাদ সম্পর্কে একটু আধটু খবর রাখেন তারা সবাই জানেন যে এই দাবীটি কত মিথ্যা। বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত এত ধরণের মধ্যবর্তী ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন যে এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির বিবর্তনের ব্যাপারটা জলের মতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পা-ওয়ালা তিমি মাছ : চার কোটি বছর আগের Dorudon atrox-এর ফসিল। সম্পূর্ণ জলচরী হওয়া সত্বেও এর তখনও পা সদৃশ উপাঙ্গ বিদ্যমান ছিল। এটি তিমি মাছের চারপায়ী স্তন্যপায়ী পূর্বপুরুষ এবং আধুনিক তিমির মধ্যবর্তী অবস্থার ফসিল।

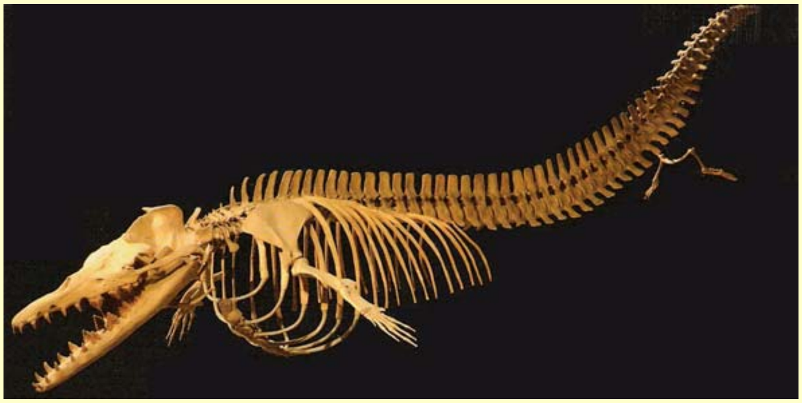

টিকটালিকঃ ২০০৬ সালে বিজ্ঞানীরা এই মাছ এবং চতুষ্পদী প্রাণীর মধ্যবর্তী ফসিল টিকটালিক (Tiktaalik roseae)-এর সন্ধান পান। প্রায় সাড়ে ৩৭ কোটি বছর আগের এই প্রাণীটির মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে মাছের মত পাখনা, আদি চোয়াল এবং আঁশ, আবার অন্যদিকে আছে চতুষ্পদী প্রাণীর মত করোটি, ঘাড়, পাঁজড়ের হাড় এবং আংশিক হাত ও পায়ের অস্তিত্ব!

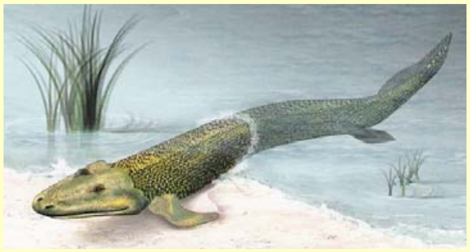

আরকিওপটেরিক্সঃ ১৫ কোটি বছর আগের পাখি এবং ডায়নোসরের মধ্যবর্তী ফসিল বা মিসিং লিঙ্ক। এদের গায়ে পাখীর মত পালক থাকলেও তখনও সরীসৃপের বৈশিষ্ট্যগুলোও বিদ্যমান ছিল (নীচে)।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ডিএনএ আবিস্কারের পর বংশগতীয় গবেষণার নতুন দুয়ার খুলে যায়। কয়েক দশকে আণবিক জীববিদ্যা, জেনেটিক্স, জিনোমিক্সের বিভিন্ন আবিষ্কারগুলো বিবর্তনবাদকে অত্যন্ত জোড়ালো ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। এতদিন পর্যন্ত পাওয়া ফসিল রেকর্ডের সাথে আনবিক জীববিদ্যা এবং জেনেটিক্সের গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলো দারুণভাবে মিলে যাচ্ছে। আধুনিক জীববিদ্যার এমন কোন শাখা নেই যা এ মুহূর্তে বিবর্তনবাদের বিরোধিতা করছে।

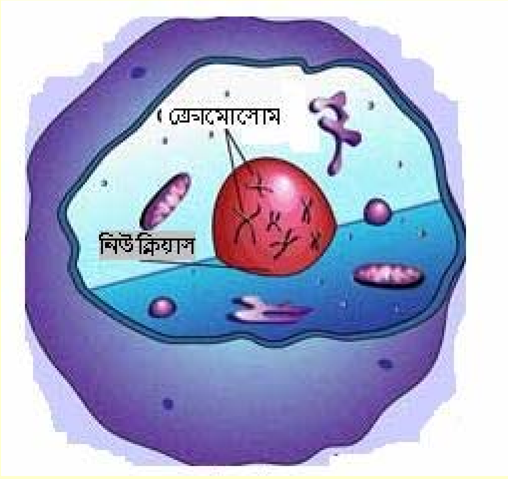

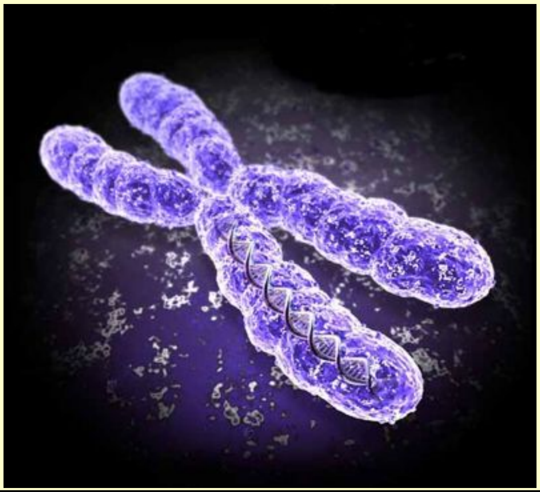

উপরে পাশাপাশি দুটি ছবিতে যথাক্রমে কোষ এবং ক্রোমোজোম দেখানো হয়েছে। পাশের ছবিতে ক্রোমজোমের গঠন এবং নীচে ডিএনএ-এর গঠন দেখানো হয়েছে।

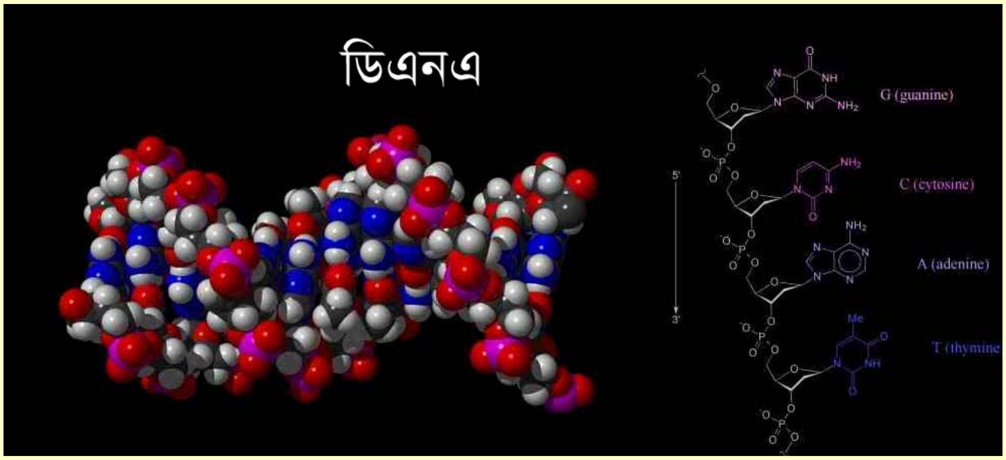

জিনোমিক্সের বিভিন্ন আবিষ্কারগুলো বিবর্তনবাদকে অত্যন্ত জোড়ালো ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্সের মতে পৃথিবীতে যদি একটাও ফসিলের অস্তিত্ব না থাকতো তাহলেও জীবের বিস্তৃতির প্যাটার্ন এবং তাদের ডিএনএ-এর ভিতরে জিনের মধ্যে লেখা বংশগতীয় তথ্য থেকেই জীবের বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করা সম্ভব হতো।

পৃথিবীব্যাপী বিশটি দেশের বিজ্ঞানীরা হিউম্যান জিনোম প্রোজক্টে অংশগ্রহন করেন। ২০০৩ সালে এর কাজ শেষ হয়, বিজ্ঞানীরা মানুষের ডিএনএ তে ২০-২৫ হাজার জিনের সন্ধান পেয়েছেন এবং ডিএনএ এর ভিতরে যে ৩ বিলিয়ন রাষায়নিক base pairs রয়েছে তাদের অনুক্রমও বের করেছেন। উপরের ছবিতে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে দেখানো হয়েছে।

জিনের বিশ্লেষণ থেকে আমরা পারিবারিক বংশগতীয় ইতিহাস, বিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাস থেকে শুরু করে, অপরাধী সনাক্তকরণ কিংবা জটিল রোগের জন্য দায়ী কারণগুলো পর্যন্ত খুঁজে বের করতে পারি। বিবর্তনের ইতিহাসে কাছাকাছি প্রাণীদের জিনোমের তুলনা থেকে তাদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। শিম্পঞ্জিরা আমাদের সবচেয়ে কাছের আত্মীয়। মাঝের ছবিতে শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের জিনোমের তুলনা দেখানো হয়েছে। তাদের মধ্যে সাদৃশ্য প্রায় ৯৯%, এবং তাদের প্রোটিনের গঠনও খুব কাছাকাছি।

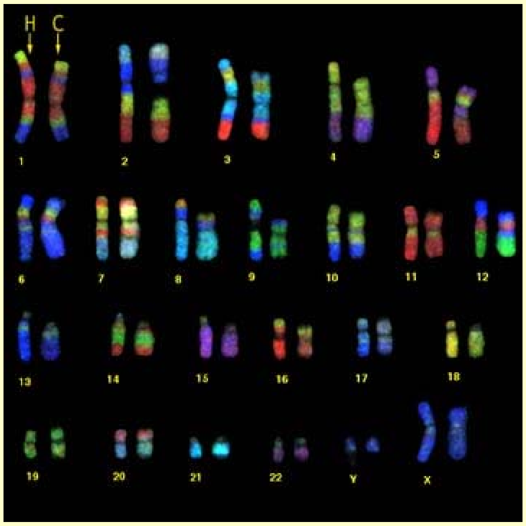

নীচের ছবিতে শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের প্রথম পাঁচটি ক্রোমজমের তুলনা দেখানো হয়েছে। শিম্পাঞ্জিদের ১২ এবং ১৩ নম্বর ক্রোমোজোম দু'টো মুখোমুখীভাবে সংযুক্ত হয়ে মানুষের মধ্যে ক্রোমোজোম ২ তৈরি করেছে।

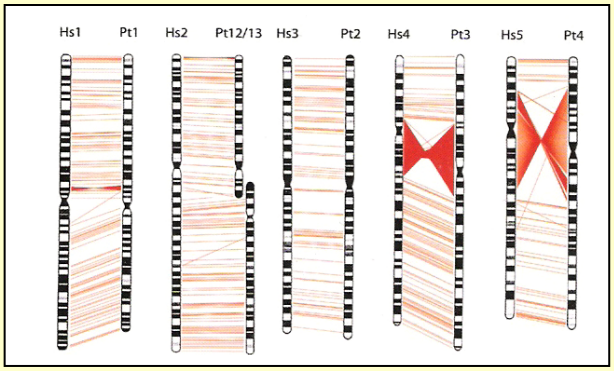

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা প্রক্রিয়া লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ধাপে ধাপে ঘটে। আজকে আমরা চোখের যে পূর্ণাংগ গঠন দেখে মুগ্ধ হই তা একদিনে তৈরি হয়নি, তা বহুকাল ধরে ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকা ছোট ছোট পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে।

ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের প্রবক্তারা দাবী করেন যে চোখের মত একটি জটিল অঙ্গ কোনভাবেই প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি হতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লাখ লাখ বছর ধরে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা পরিবর্তনের ফলে চোখের মত অত্যন্ত জটিল অংগ-প্রত্যংগ গড়ে ওঠা সম্ভব। এ প্রক্রিয়াটির নাম ক্রমবর্ধমান নির্বাচন (cumulative selection)। একাধিক ধাপের এই ক্রমবর্ধমান নির্বাচনের মাধ্যমে যে ধাপে ধাপে যে জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ভুত হতে পারে তা ইতোমধ্যেই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমানিত হয়েছে।

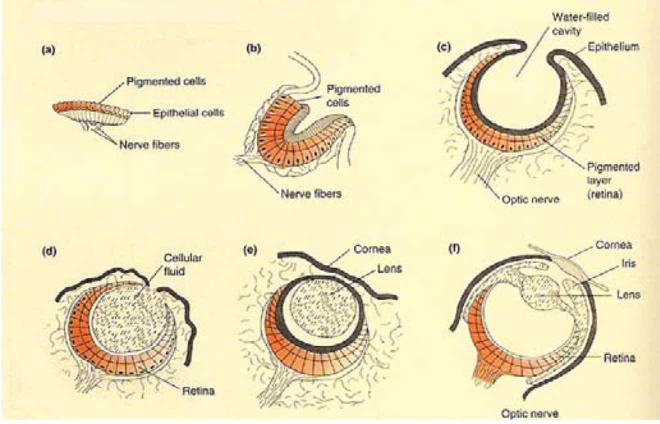

পাশের ছবিতে প্রকৃতিতে পাওয়া বিভিন্ন প্রাণীর চোখ দেখানো হয়েছে। সী-স্লাগের রয়েছে আলোর প্রতি সংবেদনশীল বিন্দু সদৃশ চোখ। আবার নটিলাসের রয়েছে পিন-হোল ক্যামারা-সদৃশ চোখ। অক্টোপাসের রয়েছে লেন্স ও রেটিনার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা জটিল চোখ। জটিল চোখ রয়েছে সরিসৃপেরও। শেষ ছবিতে দেখানো হয়েছে মানুষের চোখ। উপরের ছবিতে মোলাস্কের চোখের বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ দেখানো হয়েছে।

বিভিন্ন প্রাণীর শারীরিক গঠনের মধ্যে সাদৃশ্য থেকে বোঝা যায় যে তারা একই উৎস থেকে বিবর্তিত হয়েছে। এখন আমরা আধুনিক জেনেটিক্স-এর জ্ঞান থেকেও জানতে পারছি যে, এরকম বিভিন্ন প্রাণীর ডিএনএর মধ্যেও লক্ষ্যণীয় মিল দেখা যায়। একই ভাবে বিভিন্ন প্রাণীর শরীরে এখনও বিদ্যমান বিলুপ্তপ্রায় এবং অপ্রয়োজনীয় অংগগুলো বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে।

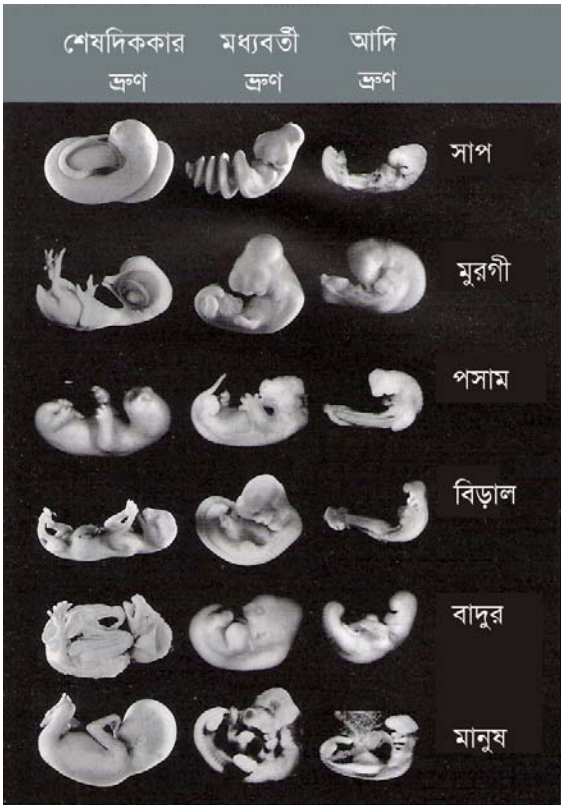

সাধারণ পুর্বপূরুষ থেকে বিবর্তিত হয়েছে বলেই সব মেরুদন্ডী প্রাণীর ভ্রূণ শুরুতে একই রকম দেখায়। এমনকি প্রথমে শ্বাস জালিকার সংখ্যাও সমান থাকে, তারপর ভ্রূণের বয়স যত বাড়তে থাকে এই বাহ্যিক সাদৃশ্য তত কমে আসে (পাশের ছবি) ।
উপরের ছবিতে পাঁচ সপ্তাহ বয়সী মানব ভ্রূণের মধ্যে লেজ এবং শ্বাস জালিকার অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে।

বিভিন্ন মেরুদন্ডী প্রাণীর সামনের হাত বা অগ্রপদের মধ্যে কি অস্বাভাবিক মিলই না দেখা যায়! ছবিতে দেখা যাচ্ছে পাখি, ব্যাঙ, বাদুর, তিমি, বিড়াল, টিকটিকি এবং মানুষের অগ্রপদের গঠন প্রায় একই রকম।

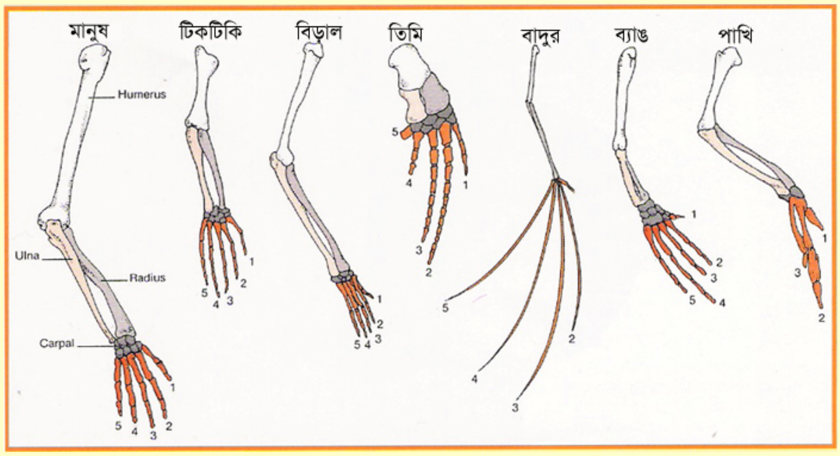

বিবর্তন তত্ত্বের সাহায্যে আমরা সহজেই প্রকৃতিতে জীবের অভিযোজন, সহবিবর্তন আর মিথোজীবিতাকে ব্যাখ্যা করতে পারি, আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি বিভিন্ন জীবের মধ্যকার বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্ককে। পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ এবং নান্দনিকতাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বিবর্তন তত্ত্ব অত্যন্ত সফল একটি তত্ত্ব।

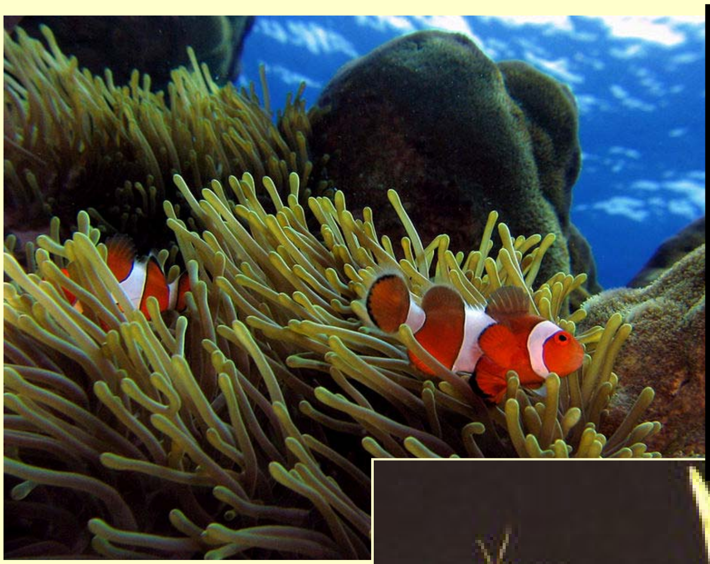

ক্লাউন মাছগুলো মিথোজীবিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ধরনের মাছ তার গাঢ় রঙের কারণে সহজেই অন্যের শিকারে পরিণত হতে পারে, আত্মরক্ষার জন্য গাঢ় রঙের সামুদ্রিক এনিমোনের শুঁড়ের ভিতর প্রায়শঃই আত্মগোপন করে। এভাবে ক্লাউন মাছগুলো শিকারী মাছের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়। আবার অন্যদিকে এনিমোনগুলোও ক্লাউন মাছের কারণে উপকৃত হয়। কারণ ক্লাউন মাছগুলো এনিমোনভোগী ছোট মাছকে তাড়িয়ে দেয়।

ডারউইন লন্ডনের এক গ্রীন হাউসে মাদাগাস্কারের বিশেষ একটা অর্কিড দেখেন যার মধু রাখার পুষ্পাধারটি ১১ ইঞ্চি লম্বা । তিনি তা দেখে মন্তব্য করেন যে, মাদাগাস্কারের যে জায়গায় এই অর্কিডটা দেখা যায়, সেখানে এমন এক ধরনের মথ জাতীয় কোন পোকা থাকতেই হবে যাদের সুর বা হুল হবে একই রকমের লম্বা। কারণ এই লম্বা মধুর পুষ্পাধারের ভিতর শুর ঢুকিয়ে মধু খাওয়ার সময়ই মথগুলো অর্কিডটার পরগায়ন ঘটাবে। এবং তাইই হলো - কয়েক দশক পরে বিজ্ঞানীরা ঠিকই খুঁজে পেলেন সেই মাদাগাস্কার স্ফিংস মথ Xanthopan morganii praedicta।

প্রকৃতিতে টিকে থাকার জন্য অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যেই এ ধরণের সহযোগীতার সম্পর্ক দেখা যায়, এবং নিজেদের প্রয়োজনে তারা দুজনেই অভিযোজিত হতে থাকে। আর একেই বলে সহ-বিবর্তন (co-evolution)।

কয়েক দশকে আণবিক জীববিদ্যা, জেনেটিক্স, জিনোমিক্সের বিভিন্ন আবিষ্কারগুলো বিবর্তনবাদকে অত্যন্ত জোড়ালো ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্সের মতে পৃথিবীতে যদি একটাও ফসিলের অস্তিত্ব না থাকতো তাহলেও জীবের বিস্তৃতির প্যাটার্ন এবং তাদের ডিএনএ-এর ভিতরে জিনের মধ্যে লেখা বংশগতীয় তথ্য থেকেই বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করা সম্ভব হতো।

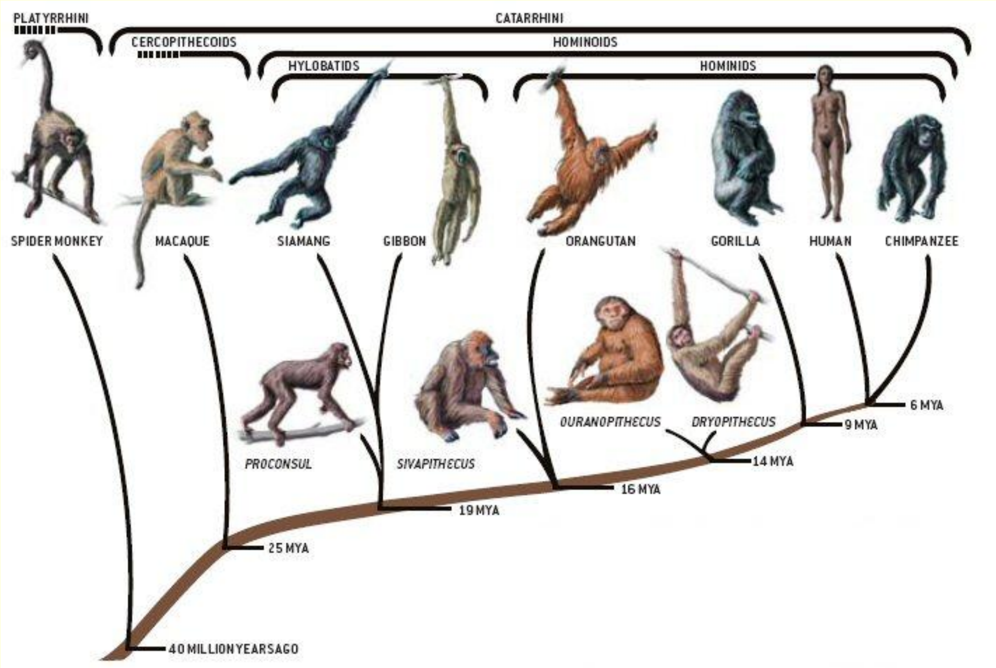

মিওসিন যুগের বেশীরভাগ এপই বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে বিজ্ঞানীরা এই যুগের আদি আদি প্রাইমেট প্রোকনসুল(Proconsul) প্রজাতিকে এখন হমিনয়েডদের সাধারণ পূর্বপুরুষ বলে মনে করেন। ফসিল রেকর্ডে এদের মোটামুটি সব হাড়েরই সন্ধান পাওয়া গেছে। সিভাপিথেকাস্কে ওরাং ওটাংদের পুর্বপুরুষ এবং ড্রাইওপিথেকাস বা ওরানোপিথেকাসকে হোমিনিডি অর্থাৎ মানুষ এবং বনমানুষের পুর্বপুরুষ বলে মনে করা হয়।

আগে ভাবা হত ছাড়া হাতিয়ারের ব্যবহার কেবল ‘মানবীয় বুদ্ধিমত্তা’র সাথে জড়িত। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে আনেক অঞ্চলের শিম্পাঞ্জী সরল হাতিয়ার তৈরি এবং তা ব্যবহার করতে সক্ষম। উপরের ছবিতে একটি শিম্পাঞ্জীকে পাথুরে অস্ত্র ব্যবহার করে বাদাম ভেঙে খেতে, আর পাশের ছবিতে আরেকটি শিম্পাঞ্জীকে লাঠির সাহায্যে উইপোকা ধরতে দেখা যাচ্ছে।

কয়েক দশকে আণবিক জীববিদ্যা, জেনেটিক্স, জিনোমিক্সের বিভিন্ন আবিষ্কারগুলো বিবর্তনবাদকে অত্যন্ত জোড়ালো ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্সের মতে পৃথিবীতে যদি একটাও ফসিলের অস্তিত্ব না থাকতো তাহলেও জীবের বিস্তৃতির প্যাটার্ন এবং তাদের ডিএনএ-এর ভিতরে জিনের মধ্যে লেখা বংশগতীয় তথ্য থেকেই বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করা সম্ভব হতো।

এখন কোন সন্দেহ নেই যে আমরা আফ্রিকার এক ধরনের বনমানুষ থেকে বিবর্তিত হয়েছি; জীবিত প্রজাতির মধ্যে শিম্পাঞ্জীরা আমাদের খুব কাছের আত্মীয়। কারণ আমরা একই পুর্বপুরুষ থেকে উদ্ভুত হয়ে দুটি ভিন্ন ধারায় বিবর্তিত হয়েছি। শারীরিক, আণবিক এবং ব্যবহারগত সাদৃশ্য থেকে পূর্ববর্তী বিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে জানা গিয়েছে। বৈসাদৃশ্য গুলো (যেমন, মানুষ খাড়া হয়ে হাটতে পারে, তাদের বিবর্ধিত মস্তিস্কের আকার, তাদের ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ ইত্যাদি) আমাদের 'সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠার' ক্ষেত্রে বিবর্তনের মাইলফলক গুলো খুঁজে পেতে সাহায্য করছে।

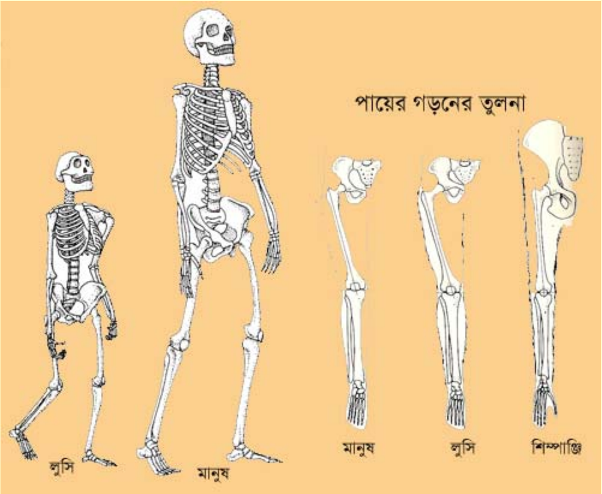

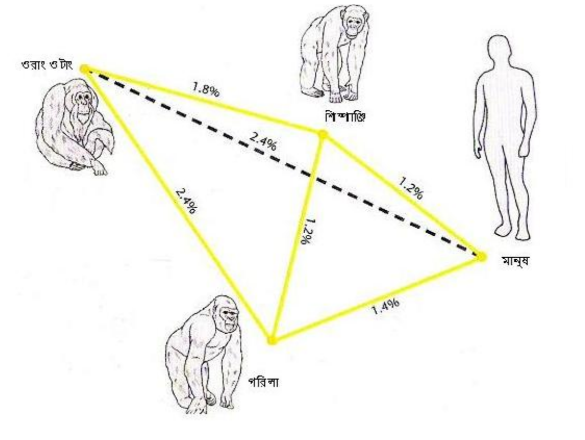

মানুষ শিম্পাঞ্জী, গরিলা এবং ওরাং ওটাং একই সাধারণ পূর্বপূরুষ থেকে ভিন্ন ধারায় বিবর্তিত হয়েছে। পাশের ছবিতে এদের মধ্যে জেনেটিক সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

গত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ বছরে অন্য সব জীবের মতই যেমন মানুষের বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে তেমনি তাদের বেশিরভাগ প্রজাতি আবার বিলুপ্তও হয়ে গেছে। পৃথিবীতে আজ *Homo sapiens* নামে আমাদের প্রজাতির মানুষই টিকে আছে, অন্যরা সবাই বিলুপ্তির পথ ধরে হারিয়ে গেছে।

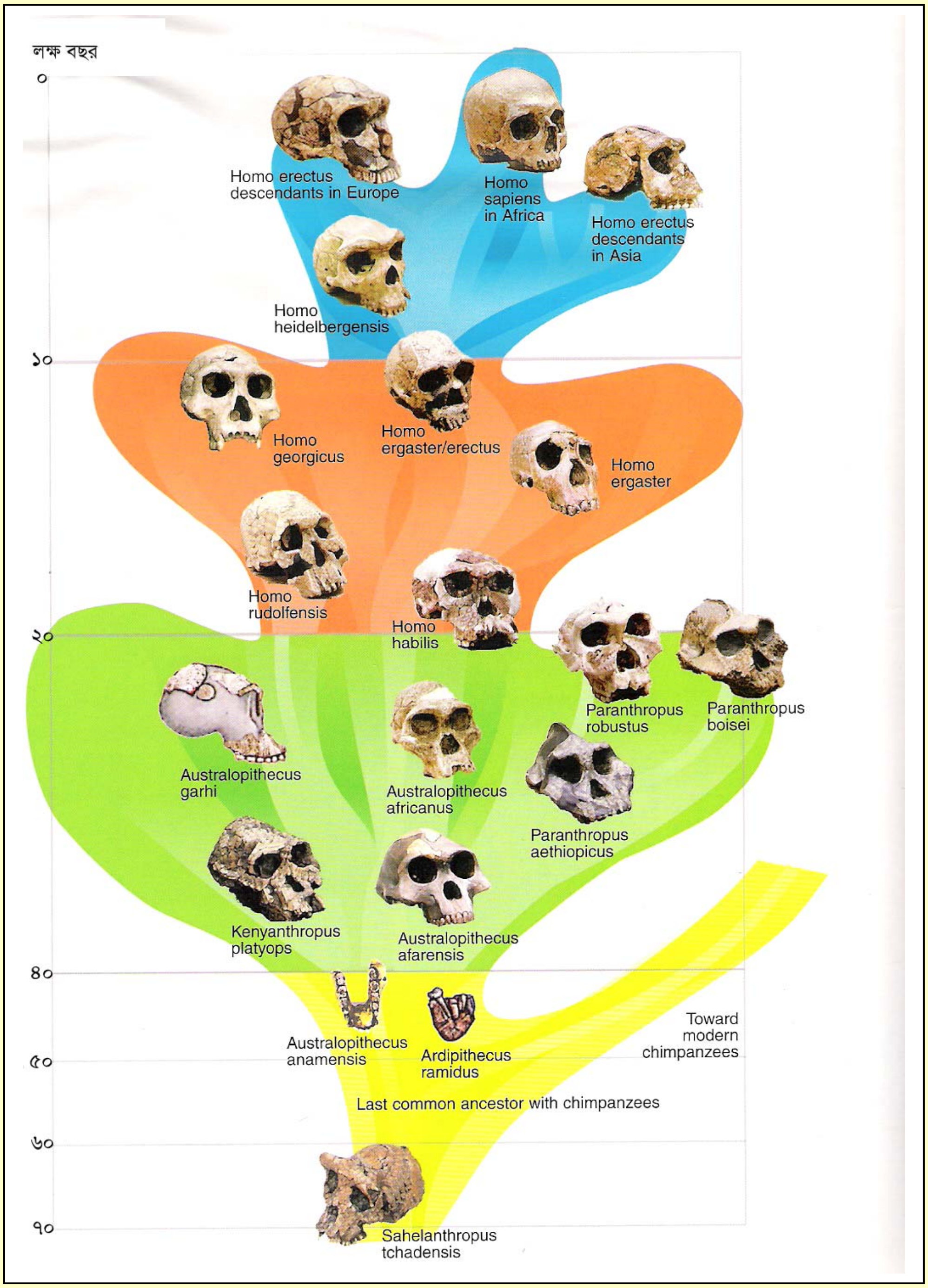

বহু প্রজাতির মানুষের পদচারণায় মুখরিত ছিল আমাদের এই পৃথিবী। ফসিল রেকর্ড থেকে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিশেষজ্ঞদের আঁকা বিভিন্ন প্রজাতির ছবি।

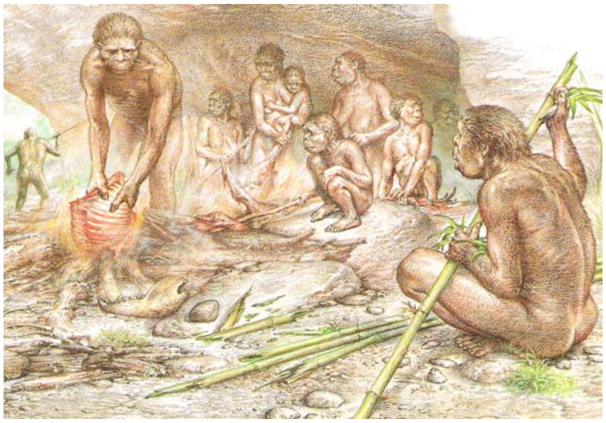

বিশ লক্ষ বছর আগের *Homo erectus* প্রজাতির সামাজিক জীবনযাত্রার ছবি।

উপরে বত্রিশ লক্ষ বছর আগের *Australopethicus afarensis* প্রজাতির সদস্য ‘লুসি’র ছবি।

নীচে দেখা যাচ্ছে বিশ লক্ষ বছর আগের *Paranthropus boisei* প্রজাতির ছবি।

Homo erectus-এর উত্তরসূরী মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে বিস্তৃত *Homo heidelbergensis* প্রজাতি। এরাই নিয়ান্ডারথাল প্রজাতির পূর্বপুরুষ।

আধুনিক মানুষ; *Homo sapiens* (পাশে)।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা দুই লাখ বছর আগে আফ্রিকায় উদ্ভূত হয়ে ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা মানুষের মধ্যে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য থাকলেও ডিএনএ-এর বিশ্লেষন থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমরা সবাই একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। কাজেই বর্ণবৈষম্য, জাতিভেদ এগুলো প্রকৃতির নয় বরং মানুষেরই সৃষ্ট।

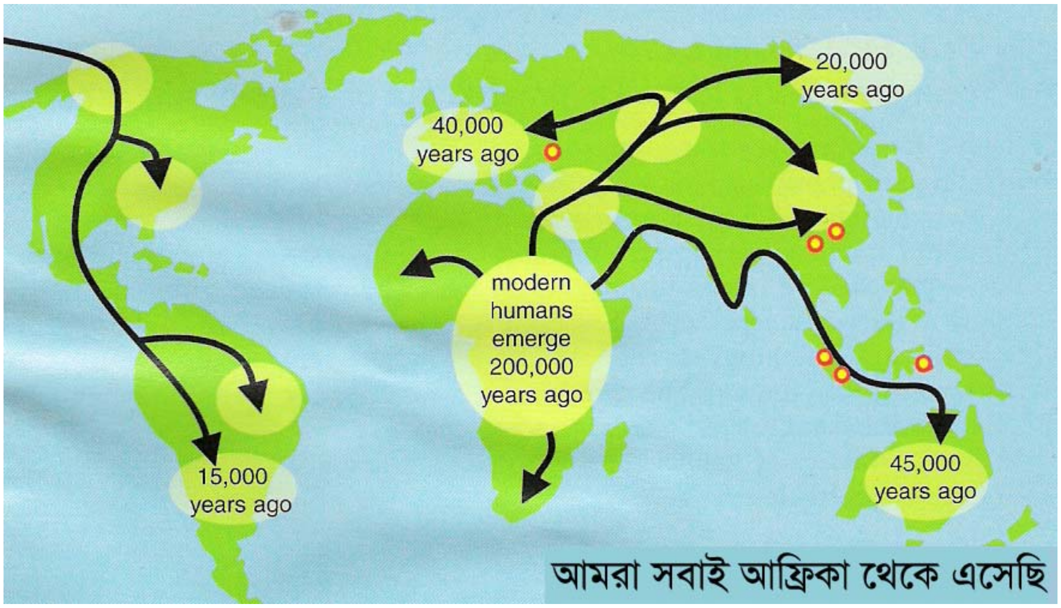

পৃথিবীতে যেমনিভাবে ডারউইনীয় বিবর্তন অনুযায়ী প্রাণের নান্দনিক বিকাশ ঘটেছে তেমনি এ মহাবিশ্বের বুকে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি গ্রহ কিংবা গ্রহাণুপুঞ্জের কোথাও কি প্রাণের বিকাশ ঘটেছে? আর ঘটে থাকলে তা কি ডারউইনীয় বিবর্তন তত্ত্বকে অনুসরণ করেই ঘটবে?

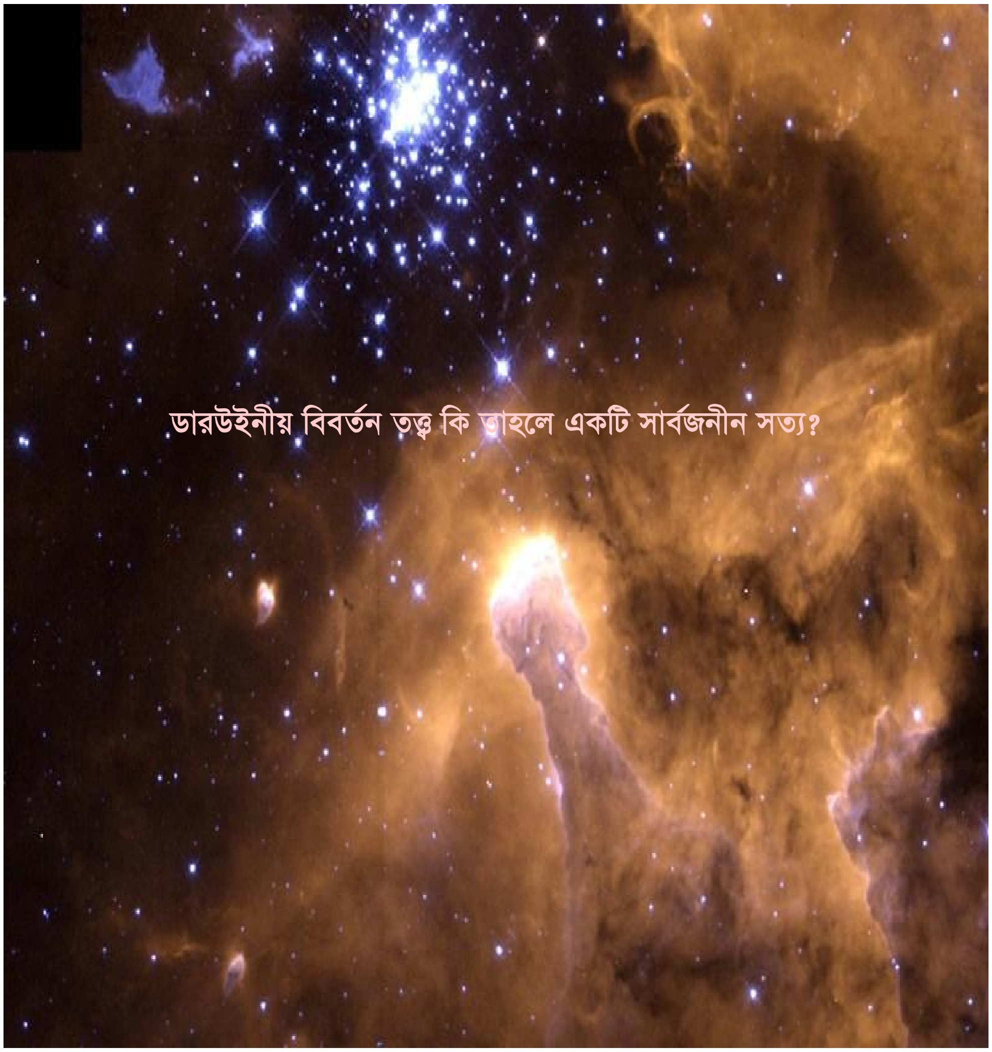

পরিশিষ্ট

বিবর্তন সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের পর

সাধারণ মানুষের মধ্যে বিবর্তন সম্পর্কে ভ্রান্তির যেন কোন শেষ নেই। একটু খেয়াল করে দেখলে তার কারণটা বুঝে ওঠাও তেমন কঠিন নয়। বিবর্তনবাদ এমন একটি তত্ত্ব যা আমাদের মানব সভ্যতার হাজার বছর ধরে লালন করা ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে চায়। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ তার এবং তার চারদিকের 'সৃষ্টি' নিয়ে ভেবেছে, গান বেঁধেছে, গুহার গায়ে ছবি এঁকেছে, দার্শনিক আলোচনায় লিপ্ত হয়েছে, কত রকমেরই না সৃষ্টিতত্ত্বের জন্ম দিয়েছে! মানব সভ্যতার সেই উষালগ্ন থেকে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে তৈরি হাজারো রকমের সৃষ্টিতত্ত্বের অস্তিত্ব দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। নিজের উৎপত্তির রহস্যের কোন কূল কিনারা না পেয়ে এবং প্রকৃতির বিশালত্বের মাঝে নিজের অসহায়ত্বে দিশেহারা হয়ে মানুষ বিভিন্ন অলৌকিক সত্তার কল্পণা করেছে; তেমনি আবার প্রকৃতির অন্যান্য জীবের সাথে তুলনা করে নিজের তথাকথিত 'মহিমায়' মুগ্ধ হয়ে সে নিজেকে বসিয়েছে সব কিছুর কেন্দ্রস্থলে, নিজেই নিজেকে ভূষিত করেছে শ্রেষ্ঠ 'সৃষ্টি'র সম্মানে। এতো মহিমা, এত আয়োজন তার নিজেকে ঘিরে! সেখান থেকে হঠাৎ করে সাধারণ এই পৃথিবীর অতি সাধারণ সব জীবের স্তরে নিজেকে নামিয়ে নিয়ে আসা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়! আসলে বিবর্তনবাদ শুধু তো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয় মানুষের চিন্তা ভাবনা দর্শনের ক্ষেত্রেও বিপ্লব ঘটিয়েছে, তাকে খুব সহজে মেনে নেওয়া তো কঠিন হওয়ারই কথা। এটা সত্যি যে, জ্ঞান যেখানে আটকে গেছে সেখানে ভীড় করেছে আলৌকিকতা, অতিপ্রাকৃতিক শক্তি, কিন্তু সেখানেই তো সে থেমে থাকেনি। আবার যখন নতুন এবং পরিবর্ধিত জ্ঞানের আলোয় আগের অজানা বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে তখনই সে সব বাধা অতিক্রম করে পুরনো ভুলগুলোকে ভেঙ্গেচুরে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। তার এই কল্পনাশক্তি, সৃজনীশক্তি এবং তার সাথে যুক্তি দিয়ে বস্তুবাদী চিন্তা দিয়ে তার চারদিকের সব কিছুকে বিশ্লেষণ করে দেখার অসীম ইচ্ছার কারণেই জ্ঞান-বিজ্ঞান আজকে এখানে এসে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। আজকে বিজ্ঞান এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, প্রাকৃতিক নিয়ম (Natural Laws) দিয়েই সে তার পারিপার্শ্বিকতাকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। এই পৃথিবীতে প্রজাতির উদ্ভব এবং বিকাশ বোঝার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণবিহীন কোন অতিপ্রাকৃত সত্তার আশ্রয় নেওয়ার আর দরকার নেই।

বিবর্তনবাদকে মেনে নিতে হলে আমাদের সনাতন বহু অন্ধ বিশ্বাসকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হয়। খুব সহজবোধ্য কারণেই সাধারণ মানুষের মধ্যে আজ আমরা বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে এত বিরোধিতা ও ভুলভ্রান্তি দেখতে পাই। ছোটবেলা থেকে আমরা সৃষ্টিতত্ত্বের সব রকমের ব্যাখ্যা পড়ে-শুনে বড় হলেও বিবর্তনবাদের মত বিজ্ঞানের মূল একটি তত্ত্বকে আমাদের পাঠ্যসূচী থেকে সযতনে এড়িয়ে যাওয়া হয়। আর তার সাথে যদি যুক্ত হয় সুচিন্তিতভাবে আরোপ করা রাজনৈতিক, সামাজিক বিরোধিতা তাহলে তো আর কথাই নেই। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেই যে শুধু বিবর্তনবাদ পড়ানো হয় না তা তো নয়, আমেরিকার মত অগ্রসর দেশেও আজকে বিবর্তনবাদের মত প্রতিষ্ঠিত একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কোন শেষ নেই। আমরা আগেই দেখেছি যে, সে দেশের প্রেসিডেন্ট বুশ বিনা দ্বিধায় ঘোষণা দেন যে, "ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন" নামের এই পুরোন ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বকে যেনো বিবর্তনবাদের বিকল্প হিসেবে বিজ্ঞানের ক্লাসে পড়ানো হয়। আমেরিকার সংবিধান আনুযায়ী সরকারী স্কুল কলেজে ধর্ম বিষয়ক কোন রকম শিক্ষা নিষিদ্ধ বলে গণ্য করা হয়, কিন্তু তারপরও এভাবে তারা ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বকে স্কুল

কলেজের পাঠ্যসূচীতে ঢুকিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা করে যাচ্ছেন। এ নিয়ে সচেতন জনগোষ্ঠী স্কুল বোর্ডগুলোর এধরণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলাও করে ছাড়ছেন, এবং এখানকার বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সামাজিক সচেতনতার কারণে এখন পর্যন্ত প্রত্যেকটি মামলার ফলই ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের বিপক্ষে গেছে। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিবর্তনবাদের বিরোধীতাটা শুধু একটা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার তা নয়; এর পিছনে খুব শক্তিশালী সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভিত্তিও কাজ করছে। স্কুলের পাঠ্যসূচীতে এই সৃষ্টিতত্ত্বকে বিবর্তনের পাশাপাশি ‘বিজ্ঞান’ হিসেবে সৃষ্টিতত্ত্ব পড়ানোর দাবী তো আছেই, সেই সাথে আছে প্রচলিত পত্র পত্রিকা, ধর্ম-প্রতিস্ঠান, প্রতিপত্তিশালী সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিবর্তন সম্পর্কে ভুল ধারণা প্রচার করার অনবরত প্রচেস্টা। বিজ্ঞানীরাও এখন অনেকে স্বীকার করেন যে, তারা শুধু এতদিন গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, সাধারণ মানুষকে বিবর্তন সম্বন্ধে অবগত করানোর বা বোঝানোর গুরুদায়িত্ব তাঁরা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই এখন রিচার্ড ডকিন্স থেকে শুরু করে কেনেথ মিলার, টিম বেড়া, ডগলাস ফুটুইমা, আর্নেস্ট মায়ার (প্রয়াত) মত বিখ্যাত জীববিজ্ঞানীরা কার্ল স্যাগানের পথ ধরে বিজ্ঞানকে বিশ্বজুড়ে সাধারণ মানুষের দরজায় পৌঁছে দেওয়ার কাজে লিপ্ত হয়েছেন।

এটা সত্যি যে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতই বিবর্তনবাদেও এখনও অনেক অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতই এখানেও বিজ্ঞানীরা বিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু বিষয় নিয়ে এখনও একমত হতে পারেননি। কিন্তু গত একশ বছর ধরে বিবর্তনবাদের মুল বিষয়বস্তু অর্থাৎ সব জীবই যে সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়েছে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই (descent, with modificatiom, of all organism from common ancestors)। আজকে পৃথিবীর গোলত্ব বা সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরছে - এগুলো যেমন প্রতিস্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিবর্তনবাদও ঠিক তেমনি একটি সুপ্রতিস্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

আসলে বিবর্তনবাদের বিরোধিতাকারীদের মধ্যে আবার বিভিন্ন রকমের ভাগ এবং স্তর রয়েছে। এক্কেবারে গোঁড়ারা বিবর্তনবাদ তো দুরের কথা, এখনও বাইবেলের সেই সমতল পৃথিবীতে বিশ্বাস করেন। অনেকে এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ছয় হাজার বছর আগেই পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছিলো এবং সাড়ে ছয় কোটি বছর আগের ডায়নোসরের অস্তিত্ব আজগুবি গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। ইন্টারনেটে সার্চ দিলে এরকম হাজার হাজার সাইট খুঁজে পাবেন। এই ধরণের ধর্মীয় মৌলবাদীরা পুরোপুরিভাবেই বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করেন। হারুন ইয়াহিয়া বলে তুর্কি এক স্বঘোষিত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক তার ‘The Evolution Deceit’ বইতে বিবর্তনবাদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে বিবর্তনবাদ আজকের পৃথিবীর আধিপত্যকারী শক্তির দ্বারা তৈরী একধরণের প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে অনেকেই আছেন যারা বিজ্ঞানের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, কিন্তু এখান থেকে সেখান থেকে শুনে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেন। আমাদের দেশের স্কুল কলেজের বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে যেহেতু পরিস্কারভাবে বিবর্তনবাদ পড়ানো হয় না তাই অনেকেই আবার ইন্টারনেটের সৃষ্টিতত্ত্ববাদী বিবর্তনবিরোধী সাইটগুলো থেকে তথ্য জোগার করে বেশ জোরেসোরে বিবর্তনবাদের বিরোধিতা করতে শুরু করে দেন। আসলে বিবর্তনতত্ত্ব হচ্ছে জীববিদ্যার সব শাখার অন্যতম ভিত্তিমুল, একে ছাড়া জীববিদ্যাই অচল হয়ে পড়বে। বাজারে বিবর্নতবাদের উপর পৃথিবীর নাম করা সব বিজ্ঞানীদের লেখা হাজারো বই রয়েছে, তাদের কোন একটি বই একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই কিন্তু বেশীর ভাগ ভুল ধারণাগুলো কেটে যায়, কিন্তু এতটুকু কষ্টই বোধ হয় অনেকের আর করে ওঠা হয় না। মজার জিনিস

হচ্ছে, ডারউইন এবং ওয়ালেস বিবর্তন তত্ত্বটি প্রকাশ করার পর বেশীরভাগ মানুষই এর বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু গত দেড়শ বছরে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে এখন আর পুরোপুরিভাবে কেউ একে অস্বীকার করতে পারেন না। তাই যারা এ সম্পর্কে অল্পসল্প খবর রাখেন তারা অনেকেই বলেন যে মাইক্রো-বিবর্তন ঘটলেও ঘটতে পারে তবে ম্যাক্রো-বিবর্তন নাকি একটি অসম্ভব ব্যাপার। চলুন তাহলে এখন বিবর্তনবাদ সম্পর্কে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা এবং প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১) বিবর্তনবাদ শুধুই একটি তত্ত্ব (Theory) এর মধ্যে কোন বাস্তবতা বা সত্যতা (Fact) নেইঃ

এই ধরণের কথা যারা বলেন তাদের কাছে বোধ হয় তত্ত্ব এবং বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্যটা ঠিক পরিষ্কার নয়। চলুন প্রথমে না হয় সেটাই একটু পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা যাক। কোন পর্যবেক্ষণ যখন বারংবার বিভিন্ন ভাবে প্রমাণিত হয় তখন তাকে আমরা বাস্তবতা বা সত্য (fact) বলে ধরে নেই। আর এদিকে তত্ত্ব হচ্ছে এই বাস্তবতা বা পরীক্ষিত কোন অনুকল্প কিভাবে ঘটছে সেই প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা। যেমন ধরুন, আপেল কেন মাটিতে পড়ে- তা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র দিয়ে তা খুব ভালভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। এখানে আপেল পড়ার ব্যাপারটা হচ্ছে বাস্তবতা। আর নিউটনের মহাকর্ষের সূত্র যা দিয়ে এই আপেল পড়ার প্রক্রিয়াটাকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তা হল তত্ত্ব। দেখা গেল এই মহাকর্ষ তত্ত্ব খুব ভালভাবেই বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করছে। কিন্তু আইনস্টাইন এসে দেখালেন যে নিউটনের মহাকর্ষ নিয়ম কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে সঠিক ফল দেয় না। এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে কখন? যখন বস্তু কণা ছুটতে থাকে আলোর বেগের কাছাকাছি কিংবা যে সমস্ত জায়গায় মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাব খুব বেশী (যেমন ব্ল্যাক হোলের কাছাকাছি)। দেখা গেল যে, এ সমস্ত পরিস্থিতিতে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের চেয়ে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার ব্যাপক তত্ত্ব (General theory of relativity) আরও নিঁখুত ফলাফল দেয়। শুধু তো তাই নয়, এইতো সেই দিন বহুলভাবে স্বীকৃত বিজ্ঞানের সাময়িকী Disccover এর আগষ্ট ২০০৬ সংখ্যায় দেখলাম মোর্ডেহাই মিলগ্রম (Mordehai Milgrom) নামের এক বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের তত্ত্বকেও চ্যালেঞ্জ করেছেন, কারণ মোর্ডেহাইয়ের তত্ত্বে সেই রহস্যময় 'ডার্ক ম্যাটার' এর ধারণা গ্রহণ করার দরকার পড়ে না। তাহলে কি আমরা বলবো, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিউটনের (বা আইনস্টাইনও যদি কখনও ভুল প্রমাণিত হয়) মহাকর্ষের সুত্রকে ব্যাখ্যা করেছিলেন তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে বিধায় গাছ থেকে আপেল পড়া বন্ধ হয়ে গেছে নাকি আপেলগুলো গাছের ডাল এবং মাটির মাঝামাঝি শুন্যে ঝুলে রয়েছে? আপেলের পতন তো আর নিউটন বা আইনস্টাইনের তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে বসে নেই। বিজ্ঞান তো স্থবির নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে পাওয়া সাক্ষ্যগুলোর চুলচেরা ক্রস-বিশ্লেষণের পরেই এরকম তত্ত্বগুলো হাজির করা হয়। যে তত্ত্বটি সবচেয়ে ভালভাবে বাস্তবতাকে (Reality) এ মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে পারছে সেই তত্ত্বটিকেই গ্রহণ করা হয়। তার পরও যদি দেখা যায় যে, এর চেয়ে আরও ভালো বিশ্লেষণ পরবর্তীতেপাওয়া যাচ্ছে, তখন বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ীই যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ব্যাখ্যাটাকে গ্রহণ করা হয়। বিজ্ঞান এভাবেই সামনের দিকে এগিয়ে যায়, নতুন নতুন এবং উন্নততর তত্ত্বের মাধ্যমে বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমের বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটতে থাকে। এদিকে আবার কিছু বাস্তবতা বা সত্য আছে যা চোখের সামনে সরাসরি দেখা যায় না, কিন্তু প্রতিবারই তাকে পরোক্ষভাবে প্রমাণ করা সম্ভব, যেমন ধরুন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, বা অণু পরমাণুর গঠন ইত্যাদি, কিন্তু এরা যে বাস্তব তা নিয়ে তো সন্দেহর কোন অবকাশ নেই।

বিবর্তনের ক্ষেত্রেও একই কথাই প্রযোজ্য। এটি একটি বাস্তবতা যে, জীব স্থির নয় বরং বিবর্তনের মাধ্যমে

তাদের পরিবর্তন ঘটে আসছে, তাদের কাউকেই পৃথক পৃথকভাবে তৈরী করা হয়নি, তারা সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তন বা পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়েছে। এই বাস্তবতাটি গত দেড়শো বছর ধরে বারবার হাজারো রকমভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আগের অধ্যায়গুলোতে এই প্রমাণগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই বিবর্তন ঘটছে, কোন তত্ত্বের মাধ্যমে এই বিবর্তনের প্রক্রিয়াকে সবচেয়ে পূর্ণাংগভাবে প্রমাণ করা যাবে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও বিতর্ক চলছে। ডারউইন নিজেও এই দু'টো বিষয়কে আলাদা করে উপস্থাপন করেছিলেন। 'The Descent Of Man' বইতে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন যে, এখানে তিনি দু'টো পৃথক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। প্রথমটি হচ্ছে যে কোন প্রজাতিকেই পৃথকভাবে তৈরি করা হয়নি, প্রকৃতিতে বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে আর দ্বিতীয়তঃ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধানতঃ এই পরিবর্তনগুলো ঘটে থাকে। তিনি এই বলেও সাবধান করে দেন যে, যদি তিনি ভুলবশতঃ প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর অত্যাধিক জোর দিয়েও থাকেন তবু তার মাধ্যমে অন্ততপক্ষে এটুকু প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন যে, প্রজাতির পৃথক পৃথক সৃষ্টির মতবাদটি অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয় [২]। সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা দাবী করেন যে, যেহেতু বিজ্ঞানীরা নিজেরাই এখনও বিবর্তন নিয়ে তর্ক বিতর্ক করে যাচ্ছেন তা থেকে নাকি প্রমাণিত হয় বিবর্তনবাদের কোন ভিত্তি নেই। আবারও, একই কথা বলতে হয় এর উত্তরে। বিজ্ঞানীরা বিবর্তন কিভাবে ঘটছে অর্থাৎ বিবর্তনের প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলেও বিবর্তনবাদের মূল বিষয়বস্তু অর্থাৎ 'বিবর্তন আদৌ ঘটছে কিনা' তা নিয়ে একবারও সন্দেহ প্রকাশ করেন না। কারণ বিবর্তনের বাস্তবতা অনেক আগেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে, এখন বিতর্ক চলেছে বিবর্তনের প্রক্রিয়া নিয়ে। যেমন ধরুন, প্রাকৃতিক নির্বাচন যে বিবর্তনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া তা নিয়ে কিন্তু বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটিই কি একমাত্র বা প্রধানতম কারণ নাকি এমন অনেক জেনেটিক বা বংশগতীয় পরিবর্তন থাকতে পারে যারা প্রাকৃতিক নির্বাচনের আওতাভুক্ত না হয়েই বিবর্তন ঘটাতে পারে, কিংবা আসলেই কি বিবর্তন শুধুমাত্র ধীর পরিবর্তনের মাধ্যমে ঘটে নাকি কোন কোন সময় তার এই গতিতে উল্লম্ফনও ঘটতে পারে। বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে বিচার করলে এই বিতর্কগুলোকে অত্যন্ত সুস্থ এবং বৈজ্ঞানিক বলেই ধরে নিতে হবে। এর মাধ্যমেই হয়তো একদিন আমরা সুস্পস্টভাবে বলতে পারবো ঠিক কোন কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিবর্তন ঘটছে। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা যখন একে পুঁজি করে বিবর্তনবাদের দূর্বলতা খুঁজতে থাকেন তখন তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দিহান না হয়ে পারা যায় না।

২) প্রকৃতিতে মাইক্রো-বিবর্তন ঘটতে দেখা গেলেও ম্যাক্রো-বিবর্তন ঘটার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাঃ

এই (কু)যুক্তিটি বিবর্তনবাদের বিরোধীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়, তারা সুযোগ পেলেই এই ব্যাপারটাকে সামনে নিয়ে আসেন। শুধুমাত্র বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারা এটা বলেন বললে বোধ হয় পুরোটা বলা হয় না। ম্যাক্রো-বিবর্তনের ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝে ওঠার জন্য বিবর্তনবাদের গভীরে যতটুকু ঢোকা দরকার সেটা তারা করেন না, কিন্তু তারা জানেন যে, ম্যাক্রো-বিবর্তনের মাধ্যমে পূর্বসুরী প্রজাতি থেকে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটতে হাজার, লক্ষ, কোটি বছর লেগে যেতে পারে। এ তো আর চোখের সামনে ঘটতে দেখা যায় না, তাই এ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব সহজেই সংশয় সৃষ্টি করা সম্ভব - আর সেটারই সুযোগ নেন তারা। প্রজাতির সংজ্ঞা কি? বিজ্ঞানীদের মধ্যে বহুলভাবে প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রজাতি হচ্ছে এমন এক জীবসমষ্টি যারা নিজেদের মধ্যে প্রজননে সক্ষম, তারা অন্য প্রজাতির সাথে প্রজননগত দিক থেকে বিচ্ছিন্ন। আমরা 'চোখের সামনেই ঘটছে বিবর্তন' অধ্যায়ে উদ্ভিদের মধ্যে বেশ অল্প সময়েই এ ধরণের নতুন প্রজাতি উৎপন্ন হতে দেখেছি, রিং বা চক্রাকার প্রজাতির মধ্যে ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতার ফলে

নতুন ধরণের প্রজাতি তৈরী থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রজাতি তৈরীর উদাহরণও দেখেছি। এখন বিবর্তনবাদের বিরোধীরা বলতে শুরু করবেন, এই সব ক্ষেত্রেই তো এক ধরণের উদ্ভিদ থেকে নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ বা টিকটিকি থেকে আরেক ধরণের টিকটিকিই তৈরী হচ্ছে, এমন তো নয় যে বানর থেকে মানুষ বা ডায়নোসর থেকে পাখি বা জলহস্তীর মত স্থলচর জীব থেকে সমুদ্রের দৈত্যাকার মাছ তিমি উৎপন্ন হয়ে যাচ্ছে - যে ধরণের ব্যাপার স্যাপারগুলো বিবর্তনের মাধ্যমে ঘটে বলে বিজ্ঞানীরা দাবী করেন। হুমমম্, অবশ্যই একটি যৌক্তিক প্রশ্ন। বিবর্তনবাদের পিছনে যে বিজ্ঞান কাজ করছে তা বুঝলে প্রশ্নটার উত্তর একটু কঠিন হলেও অবোধ্য হওয়ার কথা নয়। বিভিন্ন সময় আগের অধ্যায়গুলোতে এই বিষয়গুলো নিয়ে বারবার আলাপ করা হলেও তাদেরকে একসাথে করে বিস্তারিতভাবে না হয় আরেকবার প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া যাক। আগের লেখায় বিবর্তনের তত্ত্ব নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি, এখন আর বেশী তত্ত্ব কথায় না গিয়ে কিছু উদাহরণ, গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করা যাক।

আমাদেরকে প্রথমে বুঝতে হবে যে রাতারাতি ঘটে যাওয়া নাটকীয় কোন চটকদার পরিবর্তনের ধারণা বিবর্তনের তত্ত্বে জায়গা পায়নি। আগেই দেখেছি আমরা যে, বিবর্তন ঘটে অত্যন্ত মন্থর গতিতে, প্রাকৃতিক নির্বাচন, মিউটেশন, জেনেটিক ড্রিফট, ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা, বংশীয় বা জেনেটিক রিকম্বিনেশন সহ বিভিন্ন কারণে প্রজাতির মধ্যে ছোট ছোট পরিবর্তন বা মাইক্রো-বিবর্তন ঘটতে থাকে। আর বহু মাইক্রো-বিবর্তনের মাধ্যমে ঘটা সম্মিলিত পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে একসময় প্রজাতি বা প্রজাতিটির একটি অংশ অন্য আরেকটি প্রজাতিতে পরিণত হয়। অনেক বিজ্ঞানী বিবর্তনে উল্লম্ফন এবং মেগাবিবর্তনের কথা বলেন, এই উল্লম্ফনগুলোও এক প্রজন্মে ঘটে না, বিশেষ কোন সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে (যেমন, আকষ্মিক কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা পরিবেশগত পরিবর্তন) লক্ষ লক্ষ বছরের জায়গায় হয়তো হাজার হাজার বছর লাগে এই 'তড়িৎ' বিবর্তনগুলো ঘটতে। ব্যাপারটা এমন নয় যে একদিন সকালে উঠে দেখা গেলো যে, বনমানুষ থেকে এক মানব শিশু জন্ম নিয়ে ফেলেছে এবং সবাই অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে তা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাচ্ছে। যেমন ধরুন এক ধরণের বন-মানুষ থেকে প্রায় ৮০-৪০ লক্ষ বছর আগে যখন মানুষের পুর্বপুরুষদের বিবর্তন ঘটতে শুরু করে তখন খুব ধীরে হাজার হাজার বছরের বহু ছোট ছোট পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে শুরু করে এবং সেই সাথে সাথে ক্রমাগতভাবে তাদের মস্তিষ্কের আকারও বড় হতে শুরু করে। প্রায় ৫৫-৩০ লক্ষ বছর আগের মানুষের পুর্বপুরুষদের যে অসংখ্য ফসিল পাওয়া গেছে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করলে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, কিভাবে সময়ের সাথে সাথে ক্রমশঃ বনমানুষের চারপায়ী বৈশিষ্ট্যগুলো বদলে যাচ্ছে এবং ফসিলগুলো যত আধুনিক সময়ের দিকে এগিয়ে আসছে ততই আরও বেশী করে আমাদের মানুষের মত হয়ে উঠছে। কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো এতই ধীরে ধীরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ঘটেছে যে কোন এক প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে তা বোঝার কোন উপায় থাকে না। সেই সময়ে আরেক গ্রহ থেকে কোন এক বুদ্ধিমান প্রাণী এসে এই পূর্বপুরুষদের দেখলে অবাক হয়ে বলতো না, 'ও আচ্ছা ওরা তো দেখছি অর্ধেক মানুষে পরিণত হয়ে বসে আছে, এখনও গাছেও ঝুলছে, দু'পায়ের উপর ভর করে মাটিতেও হাঁটতে শিখেছে, মস্তিষ্কের আকারও আগের চেয়ে বড় হয়েছে, পূর্ণাংগ মানুষ হতে তো ওদের আরও কয়েক লক্ষ বছর লেগে যাবে'! যখন যে প্রজাতি যে অবস্থায় থাকে সেটাই তার পুর্নাংগ রূপ, সেই সময় এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ওই বৈশিষ্ট্যগুলোই তাকে টিকে থাকতে সাহায্য করে। অতীতের দিকে তাকিয়ে, আমরা কয়েক লক্ষ বা কোটি বছরে বিবর্তিত হতে থাকা প্রাণীদের ফসিল রেকর্ড দেখে যেভাবে মধ্যবর্তী প্রজাতি বলে সনাক্ত করতে পারি, কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে তা বোঝার কোন উপায় থাকে না, এই মধ্যবর্তী প্রজাতির ধারণাটি এখানে সম্পুর্নভাবে আপেক্ষিক। এভাবে চিন্তা করলে একদিকে যেমন বলা যায় মধ্যবর্তী ফসিল বলে কিছু নেই আবার উল্টোভাবে সেই আদি জীবের উদ্ভবের পর সবাই আসলে কারও না কারও মধ্যবর্তী জীব। সব

উভচর প্রাণী মাছ এবং সরীসৃপের মধ্যবর্তী অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে, আবার ওদিকে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীরা উভচর এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মাঝখানের অবস্থা ধারণ করে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিককালে আবিষ্কার করেছেন যে গত কয়েক হাজার বছর ধরে আমাদের মস্তিষ্ক ক্রমাগতভাবে আরও বড় হচ্ছে, অর্থাৎ আমরা এখনও বিবর্তিত হচ্ছি, তার মানে তো এই নয় যে আমরা কোন মধ্যবর্তী অবস্থায় আটকে আছি। ডঃ রিচার্ড ডকিন্স তার 'The Ancestor's Tale' বইতে বেশ মজা করেই বলেছেন, এই যে আমরা প্রায়ই প্রশ্ন করি 'মানুষের প্রথম পুর্বপূরুষ কে ছিলো' - এটা আসলে বোকার মত একটা প্রশ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়, অত্যন্ত ধীরগতিতে ধারাবাহিকভাবে ঘটতে থাকা বিবর্তনের প্রক্রিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে এই ধরণের প্রশ্নগুলোর আসলে কোন অর্থই হয় না। বিবর্তনের দৃষ্টিতে অর্থপূর্ণভাবে প্রশ্ন করতে হলে এভাবে হয়তো জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, 'মানুষের সবচেয়ে আগের কোন পূর্বপুরুষ বা পূর্বপুরুষরা স্বাভাবিকভাবে দুই পায়ের উপর হাটতে শিখেছিলো?' বা 'আমাদের কোন পূর্বপুরুষের মস্তিষ্কের আকার ৬০০ সিসির চেয়ে বড় ছিলো?' [৩]।

কিন্তু এখন সমস্যা হচ্ছে এই পরিবর্তন তো চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে না। তাহলে বিজ্ঞানীরা কি করে বলছেন যে এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির উৎপত্তি আসলেই ঘটেছিলো? বিজ্ঞানের সব তত্ত্বই তো শুধু চোখের সামনে দেখে প্রমাণ করা হয় না। তাহলে তো ভূতত্ত্ববিদ্যার প্লেট টেকটনিক্স, মহাদেশীয় সঞ্চরণ থেকে শুরু করে পদার্থবিদ্যার পরমাণুর গঠন বা বিগ ব্যাং এর মত সব তত্ত্বকেই আজকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, প্রজাতির উদ্ভব বা জীবের ম্যাক্রো-পরিবর্তনের তত্ত্বটি আজকে ফসিল রেকর্ড ছাড়াও আধুনিক বিজ্ঞানের এত শাখার সাহায্যে এত উপায়ে পরীক্ষিত যে, যারা এ নিয়ে এখনও সন্দেহ করেন তাদের পায়ের নীচে মাটি নেই বললেই চলে। পানির মাছ থেকে স্থলচর চারপায়ী প্রাণীর বিবর্তন কিংবা সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিবর্তনের প্রত্যেকটি ধারাবাহিক ধাপের একটি দুটি নয় বরং অসংখ্য ফসিল পাওয়া গেছে[৪], যেমন ধরুন, স্তন্যপায়ী প্রাণীর উত্তরসূরী সরীসৃপের নীচের চোয়ালে পাঁচটি পৃথক পৃথক হাড় রয়েছে, কিন্তু স্তন্যপায়ী প্রাণীর চোয়ালে রয়েছে মাত্র একটি হাড়। সরীসৃপের চোয়ালের হাড় গুলো ধাপে ধাপে কমতে শুরু করে এবং ফসিল রেকর্ড থেকে আজকে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে দেখতে পাই কিভাবে তা স্তন্যপায়ী প্রাণীর কানের হাড়ে রূপান্তরিত হয়েছিলো। এই ধাপে ধাপে পরিবর্তনের সাক্ষ্য হিসেবে ফসিলবিদেরা একাধিক 'মাঝামাঝি' বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ট্রায়াসিক যুগের তথাকথিত 'স্তন্যপায়ী জাতীয় সরীসৃপ' প্রাণীর ফসিল খুঁজে পেয়েছেন। এদের মধ্যে এই বিবর্তনের মধ্যবর্তী ধাপের দুটি স্তরই অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে দেখা যায়[২], এদের রয়েছে দু'টো চোয়ালের জয়েন্টঃ একটি হচ্ছে ক্রমশঃ ছোট হতে থাকা সরীসৃপের চোয়াল আরেকটি হচ্ছে নতুন ধরণের চোয়াল। পরবর্তীতে ট্রায়াসিক যুগের শেষের দিকে দেখা যায় যে, সরীসৃপের চোয়ালটির কাজ ধীরে ধীরে বদলে কানের হাড়ে পরিণত হচ্ছে । আজ পর্যন্ত আমরা এই বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে চলেছি, একারণেই কিছু চিবানোর সময় আমরা কানের ভিতরে চোয়ালের হাড়ের নাড়াচাড়া আনুভব করতে পারি। এই প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর হাজারো বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ সহ শ'য়ে শ'য়ে বই লেখা হয়েছে। এ 'Vertebrate Evolution' বা 'Evolution of Mammals' লিখে www.amazon.com নামের অনলাইন বইয়ের সাইটে সার্চ দিলেই এই সব বিষয়ের উপর গবেষণারত বিজ্ঞানীদের লেখা গাদি গাদি বইয়ের নাম বেরিয়ে পড়বে।

এটা কি একটা শুধুই কাকতলীয় ব্যাপার যে, ফসিল রেকর্ডে উভচর প্রাণীর উৎপত্তির আগে কোন সরীসৃপের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, বা সরীসৃপের আগে কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর ফসিল খুঁজে পাওয়া যায় না? এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হচ্ছে যে, এখন পর্যন্ত এমন কোন স্তরে এমন একটি অদ্ভুত ফসিল পাওয়া যায়নি যা দিয়ে বিবর্তন তত্ত্বের ধারাবাহিকতাকে ভুল প্রমাণ করা যায়। আজকে বিজ্ঞানীরা বলছেন

মানুষ এক ধরণের বনমানুষ থেকে বিবর্তিত হয়েছে, এখন যদি দেখা যায় বন মানুষ জাতীয় প্রাইমেট তো দুরের কথা স্তন্যপায়ী প্রাণী উৎপন্ন হওয়ার অনেক আগে সেই ক্যামব্রিয়ান যুগেই মানুষের ফসিল পাওয়া যাচ্ছে, তাহলেই তো বিবর্তনের তত্ত্ব ভেঙ্গে পড়ার কথা। যারা বিবর্তনবাদের বিরোধিতা করেন তাদের একবার ভেবে দেখা দরকার কেনো আজ পর্যন্ত যত হাজার হাজার ফসিল পাওয়া গেছে তার একটিও ভুল স্তরে পাওয়া যায়নি! এক কোষী প্রাণী, বহু কোষী প্রাণী, মাছ, উভচর প্রাণী, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ফসিলগুলো তাদের বিবর্তনের ধারাবাহিক স্তর ছাড়া অন্য পূর্ববর্তী কোন স্তরে হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠে না কেনো। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী হ্যালডেন একবার বলেছিলেন কেউ যদি প্রিক্যামব্রিয়ান স্তরে একটি খরগোশের ফসিল খুঁজে পায় তাহলে তিনি বিবর্তনবাদে আর আস্থা রাখবেন না। আমি 'মিসিং লিঙ্কগুলো আর মিসিং নেই' অধ্যায়ে পাখি, তিমি মাছ, মানুষ এবং চারপায়ী স্থলচর প্রাণীদের মধ্যেবর্তী ফসিলগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। স্থলচর প্রাণী থেকে পানিতে অভিযোজিত হয়ে সম্পূর্ণ এক নতুন ধরণের প্রজাতি তিমি মাছে পরিণত হওয়ার বিস্তারিত সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করেছি সেখানে। এই তিমির বিবর্তনটা বেশ গোলমেলে, বিজ্ঞানীরা প্রায় কয়েকশো বছর ধরে ব্যাপারটা নিয়ে হিমশিম খেয়ে শেষ পর্যন্ত খুব সাম্প্রতিককালে রহস্যটার কুলকিনারা করতে পেরেছেন। ব্যাপারটা যেহেতু বেশ একটু অন্যরকম তাই ম্যাক্রো-বিবর্তনের উদাহরণ হিসেবে এখানে এটাকেই বেছে নিচ্ছি বিস্তারিত আলোচনার জন্য। দেখা যাক তাহলে এই বৈজ্ঞানিক আবিস্কারটির পিছনে কতগুলো ছিলো বিজ্ঞানীদের কল্পনার তুলিতে আঁকা ছবি এবং মনগড়া ব্যাখ্যা আর কতগুলো এসেছিলো ফসিল রেকর্ড, জেনেটিক্স বা আণবিক জীববিজ্ঞানের মত বিজ্ঞানের আধুনিক শাখাগুলো থেকে পাওয়া প্রমাণগুলোর অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ থেকে।

এই বিশাল বপুর তিমি 'মাছ'গুলো বেশ অদ্ভুত। আমরা আর সব মাছের মতই এই গভীর সমুদ্রে বাস করা প্রাণীটাকে 'মাছ'ই বলি কিন্তু এদের সাথে মাছের বৈশিষ্ট্যের মিল খুব কম বললেই চলে। সেই ১৬৯৩ সালে ব্রিটিশ প্রকৃতিবিদ জন রে তিমিকে ডাঙ্গার স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সাথে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, ডারউইনের আগের বিজ্ঞানীরা ভেবে কুল কিনারা পাননি এই তিমিগুলো কি স্তন্যপায়ী প্রাণীর পুর্বপুরুষ নাকি তারা তাদের উত্তরসুরী! ডারউইন যখন বললেন যে তিমিগুলো ভালুকের মত কোন প্রাণী থেকে বিবর্তিত হলেও তিনি অবাক হবেন না তখন এটি নিয়ে এমনই হাসাহাসি করা হয়েছিল যে, তিনি তার Origin of species বই এর পরের সংস্করণ থেকে তা বাদই দিয়ে দিয়েছিলেন [৫]। এর পরেও বিভিন্ন বিজ্ঞানী তিমি মাছের বিবর্তন নিয়ে হিমসিম খেয়েছেন, তাদের শরীরের বিলুপ্তপ্রায় অঙ্গগুলো যে তাদের মাটি থেকে পানিতে বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে তা তো বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। তিমির দেহে এখনও রয়ে গেছে পাঁজরের এবং পায়ের হাড়ের অংশবিশেষ, তাদের কানের পাশে এখনও বেশ কয়েকটি মাংশপেশী রয়ে গেছে যেগুলো শুধুমাত্র কান নাড়ানোর জন্য প্রয়োজন হতে পারে (কিছু কিছু স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী তা করে থাকে) , বেলুগা জাতের তিমিতে এখনও লুপ্তপ্রায় বহির্কর্ণের অংশ রয়ে গেছে যেগুলো গভীর সমুদ্রে বাস করা জীবের কোন কাজেই আসতে পারে না [১১]। ১৯৪৫ সালে জর্জ গেলর্ড সিম্পসন লিখেছিলেন যে, এই তিমিরা হচ্ছে স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত এবং তার জানা ফসিল রেকর্ড থেকে তিমির উৎপত্তি এবং শ্রেনীবিভাগ করা একধরণের অসম্ভবই বলতে হবে [৬]। কিন্তু এর পরপরই ১৯৫০ সালে বিজ্ঞানীরা জৈব-রাসায়নিক পরীক্ষা করে জানালেন যে, তারা সেরাম প্রোটিনের তুলনামুলক পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে Cetacea জাতের অন্তর্ভুক্ত তিমি মাছের সাথে Artiodactyla (এই অর্ডার বা বর্গের মধ্যে জোড়া সংখ্যক আঙ্গুল বিশিষ্ট গরু, হরিণ, জলহস্তী ইত্যাদি রয়েছে) জাতের প্রাণীদের সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্য রয়েছে [৬]। কিন্তু ১৯৬৬ সালে ভ্যান ভ্যালেন আবার তিমিকে mesonychid condylarths নামক বিলুপ্ত এক মাংশাসী স্তন্যপায়ী প্রাণীর উত্তরসুরী বলে সনাক্ত করেন। ৭০ এর দশকে আমেরিকান ফসিলবিদ ডঃ ফিলিপ গিঙ্গরিচ (Philip D. Gingerich)

এবং তার দল তিমির পুর্বপুরুষের বেশ কয়েকটি প্রাচীন ফসিল খুঁজে পান মিশর এবং পাকিস্তানে [৯]। প্রায় পাঁচ কোটি বছরের পুরনো *Pakicetus* নামক (তিমির বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের ছবিগুলোর জন্য 'মিসিং লিঙ্কগুলো আর মিসিং নেই' অধ্যায়টি দেখুন) এক ধরণের স্থলচরী স্তন্যপায়ী প্রাণীর ফসিল পাওয়া যায় যার কানের হাড় গুলো তিমির মত হলেও করোটিটি দেখতে কুকুর জাতীয় প্রাণীর মত। তারপর তারা আরেকটু পরের সময়েয় ফসিল খুঁজে পেলেন যার পায়ের পাতা হাসের পায়ের পাতার মত ছড়ানো, কিন্তু পাগুলো তখনও হাটা বা সাতারের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। তারা মজা করে এর নাম দিয়েছিলেন 'Walking and swimming whale'। তারপর পাওয়া গেলো পরবর্তী স্তরের প্রাণী *Rodhocetus* -এর ফসিল, যারা ইতোমধ্যেই পানিতে সম্পুর্ণভাবে অভিযোজিত হয়ে গেছে, এদের নাকের ছিদ্র সরে গেছে অনেক পিছনে (আধুনিক তিমির মত তার পিঠের যে ছিদ্র থেকে পানি উৎক্ষেপন করে তার প্রায় অর্ধেক পথ দুরে), পাগুলো হয়ে গেছে অনেকটা ফ্লিপারের মত। তিমির বিবর্তনের ধারাবাহিকতার চিত্রটি যেনো ফুটে উঠতে শুরু করেছে চোখের সামনে। ফিলিপ গিঙ্গরিচ-এর দল তখন ভাবছেন আর কয়েকটি ফসিল পেলেই তারা প্রমাণ করে ফেলতে পারবেন যে তিমি আসলেই mesonychid থেকেই বিবর্তিত হয়েছে [৭, ৯]।

কিন্তু এর মধ্যে আবার আণবিক জীববিদেরা ডিএনএ সংকরায়ন এবং অন্যান্য পরীক্ষা থেকে জানালেন যে, মাংশাসী mesonychid নয় বরং ক্ষুরবিশিষ্ট তৃণভোজী Artiodactyla দের সাথেই তিমির সবচেয়ে বেশী জেনেটিক সাদৃশ্য আছে বলে মনে হচ্ছে। গিঙ্গরিচ-এর দল তখন আবার ফিরে গেলেন পাকিস্তানের নতুন এক জায়গায় আরও নতুন ফসিল আবিষ্কারের আশায়। শেষ পর্যন্ত বহুদিনের গবেষণার পর তাঁরা *Artiocetus clavis* এবং *Rodhocetus balochistanensis*-এর বিভিন্ন ফসিল খুঁজে পেলেন যাদের কঙ্কাল, গোড়ালীর হাড় এবং জয়েন্ট এবং করোটি থেকে বেশ পরিষ্কারভাবেই দেখা যাচ্ছে যে তিমির পুর্বপুরুষেরা আসলে তৃণভোজী ক্ষুরবিশিষ্ট জলহস্তীর পুর্বপুরুষ থেকেই বিবর্তিত হয়েছিলো। বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত আধুনিক তিমির পাঁচটি মধ্যবর্তী স্তর খুঁজে পেয়েছেনঃ তার মধ্যে *Rodhocetus* (এবং *Artiocetus)*-এর বেশ কয়েকটি প্রায়-সম্পূর্ণ ফসিল পাওয়া গেছে, *Basilosaurus* এবং *Doruden*-এরও একাধিক সম্পূর্ণ ফসিল পাওয়া গেছে [৭]। বিজ্ঞানীরা কয়েক দশকের গবেষণার পর তিমির ম্যাক্রো-বিবর্তন নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে শুরু করেছেন, এর পিছনে যে অক্লান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ক্রস পরীক্ষা, তথ্য এবং সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে তা জানলে অবাক না হয়ে উপায় থাকে না। ফিলিপ গিঙ্গরিচ Paleobiology, জার্নালের ২০০৩ সালের ২৯.৩ সংস্করণে প্রকাশিত রিসার্চ পেপারে তার আবিষ্কার এবং সেই সাথে অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণের বিস্তারিত বর্ণনা করে যে উপসংহার টানেন, তা আমি এখানে ইংরেজীতে হুবহু তুলে দিচ্ছিঃ "The fossils we know well support the idea of a unidirectional trend of increasing aquatic adaptation through *Rodhocetus* and *Dorudon* stages of whale evolution. However, superimposed on this is simultaneous change in locomotor adaptation involving a distinct reversal of specialization, from hindlimb-dominated swimming in *Rodhocetus*, to lumbusand tail-dominated swimming in *Dorudon.* Thus the overall pattern is neither simple nor direct. It is common to see microevolutionary histories zig-zag back and forth through time as they reverse themselves to track changing opportunities, and the land-to-sea transition of early whales provides a macroevolutionary example." [৮]

এবার চোখ ফেরানো যাক জীববিজ্ঞানের অত্যাধুনিক শাখাগুলো যেমন, আণবিক জীববিদ্যা, জেনেটিক্স জিনোমিক্স থেকে ম্যাক্রো-বিবর্তনের পক্ষে পাওয়া প্রমাণগুলোর দিকে। আজকে মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীর

সম্পুর্ণ জিনোম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'The great tree of life'-এর ধারণা কোন মনগড়া ক্ষ্যাপা বিজ্ঞানীর উর্বর মস্তিষ্কপ্রসুত গল্প নয়। ডারউইন তার সময়ের থেকে বেশ অনেকটা এগিয়ে থেকে সমস্ত জীবকুল যে একই আদি জীব থেকে বিবর্তিত হয়েছে বলে অনুকল্প দিয়েছিলেন তা আজকে জেনেটিক্স এবং জিনোমিক্সের কল্যাণে সুপ্রিতিষ্ঠিত একটি তত্ত্ব। আগে ফসিল রেকর্ড এবং জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে প্রাণের শ্রেণিবিভাগ করতে হত, এখন তা ক্রস পরীক্ষা করে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে পাওয়া স্বতন্ত্র তথ্যের মাধ্যমে। এটা এখন প্রমাণিত যে, বিবর্তনের সম্পর্কে এবং ধারাবাহিকতায় যে জীব যত অন্য জীবের কাছের সময়ের ততই তাদের মধ্যে ডিএনএ, আরএনএ বা প্রোটিনের সাদৃশ্য বেশী। কয়েকশো' বছর ধরে পাওয়া ফসিল রেকর্ডের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের এই তথ্য প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে! আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ঘাস, উদ্ভিদ থেকে শুরু করে কৃমি, পাখী, মাছ, মানুষ পর্যন্ত সবাই একই জটিল আণবিক মেশিন বা গঠন বহণ করে চলেছে, জীবনের ডিএনএ, আর এন এ কোড, প্রোটিন সিন্থেসিস-এর প্রক্রিয়া এবং শক্তি সঞ্চলনের এ টি পি (ATP) ব্যবস্থাও তাদের এক। মানুষ, শিম্পাঞ্জী, ইঁদুর, সহ বিভিন্ন প্রাণীর জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়েছে, আরও অনেক প্রাণীর জিন পড়ার কাজ এগিয়ে চলেছে। খুব সাম্প্রতিককালের আধুনিক জেনেটিক গবেষণা [১০] থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শিম্পাঞ্জীর জিনের সাথে আমাদের জিন ৯৯% মিলে যাচ্ছে আর ডিএনএ-এর সন্নিবেশ এবং মুছে যাওয়া (DNA insertion and deletion) ধরলে এই মিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৬%। মানুষের সাথে শিম্পাঞ্জীর যে পার্থক্য তার চেয়ে মানুষের সাথে ইঁদুরের পার্থক্য ৬০% বেশী। একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের ডিএনএ-এর গড়পরতা যে মিল তার চেয়ে একটা শিম্পাঞ্জীর সাথে একটা মানুষের মিলের পরিমাণ মাত্র ১০% কম। এমনি পার্থক্য একই প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন ভ্যারাইটিদের মধ্যেও দেখা যায়। তাই মানুষকে অনেকে বলেন 'তৃতীয় শিম্পাঞ্জী'। মানুষ এবং শিম্পাঞ্জী যে প্রায় ৬০ লক্ষ বছর আগে একই পূর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো তা নিয়ে এখন আর সন্দেহের অবকাশ নেই [১১]।

শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জীবের বংশানুসৃত দ্রব্য ডিএনএ এবং আরএনএ এবং প্রোটিনের অনুগুলোর আনবিক গঠন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে তাদের আণবিক গঠনও একই রকমের। যেমন প্রকৃতিতে ৩২০ রকমের এমাইনো এসিড পাওয়া গেলেও দেখা গেছে প্রতিটি জীব গঠিত হয়েছে মাত্র ২০টি এমাইনো এসিডের রকমফেরে। অর্থাৎ একই রকমের (২০টি) এমাইনো এসিড দিয়ে সকল জীবের প্রোটিন গঠিত। প্রোটিন অণুতে এমাইনো এসিডের আবশেষগুলোর পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসকে বলে এমাইনো এসিড অনুক্রম। ঠিক একই রকমভাবে দেখা গেছে যে, সকল জীবের ডিএনএ অনুর গঠন একক বেসও একই ধরনের। মাত্র চার প্রকার বেস (এডেনিন, গুয়ানিন, থাইমিন ও সাইটোসিন) দিয়ে সকল জীবের ডিএনএ গঠিত। প্রতি বছরই প্রকৃতিতে প্রায় হাজার খানেক করে নতুন প্রজাতির সন্ধান পাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। প্রতিদিনই নতুন নতুন ডিএনএ এবং প্রোটিন সংশ্লেষণ করছেন তারা ল্যাবরেটরীতে বসে। একটি ক্ষেত্রেও তারা ব্যতিক্রম পাননি। এখান থেকে বোঝা যায় যে, সকল জীবের উৎপত্তি যদি একই উৎস থেকে বিবর্তিত না হয়ে থাকে তবে আধুনিক জীববিদ্যার এ সমস্ত তথ্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। কাজেই সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই যে, জীবের উৎপত্তি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় - তা সে মানুষই হোক অথবা বিশাল বপু হিপোপটেমাসই হোক - সকলেই একই উৎসের ধারাবাহিক বিবর্তনের ফসল। ওদিকে আবার আনবিক জীববিদ্যা খুব ভাল ভাবে দেখিয়েছে যে প্রোটিনে এমাইনো এসিডের অনুক্রমে পরিবর্তনের কারণ ডিএনএ জেনেটিক কোডে মিউটেশন। মিউটেশনের হারও নানাভাবে নির্ণয় করা হয়েছে। যেমন প্রোটিনের এমাইনো এসিড অনুক্রম ও নিউক্লিয়িক এসিডে পলিনিউক্লিয়োটাইড অনুক্রম বিশ্লেষণ করে যথাক্রমে এমাইনো এসিড আর বেসের প্রতিস্থাপন হিসেব করে মিউটেশনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। দেখা গেছে সমগ্র জীব জগতে গড়ে ১৭.৬

মিলিয়ন বছরে একটি এমাইনো এসিড প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এর ভিত্তিতে হিসেব করলে দেখা যায় প্রাণী ও উদ্ভিদ একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ৭৯২ মিলিয়ন বছর আগে। এ হিসেবটি প্রত্নতাত্ত্বিকদের হিসেবের সাথে অবিকল মিলে যায়। সরিসৃপ এবং স্তন্যপায়ীদের 'সাইটোক্রোম সি' অণুর মধ্যে এমাইনো এসিডের গড় পার্থক্য থেকে হিসেব করে বের করা হয়েছে যে এ দুটি গ্রুপের পৃথক হতে সময় লেগেছে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন বছর। ঠিক একই ভাবে শিম্পাঞ্জী, ওরাং-ওটাং ও মানুষ বিবর্তনের ধারায় কখন একে অন্য থেকে স্বতন্ত্র হয়েছে তাও খুব নির্ভরযোগ্যভাবে নির্ণয় করা হয়েছে।

ম্যাক্রোবিবর্তনের পক্ষে আরও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে রক্তরস বিজ্ঞান থেকে। রক্তকে জমাটবদ্ধ হতে দিলে যে তরল পদার্থ পৃথক হয়ে আসে তার নাম সিরাম (serum)। এতে থাকে এন্টিজেন। এ সিরাম এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে প্রবেশ করালে উৎপন্ন হয় এন্টিবডি (antibodies)। যেমন মানুষের সিরাম খরগোশের দেহে প্রবেশ করালে উৎপন্ন হয় এন্টি হিউম্যান সিরাম। এতে থাকে এন্টি হিউম্যান এন্টিজেন। এ এন্টিহিউম্যান সিরাম অন্য মানুষের সিরামের সাথে মেশালে এন্টিজেন এবং এন্টিবডি বিক্রিয়া করে অধঃক্ষেপ বা তলানি উৎপন্ন হয়। এই অ্যান্টি হিউম্যান সিরাম নরবানর, 'পুরনো পৃথিবীর' বানর, লেমুর প্রভৃতির সিরামের সাথে বিক্রিয়া করালে দেখা যাবে, যে প্রাণীগুলোর সাথে মানুষের সম্পর্কের নৈকট্য যত বেশি তলানির পরিমাণ তত বেশি হয়। পুর্বোক্ত প্রাণীগুলোর মধ্যে বিক্রিয়ার অনুক্রম হল :

মানুষ –> নরবানর –> পুরোন পৃথিবীর বানর –> লেমুর

অঙ্গসংস্থানবিদদের মতে উল্লিখিত প্রাণীদের মধ্যে সর্বাধিক আদিম হচ্ছে লেমুর, আর সবচেয়ে নতুন প্রজাতি হচ্ছে মানুষ। তাই মানুষের ক্ষেত্রে তলানির পরিমাণ পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি আর লেমুরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম। দেখা যাচ্ছে বিবর্তন যে অনুক্রমে ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়েছে রক্তরস বিজ্ঞানের 'অ্যান্টিজেন এন্টিবডি' বিক্রিয়াও সে ধারাবাহিকতাকেই সমর্থন করে।

এখানেই গল্পের কিন্তু শেষ নয়, আজকের আধুনিক বিজ্ঞান থেকে পাওয়া বিবর্তনবাদের সমর্থনগুলো লিপিবদ্ধ করতে গেলে মহাভারত লিখতে হবে। যেমন ধরুন UBX জিনের আবিষ্কারের পর (এডয়ার্ড লুইস এই জিনটি আবিষ্কার করে ১৯৯৫ সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন) আমরা জানতে পারছি যে, এই জিনগুলো দিয়ে জীবের শরীরের গঠনের পরিকল্পনা, এবং বিভিন্ন জীবের গঠনের মধ্যে পার্থক্যগুলো ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই UBX জিনগুলো HOX জিনের অংশ এবং তাদেরকে স্পঞ্জ থেকে শুরু করে ফ্রুট ফ্লাই বা স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্যন্ত বিভিন্ন প্রাণীর দেহে পাওয়া যায়। তারা 'অন' না 'অফ' হয়ে আছে তার উপর নির্ভর করছে প্রাণীর শরীরের বিভক্তিকরণ থেকে শুর করে পা, এন্টেনা বা পাখার গঠন। এই জিনগুলোর মিউটেশন থেকেই সাপ তার পা হারিয়েছে, মাছের লোব ফিন থেকে হাতের উৎপত্তি ঘটেছে বা মেরুদন্ডী প্রাণীর মধ্যে চোয়ালের বিবর্তন ঘটেছে। এখান থেকে এখন বিবর্তনের বিভিন্ন বড় বড় ধাপের ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব, বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে ইতিমধ্যেই এমন অনেক পরীক্ষা চালিয়েছেন এবং আরও চালিয়ে যাচ্ছেন।

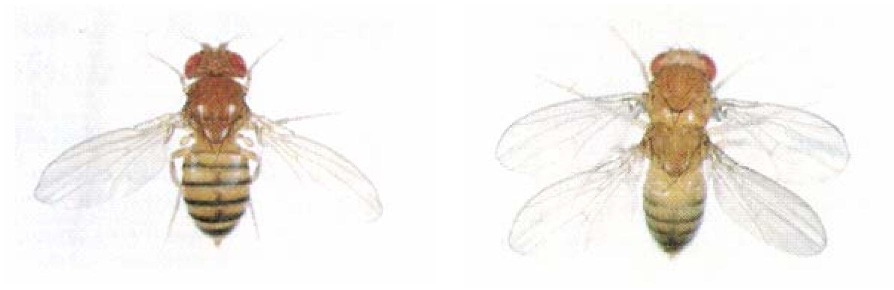

চিত্র : গবেষণাগারে ইউবি একস (UBX) জিনের মধ্যে হোমিওটিক মিউটেশনের সার্থক প্রয়োগঃ দুই পাখা বিশিষ্ট Drosophila melanogaster ফ্লাই থেকে চার পাখা বিশিষ্ট ফ্লাইয়ের উৎপত্তি। (Ref. Evolution and Development, Doglas J. Futuyama, Evolution, Sinauer Associates Inc. p.475)

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ফ্রুট ফ্লাই-এর পা এর সংখ্যা অদল বদল করে তাদের বাহ্যিক গঠন বদলে দিতে পেরেছেন। তারা আরও দেখেছেন ৪০০ মিলিয়ন বছর আগে যে প্রজাতিটি থেকে ছ' পা ওয়ালা ফ্রুট ফ্লাইগুলো ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়েছে, তাদের দৈহিক কাঠামো একেবারেই ভিন্ন ছিল। তাদের পেটের নীচের দিকে শুরের মত অসংখ্য পা সদৃশ উপাংগ ছিল। হোক্স জিনগুলোর প্রভাবে ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে ছয় পায়ে এসে ঠেকে।

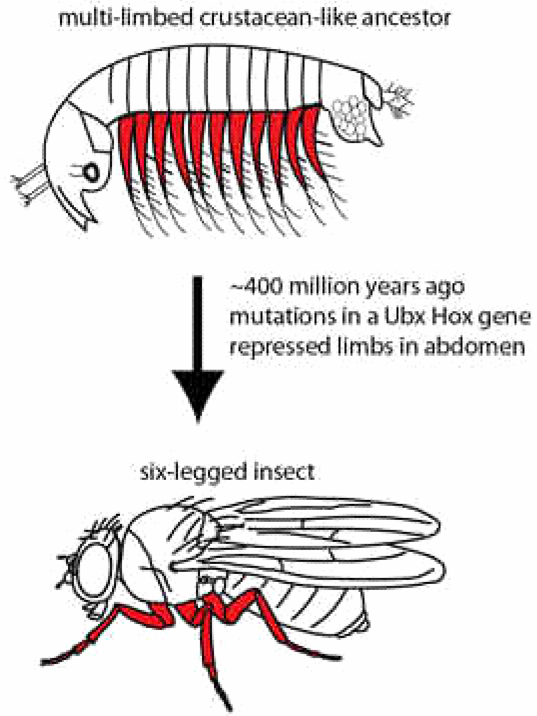

যা হোক, হোক্স জিন আর এধরণের জেনেটিক মেকানিজম সংক্রান্ত গবেষণা সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ম্যাক্রোবিবর্তনের সপক্ষে গবেষণাগার থেকেই এমন সমস্ত প্রমাণ হয়তো আমরা পেতে শুরু করব যে 'ম্যাক্রো-ইভলুশন স্রেফ বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে' - সৃষ্টিবাদীদের এ ধরনের

অভিযোগগুলো সাধারণ মানুষের কাছে নিতান্তই হাস্যকর হয়ে উঠবে।

৩) দু'চারটি আংশিক ফসিল বা হাড়গোড় পেয়েই বিজ্ঞানীরা বিবর্তনের সপক্ষে বড় বড় সিদ্ধান্ত টানেনঃ

এই ধরণের দাবী করা শুধুমাত্র বিজ্ঞানের সাথে খুব গভীর সম্পর্ক নেই এমন মানুষের পক্ষেই সম্ভব মনে হয়। বিজ্ঞান যদি বারবার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পরীক্ষা না করে, প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির না করেই দু একটি হাড়গোড় দেখেই বিবর্তনবাদের মত একটি যুগান্তকারী তত্ত্বে পৌঁছে যেতে পারে তাকে কিভাবে বিজ্ঞান বলা যায় তা আমার জানা নেই। বড়ই জানতে ইচ্ছে করে যাঁরা এই ধরণের দাবীগুলো করেন তারা কি সৃষ্টিতত্ত্ববাদী খ্রীস্টান মৌলবাদী ওয়েব-সাইটগুলো ছাড়া আর কিছু পড়ে দেখেছেন, তাদের কি আদৌ সময় হয়েছে বিবর্তনবাদের উপর লেখা একটাও পাঠ্য বই পড়ে দেখার? এই বইগুলো পড়লে তো চোখের সামনে সম্পুর্ণ ভিন্ন এক চিত্র ফুটে ওঠার কথা ছিলো। তারা দেখতে পেতেন কেমন করে দশকের পর দশক ধরে বিভিন্ন অনুকল্প পড়ে আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না পর্যাপ্ত পরিমাণে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক কম্যুনিটি তাকে গ্রহণযোগ্য বলেই গন্য করছেন না। যে ছবিগুলো বিজ্ঞানের বইয়ে ছাপা হচ্ছে তার পিছনে কত ফসিল রেকর্ড রয়েছে তা কি তারা হিসেব করে দেখেছেন। তার উপর ফসিল রেকর্ডের উপরই তো শুধু নির্ভরশীল নয় আজকের বিবর্তনবাদ, পৃথক পৃথকভাবে আণবিক জীববিদ্যা, জেনেটিক্স, এমনকি অত্যাধুনিক জিনোমিক্স শাখার গবেষণা থেকে এর পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। চলুন একটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখা যাক, দু'একটি হাড় গোড়ের উপর ভিত্তি করে নাকি দৃঢ় বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে এই তত্ত্ব এবং সিদ্ধান্তগুলো।

মানুষ এবং বনমানুষ বা এপ এর মধ্যবর্তী ফসিলের কথা উল্লেখ করেছিলাম আগের অধ্যায়গুলোতে। মধ্যবর্তী ফসিলের উদাহরণ হিসেবে ৩০-৪০ লক্ষ বছর আগে আমাদের পুর্বপুরুষ *Australopethicus afarensis* এর চেয়ে ভালো আর কি বা হতে পারে! তাদের মুখের আদল তখনও বনমানুষেরই মত, অথচ দুই পায়ে ভর করে দাঁড়াতে শিখে গেছে, বনমানুষের চেয়ে বড় কিন্তু আধুনিক মানুষের চেয়ে বেশ খানিকটা ছোট মস্তিষ্কের আকার! ডারউইন এসব ফসিল পাওয়া যাওয়ার অনেক আগেই ধারণা করেছিলেন যে আফ্রিকার বনমানুষ (গরিলা, শিম্পাঞ্জীর কোন পূর্বপুরুষ) থেকেই মানুষের উৎপত্তি হতে পারে, কিন্তু এর পিছনে তখনও কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকায় তা অনুকল্প হিসেবেই থেকে যায়। তারপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকাসহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন ধরণের মানুষের ফসিল পাওয়া যেতে শুরু করে। বিজ্ঞানীরা ক্রমান্বয়ে বুঝতে শুরু করেন যে, এতদিন আমরা যা-ই ভেবে থাকি না কেনো মানুষের প্রজাতি আসলে একটি নয়, বহু মানব প্রজাতির পদচারণায় মুখরিত ছিলো এই পৃথিবী এক সময়। ফসিলবিদেরা বনমানুষ এবং আধুনিক মানুষের মাঝখানের বিভিন্ন প্রজাতির মানুষের পূর্বপুরুষের ফসিল থেকে ধারণা করতে শুরু করেন যে, প্রায় ৪০-৮০ লক্ষ বছর আগে এই বিবর্তন ঘটতে শুরু করে। একের পর এক ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে, ডিএনএ-এর পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাইমেটদের মধ্যে অন্যরা নয় (ওরাং ওটাং বা গরিলা নয়) শুধু শিম্পাঞ্জীর সাথেই আমাদের সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। প্রাথমিকভাবে মানুষের জিনোমের সিকোয়েন্সিং করার কাজ শেষ হয়েছে সেই ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে, সেই সাথে ২০০৫ সালেশিম্পাঞ্জীর জিনোমও পড়ে ফেলেছেন বিজ্ঞানীরা। গত দুই বছরে মানুষ, শিম্পাঞ্জী, বনোবো, গরিলা এবং ওরাং ওটাং এর জীনের তুলনামুলক গবেষণা থেকেও দেখা গেছে যে, তাঁদের আবিষ্কারগুলো ফসিলবিদদের আবিষ্কৃত ফসিলগুলোর সাথে প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালের বিজ্ঞানের জার্ণালগুলো খুঁজলেই এই ধরণের হাজারো রিসার্চ পেপার

পাওয়া সম্ভব। এ তো আর হতে পারে না যে বিজ্ঞানের এতগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত শাখা থেকে পাওয়া পৃথক পৃথক ফলাফল 'ঝড়ে বক পড়া'র মত করে মিলে যাচ্ছে, আর বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা সেই ভন্ড সাধুর মত তার কৃতিত্ব নিয়ে যাচ্ছেন যুগের পর যুগ ধরে! গত ১৭ই মে ২০০৫ সালের 'Nature' জার্ণালে প্রকাশিত গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানীরা জিনোম পরীক্ষা করে এখন নিশ্চিত যে মানুষের এবং শিম্পাঞ্জীর পুর্বপুরুষেরা ৬৩-৫৪ লক্ষ বছর আগে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো [১২], যা আবার এখন পর্যন্ত পাওয়া রেকর্ডগুলোর সাথে মিলে যাচ্ছে প্রায় সম্পুর্ণভাবে। এখানে আরেকটি উদাহরণ হয়তো প্রাসঙ্গিক হবে, ফসিলবিদেরা গত শতকে নিয়ান্ডারথাল মানুষের বহু ফসিল আবিষ্কার করেছেন, তারা আমাদের আধুনিক মানুষের এতোই কাছাকাছি যে প্রথমে তাদেরকে আমাদের নিজেদের প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত বলেই গন্য করা হয়েছিল। এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে তর্ক বিতর্ক যেন আর শেষ হচ্ছিল না, অবশেষে ১৯৯৭ এ একদল বিজ্ঞানী ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে এই বিতর্কের অবসান ঘটালেন। তারা ১৮৫৬ সালে পাওয়া সেই নিয়ান্ডারথালের ফসিল থেকে ডিএনএ বের করে প্রমাণ করলেন যে, ফসিলটির বয়স আসলেই প্রায় ৩০,০০০ বছর এবং এর সাথে মানুষের আনেক বৈশিষ্ট্যের মিল থাকলেও তারা আসলে আমাদের প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত নয় [১৩]। এ তো গেলো বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ক্রস পরীক্ষণের ব্যাপারটি, এবার চলুন দেখা যাক ফসিল রেকর্ডগুলো কি ধরণের তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়।

৭০ দশকের প্রথম দিকে ইথিওপিয়া ও তানজেনিয়ায় *Australopethicus afarensis* (আফার অঞ্চল থেকে পাওয়া দক্ষিণের বনমানুষ *)* প্রজাতির আংশিক ফসিল পাওয়া যায়, এর মধ্যে ছিল হাটুর জয়েন্ট এবং পায়ের হাড়ের উপরের অংশ যেখান থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে এরা দুই পায়ের উপর ভর করে হাটতে পারতো। কিন্তু তারপরের পাঁচ বছরে আরও একই ধরণের প্রজাতির বহু ফসিল পাওয়া যেতে শুরু করে যার মধ্যে বিজ্ঞানীরা খুঁজে পান সেই বিখ্যাত লুসির প্রায় সম্পূর্ণ কঙ্কালটি। শুধু তো তাই নয় তার সাথে আরও পাওয়া গেছে ১৩ টি *Australopethicus afarensis* এর ফসিল। অনেকেই মনে করেন যে এরা কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে একসাথে মৃত্যুবরণ করেছিলো। এই সবগুলো ফসিলেরই বয়স ২৮-৪০ লক্ষ বছরের মধ্যে [১৩]। তাঞ্জেনিয়ার একটি অঞ্চলে আরও অনেকগুলো এই প্রজাতির ফসিল পাওয়া গেছে যাদের বয়স ৩৫-৪০ লক্ষ বছরের মধ্যে। আরও অদ্ভুত যে জিনিষটি পাওয়া গেছে তা হল এই অঞ্চলে একই সময়ে ঘটা এক অগ্নুৎপাতের লাভার মধ্যে সংরক্ষিত এই প্রজাতির দু'টি প্রাণীর পায়ের ছাপ। এছাড়াও ৩০-৫০ লক্ষ বছরের এই প্রজাতির আরও বেশ কিছু আংশিক ফসিল পাওয়া গেছে আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায়। প্রায় ২০ লক্ষ বছরের বেশি সময় ধরে বিবর্তিত হতে থাকা এই বিভিন্ন মাত্রার ফসিলগুলোর বিবর্তন দেখলে পরিষ্কার হয়ে ওঠে কি করে মানুষের আদি পূর্বপুরুষেরা ক্রমশঃ বনমানুষের বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে ক্রমান্বয়ে আরও বেশি করে মানুষের মত বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে শুরু করেছিলো। মানুষের বিবর্তনের উপর লেখা যে কোন ভালো বৈজ্ঞানিক বই খুললেই এর বিস্তারিত সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। আর এরকম একটি দু'টি প্রজাতির মানুষের পূর্বপুরুষের তো নয়, অনেকগুলো প্রজাতির ফসিলের সন্ধান পাওয়া গেছে এখন পর্যন্ত, যা নিয়ে মানুষের বিবর্তন অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা খুব সহজে যে কোন অনুকল্পকে সঠিক বলে গ্রহণ করেন না, পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত যে অনুকল্প অনুকল্পই থেকে যায়, তা আর তত্ত্বে রূপ নেয় না, তার প্রমাণ স্বরূপ আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আফ্রিকার চাদ নামক দেশটিতে থেকে মানুষের পুর্বপুরুষের একটি সম্পুর্ণ মাথার খুলি পাওয়া গেছে যার বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ৬০-৭০ লক্ষ বছর। খুব সম্প্রতি কেনিয়া এবং ইথিওপিয়ায় প্রায় একই সময়ের আরও দু'টি ফসিলের অংশবিশেষ পাওয়া গেছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখনও এদেরকে সবচেয়ে পুরোনো মানুষের পুর্বপুরুষের ফসিল বলে স্বীকৃতি দিতে নারাজ কারণ তাদের মতে কোন সিধান্তে পৌছানোর মত পর্যাপ্ত পরিমাণ সাক্ষ্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। লন্ডনের ন্যাচারাল

হিস্ট্রি মিউজিয়ামের মানুষের উৎপত্তি বিভাগের প্রধাণ Chris Stringer এবং প্রাক্তন প্রধান Peter Andrews-এর লেখা খুব সাম্প্রতিক (২০০৫ সালে প্রকাশিত) বই The Complete World of Human Evolution এ তারা খুব পরিষ্কারভাবেই বলছেন যে, এ সম্পর্কে কোন শেষ সিধান্তে আসা এখনও সম্ভব নয়, এ ব্যাপারে জুরির রায় এখনও প্রকাশ করার সময় হয়নি [১৪]।

এখন, যাঁরা বলেন দু'একটা হাড়গোড় থেকে বিজ্ঞানীরা এধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছান তাঁদের কি উত্তর

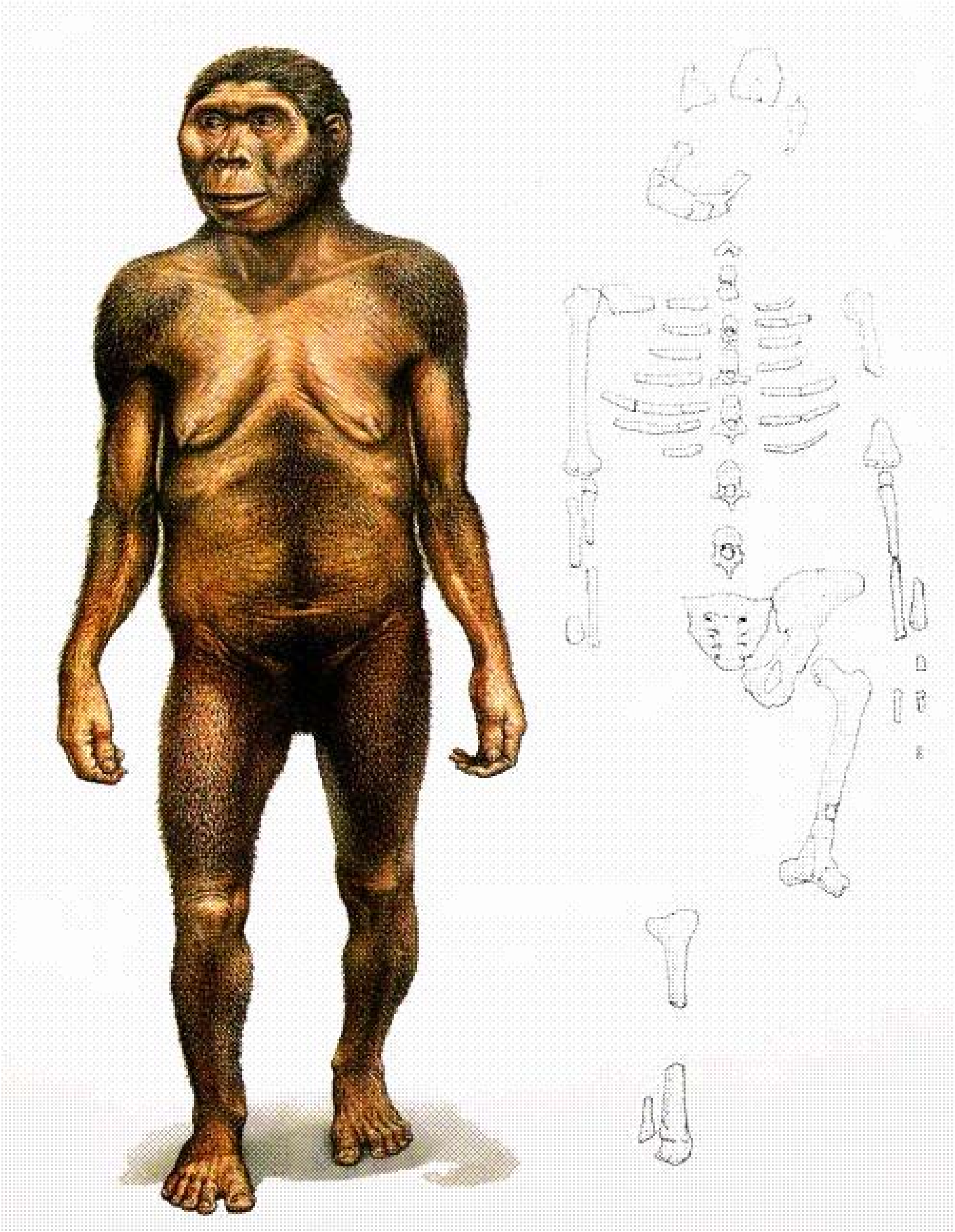

চিত্র ১০.১ : লুসির ফসিল এবং তা থেকে আঁকা সম্ভাব্য প্রতিকৃতি (১৪)

দেওয়া উচিত আসলেই বুঝতে পারি না। 'আরেকটু ধৈর্য নিয়ে পড়ে দেখুন' বা 'বই পড়ুন' ধরণের উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কি বা করার থাকতে পারে এখানে। এই ধরণের বিস্তারিত অনুসন্ধান, বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে বিজ্ঞানীরা ছবি আঁকেন বিভিন্ন প্রজাতির, মনগড়া ছবি এঁকে দেওয়ার অবকাশ কোথায় এখানে? উপরের *Australopethicus afarensis*-এর ছবিটি আঁকা হয়েছে আগে বলা সবগুলো সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে - এর পরে কেউ যদি বলেন আমরা তো ৩০-৪০ লক্ষ বছর আগে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম না, কিংবা এটি হচ্ছে বিজ্ঞানীদের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা, বা দু'একটি হাড় গোড়ের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে পৌছে যাচ্ছেন তখন এসব লোকের অজ্ঞতার পরিমান দেখে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কি বা করা যায়?

৪) একবার বনমানুষ থেকে যদি মানুষের বিবর্তন হয়ে থাকে তাহলে এখন কেনো তা আর হচ্ছে না? অর্থাৎ, একই রকম বিবর্তন কেনো বারবার ঘটতে দেখা যায় না?

অনেক বিবর্তনই মিউটেশনের মত আকস্মিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। আবার শুধু মিউটেশন বা জেনেটিক রিকম্বিনেশনের মত ব্যাপারগুলো তো ঘটলেই হবে না, তাকে আবার নির্দিষ্ট কোন সময়ের পরিবেশে সেই জীবকে টিকে থাকার জন্য বাড়তি সুবিধা যোগাতে হবে যার ফলে তা সমস্ত জিন পুল বা জনসমষ্টিতে ছড়িয়ে পড়তে পারবে। যেমন ধরুন, প্রায় ৬০-৮০ লক্ষ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষের মধ্যে যে মিউটেশন বা পরিব্যক্তিগুলো ঘটেছিল এবং তার ফলে সেই সময়ের পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যেভাবে বিবর্তন হয়েছিলো তা আবার একইভাবে ঘটা এবং তার সাথে সাথে পারিপার্শ্বিকতাসহ অন্যান্য সবগুলো ফ্যাক্টরের সংযোগ বা সমন্বয় আবার একই রকমভাবে হওয়া প্রায় অসম্ভব। বিজ্ঞানী জে. গুলড তার Wonderful Life বই তে বলেছিলেন যে, বিবর্তনের টেপটি যদি রিওয়াইন্ড করে আবার নতুন করে চালানো হয় তাহলে ফলাফল কখনই এক হবে না[১৫], এর কারণ আছে। বিবর্তন অনেকাংশেই একটি ইতিহাস-আশ্রয়ী বিজ্ঞান। ইতিহাসকে খুব সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু সব সময় আগেভাগেই তার নিঁখুতভাবে ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না। অনেকেই জানেন, বিজ্ঞানী ল্যাপ্লাস সেই আঠারো শতকের শেষ দিকে আস্থার সাথে ডিটারমিনিজম বা নিশ্চয়তাবাদের পক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন; তিনি বলেছিলেন, প্রতিটি কণার অবস্থান ও গতি সংক্রান্ত তথ্য যদি জানা যায়, তবে ভবিষ্যতের দশা সম্বন্ধে আগেভাগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে। কিন্তু বৈশ্বিক জটিলতার প্রকৃতি (nature of universal complexity) তাঁর সে উচ্চাভিলাসী স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দেয়। ইতিহাসের পরতে পরতে লুকিয়ে আছে অনাকাংক্ষিত বিশৃংখলা আর অভূতপূর্ব জটিলতা যার ফলশ্রুতিতে প্রতি মিনিটেই জন্ম নেয় নানা ধরনের নাটকীয় অনিশ্চয়তা। কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর প্রকৃতি পরিবেশ যে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে তার চিহ্ন আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই প্রকৃতির এবং জীবের বিবর্তনের ইতিহাসে, এটি সত্য, কিন্তু এই প্রাকৃতিক পরিবর্তনগুলো যদি অন্যভাবে ঘটতো তাহলে জীবের বিবর্তনের ধারাও যে অন্যরকম হত তাতে কোন সন্দেহই নেই। মানুষের উৎপত্তির ব্যাপারটাই ধরা যাক। এটি সৌভাগ্যপ্রসূত হাজার খানেক ঘটনার সমন্বয় ছাড়া কখনই ঘটতে পারতো না। ঘটনাগুলো যদি অন্যরকম ভাবে ঘটতো, তাহলে হয়তো শেষ পর্যন্ত এ পৃথিবীতে কোন 'মানবীয় সত্ত্বা'র উন্মেষ ঘটতো না। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা পর্যালোচনা করা যাক [১৬]:

(ক) আমাদের পূর্বসূরী সেই আদিম বহুকোষী জীবগুলো যদি ৫৩ কোটি বছর আগে ক্যাম্বরিয়ান

বিস্ফোরণের সময় উত্তপ্ততা আর তেজস্ক্রিয়তাসহ নানা উৎপাত সহ্য করে টিকে না থাকতো, তবে হয়তো পরবর্তীতে কোন মেরুদন্ডী প্রাণীর জন্ম হত না।

(খ) সেই লোব ফিন বিশিষ্ট মাছগুলো যারা দেহের কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর নিজস্ব ওজনকে বহন করার ক্ষমতা রাখে, সেগুলোর বিবর্তন এবং বিকাশ না ঘটলে মেরুদন্ডী প্রাণীগুলোর ডাঙ্গায় উঠে আসা সম্ভব হতো না। আবার সেই সময়ে যদি তাপমাত্রার ওঠানামার এবং বরফ যুগ শুরু হওয়ার ফলে পানির উচ্চতা কমে না যেত তাহলে হয়তো ডাঙ্গার প্রাণীগুলোর বিকাশ এভাবে ঘটতে পারতো না।

(গ) সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে এক বিশাল উল্কাপিন্ড পৃথিবীতে আছড়ে পরে বিশালাকার ডায়নোসরগুলোর অবলুপ্তির কারণ না ঘটাতো, তাহলে হয়ত সেই সময়ের নগন্য স্তন্যপায়ী জীবগুলো আর বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেত না, বরং ডায়নোসরদের প্রবল প্রতাপের সামনে কুনো ব্যাং হয়ে রইতো।

(ঘ) যদি আফ্রিকার গহীন অরণ্যে বিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ বছর আগে আমাদের পুর্বপুরুষের দেহের ভিতরে পরিবর্তন না ঘটতো এবং সেই পরিবর্তনগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা তখনকার সেই পরিবেশগত সুবিধাগুলো না পেত, তাহলে হয়তো তারা দু'পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াবার আর চলবার মত সুগঠিত হতে পারত না, আজকে মানুষের বিবর্তনও ঘটতো না, আমরাও আজকে আর এখানে থাকতাম না। কাজেই দেখা যাছে পুরো মানব বিবর্তনটিই দাড়িয়ে আছে অনেকগুলো আকস্মিক ঘটনার সমন্বয়ে। বিবর্তনের পুরো প্রক্রিয়াটা আবার প্রথম থেকে চালানো গেলেও সে 'দৈবাৎ ঘটে যাওয়া' ঘটনাগুলো একের পর এক ঘটবেই, এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারেনা।

আবার কখনও কখনও একই রকমের বিবর্তন যে সম্পুর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন জীবে ঘটে না তাও কিন্তু নয়। এর ফলে দুইটি জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত মিল দেখা গেলেও তাদের বিবর্তন কিন্তু ঘটেছে সম্পূর্ণভাবে দু'টো আলাদা প্রক্রিয়ায়। প্রকৃতিতে এরকম সমান্তরাল বিবর্তনের উদাহরণ রয়েছে অনেক। যেমন ধরুন, মানুষ এবং মলাঙ্কের চোখের মধ্যে অনেক মিল থাকলেও (ইনটেলিজেন্ট ডিজাইন অধ্যায় দেখুন) তারা যেহেতু সম্পুর্ণ আলাদাভাবে বিবর্তিত হয়েছে তাদের মধ্যে গঠনগত পার্থক্যও রয়েছে অনেক।

৫) বানর থেকে মানুষের উদ্ভব ঘটলে এখনও বানরগুলো পৃথিবীতে রয়ে গেলো কি করে?

আমার পরিচিত বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন অনেককেই এ প্রশ্নটি করতে শুনেছি। ছোট্ট এ প্রশ্ন থেকেই আঁচ করা যায় সাধারণ মানুষের মধ্যে বিবর্তন সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিমাপটুকু। যে ভুলটি প্রায়শই তারা করে থাকেন, তা হল, তারা বোধ হয় ভাবেন যে জঙ্গলে গাছের ডালে বা চিড়িয়াখানার খাঁচার রড ধরে ঝুলে থাকা বাঁদর-শিম্পাঞ্জী গুলো থেকেই বুঝি মানুষের উদ্ভব হয়েছে। আসলে তো ব্যাপারটা তা নয়। বিবর্তন তত্ত্ব বলছে মানুষ আর পৃথিবীর বুকে চড়ে বেড়ানো মানুষ এবং অন্যান্য বনমানুষগুলো অনেক অনেককাল আগে একই পূর্বপুরুষ (common ancestor) হতে উদ্ভুত হয়ে বিবর্তিত হয়ে আলাদা আলাদা প্রজাতির ধারা (lineage) তৈরি করেছে। এর মানে কিন্তু এই নয় পৃথিবীতে বিদ্যমান সব শিম্পাঞ্জীগুলো মানুষ হয়ে যাবে বা সব মানুষগুলো শিম্পাঞ্জী হয়ে যাবে। প্রাণের বিকাশ এবং বিবর্তনকে একটা বিশাল গাছের সাথে

তুলনা করা যায়। একই পূর্বপূরুষ থেকে উদ্ভুত হয়ে বিবর্তনের ওই গাছটির (জাতিজনি বৃক্ষ) বিভিন্ন ডাল পালা তৈরি হয়েছে (উপরের ছবি দ্রষ্টব্য)। এর কোন ডালে হয়তো শিম্পাঞ্জীর অবস্থান, কোন ডালে হয়ত গরিলা আবার কোন ডালে হয়ত মানুষ। অর্থাৎ, একসময় তাদের সবার এক সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিলো, ১.৪ কোটি বছর আগে তাদের থেকে একটি অংশ বিবর্তিত হয়ে ওরাং ওটাং প্রজাতির উদ্ভব ঘটে। তখন,

যে কারণেই হোক, এই পূর্বপুরুষের বাকি জনপুঞ্জ নতুন প্রজাতি ওরাং ওটাং এর থেকে প্রজননগতভাবে আলাদা হয়ে যায় এবং তার ফলে এই দুই প্রজাতির বিবর্তন ঘটতে শুরু করে তাদের নিজস্ব ধারায়। আবার প্রায় ৯০ লক্ষ বছর আগে সেই মুল প্রজাতির জনপুঞ্জ থেকে আরেকটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং পরবর্তিতে ভিন্ন ধারায় বিবর্তিত হয়ে গরিলা প্রজাতির উৎপত্তি ঘটায়। একইভাবে দেখা যায় যে, ৬০ লক্ষ বছর আগে এই সাধারণ পুর্বপুরুষের অংশটি থেকে ভাগ হয়ে মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির বিবর্তন ঘটে। তারপর এই দু'টো প্রজাতি প্রজননগতভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন থেকেই

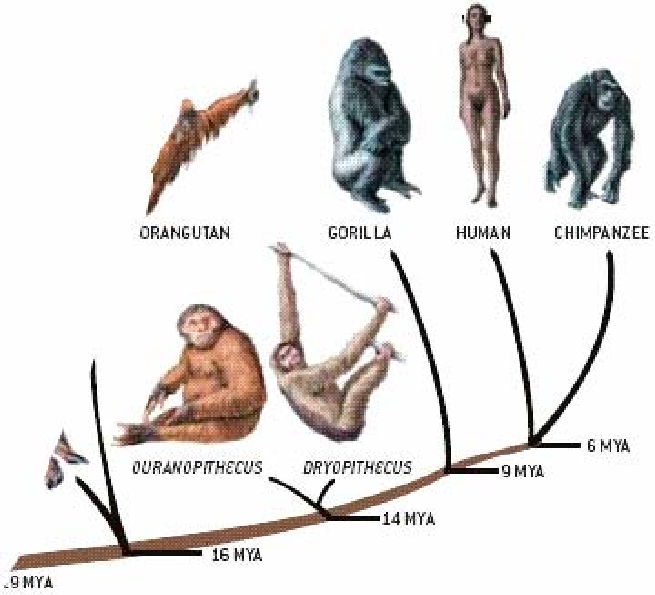

চিত্রঃ ১০.২ : সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিভিন্ন সময়ে মানুষ, শিম্পাঞ্জী, গরিলা এবং ওরাংওটাং এর বিবর্তন ।

একদিকে স্বতন্ত্র গতিতে এবং নিয়মে মানুষের প্রজাতির বিবর্তন ঘটতে শুরু করে, আর ওদিকে আলাদা হয়ে যাওয়া শিম্পাঞ্জীর সেই প্রজাতিটি ভিন্ন গতিতে বিবর্তিত হতে হতে আজকের শিম্পাঞ্জীতে এসে পৌঁছেছে। সুতরাং কোন এক সাধারণ পুর্বপুরুষ থেকে দু'টো প্রজাতির উৎপত্তি ঘটলেই যে তাদের একটিকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে হবে বা এক প্রজাতির সবাইকে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে হবে এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম প্রকৃতিতে নেই। বিবর্তন প্রায়শঃই কাজ করে ঝোপের মত, ক্রমাগতভাবে একই দিকে উপরে উঠতে থাকা মইয়ের মত নয়।

৬) বিবর্তন তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রকে লংঘন করেঃ

এটি যারা বলেন তাদের তাপগতিবিদ্যা (Thermodynamics) এবং এর সূত্রগুলো সম্বন্ধে কোন বাস্তব ধারণা নেই। তাপগতিবিদ্যার তিনটি সুত্র আছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় সূত্রটি বলছে : 'তাপ কখনও নিজে

থেকে শীতল বস্তু হতে গরম বস্তুতে যেতে পারে না।' সূত্রটিকে অনেক সময় এভাবেও বলা হয় : 'একটি বদ্ধ সিস্টেমে এনট্রপি কখনও কমতে পারে না।'

এনট্রপি ব্যাপারটিকে অনেকসময় সাদামাটাভাবে বিশৃঙ্খলা বা disorder হিসেবে দেখানো হয়। এনট্রপি কমার অর্থ হচ্ছে সাদামাটা ভাবে বিশৃংখলা কমা। তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্র বলছে বদ্ধ সিস্টেমে এনট্রপি কমতে পারবে না, বাড়তে হবে।

বোঝা যাচ্ছে যে, তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্রটি যে ভাবে বলা হচ্ছে তা শুধু বদ্ধ সিস্টেমের জন্যই প্রযোজ্য। আমাদের বাসার রেফ্রিজেটরের উদাহরণটি হাজির করি। আমরা সবাই জানি যে, রেফ্রিজেটরে তাপকে 'উল্টো দিকে' চালিত করা হয়, অর্থাৎ, শীতল অবস্থা থেকে গরম অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়, ফলে সেখানে পানি জমে বরফ হতে পারে। বৈজ্ঞানিকভাবে এর অর্থ হচ্ছে রেফ্রিজেটরের ভিতরে এনট্রপি কমেছে। কিন্তু তাপকে এই 'উল্টো দিকে' চালিত করার জন্য রেফ্রিজেটরকে বাড়তি কিছু কাজ করতে হয়। কাজ করবার শক্তিটুকু রেফ্রিজেটরটি কোথা হতে পায়? রেফ্রিজেরটের পেছনে লাগানো মোটর আর কিছু জ্বালানী এই শক্তিটুকু সরবরাহ করে। কিন্তু এই শক্তিটুকু সরবরাহ করতে গিয়ে তারা ঘরের এনট্রপিকে বাড়িয়ে তোলে। এবারে খাতা কলম নিয়ে হিসেব কষলে দেখা যাবে পানিকে বরফ করে রেফ্রিজেটর তার ভেতরে এনট্রপি যত না কমিয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশী বাড়িয়ে তুলেছে ঘরের এনট্রপি। কাজেই যোগ-বিয়োগ শেষ হলে দেখা যাবে এনট্রপির নেট বৃদ্ধি ঘটেছে। কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি শুধুমাত্র রেফ্রিজেটরের ভিতরটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে পারে, এনট্রপি তো কমে গেছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে পুরো সিসটেম (ওপেন সিস্টেম) গোনায় ধরলে দেখবে যে, এনট্রপি আসলে কমেনি, বরং বেড়েছে।

বিবর্তনের ব্যাপারটাও তেমনি। সূর্য আমাদের এ পৃথিবীতে প্রতি নিয়ত শক্তির যোগান দিয়ে চলেছে। সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবদেহে কোষের বৃদ্ধি ঘটে, এবং কালের পরিক্রমায় বিবর্তনও ঘটে। শুধুমাত্র জীবদেহের দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হবে যে এনট্রপি কমেছে। কিন্তু ঠিকমত হিসেব-নিকেশ করলে তবেই বোঝা যবে যে, এই 'আপাতঃ এনট্রপি' কমাতে গিয়ে শক্তির যোগানটা পড়ছে অনেক বেশী। কাজেই এনট্রপির আসলে নীট বৃদ্ধিই ঘটছে।

সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থার উত্তরণকে যারা 'এনট্রপি কমার' অজুহাত তুলে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের লংঘন ভাবেন তারাও ভুল করেন। প্রকৃতিতে সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় উত্তরণের উদাহরণের অভাব নেই। এমনকি জড়জগতেও এধরনের 'আপাতঃ এনট্রপি' কমার উদাহরণ রয়েছে বিস্তর। ঠান্ডায় জলীয়-বাষ্প জমে তুষার কণিকায় পরিণত হওয়া, লবনের মধ্যে কেলাস তৈরী, কিংবা পাথুরে জায়গায় পানির ঝাপটায় তৈরী হওয়া জটিল নকসার ক্যাথেড্রালের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতে বিরল নয়। কোনটির ক্ষেত্রেই তাপগতির সূত্র ব্যহত হয়নি। কাজেই কালের পরিক্রমায় সরল জীব থেকে বিবর্তিত হয়ে জটিল জীবের অভ্যুদয় কোন অসম্ভব ঘটনা নয়, নয় তাপগতিবিদ্যার লংঘন।

৭) বিবর্তনের সাথে সাথে স্কুল কলেজের বিজ্ঞানের পাঠ্যসুচীতে ধর্মীয় সৃষ্টতত্ত্ব বা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন পড়ানো উচিত।

অনেকেই নিরপেক্ষতার খাতিরে এ ধরনের যুক্তিকে 'গ্রহনযোগ্য' বলে মনে করেন। সত্যি তো, বিবর্তনবাদের পাশাপাশি সৃষ্টি তত্ত্ব স্কুল কলেজের বিজ্ঞানের ক্লাশগুলোতে পড়ালে অসুবিধাটা কি? একটু

চিন্তা করলেই এ ধরনের যুক্তির নানা অসারতা ধরা পড়ে। আমাদের সমাজে ছড়িয়ে আছে হাজারো লোক কথা, উপকথা, কুসংস্কার আর রূপকথা। সবকিছুকেই কি বিজ্ঞানের ক্লাসে অন্তর্ভূক্ত করা হয়? নাকি উচিৎ? বিজ্ঞানের সংজ্ঞাই হচ্ছে - 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও পদ্ধতিগতভাবে লব্ধ জ্ঞান।' বিজ্ঞানীরা বলেন, অলৌকিক কিংবা অপার্থিব (supernatural) বিষয়গুলো বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে ন, কারণ ওগুলো পরীক্ষা করে সত্যাসত্য নির্ণয় করা যায় না। ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা কিংবা কোন বুদ্ধিমান সত্ত্বা সত্যই এ মহাবিশ্ব বানিয়েছিলেন কিনা এটি বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা কিংবা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। আর তা ছাড়া অলৌকিক কারণ খুঁজতে চাইলে সব কিছুতেই অলৌকিক কারণ খুঁজে ফেরা সম্ভব। গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে আকর্ষণ বলকে মাধ্যাকর্ষণ দিয়ে ব্যাখ্যা না করে তার পেছনে কোন বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বার কারসাজি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, ঠিক যেমনি ভাবে বৃষ্টিপাতেরর কারণকে জলচক্র (water cycle) দিয়ে ব্যাখ্যা না করে কোন অশরীরী সত্ত্বার কাজ বলে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যাকে কি 'বৈজ্ঞানিক' বলা যাবে নাকি বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হবে?

শুধু বিজ্ঞান কেন আমরা দৈনিন্দিন জীবনের ঘটনাবলিকে প্রাকৃতিক কারণ দিয়েই ব্যাখ্যা করি। কোন উড়োজাহাজ দুর্ঘটনাকবলিত হয়ে ভূপাতিত হলে পুলিশ এবং গোয়েন্দারা এর পেছনে তার পেছনে যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কিনা, কিংবা মিসাইলের কোন আঘাত লেগেছিল কিনা, কিংবা বিমানের ভিতরে কোন সন্ত্রাসবাদী বোমা বহন করছিল কিনা, এধরনের বিভিন্ন পার্থিব কারণই অনুসন্ধান করেন, অলৌকিক কিংবা অপার্থিব কারণ নয়। বাসায় ডাকাতি হলে আমরা চোর ডাকাতদের অভিযুক্ত করেই থানায় রিপোর্ট করি, কোন অশরীরী সত্ত্বাকে অভযুক্ত করে নয়। ডগলাস ফুটুইমা বিবর্তনবাদের উপর সবার্ধিক বিক্রিত পাঠ্যপুস্তক 'Evolution' -এ সরাসরি বলেছেন [১]:

> 'যেহেতু অপার্থিব বা অলৌকিক অনুকল্পগুলো বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষণ যোগ্য নয়, সেহেতু এ নিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা হতে পারে না। তার মানে এই যে, এ ধরনের বিষয়গুলো বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য নয়।'

ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন বা সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পকে যারা স্কুলের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করতে চান, তাদের দাবী যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, তা দেখিয়ে দশম অধ্যায়ে (ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন অধ্যায় দ্রষ্টব্য) বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প মুলতঃ কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণারই অংশ নয়, কারণ কোন বৈজ্ঞানিক জার্নালেই তাদের কোন গবেষণার প্রতিফলন দেখা যায় না। রিচার্ড ডকিন্স এবং জেরী কয়েন ২০০৫ সালে সেপটেম্বর মাসে গার্ডিয়ানে প্রকাশিত 'One side can be wrong' প্রবন্ধে তাই লিখেছেন [১৭]:

> 'আইডি যদি একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হত, তবে বৈজ্ঞানিক জার্নালগুলোতে এ নিয়ে গবেষণার প্রতিফলণ আমরা দেখতে পেতাম। আমরা তেমন কোন কিছুই এখনো দেখি নাই। এমন নয় যে বৈজ্ঞানিক জার্নালগুলো আই ডি সংক্রান্ত গবেষণা ছাপতে চায় না। আসলে আই ডি নিয়ে ছাপার মত কোন গবেষণারই অস্তিত্ব নেই। আইডির প্রবক্তারাও এটি বোঝেন। তাই তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে পাশ কাটিয়ে সাধারণ জনগণের কাছে আর সুচতুর সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছেন।'

৮) বিবর্তন নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক থেকে বোঝা যায় যে, বিবর্তনবাদ আসলে ভুল, ডারউইনের তত্ত্বের কোন ভিত্তি নেই।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কোন বৈজ্ঞানিক জার্নালে বিবর্তনের বিরোধিতা করা হয় না। বিজ্ঞানীরা বিবর্তন কিভাবে ঘটছে অর্থাৎ বিবর্তনের বিভিন্ন ধরণের প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলেও বিবর্তনবাদের মূল বিষয়বস্তু অর্থাৎ 'বিবর্তন আদৌ ঘটছে কিনা' তা নিয়ে একবারও সন্দেহ প্রকাশ করেন না। কারণ বিবর্তনের বাস্তবতা অনেক আগেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে, এখন জার্নালগুলোতে বিতর্ক চলেছে বিবর্তনের প্রক্রিয়া নিয়ে, কিংবা বিবর্তন ঘটার হার নিয়ে কিংবা প্রজাতির উদ্ভবের পেছনে থাকা কোন কারিগরী বিষয় নিয়ে। এ ধরনের সুস্থ বিতর্ক বিবর্তন কেন, বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই বিদ্যমান। বিজ্ঞান যে অনবরত প্রশ্ন করে, চোখ বন্ধ করে কিছুই মেনে নেয় না, নতুন নতুন জ্ঞানের আলোকে পুরনোকে ঝালাই করে এগিয়ে চলে এটা বিজ্ঞানের শক্তিশালী দিক, একে খারাপ প্রতিপন্ন করার চেষ্টাই বরং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

অথচ সৃষ্টিবাদীরা বিজ্ঞানের এই শক্তিশালী দিকটি বিকৃত ভাবে উপস্থাপন করেন। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টিফেন জে গুল্ড যখন তার বিবর্তনের 'punctuated-equilibrium' এর মডেলটি উপস্থাপন করলেন, তখন সৃষ্টিবাদীরা তাদের বিভিন্ন ওয়েব সাইটে গুল্ডের রচনার বিভিন্ন অংশ লিপিবদ্ধ করে প্রমাণ করতে চাইলেন যে বিজ্ঞানীরা নিজেরাই বিবর্তনের মত 'বিতর্কিত' বিষয়ে নিয়ে একমত নন। অথচ বাস্তবতা কিন্তু ঠিক উল্টো। স্টিফেন জে গুল্ড সারা জীবন ধরেই বিবর্তনবাদের পক্ষেই প্রচার চালিয়েছিলেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা তৈরি করতে বিবর্তন বিষয়ে বহু 'জনপ্রিয় ধারার' প্রবন্ধও লিখেছেন। অথচ সৃষ্টিবাদীরা অসচেতন জনগণের মধ্যে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন যেন মনে হয় গুল্ড তার নতুন তত্ত্বের মাধ্যমে পুরো বিবর্তনকেই অস্বীকার করছেন।

আর 'অধিকাংশ বিজ্ঞানীরাই বিবর্তন তত্ত্বকে অস্বীকার করেন'- এরকম একটা ধারণা সৃষ্টিবাদীরা জনগণের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে সচেষ্ট হলেও ব্যাপারটা কিন্তু আসলে ডাহা মিথ্যা। ১৯৯৫ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলীদের মধ্যে চালানো জরিপে (Gallup poll, 1995) দেখা যায় এদের মধ্যে মাত্র ৫% সৃষ্টিবাদী, বাকি সবারই আস্থা আছে বিবর্তন তত্ত্বে। আর যারা জীববিজ্ঞান এবং প্রাণের উৎস নিয়ে গবেষণা করেন তাদের মধ্যে তো ইদানিংকালে সৃষ্টিবাদীদের খুঁজে পাওয়াই ভার। ৪,৮০,০০০ জন জীববিজ্ঞানীদের উপর চালানো জরিপে মাত্র ৭০০ জন জন সৃষ্টিতাত্ত্বিক পাওয়া গেছে, শতকরা হিসেবে যা ০.১৫ এরও কম [১৮]। কিন্তু এদের মধ্যে আবার অনেকেই প্রাণের প্রাথমিক সৃষ্টি কোন এক সৃষ্টিকর্তার মাধ্যমে হয়েছে মনে করলেও তারপর যে প্রাণের বিবর্তন ঘটছে প্রাকৃতিক নিয়মেই তা মেনে নেন। এ জরিপের ফল শুধু আমেরিকার ভেতর থেকেই উঠে এসেছে, যে দেশটি আক্ষরিক অর্থেই 'সৃষ্টিবাদীদের আখড়া' হিসেবে পরিচিত এবং রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে অনেক বেশী রক্ষণশীল। এদিক দিয়ে অনেক বেশী প্রগতিশীল অবস্থানে থাকা ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন সৃষ্টিবাদী বিজ্ঞানী নেই বললেই চলে।

বহু বৈজ্ঞানিক সংগঠন বিবর্তনের সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণকে এতই জোরালো বলে মনে করেন যে, বিবর্তনের সমর্থনে তারা নিজস্ব statement পর্যন্ত প্রকাশ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবীর বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত National Academy of Science এর মত প্রথিতযশাঃ সংগঠন ১৯৯৯ সালে বিবর্তনের স্বপক্ষে লিখিত বক্তব্য দিয়ে একটি ওয়েবসাইট পর্যন্ত প্রকাশ করেছে। ১৯৮৬ সালে লুজিয়ানা ট্রায়ালে

বাহাত্তর জন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী সুপ্রিম কোর্টে বিবর্তনের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন প্রদান করেছিলেন।

জীববিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞান, জেনেটিক্স, জিনোমিক্স বা আণবিক জীববিদ্যার কোন শাখাই বিবর্তনের কোন সাক্ষ্যের বিরোধিতা করছে না; আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছি যে ডারউইনের পরে গত দেরশো বছরের কিভাবে বিবর্তন তত্ত্ব পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত হয়েছে। জেনেটিক্সের বিভিন্ন শাখার গবেষণা যে গতিতে এগিয়ে চলেছে তাতে আশা করা যায় আমরা আচিরেই আরও অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর পেতে সক্ষম হব। আর বিজ্ঞানীরা সে লক্ষ্যেই নিরন্তর কাজ করে চলেছেন।

তথ্যসুত্রঃ

১. Futuyma DJ, 2005, Evolution, pg.523, Sinauer Associates, INC, MA, USA

২. Gould SJ, 1994, Evolution as Fact and Theory.
http://www.stephenjaygould.org/library/gould-and-theory.htm

৩. Dawkins R, 2004, The Ancestor's Tale, A pilgrimage to the dawn of evolution, Houghton Miffin Company, Boston, New york, p 86.

৪. Futuyma, DJ, 2005, Evolution, Sinauer Associates, INC, MA, USA, p 76.

৫. Raymond S, 2001, The Origin of Whales and the Power of Independent Evidence, TalkOrigin website. http://www.talkorigins.org/features/whales/

৬. Gingerich PD, 2005 . Cetacea. In K. D. Rose and J. D. Archibald (eds.), Placental mammals: origin, timing, and relationships of the major extant clades, Johns Hopkins University Press, Baltimore, pp. 234-252. http://www-personal.umich.edu/~gingeric/PDFfiles/PDG432_rosearch_cetacea_opt.pdf

৭. Gingerich PD, Research on the Origin and Early Evolution of Whales (cetacea), http://www-personal.umich.edu/~gingeric/PDGwhales/Whales.htm

৮. Gingerich PD, 2003, The Land to Sea Transition in early Whales, Paleobiology, 29(3), pp.429-454
http://www-personal.umich.edu/~gingeric/PDGwhales/Whales.htm

৯. Was Darwin Wrong, 2004, National Geographic, November issue.

১০. New Genome Comaprison Finds chimps, humans very similar at DNA level, 2005, NII/National Human Genome Reserach Institute, Originally published in journal 'Nature', September 1, 2005. http://www.sciencedaily.com/releases/2005/09/050901074102.htm

১১. Benton M, 2001, Evidence of Evolutionary Transitions. Originally published in American Institute of Biological Sciences.
http://www.actionbioscience.org/evolution/benton2.html

১২. Human and chimp Genomes Reveal New Twist on Origin of Species, 2006, Broad Institute of MIT and Harvard, Originally published in Nature Online, http://www.sciencedaily.com/releases/2006/05/060518075823.htm

১৩. Stringer, C. and Andrews, P , 2005, The Complete World of Human Evolution, Thames and hudson Ltd, London, pp 178-180.

১৪. Stringer, C. and Andrews, P , 2005, The Complete World of Human Evolution, Thames and hudson Ltd, London, pp 117-118.

১৫. Interview with Futuyma D, 2004, Evolution in action Natural Selection: How Evolution Works, An ActionBioscience.org original interview, http://www.actionbioscience.org/evolution/futuyma.html

১৬. Gould, SJ, 1994, The evolution of life on earth, Scientific American, October issue.

১৭. Dawkins R and Coyne J, 2005, One Side Can be Wrong, Guardian.

১৮. CA111: Scientists reject evolution?, 2006, Talk Origin Archive, http://www.talkorigins.org/indexcc/CA/CA111.html.

রঙীন প্লেট দ্রষ্টব্য

{বন্যা আহমেদের *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটি অবসর প্রকাশনী থেকে ২০০৭ এর একুশে বইমেলায় প্রকাশিতব্য। }